বাংলা পেশাদারি থিয়েটার একটি ইতিহাস

নাট্যচিন্তা

বাংলা পেশাদারি থিয়েটার : একটি ইতিহাস

প্রকাশক : তন্দ্রা চক্রবর্তী
নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন
১০বি ক্রিক লেন। কলকাতা ৭০০ ০১৪
ফোন : ২২৬৪৪৮৮৮/৬৫৪৫৬৯২৮/২৩৩৭০৩৯৫

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০২

মুদ্রণ : অলকা দাস
বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৪

বাঁধাই : বিভাবতী বাইন্ডিং

NATYACHINTA FOUNDATION
JOURNAL ON THEATRE, PERFORMING ARTS
& OTHER SOCIAL SUBJECTS
PUBLICATION OF BOOKS
AUDIO CD-CASSETE UNIT

বাংলা পেশাদারি থিয়েটার : একটি ইতিহাস

প্রথম পর্ব

প্রাথমিক আলোচনা ও তথ্য

বাংলা পেশাদারি থিয়েটার : একটি ইতিহাস

তৃতীয় পর্ব

চতুর্থ পর্ব

বাংলা পেশাদারি থিয়েটার : একটি ইতিহাস

চতুর্থ পর্ব

বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিপাত

প্রচ্ছদ : রথীন চক্রবর্তী । অলঙ্করণ : অলকা দাস

ব্যবহৃত ছবি

রামনারায়ণ তর্করত্ন। মধুসূদন দত্ত। নবীনচন্দ্র বসু। কালীপ্রসন্ন সিংহ। দীনবন্ধু মিত্র। ধর্মদাস সুর। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। গিগিশচন্দ্র ঘোষ। শিশিরকুমার ভাদুড়ী। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। আশুতোষ দেব। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। অমৃতলাল বসু। শিশিরকুমার ঘোষ। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অহীন্দ্র চৌধুরী। সরযূবালা দেবী। মলিনা দেবী। তিনকড়ি। বিনোদিনী। মহেন্দ্রলাল বসু। তারাসুন্দরী। বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার। বিধান সরণির স্টার থিয়েটার। স্টারের ষষ্ঠ পর্বের প্রথম নাটক শ্যামলী। স্টার পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বিজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠান। মিনার্ভা : বিজ্ঞাপন। মিনার্ভা : লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজনা কল্লোল। বিশ্বরূপা : প্রথম প্রযোজনা আরোগ্য নিকেতন। শ্রীরঙ্গাম ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী : রিজিয়া, চন্দ্রগুপ্ত, প্রফুল্ল। রঙমহল : প্রথম প্রযোজনা বিষ্ণুপ্রিয়া। রঙমহল : বিজ্ঞাপন ও সংবাদপত্রের আলোচনা। রঙ্গানার প্রথম প্রযোজনা : নট-নটী। সারকারিনার প্রথম প্রযোজনা : তুষার যুগ আসছে। মাইকেল। সাজাহান। ক্ষুধা। সেতু। একক দশক শতক। নামজীবন

কৃতজ্ঞতা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও মুনতাসীর মামুন। প্রতিভা অগ্রবাল ও নাট্যশোধ সংস্থান। রঙ্গানা কর্তৃপক্ষ। মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ। সারকারিনা কর্তৃপক্ষ। অজয় কুমার শীল। সচ্চিদানন্দ চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

প্রথম প্রচ্ছদের ছবি : 'শ্যামলী' নাটকে উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রবি রায়
চতুর্থ প্রচ্ছদের ছবি : 'শ্রীমতী ভয়ঙ্করী' নাটকে রবি ঘোষ ও বাসবী নন্দী

সংস্কৃতির ছাই!

১.

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় তথা পেশাদারি নাট্যশালা গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল কম-বেশি দু'শ বছর। সেই থিয়েটার প্রায়-বিলুপ্ত হতে দশ বছর সময়ও লাগেনি। একে একে আলো নিভে আসছিল, তবুও স্থবিরতা সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারেনি, এমনই এক সময়ে মাঝরাতে আগুন লেগে পুড়ে গেল স্টার থিয়েটার। গোটা প্রক্রিয়াই তখন স্তব্ধপ্রায়। কিন্তু আছে শুধু বিবৃতির পর বিবৃতি, ভাষণের পর ভাষণ, প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি। শুরু হল স্টার-রাজনীতি। এবং দেখা গেল, তারও পেছনে আছে আরও বড় খেলা, প্রোমোটার-রাজনীতি। প্রোমোটার, অর্থাৎ যাঁরা এখন সংস্কৃতির দিশারী, রাজনীতির বড় বোদ্ধা, সমাজসেবার সব থেকে বড় মোহান্ত। যাঁদের পেছনে একই সঙ্গে আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের পৃষ্ঠপোষণা এবং সমাজবিরোধী গুন্ডাবাহিনীর সহযোগী হাত। সুতরাং স্টারের পুনরুজ্জীবন নিয়ে বেসরকারি স্তরে যাঁরা কিছুটাও এগিয়েছিলেন তাঁরাও অতঃপর নীরব হলেন। যে পুরসভা বিস্তর হইচই ফেলে স্টার 'অধিগ্রহণ' করল তাদের মুখেও কথা নেই। চতুর্দিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলা সময়ের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হল রঙমহল। অতঃপর কেউ আর কোনও কথা বলল না, একটিও বিবৃতির টুকরো উড়ল না আকাশে। পড়ে রইল শুধু সংস্কৃতির ছাই!

২.

বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের দিকে আমরা, 'প্রগতিশীল' মানুষরা, চিরকালই একটু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকেছি। অপেশাদারি বাংলা থিয়েটারের সচেতন রাজনীতি-সমৃদ্ধ কর্মীদের অনেকেই এখনও বলেন, ওরা। ভাবখানা এমন, ওরা, মানে ওপারের ফুটপাথের মানুষেরা। বিপ্লব-বিবর্জিত লোকজনেরা। এই উন্নাসিকতা পেশাদারি থিয়েটারকে যেমন সহমর্মিতালাভ থেকে বঞ্চিত করেছে,

তেমনই অপেশাদারি থিয়েটারকেও বাঁচার পথে সামান্যতম সাহায্য করেনি। যে নীতিহীনতাকে ঘৃণা করত রাজনীতি-দীক্ষিত অপেশাদারি থিয়েটার, তাদের অনেকেই আজ নীতিহীনতার শিকার। তির্যক দৃষ্টির এই প্রথা, এই সাংস্কৃতিক-বিচ্ছিন্নতা, কার্যত সংস্কৃতির জগৎকে টুকরো টুকরো করেছে, এবং এখনও করে চলেছে। আর এই বিভাজন যত বাড়ছে সংস্কৃতি তত দুর্বল হচ্ছে, তার পিঠে সওয়ার হচ্ছে রাজনৈতিক মাফিয়া ও প্রোমোটারের দল।

৩.

বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের অবলুপ্তির জন্য দায়ী কে, এমন একটি মনোলোভা প্রশ্নের পেছনে ছোটার কোনও ইচ্ছা আমাদের নেই। পরিবর্তনশীল সময় বা রুচির পর্বান্তর বা পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ইত্যাদি সদাব্যবহৃত শব্দ দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তরকে আবৃত করার কৌশল গ্রহণ করতেও ইচ্ছা হয় না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা পেশাদারি থিয়েটারকে আমাদের আদর্শগত ভাবনা দিয়ে মনোমতোভাবে মুড়তে না পারায় তার বিলুপ্তিতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা বোধহয় মেনে নিতে রাজি নন যে তাঁদের কাঁথার কোণাতেও আগুন লেগেছে। আগুনের মাথাগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছে।

৪.

এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের নির্মাণ ও বিলুপ্তি' নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অধিক জরুরি বলে আমাদের মনে হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ২০০১ সালে আমরা 'নাট্যচিন্তা' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম। 'বাংলা পেশাদারি থিয়েটার : একটি ইতিহাস' তারই পুনঃপ্রকাশ। আমরা লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছি বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের ইতিহাস, যাতে এ বিষয়ে আগামী দিনের আগ্রহী মানুষদের তা কিছুটা সাহায্য করতে পারে। কারণ সকলেই তো দেখেছেন, কীভাবে অসামান্য বেলগাছিয়া নাট্যশালার বাড়িটি প্রথমে মেট্রো রেল এবং অতঃপর সর্বশক্তিমান প্রোমোটারের হাতে চলে গেছে! বাংলা পেশাদারি থিয়েটার বলে আর কিছু নেই। একটি জাতির সংস্কৃতির একটি প্রধান ধারা আজ নিশ্চিহ্ন।

৫.

গোর্কি লিখেছিলেন, 'সংস্কৃতির প্রভুরা! আপনারা কোন পক্ষে?'
আমাদের সংস্কৃতির প্রভুদের কাছেও আমরা প্রশ্নটি রাখতে চাই।

লিয়েদেফের প্রযোজনার প্রথম রজনীর প্রচারপত্র

BENGALLIE THEATRE.

THE DISGUISE.

লিয়েবেদেফের প্রযোজনার নাট্যপবিচিতিপত্র
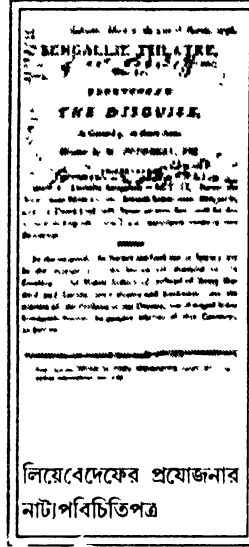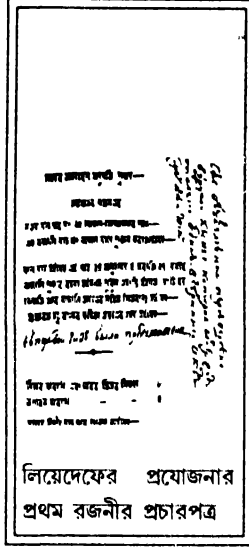
প্রথম বাংলা পেশাদারি রঙ্গামঞ্চ

রথীন চক্রবর্তী

১.

বাংলা পেশাদারি থিয়েটার এবং সাধারণ রঙ্গালয় নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভেই অনিবার্য প্রবেশ বিতর্কের।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থের শুরুতেই লিখেছেন : 'প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ সালে। ইহার সহিত পরবর্তীকালের বাংলা নাট্যশালার কোনও যোগ নাই। কারণ এই নাট্যশালায় বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দ্বারা বাংলা নাটক অভিনীত হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী নহেন।'

এর কিছু পরেই ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীর কীর্তি। দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সহিত উহার কোনও যোগ ছিল না, তাই উহা স্থায়ী হইতে পারিল না। বিদেশী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা ও বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যকার দেশী নাট্যশালার মধ্যে চল্লিশ বৎসরেব ব্যবধান।'

রামমোহন-কালের ব্রাহ্মণদের বর্ণ ও জাত-পাতের আচার-বিচারের মতোই ব্রজেন্দ্রনাথের এই দেশী-বিদেশী সংস্কার আজকের দিনের সংস্কৃত-মনস্ক যে কোনও মানুষকেই ব্যথিত করবে। প্রতিষ্ঠাতা অবাঙালি, তাই বেঙ্গালি থিয়েটার 'সত্যকার' বাংলা নাট্যশালা নয়, এই স্বতঃসিদ্ধতা ব্রজেন্দ্রনাথের মতো নমস্য এক ইতিহাসবেত্তার ভাবমূর্তিকে অনেকটাই নষ্ট করবে বলে মনে হয়, যদি গুর্মুখ রায়ের অর্থে প্রতিষ্ঠিত স্টার থিয়েটারের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ আনা যায়।

তাছাড়া আরও কিছু কথা, কিছু প্রশ্ন অতি-সংক্ষিপ্ত এই পঙ্‌ক্তি ক'টির মধ্যে বিকট শব্দে দাপিয়ে বেড়ায়। যেমন, 'ইহার সহিত পরবর্তীকালের যোগ নাই', এমন একটি রায় ঘোষণার কোনও উপযুক্ত ব্যাখ্যা ব্রজেন্দ্রনাথ দেননি। এবং, 'দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সহিত উহার কোনও যোগ ছিল না, তাই উহা স্থায়ী হইতে পারিল না' — এই ব্যাখ্যাও

ইতিহাসকে বিকৃত করে। ব্রজেন্দ্রনাথের বৈদগ্ধ রক্ষার উদ্দেশ্যে বরং ধরে নেওয়া যেতে পারে, লিয়েবেদেফের বেঙ্গালি থিয়েটারে ইংরেজরা যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সেই তথ্য ব্রজেন্দ্রনাথের জানা ছিল না।

খুবই বিস্মিত করে দেওয়ার মতো ঘটনা, কিরণচন্দ্র দত্ত তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' বইতে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেফ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গালি থিয়েটারের কোনও উল্লেখই করেননি। হয় বিতর্কের ঝুঁকি না নেওয়ার কারণে, অথবা চূড়ান্ত লিয়েবেদেফ বিরোধিতায়।

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীদের কীর্ত্তি। দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সহিত উহার কোনও যোগ ছিল না, তাই উহা স্থায়ী হইতে পারিল না। লেবেডেফের ইংলন্ড-প্রয়াণের পরই উহা লুপ্ত হইল। বিদেশী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'এই প্রথম' বঙ্গীয় নাট্যশালা ও বাঙালী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যকার দেশী নাট্যশালার মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। এই চল্লিশ বৎসর বাঙালী জীবনে একটা যুগ-পরিবর্ত্তনের সময়।' ব্রজেন্দ্রনাথের মতে, এই চল্লিশ বছর সময়কাল হল 'বাঙালী কর্ত্তৃক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত'-এর সময়।

নাট্যনিষ্ঠ মানুষ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, ব্রজেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার মধ্যে কী বিচিত্র ভারসাম্যহীনতার অবস্থান। লিয়েবেদেফের বেঙ্গালি থিয়েটারে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল দু'বার। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর ও ১৭৯৬ সালের ২১ মার্চ। লিয়েবেদেফের নিজের কথা থেকে জানা যায়, প্রেক্ষাগৃহ দু'বারই পূর্ণ হয়ে যায়। উৎসাহিত হয়ে লিয়েবেদেফ তৃতীয় অভিনয়ের আয়োজন করেন। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের জন্য তা হতে পারেনি। সুতরাং দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সঙ্গো যোগ ছিল না, 'তাই উহা স্থায়ী হইতে পারিল না' — এসব কথা খুবই খেলো মনে হয়। দ্বিতীয়ত, লিয়েবেদেফের ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার পর এই থিয়েটার লুপ্ত হয়, একথাও সত্য নয়। অগ্নিকাণ্ডের পর এই থিয়েটার লিয়েবেদেফ বন্ধ করে দেন, অর্থাৎ লুপ্ত হয়, এবং তারপর লিয়েবেদেফ স্বদেশের পথে ইংল্যান্ডে রওনা হন। তৃতীয়ত, প্রথম 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' এবং 'সত্যকার দেশী নাট্যশালা' কথা দুটির মধ্যে অদৃশ্য পার্থক্যের সুতোটাকে কোথায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং ঠিক কোন স্পর্শপ্রবণ বিন্দুতে পা পড়লেই সেই সুতোয় টান পড়ছে তা বোঝা খুবই কঠিন। 'সত্যকার দেশী নাট্যশালা' কথাটি মায়াজাল বিস্তার ছাড়া কিছুই নয়। এই সূত্রে বলতে হয়, চল্লিশ বছরের ব্যবধান এমন বিরাট কিছু সময়-বিচ্ছেদ নয়, অন্ততপক্ষে প্রজন্মগত যোগসূত্র এতটা অনিবিড় নয় যে বেঙ্গালি থিয়েটারের ছায়া বা প্রচ্ছায়া সেই সময়কাল পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। বরং উল্টোটাই বলা যেতে পারে। বেঙ্গালি থিয়েটারের আশপাশে বিরাজমান ছিল যে একাধিক ইংরেজি নাট্যশালা, যার দর্শক অনেকাংশেই ছিলেন নব্য বাঙালিবাবুরা, তাঁদের মনের মধ্যে ধূমকেতুর মতো হলেও, এই বেঙ্গালি থিয়েটার রেখে গিয়েছিল একটা আবেশ, এবং সংযোগের হাতছানি, যাতে প্রথম সাড়া দিয়েছিলেন নবীনচন্দ্র বসু। হ্যাঁ, বিতর্ক এখানেও। কিন্তু মনে রাখা দরকার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নারকেলডাঙার বাড়িতে হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করলেও নাটক অভিনীত হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়। অন্যদিকে নবীনচন্দ্র বসু তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে বাংলায় অনূদিত ভারতচন্দ্র রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় করান। কিন্তু কোনওটাই সাধারণ রঙ্গালয় নয়, কারণ সর্বসাধারণের জন্য তা উন্মুক্ত ছিল না। সে গৌরব লিয়েবেদেফের বেঙ্গালি থিয়েটার করতে পারে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের অনুসিদ্ধান্ত হল : 'সৌখিন নাট্যদল বাগবাজার এমেচার থিয়েটার তথা শ্যামবাজার নাট্যসমাজ নামে বাগবাজারের যে-কয়টি যুবক মিলিয়া 'লীলাবতী'-নাটকের অভিনয় করেন, তাঁহাদের দ্বারা পরিশেষে এই অভাব পূর্ণ হয়। তাঁহাদের দলই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া কলিকাতায় প্রথম পেশাদারী নাট্যশালা পত্তন করেন।'

এখানে অবশ্যই একটা ফাঁক আছে। 'কলিকাতায় প্রথম পেশাদারী নাট্যশালা', ব্রজেন্দ্রনাথ বাংলা দেশের প্রথম বাংলা পেশাদারি নাট্যশালার কথা বলেননি। কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছেন : 'ন্যাশনাল থিয়েটার কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও, সর্বপ্রথম ঢাকাতেই টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় প্রদর্শিত হয়।' ব্রজেন্দ্রনাথের এই উক্তি অবশ্যই বেঙ্গালি থিয়েটারকে হিসেবের বাইরে রেখে।

এই শিথিল-বর্ণন কোনও ইতিহাসসন্ধানীকে তৃপ্ত করতে পারে বলে মনে হয় না। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার, পরে নাম পাল্টে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ শৌখিন অভিনয় করেন, প্রথমে 'সধবার একাদশী' সাতবার, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের বাড়িতে মঞ্চ বেঁধে; দ্বিতীয় প্রযোজনা দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী', সেটাও একটি বাড়িতে মঞ্চ বেঁধে, এবং তারপর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। এই নীলদর্পণ করার সময় শ্যামবাজার নাট্যসমাজ নাম পাল্টে করা হয় 'কলিকাতা ন্যাসনেল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি।' ১৮৭২ সালের ১০ নভেম্বরের সুলভ সমাচারের বিজ্ঞাপন সেকথাই বলে। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর স্মৃতিকথাকে উদ্ধৃত করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, পরে নাম প্রস্তাব হয় দা ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েটার, এবং তারপর সিদ্ধান্ত হয় দা ন্যাশনাল থিয়েটার। ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ করে ন্যাশনাল থিয়েটার, এবং সেটা টিকিট বিক্রি করে। 'দেশী', 'সত্যকার দেশী', বঙ্গাজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-কেই অতঃপর বলা হতে থাকল প্রথম বাংলা সাধারণ নাট্যশালা। অন্যদিকে, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক ১৮৬১ সালে পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা শহর থেকে প্রকাশিত হয়ে ঢাকাতেই অভিনীত হয় প্রথম। মুনতাসীর মামুন জানিয়েছেন, এর আগেও ঢাকাতে থিয়েটারের চল ছিল, তবে সেটা শখের পর্যায়ে। কিন্তু 'নীলদর্পণ'-এ টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল। এরপর ১৮৭০-৭২ সালের মধ্যে ঢাকায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে একটি হল স্থাপন করা হয়। সেখানে একটি বাঁধা স্টেজ ছিল। এই হলে পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ মঞ্চস্থ করে তাদের প্রথম নাটক 'রামাভিষেক', টিকিট : চারটাকা, দু'টাকা, একটাকা। এসব তথ্য কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ ও অন্য ইতিহাসকাররা উল্লেখ করেননি।

দ্বিতীয়ত, যদিও প্রায় সকলেই জানেন, বাগবাজার অ্যামেচার প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল থিয়েটার আদৌ 'ন্যাশনাল' ছিল না। জাতীয় স্তরে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব করার মতো বোধ, ইচ্ছা, ক্ষমতা কোনওটাই তাদের ছিল না। এই থিয়েটারের কোনও নাট্যশালা ছিল না। আপার চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের বাড়ির সামনের অংশের জমিতে মঞ্চ বাঁধা হয়েছিল, মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায়। এই থিয়েটারের সঙ্গো 'ন্যাশনাল' শব্দটির অর্থের সামান্যতম যোগ ছিল না বলেই এই নামকরণে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, এবং এই থিয়েটারের সঙ্গো তিনি কোনও সম্পর্ক রাখেননি। পরে ফিরে আসেন, তাঁর সুবিধাবাদী চরিত্রের সঙ্গো সাযুজ্য রেখে। সেটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গা।

তৃতীয়ত, টিকিট বিক্রি যদি 'সাধারণ নাট্যশালা' এবং সেই সূত্রে 'পেশাদারি নাট্যশালা' চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা হয়, তাহলে প্রথম স্থান বেঙ্গালি থিয়েটারের, দ্বিতীয় স্থান ঢাকার এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের অধিষ্ঠান তৃতীয় আসনে।

চতুর্থত, সাধারণ নাট্যশালার সঙ্গো পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গির যে নিকটবর্তিতা বা যোগ তাও এখানে অনুপস্থিত। এই থিয়েটারের কোনও পেশাদারি কাঠামো ছিল না। কোনও পেশাদারি পরিকল্পনা ছিল না। যদিও অর্থ রোজগারের জন্য এই থিয়েটার কলকাতার বাইরে অভিনয় করেছে। এই থিয়েটারের সঙ্গো শিল্পীদের পেশাগত কোনও যোগও ছিল না। যে কারণে অল্পদিনের মধ্যেই দল ভেঙে যায়।

সব থেকে বড় ঘটনা, নীলদর্পণ মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে সরকারের তরফে যখন ন্যাশনাল থিয়েটারকে ধমক দেওয়া হয়েছিল তখন এই থিয়েটার কর্তৃপক্ষ সবিনয়ে লিখিতভাবে মুচলেকা দিয়েছিলেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁরা কোনও কথাই বলেননি, ইংরেজদের মানহানি ঘটানোর কোনও ইচ্ছাই তাঁদের নেই। সাধারণের মধ্যে বিকাশের এবং আদর্শ ও পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি, কোনওটাই কি এই ঘটনায় বিধৃত?

তবুও একে প্রথম বাংলা সাধারণ ও পেশাদারি নাট্যশালা বলে চিহ্নিত করা হয়। বা করা হয়েছে। যেমন এক ইতিহাসপ্রণেতা লিখেছেন : 'ন্যাশনাল থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেই এদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত।' এই অতিসরল উপপাদ্য রচনা দুঃখজনক।

ব্রজেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীরা একটা কথা প্রায়শই বলেন, বেঙ্গালি থিয়েটার পরবর্তী যুগের ওপর কোনও প্রভাব রাখতে পারেনি। ১৭৯৫ সালের পর ১৯০৮ সালে, ১৩ বছর পর চন্দননগর থিয়েটারে অভিনীত হয় একটি ফরাসি নাটকের অনুবাদ। এর ২৫ বছর পরে হিন্দু থিয়েটার, চার বছর পরে নবীন বসু। এই বিন্দুগুলি কি এতই বিচ্ছিন্ন যে

তাতে 'প্রভাব' বা দৃষ্টান্তের কোনও ছায়াপাত বা অনুরণন নেই বলে আমরা শেষ কথা জারি করতে পারি?

ইতিহাসবিদবৃত্তের বিশ্লেষণ কয়েকটি ভাবলৌকিক বিশেষণে চিহ্নিত। ১. প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা। ২. বাঙালির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। ৩. বাঙালির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা নাট্যশালা। ৪. প্রথম বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়। ৫. প্রথম বাংলা পেশাদারি রঙ্গালয়।

ফল হল এই, প্রথম বাংলা নাট্যশালা এবং পেশাদারি থিয়েটারের প্রশ্নে পরবর্তীকালে নাট্যবুদ্ধিজীবীরা স্পষ্টত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। একদল স্পষ্টতই প্রথম বাংলা পেশাদারি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হিসাবে চিহ্নিত করলেন ১৮৭২ সালকে, এবং এই সূত্রে ১৯৭২ সালে মহাসমারোহে 'বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষ' (কথাটা খুবই অপরিচ্ছন্ন। কারণ, সাধারণ, না পেশাদারি, না অপেশাদারি, অথবা বঙ্গজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, নাকি বিদেশীর?) উৎসব পালিত হয়। সেই সময়ের অতি জনপ্রিয় ও সর্বাধিক বিক্রিত সিনেমা পত্রিকা 'প্রসাদ'-এ একটি অশিক্ষিত ও অসাংস্কৃতিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় :

সারা ভারতে
প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় : বাঙলায়
উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা : বাঙালী
অভিনীত নাটক : বাঙলা

অপর দল এই সময়চিহ্নকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে তাঁদের বিশ্লেষণ ও অবতরণে অনড় রইলেন। ১৯৯৫ সালে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ, দুই বাংলাভাষী জনপদেই বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পালিত হল বাংলা নাট্যশালার দ্বি-শতবর্ষপূর্তি উৎসব। ১৯৭২ সালে যদি বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষ হয়, তাহলে ১৯৯৫ দ্বিশতবর্ষ হয় কী করে, স্পষ্ট গলায় কেউই এই প্রশ্ন তুললেন না। বরং দেখা গেল, যাঁরা ১৮৭২ সালকে প্রথম নাট্যশালা এবং প্রথম বাংলা পেশাদারি নাট্যশালা স্থাপনের জন্মকাল চিহ্নিত করার সমর্থক ছিলেন, তাঁরাও বা তাঁদের অধিকাংশই ১৯৯৫ সালের দ্বি-শতবর্ষপূর্তি উৎসবে শামিল হয়েছেন। সম্ভবত এই কারণেই যে, ১৭৯৫ সালকে অগ্রাহ্য করার পক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমুখ যেসব যুক্তি এতদিন দেখিয়ে এসেছিলেন সেইসব যুক্তির ওপর আর ভরসা করতে পারছিলেন না এই মতবাদিকরা। এবং সকলের উদ্যোগ ও প্রস্তাবক্রমে লিয়েবেদেফের নামে কলকাতায় একটি রাস্তাকে নামাঙ্কিত করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। উল্লেখ্য, ১৯২২ সালে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার অর্ধ-শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হয়েছিল। ১৯৭২ সালে শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি উৎসব কমিটি গঠিত হয়, এবং ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ড. অজিতকুমার ঘোষের সম্পাদনায় একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই স্মারক গ্রন্থে অর্ধ-শতবর্ষপূর্তি উৎসবের কথা জানা যায়। শতবর্ষ উৎসব কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

কিন্তু ইতিমধ্যেই ১৭৯৫, না ১৮৭২, এই প্রশ্নে বিতর্ক দেখা দিতে থাকে। ১৯৭২ সালেই, শতবর্ষপূর্তি উৎসব যখন চলছিল, তৃপ্তি মিত্র দেশ পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায় লিখলেন 'শতবর্ষের নাটক' শিরোনামে : 'এই যে শতবর্ষপূর্তি উৎসব, এটা পাশ্চাত্য প্রথায় বাংলা নাটক পরিবেশনের উৎসব। যা নাকি শুরু করেছিলেন গেরাসিম লেবেদেফ, সঙ্গে গোলকনাথ দাস, ১৭৯৫ সালে একটি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ নিয়ে। পূর্বের সমস্ত ঐতিহ্য বাদ দিলে ওই নভেম্বর মাসকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের সূচনা বলে ধরলে ক্ষতি হয় না। কেননা প্রথমত, লেবেদেফ রঙ্গালয়টির নাম দিয়েছিলেন 'বেঙ্গলী থিয়েটার'। দ্বিতীয়ত, টিকিট কাটলে যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষেই ওই থিয়েটারে প্রবেশাধিকার সম্ভব ছিল। কাজেই টিকিট বিক্রির প্রথাটিকে যদি মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা যায় তাহলে সেই ঘটনা শুরু হয়েছিল ১৭৯৫ সালে। .... ১৮৭২ সাল নাটকেব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই। কিন্তু তার গৌরব টিকিট বিক্রি প্রথা প্রবর্তনের জন্য নয়। তার গুরুত্ব নীলদর্পণ নাটক করার জন্য। .... এই দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮৭২ সালকে দেখলে বোধহয় ভালো হত।'

এবং ১৯৮৭ সালে তৃপ্তি মিত্রই সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় একটি নিবন্ধে তির্যক প্রশ্ন তুললেন : '১৯৯৫ সালের আর দেরি নেই, এবার কি তাহলে লেবেদেফের, প্রথম বাংলা থিয়েটারের দুইশত বার্ষিকী পালন হবে?'

তৃপ্তি মিত্রকে উদ্ধৃত করার কারণ এই নয় যে, তিনি ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ ছিলেন কোনওদিন, বরং তাঁর উদ্ধৃতিতে আমরা তৃপ্ত এজন্যই যে ১৯৭২ সালের সেই উৎসবের মধ্যেই এবং বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের নানাবিধ দোলাচলতার মধ্যেও তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি প্রশ্নটিকে লিখিতভাবে সর্বসমক্ষে স্থাপন করেছিলেন। বিষণ্ণতা এখানেই যে, ১৯৯৫ সালে বাংলা থিয়েটারের দু'শ বছর পূর্তির সময় তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন না।

২.

এই বিতর্ককে বহন করে নেওয়া যেতে পারে আরও অনেক দূর, তাতে লিয়েবেদেফকে যেমন খাটো করা যাবে না, তেমনই অন্যদের অযৌক্তিক সম্মানিত করার সুযোগও থাকবে বলে মনে হয় না। তবে একটা কথা বোধহয় মনে রাখা ভালো, বাংলা দেশে 'ওল্ড প্লে হাউস' নির্মাণ তথা বাংলা সংস্কৃতিতে 'থিয়েটার'-এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থে, কিন্তু বেঙ্গালি থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অন্তরালে সম্ভবত তেমন কোনও উদ্দেশ্য খেলা করেনি। বাংলার মাটিতে সংস্কৃতির বীক্ষণ ইংরেজি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা অবশ্যই একটি রাজনৈতিক কৌশল। এবং প্রথম দিকে তার আভিজাত্য ও জাতি-বর্ণ-ময় প্রকাশ ও উপস্থিতি এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে অনুসরণলোভা হয়ে উঠলেও সম্ভ্রম আদায় করতে পারেনি। বেঙ্গালি থিয়েটার তা পেরেছিল। পেরেছিল বলেই তার ওই মর্মান্তিক পরিণতি।

সেই পরিণতির পুনরাবৃত্তি দু'শ বছর পরেও। স্টার থিয়েটার ভস্মীভূত, রঙমহল অগ্নিদগ্ধ। অন্য পেশাদারি মঞ্চগুলিও মৃত ও লুপ্ত। সমগ্র জীবন যখন আজ দাবি করছে সার্বিক পেশাদারি পটুত্ব, সংস্কৃতিব সমস্ত শাখা-প্রশাখা, তখন একটি অঙ্গানেই শুধু শৌখিনতার বিলাস?

মধুসূদন সান্যালের বাড়ি

রামনারায়ণ তর্করত্ন

মধুসূদন দত্ত

নবীনচন্দ্র বসু

কালীপ্রসন্ন সিংহ

অন্তর্বর্তীকালীন অপেশাদারি থিয়েটার

কিরণচন্দ্র দত্ত

... যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে 'কলি-রাজার যাত্রা' নাটকখানিই সর্বপ্রথম নাটক নামধেয় পুস্তক। কলিকাতা রিভিউ পত্রের (Calcutta Review Vol XIII 1850) ১৬০ পৃষ্ঠা হইতে জানা যায় যে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে 'কলি-রাজার যাত্রা' নাটকাভিনয় হইয়াছিল। ১২২৭ সালে ইংরাজি ১৮২১ খ্রি. বাঙ্গালা সংবাদপত্র 'সংবাদ কৌমুদী'র ৮ম সংখ্যায় এই অভিনয় কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, (১৭৭৪-১৮৩৩) যখন এই পুস্তকখানিকে 'যাত্রা নামধেয় হইলেও 'নাটক' সংজ্ঞা দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তখন ইহাকে বাঙ্গালার প্রথম নাটক বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করা যায়। 'কলিকাতা রিভিউ' মধ্যে প্রদত্ত 'সংবাদ কৌমুদীয়' বিবরণ হইতে জানা যায় যে ওই পত্রের ৫ম সংখ্যায় 'অধুনা প্রচারিত নাটকগুলির দুষিত রুচির' আলোচনা প্রবন্ধে কয়েকখানি নাটকের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু এই সকল নাটকগুলির নাম, রচয়িতার নাম বা এই সকল নাটকগুলি কখনও অভিনীত হইয়াছিল কি না, বা এইগুলি ইংরাজি অনুকরণে লিখিত কিছুই জানা যায় না। এবং উল্লিখিত নাটক 'কলিরাজার যাত্রা' নাম হইতে যদি অনুমান করা যায় যে ইহা ইংরাজি নাটকানুকরণে লিখিত নহে তাহা কি অসমীচীন হইবে?

বাঙ্গালার প্রথম নাট্যাভিনয় ১২৩৭
বঙ্গাব্দ বা ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ

প্রায় দশ বৎসর পরে ১২৩৭ বঙ্গাব্দে বা ইংরাজি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে (৬ তারিখে) কোজাগর-পূর্ণিমা রজনীতে কলিকাতায় বাঙ্গালীর দ্বারা প্রথম বাঙ্গালা নাটকাভিনয় হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র বসু বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার বাটিতে (এই বাটির চিহ্নমাত্র নাই। শ্যামবাজার মোড়ের দিকে, কৃষ্ণরাম বসুর গলিতে

প্রবেশ করিয়াই বর্তমান ট্রাম কোম্পানির আস্তাবল ও তৎসংলগ্ন ভূমিতে এই বৃহদায়তন অট্টালিকা ছিল) 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করেন। বিশ্বকোষ-কার লিখিতেছেন, — 'এই অভিনয়ে প্রথমে চিত্রিত নাট্যশালার ব্যবস্থা হয় নাই। নাটকোক্ত দৃশ্যাবলী বাটীর নানাস্থানে প্রকৃত সাজ-সজ্জাদির দ্বারা সাজান হইয়াছিল। এক ঘর হইতে অন্য ঘরের মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া সুড়ঙ্গ করা হইয়াছিল। বকুলতলার পুষ্করিণীর দৃশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে অট্টালিকাসংলগ্ন উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতীরে সজ্জিত হইয়াছিল। বীরসিংহের দরবার (নবীনবাবুর) সুবৃহৎ বৈঠকখানায় সাজান হইয়াছিল। (অট্টালিকা সংলগ্ন) উদ্যানের এক পার্শ্বে মালিনীর কুটীর ও মালঞ্চ সজ্জিত (গুছান) হইয়াছিল। একস্থানে এক দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া, (অন্য দৃশ্য দর্শনের জন্য যেখানে সেই দৃশ্য সাজান হইয়াছে, দর্শকগণকে সেইখানে উঠিয়া যাইতে হইত।) ছুটাছুটি করিয়া অন্য দৃশ্য দেখিতে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। — ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ত্রী অভিনেত্রীগণের ভূমিকাগুলি স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনীত হয়। যোগীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, — 'আধুনিক রীতি অনুসারে বিচার করিলে নবীনবাবুর বাটীর অভিনয় অবশ্যই সম্পূর্ণ নাটকোচিত হয় নাই, কিন্তু দৃশ্যপটের সমাবেশ, কৃত্রিম সুড়ঙ্গ খনন এবং (পুরুষ) অভিনেতাগণের সঙ্গে (স্ত্রী) অভিনেত্রীগণের প্রবর্তন, ইত্যাদির জন্য ইহাকেই বঙ্গদেশের প্রথম নাটকাভিনয় বলা যাইতে পারে।' পাঠকগণ, উপরোক্ত বিবরণ দুইটি হইতে আমাদের বঙ্গদেশে নাট্যশালার উৎপত্তির তৃতীয় অনুমান সপ্রমাণ হয় না কি? এই নাটকাভিনয়ের সহিত আমাদের পূর্বকথিত যে 'শ্রীরাম লীলা' অভিনয়ের সৌসাদৃশ্য বিশেষভাবে বর্তমানেও দেখা যায় না কি? শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রবাবুও এক প্রকারে স্বীকার করিলেন যে এই নাটকাভিনয় আধুনিক রীতি (ইংরাজি অনুকরণে) অনুসারে হয় নাই। এবং 'বিশ্বকোষ'-এর 'রঙ্গালয়' লেখক যে 'রঙ্গামঞ্চের অভাবে নানাস্থানে দৃশ্য সাজাইয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করার নবীনবাবুর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়' পাইয়াছেন তাহার মূলেও সেই উত্তর- পশ্চিম দেশবাসীদিগের প্রবর্তিত রাম-লীলা অভিনয়ের অস্তিত্ব আমরা বেশ অনুভব করিতেছি। নবীনবাবুর এই নাট্য সম্প্রদায় অন্তত চার-পাঁচ বৎসর কাল জীবিত ছিল। কিন্তু 'বিদ্যাসুন্দর' ব্যতীত অন্য নাটকাদি অভিনীত হইত কি না তাহা জানা যায় নাই। ১৮৩৫ খ্রি. (১২৪১ সাল) প্রকাশিত হিন্দু পাইওনীয়ার 'Hindu Pioneer' নামক পত্রে (২২) অক্টোবর সংখ্যায় জানা যায় যে তখনও 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হইতেছে। রাত্র ১২।।০ টার সময় আরম্ভ করিয়া পর দিবস প্রাতে ৬। ।০ ঘটিকা পর্যন্ত এই অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে ঐক্যতানবাদন সম্প্রদায় দ্বারা যন্ত্রসংগীত দেশীয় অভিনয়ের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। বেহালাবাদক প্রমথ গোস্বামী (ব্রজনাথ গোস্বামী) মহাশয় উচ্চ প্রশংসা পান। যতদূর জানা যায় তাহাতে বরাহনগর নিবাসী শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — সুন্দর, রাধামণি বা মণি — বিদ্যা, জয়দুর্গা — রাণী ও মালিনী এবং রাজকুমারী বা রাজু — সহচরীর ভূমিকাগুলি অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের জন্য এবার রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছিল। চিত্রিত নানা দৃশ্যাবলী-সংযোজিত এই নাট্যশালা ও এই সকল অভিনয়ের জন্য নবীনবাবু শুনা যায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ধন্য নবীনবাবু! ধন্য বাগবাজার — বঙ্গীয় নাট্যাভিনয় ও নাট্যশালার জন্মভূমি! প্রথম বাঙ্গালা নাট্যাভিনয় ১২৩৭ সালের (৬ অক্টোবর, ১৮৩৫) কোজাগর পূর্ণিমা রজনীতে আদি কবি ভারতচন্দ্রের (১৭১১-১৭৫৯) 'বিদ্যাসুন্দর'!

২.

বাগবাজারের সেই নবীনবাবুর অনুষ্ঠিত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের বাঙ্গালা নাটকাভিনয়ের পর অর্থাৎ 'বিদ্যাসুন্দর' হইবার পর বাঙ্গালার কোনও স্থানে কোনও বাঙ্গালা নাটক অভিনীত হইয়াছিল কি না তাহা অন্তত ১৮৫৭ খ্রি. পর্যন্ত সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। ১২৬৩ বঙ্গাব্দ ইং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ হইতেই বাঙ্গালা নাটকাবলীর অভিনয় প্রকৃত আরম্ভ হইয়াছে ইহা বেশ বলা যায়। কেননা এই ১২৬৩/১৮৫৭ অব্দেই কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটার সন্নিকটে চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাটীতে সিমুলিয়ার আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) বাটীতে, জোড়াসাঁকোর স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে, গদাধর শেঠের বাটীতে; ও মফস্বলের নানা স্থানে বিশেষত চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত হইতে ভাষান্তরিত বাঙ্গালা নাটকাবলীর অভিনয় হইয়াছিল। আমরা সংক্ষেপে সেই সকল অভিনয়ের ইতিহাস এখানে দিলাম।

১। ১২৬০ বঙ্গাব্দে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'রঙ্গপুর বার্তাবহে' এক বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহার মর্ম এইরূপ — ছয় মাস মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নামক উৎকৃষ্ট নাটক বঙ্গ ভাষায় রচনা করিতে পারিবেন, তিনি রঙ্গপুর কুন্ডীর, সেই বদান্য মাতৃভাষার উন্নতিকামী জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত ৫০৲ টাকার এক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন। 'পতিব্রতা উপাখ্যান' রচনা করিয়া কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন ১২৫৯ বঙ্গাব্দে এই মহাত্মা-ঘোষিত আর এক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবারও তিনি ১২৬১/১৮৫৪ অব্দে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন। বলাবাহুল্য, রামনারায়ণের এই রচনা পূর্বের ন্যায় সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হইয়া উক্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই নাটক তিন বৎসর পরে লোকসমাজের নিকট সবিশেষ আদৃত হয়, ও তখনকার নাট্যাভিনয়ব্রতীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১২৬৩/১৮৫৭ অব্দেই (মার্চ মাসে) পূর্বোল্লিখিত কলিকাতার চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাটীতে এই 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়, Oriental Theatre-এর অভিনেতা রাধাপ্রসাদ বসাক প্রভৃতি, যে কয়জন ব্যক্তি এই অভিনয়ে অভিনেতারূপে যোগদান করেন তাঁহাদের এই কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, — জয়রাম বসাক, জগদ্দুর্লভ বসাক, নারায়ণ চন্দ্র বসাক, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ বসাক ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। ইনিই উত্তরকালে সেই Royal Bengal Theatre-এর স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ, নাট্যকার ও অভিনেতা। বঙ্গের স্থায়ী নাট্যমন্দিরে, যে যে ব্যক্তি অভিনয়াদি করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন, ইনিই অভিনয় চর্চায় তাঁহাদের প্রথম স্থানীয়। ইঁহার পরের কয়েকজন স্থায়ী নাট্যশালার অভিনেতাগণের ন্যায় ইনিও 'স্ত্রী চরিত্র' প্রথম অভিনয় করেন। আবশ্যকমতো এই কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। শুনিতে পাওয়া যায় এই অভিনয় দুইবার মাত্র হইয়াছিল।

২। এই অভিনয়ের সমসাময়িক অর্থাৎ ১২৬৩/১৮৫৭ বাং ইং অব্দেই সিমুলিয়ার ধনকুবের স্বর্গীয় রামদুলাল সরকার মহাশয়ের বাটীতে তদীয় পুত্র আশুতোষ দেব মহাশয়ের উদ্যোগে মহা সমারোহে বিপুল অর্থব্যয়ে এক নাটকাভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। কালিদাসের 'শকুন্তলা' ভাষান্তরিত হইয়া অভিনীত হয়। বিশ্বকোষ সংগ্রহকর্তা বলেন যে এই শকুন্তলার অভিনয় জয়রাম বসাকের বাটীর 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়ের পরদিবস হইয়াছিল। একদিন পরে হইলেও এই আশুতোষবাবুর (ছাতুবাবুর) বাটীর অভিনয়ই তখনকার কালের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ করে। শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, — এই ছাতুবাবুর বাটীর অভিনয়ে, 'কলিকাতার অন্যান্য নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় পাইকপাড়া রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (যাঁহার প্রতিকৃতি 'নাট্য-মন্দিরে'র গ্রাহকগণ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উপহার পাইয়াছেন) এবং বাবু (পরে সার্ মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন।' বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শরচ্চন্দ্র ঘোষ, প্রিয়মাধব বসু মল্লিক (গীত রচয়িতা) ও মণিমোহন সরকার প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতার নাম উল্লেখযোগ্য।

৩। এই ১২৬৩/১৮৫৭ অব্দেই জোড়াসাঁকোর প্রথিতনামা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের ভবনে তাঁহার নিজেরই যত্নে ও আগ্রহে নাটকাভিনয় আরম্ভ হয়। মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্নবাবু তখনকার কালের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি মাতৃভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে তিনি সময় ও অর্থ সমভাবে ব্যয় করিতেন।

সংস্কৃত মূল মহাভারতের ও নানা নাটকাবলীর অনুবাদে স্বয়ং ব্রতী হওয়া ও ওই কার্যে অন্যান্য পন্ডিতমন্ডলীর সাহায্য গ্রহণ করার প্রধান উদ্দেশ্য দীন বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন। ১৮৫৭ খ্রি. রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটক প্রথমে অভিনীত হয়। ইতিপূর্বে কেবলমাত্র 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' ও 'শকুন্তলা' নামক নাটকদ্বয় অভিনীত হইতেছিল। সেই হিসাবে এই 'বেণীসংহার'ই তৃতীয় অভিনীত নাটক। ১২৬৩ চৈত্র মাসে ইং ১৮৫৭ মার্চ এই অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের পর তিনি বাঙ্গালা নাটক ও নাটকাভিনয়ের সমধিক অনুরাগী হয়েন। ইংরাজি নাটকাভিনয়ের দর্শকরূপে নানা স্থানে উপস্থিত থাকিয়া যে অভিনয়ানুরাগ তাঁহার মনে ইতিপূর্বে স্থান পাইয়াছিল, স্বীয় ভবনে নাটকাভিনয় আরম্ভ করিয়া সিংহ মহাশয়ের নাট্য-প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত নাটকাবলীর সংখ্যা অতি অল্প দেখিয়াই পন্ডিতমন্ডলীর

সাহায্যে স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনূদিত প্রথম বাঙ্গালা নাটক 'বিক্রমোর্ব্বশী'। পরে 'মালতী-মাধব'ও অনুবাদ করেন। 'বেণীসংহার' নাটকের আটমাস পরে, যোগীন্দ্রবাবু লিখিতেছেন : 'সিংহ মহোদয়ের বাটিতে সমধিক সমারোহের সহিত তাঁহার নিজের অনুবাদিত 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটক অভিনীত হইয়াছিল।' তিনি নিজে তাহাতে একজন অভিনেতা ছিলেন। পুরুরবার অংশ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ শুনা যায়। 'বেণীসংহারের' অভিনেতাগণের মধ্যেও আমরা তাঁহার নামের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবিখ্যাত ব্যবহারজীবীকুলশেখর স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (Mr. W. C. Bondhapadhaya), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (manager, Bengal Theatre)প্রভৃতি মহাশয়গণেরও নাম দেখিতে পাই। 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে রামদাস গঙ্গোপাধ্যায় নামক আর একজন তৎকালীন উৎকৃষ্ট অভিনেতার নামও সংশ্লিষ্ট আছে। বলাবাহুল্য, এই সকল নাটকাভিনয়ে কলিকাতার বাণী ও রমার বরপুত্রগণ সকলেই দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন। ইংরাজরাজের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কর্মচারীগণও আমন্ত্রিত হইয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সার সিসিল বিডন ভারত গবর্ণমেন্ট-এর সেক্রেটারি (সচিব) কালীপ্রসন্নবাবুর বাটীতে অভিনয় দর্শনে উপস্থিত ছিলেন। সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন যে এই অভিনয়ের সময় 'ফোর্ট উইলিয়ামের' ইংরাজি বাদ্য সম্প্রদায় (গোরার বাজনা) ঐক্যতান বাদনের কার্য করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন : 'ইহার পূর্বে কলিকাতায় যে কয়বার ইংরাজি নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই কেবল তাহার রসাস্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আশুতোষবাবুর ও কালীপ্রসন্নবাবুর বাটীর (কুলীন কুলসর্ব্বস্ব, শকুন্তলা, বেণীসংহার এবং বিক্রমোর্ব্বশী) অভিনয় হইতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নব্য, প্রাচীন সকলেই নাটকাভিনয়ের রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইলেন।' কলিকাতায় একটি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, এবং যাত্রা, হাফ্-আকড়াই, কবি পাঁচালী প্রভৃতি তৎকালীন আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধে নব্য সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বিতৃষ্ণা জন্মিল।' এই অভিনয় কাল ইংরাজি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ, কিন্তু ইহা ১২৪২ বঙ্গাব্দ।

৪। ইহার মাঝামাঝি সময়ে ১২৬৪ সালের প্রারম্ভেই ওরিএন্টাল থিয়েটারের অন্যতম অভিনেতা প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে তাঁহার মাতামহাশ্রম গদাধর শেঠ মহাশয়ের বাটীতে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকাভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। প্রিয়নাথবাবুর মাতুল গোপালচন্দ্র শেঠই (গদাধর শেঠের পুত্র) ইহার পৃষ্ঠপোষাক। গোপালবাবু স্বয়ং প্রিয়নাথ দত্ত, নকুড়চন্দ্র শেঠ ও নারায়ণচন্দ্র বসাক (জয়রাম বসাকের বাটীর অভিনেতা) প্রভৃতি অভিনয়কুশল ব্যক্তিগণ অভিনেয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। নারায়ণবাবু 'স্ত্রী ভূমিকায়' বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জাহ্নবী ও রসিকা নাপিতানীর ভূমিকা একত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ জানা যায়। মফস্বলে বিশেষত চুঁচুড়ায় রামনারায়ণের এই 'যুগান্তকারী' নাটক 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' মহা আগ্রহের ও নৈপুণ্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

৫। এইখানে আমরা আর একটি নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠানের কথা কিছু বিশদ করিয়া লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই অনুষ্ঠানের সঠিক ইতিহাস অনেকটা মাইকেল-জীবনচরিতে যোগীন্দ্রবাবু সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। এই নাট্যসম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য লালাবাবুর বংশধর রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহোদয়দ্বয়। কলিকাতার সুবিখ্যাত মহারাজ শ্রী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর — বাণী ও রমার বরপুত্র বাবু গৌরদাস বসাক, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বাবু প্রিয়নাথ দত্ত (Asst. Comptroller — Financial Dept.), বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ নটকুলচূড়ামণি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এই সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। মাইকেল জীবনীতে বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় লিখিত 'Reminiscences of Michael M. S. Dutta' — মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি নামক সন্দর্ভ পাঠে এই নাট্যসম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ বিবরণ জানা যায়। ইংরাজি নাটকের অনুকরণে নাটক লিখিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রবর্তক কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়। তিনি তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন : 'Should the drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen — the earliest friends of our rising National Theatre.' অর্থাৎ ভারতবর্ষে নাট্যকলার সমধিক প্রসারের সঙ্গে আমাদের উদীয় নাট্যশালার প্রথম সুহৃৎরূপী এই মহানুভব ব্যক্তিগণের নাম ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ কখনও বিস্মৃত হইবেন না। ধন্য কবিবর! তুমি 'মেঘনাদ বধ' লেখার সময় লিখিয়াছিলে যে, — 'রচিব

যে মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি' — উহা যেমন সার্থক হইয়াছে, নাটকের ভূমিকায় নাট্যকলানুরাগের প্রসার বৃদ্ধি হিসাবে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছ তাহাও আজ সফল হইয়াছে। তোমাব 'Rising National Theatre' যথার্থই এখনও সমধিক প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া নাট্যামোদীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া নাট্য-সাহিত্যের ও নাট্যকলার যথেষ্ট প্রসার করিয়াছে। রুচিবাগীশের দল রুষ্ট হইয়া যতই নাসিকা কুঞ্চন করুন না কেন, নাট্যশালার দ্বারা বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজ যে অনেকভাবে উপকৃত তাহা মহা মহা রথীগণও স্বীকার করেন। গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল' ও 'বুদ্ধদেবচরিত' ইত্যাদি নাটকের অভিনয় দর্শনে অনেক পাষণ্ডেরও প্রেমাশ্রু ঝরিয়াছে। মাইকেল জীবনী সংগ্রহ করিতে বসিয়া শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রবাবু যেমন নাট্যশালার ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন ও তৎসঙ্গে বেলগেছিয়ার নাট্যসম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরাও এইস্থানে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালা নাটকের ও নাট্যাভিনয়ের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট 'Belgachia Theatre'-এর কথা বিশেষ আবশ্যক জ্ঞানে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পূজ্যপাদ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ১৮০৬-১৮৬৭) মহাশয়ের কনিষ্ঠ শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায (রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ১৮২৯-১৯১৪) মহাশয় লিখিয়াছেন : 'একেই ত নাট্যশালা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তাহার উপর অরচেষ্ট্রা যতদূর মনোরম হইতে পারে, তাহাই হইয়াছিল। ইহাতে রঙ্গভূমির শোভা ইন্দ্রালয়ের ন্যায় হইয়াছিল, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইতে পারে না, শ্রোতামাত্রেই মোহিত হইয়াছিলেন এবং আমি স্বাভাবিক অনেক বিষয়ে সিনিকাল (Cynical) আমিও ক্ষণকাল মোহিত হইয়াছিলাম।' এই সম্প্রদায়ের মোটামুটি ইতিহাস এই, — ওরিএন্টাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিনেতাগণের কোনও কারণে মনোমালিন্য ঘটায় তাঁহারা রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহোদয়গণের সহিত মিলিত হন। ছাতুবাবুর বাটীর 'শকুন্তলা' ও কালীপ্রসন্নবাবুর বাটীর অভিনয়াদি দর্শনে কলিকাতার গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মহোদয়গণের মনে এই ইচ্ছা হয় যে দুই-একরাত্র নাট্যাভিনয় করিয়া অজস্র অর্থব্যয় করা অপেক্ষা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়া অভিনয়াদি করিলে নাট্যচর্চার জন্য অযথা অর্থব্যয় হইবে না এবং নাট্যকলার উন্নতি সাধন স্থায়ীভাবে শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত হইবে। মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ই এই প্রস্তাব প্রথমে করেন। এই সময় স্বর্গীয় 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ বেলগাছিয়ায় বাগানবাটী রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সংগ্রহ করেন। এখানে সেখানে নাট্যশালা না কবিয়া উপরোক্ত মহাত্মারা এই বেলগাছিয়ার উদ্যানেই নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। রাজভ্রাতৃযুগল বিশেষত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়া বহুদিনের সাধ মিটাইবার ইচ্ছায় এক নাট্যশালা প্রস্তুত করেন। বাবু গৌরদাস বসাক লিখিয়াছেন: To say that the Belgachia Theatre scored a brilliant success is repeat a truism that has passed into a proverb. It achieved a success unparalleled in the annals of amateur theatricals in this country. The graceful stage, the superb sceneries, the stirring orchestra, the gorgeous dresses, the costly appertenances, the splendid get-up of the whole concern, were worthy of the brother Rajas, and the genius of their intimate friend Maharaja Sir Jatindra Mohan Tagore, an accomplished connoisseur. The perfomance of a single play, *Ratnavali*, which alone cost the Rajas ten thousand rupees, realised the idea and establised the character of the real Hindu Drama with the improvements, suited to the taste of an advanced age.

১২৬৫ সালের ১৬ শ্রাবণ ১৮৫৮ খ্রি. ৩১ জুলাই এই বেলগাছিয়া থিয়েটার কর্তৃক তাঁহাদেরই আবশ্যকমতো নাট্যকার রামনারায়ণ কর্তৃক 'শ্রীহর্ষদেব' প্রণীত রত্নাবলী নাটিকার বঙ্গানুবাদ নাটকাকারে অভিনীত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য (গীত রচয়িতা) বাবু গুরুদয়াল চৌধুরী মহাশয় 'রত্নাবলী'র গীতগুলি রচনা করেন। এবং বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ ইংরাজ, পারসি, ইহুদি প্রভৃতি কৃতবিদ্য ও গণ্যমান্য দর্শকগণের জন্য এই রত্নাবলীর এক ইংরাজি অনুবাদ করাইয়া মুদ্রিত করান হয়। এই অনুবাদক অপর কেহ নহেন — সেই অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই অনুবাদের পরিতোষিক হিসাবে রাজ ভাতৃদ্বয় মধুসূদনকে পাঁচশত টাকা দান করেন।

তখনকার শ্রেষ্ঠ নাটক লেখক রামনারায়ণ এই নাট্যশালার নাট্যকার, সুপ্রসিদ্ধ গীতি রচয়িতা গুরুদয়াল বসু ইহার গীত রচয়িতা, ইংরাজি অনুবাদক কবিবর মাইকেল মধুসূদন, সংগীত শিক্ষক সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং একতান বাদনের অধ্যক্ষ বাবু যদুনাথ পাল (যিনি বঙ্গের একতান বাদনের সৃষ্টিকর্তা বলিলেও চলে)। কিন্তু এই নাট্যসম্প্রদায়ের নাট্যাচার্য ছিলেন কে তাহা কি জানিতে ইচ্ছা হয় না? সেই নটকূলচূড়ামণি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বাগবাজার নিবাসী) নাট্যশিক্ষক ছিলেন। ইনি স্বয়ং 'রত্নাবলী'র 'বসন্তক' (বিদূষক)-এর ভূমিকা গ্রহণ করেন। নিম্নে আমরা অভিনেতাগণের নাম ও ভূমিকার পরিচয় দিলাম :

প্রিয়নাথ দত্ত — রাজা উদয়ন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — বসন্তক। — (বিদূষক)। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ — বুমন্বান। — (সেনাপতি)। গৌরদাস বসাক — যৌগন্দনারায়ণ। — (মন্ত্রী) (পরে দীননাথ ঘোষ ও তারাচাঁদ গুহ)। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — বাভ্রব্য। গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বহুভূতি। মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী —বাসবদত্তা (চুনীলাল বসু) । হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — রত্নাবলী। অঘোরচন্দ্র দীঘড়িয়া —সুসঙ্গাতা। শ্রীনাথ সেন — বাজীকর। যদুনাথ ঘোষ — দ্বারবান। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী — সূত্রধর। দ্বারকানাথ মল্লিক ও কৃষ্ণ গোপাল ঘোষ — চোপদার। রমানাথ লাহা — নবী। কালিদাস সান্যাল ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় — নর্তকী। শ্রীরামপুর নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ — কাঞ্চনমালা।

বলাবাহুল্য, এই সকল অভিনেতাগণ সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয় কৃতবিদ্য ও অভিনয়কলা-নিপুণ।

বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এরূপ দক্ষতার সহিত এই 'রত্নাবলী'র অভিনয় শিক্ষা দেন ও নিজে অভিনয় করেন যে শতমুখে তাঁহার প্রশংসার কথা মুখরিত হয়। বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুর সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণ ও পন্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উকিলশ্রেষ্ঠ রমাপ্রসাদ রায় (রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র) প্রমুখ কলিকাতার খ্যাতানামা সুধীবর্গ উপস্থিত থাকিয়া এই সকল অভিনয়াদি দর্শন করিতেন। বঙ্গদেশে আর কখনও এরূপভাবে কোনও নাটক অভিনীত হয় নাই। আমাদের বেলগাছিয়া থিয়েটারের নাট্যশিক্ষক বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিম্নে বিবৃত হইল। যাক সে কথা।

বাবু গৌরদাস বসাক (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও স্বনামখ্যাত কলিকাতার মহাপন্ডিত) লিখিয়াছেন : "The Dramatic corps was drawn from the flower of our educated youth. Among the actors Babu Keshab Chandra Ganguly stood pre-eminent. Endowed by nature with histrionic talents of no mean order, he represented the 'Vidushaka' (Jester) with such life-like reality, and so rich a fund of humour as to be styled the *Garrik* of our *Bengali Stage*. The lieutenant Governor Sir Frederick Holiday — who was present with his family, was so delighted that he complimented him on his extra-ordinary dramatic talents. He said that looking at his serious and sedate appearence one could hardly believe him capable of acting the part of the jester."

স্বর্গীয় বাবু কিশোরী চাঁদ মিত্র 'কলিকাতা রিভিউ' (Calcutta Review) পত্রে লিখিয়াছেন --- '*The Gem of the actors* was 'Vasantaka' who was represented by *Babu Keshab Chunder Ganguly*. His ready wit, inimitable comic humour may fairly entitle him to the praise of being *the best actor in Bengal*. He kept up the interest of the play most successfully and *was the life* and soul of the performance.'

মহাকবি মধুসূদন নিজেও এই মহাত্মার গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক নটকূলচূড়ামণি কেশবচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করিয়া লিখিতেছেন — 'আপনি আধুনিক নটকুল শিরোমণি, 'কৃষ্ণকুমারী'র দোষগুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবে না। বিশেষত আমার এই বাসনা, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় জানিতে পারেন যে, আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য বিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ প্রকাশ করিতেন।' তখনকার কালে অভিনেতা ও অভিনয়ের (নাটকাকারের) কীরূপ সদ্ভাব ছিল, পাঠকগণ দেখিলেন কি?

আমরা বাবু কেশবচন্দ্রের প্রতিবাসী ছিলাম। বাল্যে তাঁহার নানা গুণাবলীর কথা শুনিতাম। লেখকের পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ও বেলগাছিয়ার এই সকল নাট্যাভিনয়ে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন। কেশববাবুর ন্যায় অভিনেতা ও নাট্য-কলা-কুশল বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কথা আমরা কেবলমাত্র যোগীন্দ্রবাবুর মাইকেল জীবন-বৃত্তে দেখিতে পাই। দিন দিন সে সকল কথা চাপা পড়িতেছে। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়ভাবে বিজড়িত থাকে এই উদ্দেশ্যে আমরা এই সকল কথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই বেলগাছিয়া থিয়েটার ব্যতীত তিনি আরও এক সম্ভ্রান্ত নাট্যসম্প্রদায়ের নাটক শিক্ষক ছিলেন, সেকথা যথাস্থানে হইবে।

শুনিতে পাওয়া যায় এই রত্নাবলী নাটকের ছয়টি অভিনয় হয়। শেষ অভিনয় শনিবার ২৪ কার্তিক ১২৬৫ সাল ইংরাজি ১৯ অক্টোবর ১৭৫৮ (১৮৫৮) খ্রিস্টাব্দে। এই সম্প্রদায়ের সংগীত শিক্ষক সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রযত্নে ও উৎসাহে দেশীয় যন্ত্রাদির সাহায্যে এক একতান বাদনের প্রবর্তন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি এখনও বঙ্গদেশের কোথাও কেবল দেশী যন্ত্র সাহায্যে একতান-বাদন-সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন না। 'রত্নাবলী'র ইংরাজি অনুবাদ সূত্রে কবিবর মাইকেল মধুসূদনের সহিত এই সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতা হয়। মধুসূদন আজীবন ইংরাজি অনুরাগী, এবং সেই জন্য সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী' তাঁহার মনোমত ছিল না। তিনি বাংলা নাটকে ইংরাজি প্রথা আনয়ন প্রয়াসে সচেষ্ট হয়েন। তিনি সংস্কৃত নাটকের বহু দোষের বিষয় সর্বদা আলোচনা করিতেন। 'রত্নাবলী' নাটকও যে নাট্যাংশে উৎকৃষ্ট নহে তাহাও দেখাইতেন। কিন্তু তিনি 'রত্নাবলী' নাটক অনুবাদ করিয়াই যশস্বী হয়েন — যোগীন্দ্রবাবু বলেন যে 'হরকরা'র সম্পাদক নাকি লিখিয়াছেন — বাঙালির লেখনী হইতে এরূপ লেখা যে কখনও বাহির হয় তাহা আমরা জানিতাম না। বঙ্গেশ্বর হ্যালিডে মহোদয়ও নাকি এই অনুবাদের উচ্চ প্রশংসা করেন। যাহা হউক না কেন, মধুসূদন কিন্তু সংস্কৃতানূদিত 'রত্নাবলী' নামক এই অকিঞ্চিৎকর নাটকখানার জন্য রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন দেখিয়া বহু আক্ষেপ করেন। এবং বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া বাংলা নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এই সকল কথা বিস্তারিতভাবে মাইকেল জীবনবৃত্তে নবম অধ্যায়ে যোগীন্দ্রবাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধুসূদনের প্রথম বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। কেশববাবু নাকি ইহা দেখিয়াছিলেন, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বহু উৎসাহে এই নাটকখানি গ্রহণ করিয়া এই বেলগেছিয়া থিয়েটারে অভিনয় করেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই নাটকের পাণ্ডুলিপি পাঠে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েন এবং স্বয়ং এই 'শর্মিষ্ঠা'র জন্য কয়েকখানি গীত রচনা করেন। শেষাঙ্কের শিবস্তোত্র সংগীতটি তাঁহারই রচিত। বলাবাহুল্য, নাট্যানুরাগী রাজ ভ্রাতৃদ্বয় এই নাটকের জন্য পূর্বের ন্যায় কবিবরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন এবং নিজব্যয়ে উহা মুদ্রিত করিয়া দেন। ১২৬৬ সালে ৩ ভাদ্র (১৮৫৯ খ্রি. অগাস্ট) এই 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয়ে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু কৃষ্ণধর মুখোপাধ্যায় (শর্মিষ্ঠা), বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন নাট্যবিৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি 'রত্নাবলী'র পূর্বলিখিত অভিনেতাগণের সহিত যোগদান করেন। রাজার ভূমিকা এবারও সেই 'রত্নাবলী'র রাজা প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয়কে প্রদত্ত হয় তবে পিতৃবিয়োগ ঘটায় তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় এই ভূমিকা গ্রহণ করেন। মাধব্য (বিদূষক) এবার সেই নট-শিরোমণি বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। (বিশ্বকোষে বিস্তারিত তালিকা দেখুন)।

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' প্রথম, দ্বিতীয় 'শকুন্তলা', তৃতীয় 'বেণীসংহার', চতুর্থ 'বিক্রমোর্ব্বশী' ('মালতী-মাধব'-এর অভিনয় কথা শুনা যায় না)। সেই হিসাবে 'রত্নাবলী ও মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' পঞ্চম ও ষষ্ঠ অভিনীত বাঙ্গালা নাটক।

৬। এই সময় আহিরিটোলা-নিবাসী, হাওড়া, জনাই-এর সুবিখ্যাত জমিদার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ের কথা শুনা যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত জয়রাম বসাক ও অভয়চরণ বসু নামক জনৈক নাট্যকুশল এই অভিনয়ের অধ্যক্ষতা ও শিক্ষকতা করেন। এই অভিনয় ১২৬৬ সালের প্রারম্ভেই হইয়াছিল। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ ও 'ভাস্কর'-এ এই অভিনয় করার বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। 'নাট্যপ্রেমিক' স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ও বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত গৌরশেখর ভট্টাচার্য্য ও হুগলীর শ্রীরামপুরের

ম্যাজিস্ট্রেটাদি রাজকর্মচারীগণ নাকি দর্শকরূপে এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন না (না?)। ১২৬৬ সালের প্রথম মাসেই এই অভিনয়ানুষ্ঠান হয়।

৭। 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয়ের সমসাময়িক আর এক অভিনয় আয়োজনের কথা আমরা জানিতে পারি। স্বর্গীয় আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে সিন্দুরিয়াপটী নামক কলিকাতার বড়বাজার পল্লীতে 'বিধবা বিবাহ' নাটক এক অভিনয় অনুষ্ঠান হয়। প্রথম অভিনয় ১২৬৭ সালের বৈশাখ বা ১৮৬০ খ্রি. এপ্রিল মাসে। সিন্দুরিয়াপটীর (রাম) ৺গোপাল মল্লিকের বাটীতে এই অভিনয় হয়। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনই স্বয়ং নাট্য-শিক্ষক।

নিম্নলিখিত তালিকানুযায়ী 'বিধবা বিবাহ' নাটকের ভূমিকা খ্যাতনামা সুধীবর্গ গ্রহণ করেন। কৃত্তিরাম ঘোষ — মহেন্দ্রনাথ সেন, মন্মথ — বেভারেন্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রামকান্ত — কৃষ্ণবিহারী সেন (অধ্যাপক); গুরুমহাশয় — হারানচন্দ্র মজুমদার ও রামদেব অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার; বর — যাদবচন্দ্র রায়; সুলোচনা — বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (নাট্যকার), পদ্মাবতী — গোপালচন্দ্র সেন, সুখময়ীর পুত্রবধূ — নরেন্দ্রনাথ সেন (মিরর সম্পাদক); রসবতী — রাখালচন্দ্র সেন। কণ্ঠ সংগীতে ও যন্ত্র সংগীতে নিম্নলিখিত কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যোগদান করেন। বাবু উমেশচন্দ্র ভদ্র, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ক্ষেত্রমোহন বসু, পঞ্চানন মিত্র, গদাধর মিত্র, রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেণীমাধব সোম মহাশয়গণ। পাইকপাড়ার রাজাদিগের বেলগেছিয়া থিয়েটারের প্রতিযোগী হিসাবে এই অভিনয়ে বহু অর্থব্যয় করা হইয়াছিল। বাবু মুরলীধর সেনই প্রধান পৃষ্ঠপোষক। চারিহাজার টাকা নাকি ব্যয় হয়। হলবিৎ [মি. হলবাইন্ (Holbein)] নামক জনৈক ইংরাজ নাটপীঠ-শিল্পী দ্বারা মঞ্চ ও দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। তখনকার (বেঙ্গাল) 'হরকরা' পত্রে ইহার কিছু কিছু আলোচনা আছে।

১২৬৩/৬৬ বঃ অর্থাৎ ১৮৫৭/৬০ খ্রি. মাত্র চারি বৎসরকাল মধ্যে কলিকাতায় ও স্থানে স্থানে এই সকল উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। নাটক, নাট্যাভিনয় ও অভিনেতৃকুলের যথেষ্ট আদর দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তখনকার কালে যদি কোনও 'গিরিশচন্দ্র' উদিত হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আক্ষেপ করিয়া লিখিতে হইত না যে —

লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।
পরের বেদনা হায়! পরে কি বুঝিবে তায়,
হায়রে, ব্যথার ব্যথী আছে কয়জন?

৩.
সিন্দুরিয়াপটীব ৺গোপাল লাল মল্লিকের (রাম গোপাল মল্লিকের) বাটীতে অভিনয়ের ৩/৪ বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৭১/১৮৬৪ অব্দে কলিকাতার সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী শোভাবাজারের রাজবাটীর ৺দেবীকৃষ্ণ দেব মহাশয়ের ভবনে, 'Shovabazar Private Theatrical Society' নামে এক নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমিতির অভিনয় কার্যাদি বেশ শৃঙ্খলার সহিত হইত। বাবু চন্দ্র কালী ঘোষ মহাশয় সভাপতি ও ডাক্তার চন্দ্র মিত্র মহাশয় এই সম্প্রদায়ের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনীত নাটক বা প্রহসন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'। এই পুস্তকের পর পর তিনটি অভিনয় হইয়া কিছুদিন এই সম্প্রদায়ের কার্যাদি স্থগিত থাকে। সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্যোক্তা ও অভিনেতাগণের মধ্যে এই কয়েকজন ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য — কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ (কালীবাবু), মণিমোহন সরকার (নববাবু), কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ (হরকামিনী), কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ (প্রসন্নময়ী), গোপালচন্দ্র রক্ষিত (কমলা ও বাবু), কালীকৃষ্ণ বসু (সার্জন), কুমার উদয়কৃষ্ণ (মুটে ও কমলা), পেয়ারী বৈষ্ণব (কর্তা,

মাতাল যন্ত্রী), প্রিয় মাধব বসু মল্লিক (বাবাজী) ও ডাক্তার উমেশ চন্দ্র মিত্র (বেলফুলওলা ও মালী) প্রভৃতি। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুধীবৃন্দ দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। 'Hindu Patriot' নামক খ্যাতনামা পত্রে এই Society-র অভিনয়াদির কথা পাওয়া যায়। পর বৎসর ১২৭২/১৮৬৫ অব্দে (১০ শ্রাবণ। ২৪ জুলাই) এই সম্প্রদায় কর্তৃক মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই সময়ে প্রায় আঠারো মাস কাল আবার এই সম্প্রদায়ের কার্যাদি বন্ধ থাকে। সমিতি পুনর্গঠিত হয়। এবং একটি বৃহৎ কার্য নির্বাহক সমিতি নির্বাচিত হইয়া ওই সম্প্রদায়ের কার্যাদি মহা উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। সুবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েন। রাজবাটীর কুমারগণ বিশেষ উদ্যোগী হন ও নানা কার্যের ভার নিজে নিজে গ্রহণ করেন। তাঁহারা ব্যতীত রাজ-জামাতা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র, প্যারীমোহন দাস (পেয়ারী বৈষ্ণব), মণি মোহন সরকার ও রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণও এই সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ কার্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১২৭৩/১৮৬৭ অব্দে (ফাল্গুনের শেষে ফেব্রুয়ারির প্রথমে) মহাসমারোহে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের এক অভিনয় হয়। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকাভিনয়ের ভূমিকা ও অভিনেতাগণের নাম — সূত্রধার — ক্ষেত্র মোহন বসু, ভীমসিংহ — বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, বলেন্দ্র সিংহ — প্রিয়মাধব বসু মল্লিক, সত্যদাস — কুমার আনন্দ কৃষ্ণ, জগৎ সিংহ — কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ, নারায়ণ মিশ্র ও দূত — বেণীমাধব ঘোষ, ধনদাস — মণিমোহন সরকার, ভৃত্য — জীবনকৃষ্ণ দেব, কৃষ্ণকুমারী — কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ, অহল্যাবাঈ — কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ, তপস্বিনী — কুমার উদয়কৃষ্ণ, মদনিকা — রামকুমার মুখোপাধ্যায় ও সহচরীদ্বয় — হীরালাল সেন ও নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এবারও সাময়িক শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে', এই সকল অভিনয়ের বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়। রাজবাটীর এই অভিনয়ে বঙ্গের স্থায়ী নাট্যশালায় ভাস্কর, নটকুল ধুরন্ধর, শ্রেষ্ঠ নাটককার, নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দর্শক রূপে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে দুই এক স্থল ব্যতীত সংস্কৃত ভাষান্তরিত বাঙ্গালা নাটকাপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়ের আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক ও প্রহসনাদি অধিকাংশ স্থলেই অভিনীত হইত।

১২৭১/১৮৬৪ অব্দেই বাগবাজারে নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয়ের শ্রী শ্রী মদন মোহন জীউর রাসমঞ্চের পশ্চাৎ ভাগস্থিত ভবনে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবতীর উদ্যোগে এক নাট্য সম্প্রদায়ের গঠন হয়। এই সম্প্রদায় ৪ বৎসর কাল জীবিত ছিল। প্রথম দুই বৎসর শ্রীযুক্ত কালীদাস সান্যাল মহাশয়ের রচিত 'নলদময়ন্তী' নামক নাটকের ১৪/১৫টি অভিনয় যথাক্রমে হয়। এই কালীদাসবাবু শোভাবাজার রাজবাটীর দলের একজন যোগ্য অভিনেতা ছিলেন। তিনি ও গোপালবাবু একত্রে এই নূতন সম্প্রদায়ের শিক্ষাবিধানে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত বহু সম্প্রদায়ের ন্যায় এই সম্প্রদায় যে কেবল আপনাদের সমিতির ভবনেই অভিনয়াদি করিয়া ক্লান্ত ছিলেন এমন নহে। ইঁহারাই নাকি প্রথম নিজালয় ছাড়িয়া অন্যান্য স্থানে আমন্ত্রিত হইয়া অভিনয়কলার প্রসার বৃদ্ধি কল্পে দেশে বিদেশে অভিনয় দেখাইয়া বেড়ান। পাঠকগণ, স্মরণ করিয়া রাখিবেন যে এই কার্যেও 'বাগবাজার'ই অগ্রণী বা প্রথম। কলিকাতাস্থ পাথুরিয়াঘাটার বীর নৃসিংহ মল্লিক, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রী শ্রী মদন মোহন জিউর সেবাইত গোকুল চাঁদ মিত্র ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোপালবাবুর নিজ ভবনে এই সম্প্রদায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত নাট্যাভিনয় দেখাইয়া ছিলেন। মফস্বলের মধ্যে বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে, ভট্টপল্লীর অধ্যাপকগণের বাটীতে যেসকল অভিনয় হয় তাহারও সুযশ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান রাজবাটীর অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখাইয়া সম্প্রদায়ের নেতা কালিদাস সান্যাল মহাশয় মহাতাব্ চাঁদ বাহাদুরের বিশেষ প্রিয় পাত্র হয়েন, সেই সুযোগে রাজ সরকারের কর্মচারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। টটামহেশতলা নিবাসী গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ইন্দুপ্রভা নামক আর একখানি নাটক এই সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল।

বাগবাজারের এই সম্প্রদায়ের 'নলদময়ন্তী' অভিনয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অভিনয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; — বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (নল), কালিদাস সান্যাল (বিদুষক), নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (মন্ত্রী), গগনচন্দ্র চক্রবতী (ভীমসেন), শ্যামাচরণ চক্রবর্তী (কঞ্চুকী), রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যাধ), গিরিশচন্দ্র মিত্র (ব্রাহ্মণী), গিরীশচন্দ্র ঘোষ

— ইনিই উত্তরকালে Bengal Theatre-এর সেই 'স্থূলকায়' গিরীশ ঘোষ (ঋষি), আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উভয়ে (দময়ন্তী); গোপালচন্দ্র মজুমদার, আনন্দলাল মিত্র ও হরিদাস সরকার (সখিত্রয়), ক্ষেত্রমোহন বসু (নট) ও হরিশচন্দ্র কর্মকার (নটী)। আর 'ইন্দুপ্রভা' নাটকের 'বিচিত্রবাহু'র ভূমিকাও গোপালবাবু স্বয়ং গ্রহণ করেন।

১২৭০ বঙ্গাব্দে ইংরাজি ১৮৬৩/৬৪ খ্রিস্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার সেই প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ঠাকুর বংশের গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর (তখন বাবু) মহোদয়ের প্রযত্নে এক উৎকৃষ্ট নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশিত আছে। পাইকপাড়ার রাজাদিগের স্থাপিত 'বেলগাছিয়া থিয়েটার'-এর সহিত মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন একথা আমরা পূর্বেই আভাস দিয়াছি। মধুসূদন জীবনীতে (যোগীন্দ্রবাবুর) এ বিষয়ে অনেক কথা সুশৃঙ্খলে ও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ আছে। পাথুরিয়াঘাটার এই সম্প্রদায় 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক লইয়া প্রথম রঙ্গামঞ্চে আবির্ভূত হলেন। ১২৭১ সাল ইংরাজি ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। পরে ২/৩ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহারা 'বিদ্যাসুন্দর', 'যেমন কর্ম তেম্‌নি ফল', 'বুঝলে কি না?' (১৮৬৬, ১৫ ডিসেম্বর), 'মালতী মাধব', 'উভয় সঙ্কট', 'চক্ষুদান' (এই দুটি প্রহসন ১৮৭০, ২৬ ফেব্রুয়ারি), রুক্মিণীহরণ (১৮৭২, ১৩ জানুয়ারি) ইত্যাদি অভিনয় করিতে থাকেন। বহুকাল পরে আবার ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে নাকি তাঁহারা 'রসাবিষ্কারবৃন্দক' নামক এক ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্যের অভিনয় কিছুদিনের জন্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল নাট্যগুলির মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয়ের বিশেষ সুনাম প্রকাশ আছে। Belgachia Theatre-এর কয়েকজন সুযোগ্য অভিনেতা এই সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সুবিখ্যাত নাট্যাচার্য কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮২৬-১৯০৮) মহাশয়ই এই সম্প্রদায়েব নাট্য-শিক্ষক ছিলেন। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে এই সম্প্রদায় কিরূপ উৎকৃষ্ট ছিল। বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় তাঁহার Reminiscences of Michael M. S. Dutta-এ লিখিতেছেন, — 'I need scarcely add that the Pathuriaghatta Theatre, that had the magnificent Orchestra of the Belgachia Theatre with some additions and alterations, formed a corps that was equally successful in achieving a reputation as high as that which had been attained by its prototype of Belgachia.' গৌরদাসবাবু লিখিয়াছেন যে এই সম্প্রদায়ের প্রথম প্রতিষ্ঠানকাল ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ এবং সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ২২ বৎসর কাল নাকি জীবিত থাকিয়া এই সম্প্রদায় কলিকাতার কৃতবিদ্য গণ্যমান্য সমাজের অভিনয় দর্শনোৎসুক্য চরিতার্থ করিয়া জাতীয় নাট্যকলার প্রসারবৃদ্ধি-কল্পে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় দর্শনার্থ রেবার রাজা অমাত্যগণ সহিত বিজয়নগরের মহারাজ ও ইউরোপের প্রসিদ্ধ ইংরাজ মন্ত্রী 'থেবেস পুসার্ড' ও বাদ্যযন্ত্রবিক্রেতা বিখ্যাত 'বার্কিস্ ইয়ং' কোম্পানীর manager অধ্যক্ষ রিজলে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। বাদ্যযন্ত্র বিশারদ এই কলাবিৎগণ নাকি ঐক্যতান বাদনের সময় বেহালা ও পিয়ানো বাজাইয়া দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। 'মালতী মাধব' নাটক ১২৭৪ সালের ১৫ আশ্বিন (১৮৬৭ খ্রি. ৩০ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবারে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকেরও ৮/১০ বার অভিনয় হইয়াছিল। এই নাটকের কোনও বিশিষ্ট অভিনয় রজনীতে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর 'Lord Lawrence' দর্শকের আসন অলঙ্কৃত করিয়া পাথুরিয়াঘাটার এই নাট্য সম্প্রদায়কে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই সকল রাজন্যবর্গের ও ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধির উপস্থিতির কথা লক্ষ্য করিয়া গৌরদাসবাবু লিখিয়াছেন, — The performances (held, at intervals at his house) were continued, (for the period of 20 years,) to afford a rare and rich treat to the *elite* of our Calcutta society, from the Viceroy down to the latest newcomer and left a lasting mark on the annals of our Drama.' নিম্নলিখিত অভিনেতাগণ বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়া অভিনয় কলাকুশল বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর'-এ, — রাজা বীরসিংহ — রাধাপ্রসাদ বসাক (সেকালের প্রসিদ্ধ), সুন্দর — মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যা — মদনমোহন বর্মা ও হীরা মালিনী — কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মালতী মাধব'-এ — মাধব — যদুনাথ ভট্টাচার্য ও 'রুক্মিণীহরণ'-এ — তোত্‌লা ব্রাহ্মণ — রাধাপ্রসাদ বসাক। আর এক কথা, ঠাকুর বাটীর তৃতীয় অভিনীত পুস্তক 'যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল' নামক প্রহসন

'বিদ্যাসুন্দর' নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনীত হইয়াছিল। নাটকের সঙ্গে প্রহসনাভিনয় যোগ বুঝি এই প্রথম। পাথুরিয়াঘাটার এই সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনয় অনুষ্ঠানের পরও কতক কতক সমসাময়িক আরও কয়েকস্থানে, বাণী ও রমার বরপুত্রগণের আলয়ে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর নাটকাভিনয় অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে (যথাস্থানে সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল)। তন্মধ্যে জোড়াসাঁকোর স্বনামখ্যাত 'ঠাকুর' পরিবারস্থ নাট্যসম্প্রদায়ই সমাধিক প্রসিদ্ধ। তাই গৌরদাসবাবু লিখিয়াছেন যে, 'The example set by the Belgachia Pathuriaghatta and Jorasanko Theatres paved the way for the establishment of several permanent public Theatres that have now become standing institutions in our country for the amusement and instruction of the people' (দুঃখের বিষয়, কোনও কোনও সম্প্রদায় স্বনামখ্যাত এই বহুদর্শী বিজ্ঞসুধীর মতের বিরোধী। কিন্তু কি করা যাইবে? সাম্প্রদায়িক মত সর্ব্বত্রই পরিত্যাজ্য।)

পাথুরিয়াঘাটার এই ঠাকুর বংশের সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যসম্প্রদায়ের কথা শেষ করিবার পূর্বে আমরা এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তখনকার কালের এই প্রদেশস্থ সম্ভ্রান্ত নাট্য-সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ মাতৃভাষানুরাগী নাট্যকলাপ্রিয়, সুকবি ও সুধী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যম ও উৎসাহের কথা এখানে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। এই স্বনামখ্যাত মহারাজ উত্তরকালে সাধারণের হিতকর নানা অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া ও নানা সৎকার্যের অনুষ্ঠাতা স্বয়ং হইয়া বহুবিধ রাজসম্মানে ভূষিত ও জনসাধারণের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া যেমন প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন, জীবনের প্রথম ভাগেও তেমনই ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষা সমূহে বহুবিধ প্রবন্ধ, সংগীত ও নাটক প্রহসনাদি রচনা করিয়া তখনকার গণ্যমান্য সম্প্রদায়ের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, সুকবি ও নাট্যকলাবিশারদ ও নাট্য-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মহা যত্নশীল বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নাট্যানুরাগী হইয়া বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের ন্যায় ইনিও নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। 'বিদ্যাসুন্দর', 'যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল', 'উভয় সঙ্কট ও চক্ষুদান প্রভৃতি নাটক প্রহসনাদি সেই চেষ্টার তেম্‌নি ফল। এক কথায় এ প্রদেশে ইঁহারই যত্নে ও আগ্রহে নাট্যাভিনয়ের ও নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার প্রথম সূত্রপাত হয় বলিলেও চলে। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই মহাত্মা তখনকার কালের প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত নাট্যসম্প্রদায়ের উৎসাহদাতা পরামর্শদাতা ও সহযোগী কর্মী বন্ধু ছিলেন। আর এক কথা, ইনিই সহোদর রাজা শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নাট্যাভিনয়ের সহিত ঐকাতান বাদনের প্রথা প্রবর্তিত করেন (এই ঐকাতান বাদন প্রথা নাট্যশালার অঙ্গবিশেষ হিসাবে ইহার সহিত জড়িত বলিয়া প্রকারান্তরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে এরূপ সংকল্প রহিল)। বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় এই সকল বিষয়েও সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহার লিখিত Oriental Theatre-এর উল্লেখ কথায় তিনি বলিতেছেন, — It was Babu (since Maharaja Sir) Jotindra mohan Tagore, who first of all suggested to them that they should introduce native Dramatic representation, and organise a native orchestra on the basis of our native instruments.'

পাথুরিয়াঘাটার এই সুবিখ্যাত নাট্যসম্প্রদায়ের বহু বর্ষব্যাপী জীবনকাল মধ্যে কলিকাতায় ও অনান্য স্থানে অনেকগুলি নাট্যাভিনয় হইয়া গিয়াছিল। এখানে সেই সকল নাট্যাভিনয়ের কথা সংক্ষেপে কিছু কিছু প্রদত্ত হইল।

১২৭২ সালের চৈত্র মাসে (ইং ১৮৬৬ মার্চ) ভবানীপুরে 'অবৈতনিক নাট্য-মন্দির' নামে প্রতিষ্ঠিত এক নাট্য-সম্প্রদায় নীলমণি মিত্রের বাটীতে (হাইকোর্টের সেই স্বনামখ্যাত জজ স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়দিগের পুরাতন বাটী) বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত সীতার বনবাস নামক এক নাটকের অভিনয় করেন। জজ মহোদয়ের ভ্রাতা সুবিখ্যাত পাখোয়াজ শিক্ষক বাবু কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয় শিক্ষিত এক একতান বাদন সম্প্রদায় এই অভিনয়ে নাটকাঙ্কের বিরাম স্থানে বাদ্য করিয়াছিলেন।

১২৭৩ বৈশাখে (১৮৬৬ এপ্রিল) পটলডাঙ্গার 'আড়পুলি' পল্লীস্থ 'আড়পুলি নাট্যসমাজ' নামধেয় এক নাট্যসম্প্রদায় 'মহাশ্বেতা' নামক নাটকাভিনয় করেন। ইঁহারা ক্রমান্বয়ে 'শকুন্তলা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'চন্দ্রাবলী' ও এঁরাই আবার 'বড় লোক' নামক নাটক প্রহসনাদি অভিনয় করেন। 'প্রাণীবৃত্তান্ত' প্রণেতা বাবু সাতকড়ি দত্ত এই

সম্প্রদায়ের সম্পাদক ছিলেন। সিমুলিয়ার আশুতোষবাবুর বাড়ির 'শকুন্তলা' ও 'মহাশ্বেতা' নাটক দুইখানির সহিত এই আড়পুলির সম্প্রদায়ের নাটক দুইখানি নাকি পৃথক এবং এই সম্প্রদায়স্থ জনৈক ব্যক্তিই ইহাদের রচয়িতা। 'চন্দ্রাবলী' নাটকের বচয়িতা বাবু নিমাইচরণ শীল।

ওই ১২৭৩ সালের মাঝামাঝি সিমুলিয়া শুঁড়িপাড়া পল্লীর শুঁড়িদিগের বাটীতেই এই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল। 'পদ্মাবতী' নামক নাটকখানি এইখানে অভিনীত হয়। বাগবাজার রামকান্ত বসু স্ট্রিট নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বঙ্গে সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান অগ্রণী ও উদ্যোক্তা, এই সম্প্রদায়ের নাট্যশিক্ষা দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কঞ্চুকীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রথম অভিনেতারূপে সাধারণ সমক্ষে বাহির হয়েন। 'নাট্যমন্দির'-এ এই নাট্যকলা-কুশল অভিনেতা ও স্থায়ী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠাতৃগণের অন্যতম প্রধান ব্যক্তির একখানি প্রতিকৃতি পাঠকগণ ইতিপূর্বে দেখিতে পাইয়াছেন ও সেই সঙ্গে সম্পাদক লিখিত ইঁহার নট-জীবনের দু-এক কথাও পাঠ করিয়াছেন।

১২৭৩ সালের প্রথমেই, ইংরাজি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যমাংশে জোড়াসাঁকোর স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) মহাশয়ের ভবনে তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংশে তদীয় পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে 'জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ' (থিয়েটার বা জোড়াসাঁকো নাট্যশালা) নাম লইয়া এক বিশিষ্ট নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। শোভাবাজার রাজবাটীর প্রাইভেট 'থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি'র ন্যায় ইঁহারাও এক কমিটি গঠন করিয়া সম্প্রদায়ের কার্যাদি পরিচালনা করিতেন। সুবিখ্যাত লেখক বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র (টেক্‌চাঁদ ঠাকুর) (১৮১৪-১৮৮৩) মহাশয় এই কমিটির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবি ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, (১৮৪০-১৯২৬), শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঠাকুব (প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথের পৌত্র), শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায় সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্বে পূর্বে অভিনীত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব, 'বিধবা বিবাহ' প্রভৃতি নাটকগুলির ন্যায় জনসমাজের কল্যাণকর কোনও নূতন নাটকের অভিনয় প্রয়াসী হইয়া ইঁহারা দেশপূজ্য পণ্ডিত-কুলচূড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) মহাশয়ের পরামর্শানুযায়ী দুইশত টাকা ঘোষণা করিয়া 'নবনাটক' নামক এক নূতন নাটকের পাণ্ডুলিপি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় গ্রহণ করেন। এবারও সেই নাট্যকারশ্রেষ্ঠ রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটুকে নারাণ) এই 'নবনাটক' রচনা করিয়া পুরস্কৃত হইলেন। ১২৭৩ সালের ২২ পৌষ ইংরাজি ১৮৬৭ খ্রি. ৫ জানুয়ারি এই 'নবনাটক'-এর প্রথমাভিনয় হয়। ইহার শেষ অভিনয় নাকি ১২৭৩ সালের ১২ ফাল্গুন (ইং ১৮৬৭, ২৩ ফেব্রুয়ারি)। আট/নয় বার এই নাটকখানির অভিনয় হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের এই নাটকাভিনয়ের প্রধান প্রধান অভিনেতা এই কয়জন ছিলেন : বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার, পণ্ডিত আনন্দ চন্দ্র বেদান্ত বাগীশ ও বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহর্ষির পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ একে একে অভিনয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এই সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বেই লিখিয়াছি বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় জোড়াসাঁকোর এই সম্প্রদায়কে উচ্চ সম্মান দিয়াছেন। এখানে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের কথা শেষ করিব। 'I should not omit to mention here that the sons and nephews of Maharshi Debendra Nath Tagore, already known to fame as a family of geniuses, have been no less distinguished in their endeavours to resuscitate our Hindu Drama.' কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ও নাকি এই সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বাবু অক্ষয়কুমাব মজুমদার সেকালের একজন অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। গৌরদাস বাবু বলেন যে অভিনয়চাতুর্যে অক্ষয়বাবু, বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন ছিলেন না। (In Babu Akshoy Kumar Mazumdar a Jester of no less distinction than Babu Keshab Chandra Ganguly) — জোড়াসাঁকোর এই খ্যাতনামা ঠাকুর বংশ কি সংগীত চর্চায়, কি নাট্যাভিনয়ে ও কি নাট্য সাহিত্যালোচনায় বহুদিন যাবৎ কলিকাতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই মহা শিক্ষিত বংশের আবালবৃদ্ধবনিতা স্বীয় পরিবার মধ্যস্থ

নাট্যাভিনয়ে যোগদান করিয়া থাকেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২০) ভ্রাতৃদ্বয় অভিনয়ে, সংগীতে ও নাট্যরচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া জনসমাজে উচ্চ সম্মানের অধিকারী। তাঁহাদের গুণমুগ্ধ নয় এমন লোক একজনও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌরদাস বাবু লিখিয়াছেন, — 'We have in Babu Rabindra Nath Tagore not only a rare actor true to the life, but a songster of superior order and in Babu Jotirindra nath Tagore a brilliant musician.' অদ্যাবধিও এই বংশে নাট্যানুরাগ সমভাবে বর্তমান। মাঘ মাসের ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে এখনও ইঁহাদের ভবনে নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাটীর 'নবনাটক' অভিনয়ের কয়েক মাস পরে ১২৭৪ সালের ৩০ ভাদ্র, ইংরাজি ১৮৬৭ খ্রি. ১৪ সেপ্টেম্বর, শনিবার বাঁধা বটতলার খ্যাতনামা ধনী ৺জয়চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্রের উদ্যোগে, তাঁহাদের পুরাতন বাটী, ৩১৯ নং অপার চিৎপুর রোডস্থিত ভবনে এক সুন্দর নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকই এ যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করে। পঞ্চাননবাবুও এই 'পদ্মাবতী' নাটকই অভিনয় করান। বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (স্থূলকায়), মণিমোহন সরকার, জীবনকৃষ্ণ সেন ও শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ যথাক্রমে ইন্দ্রনীল, মন্ত্রী, সারথী, কঞ্চুকী ও অঙ্গিরা, বিদূষক, কলি ও পদ্মাবতীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন এইরূপ শুনা যায়। বিহারীলালবাবুই নাট্যশিক্ষক ছিলেন। সুবিখ্যাত সংগীত বিশারদ জোয়ালাপ্রসাদ ও সুবাদক নিতাই চক্রবর্তী (বৈষ্ণব) সঙ্গীতাদি শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন। কবিবর মধুসূদন দত্ত মহাশয় স্বয়ং নাকি দু-একটি অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় কলিকাতার নানাস্থানে শহরতলীতে ভবানীপুর, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে নানা নাট্যাভিনয়ের আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তবে এ সকল নাট্য-সম্প্রদায়ের কোনওটিই স্থায়ী আকার ধারণ করে নাই। সেই জন্য আমরা তাঁহাদের নামোল্লেখ ও দু-এক কথা মাত্র লিপিবদ্ধ করিব। চোরাবাগানে বাবু কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে Chorebagan Amateur Theatre নামে এক নাট্যসম্প্রদায় 'উষা অনিরুদ্ধ' নাটকাভিনয় করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ংই প্রধান উদ্যোক্তা।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের ৺শ্যামলাল ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র বাবু হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও তৎকালীন প্রহসন লেখক বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে তাঁহারই রচিত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক প্রহসন বিশেষের অভিনয় হয়। ('কিছু কিছু বুঝি' প্রথম অভিনয় ১২৭৪ সালের ১৭ কার্তিক, শনিবার (২ নভেম্বর, ১৮৬৭)। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীর সেই [১৮৬৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (?) রচিত] 'বুঝলে কি না' প্রহসনের উত্তরস্বরূপ এই 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের উদ্ভব। দেশের কবি, পাঁচালি, তরজা ও হাফ্-আকড়াই প্রভৃতি সংগীত সংগ্রামের ন্যায় নাট্যাভিনয়েও এই সময়ে নাট্যসংগ্রাম চলিতে লাগিল। কয়লাঘাটায় অর্থাৎ রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট জোড়াসাঁকোস্থ হেমেন্দ্র বাবুদিগের বাটীতে এই প্রহসনখানির কয়েকবার অভিনয় হয়। এই পুস্তকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় কিছুই ছিল না। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। এই সম্প্রদায়ে আমাদের চিরপ্রিয় রঙ্গরসাবতার হাস্যার্ণব অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও বঙ্গে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রথম পীঠশিল্পী ও নির্মাতা ধর্মদাস সুর মহাশয়দ্বয় অভিনয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু দন্তবক্র, মুরাদ আলি ও চন্দনবিলাস নামক তিনটি ভূমিকা ও ধর্মদাসবাবু চন্দনবিলাসী (স্ত্রী ভূমিকা) গ্রহণ করেন। ইঁহাদের অভিনয় নাকি বেশ ভালো হইয়াছিল। 'বিশ্বকোষ' সংগ্রহকর্তা বলেন, কবিবর মধুসূদন নাকি এই অভিনয় দেখিয়া 'মৃত্তিকেরে বাবা মৃত্তিকে' আনন্দ উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠেন। অর্থাৎ অন্য সকলকে মাটি করিল। কিন্তু কবিবরের ঐ চিৎকারটিকে কেহ কেহ এরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন যে এই অভিনয় 'মাটি' ছাড়া কিছু নয়, অর্থাৎ ইহা একেবারে মাটি হইয়াছে, অভিনয় হয় নাই। কবিবর গিরিশচন্দ্র যেমন পরবর্তী সময়ে 'National Theatre'- এর 'নীলদর্পণ' অভিনয়কে লক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার' অর্থাৎ নীলদর্পণে শৌচ ত্যাগ করিতেছে।

ওদিকে বহুবাজার অঞ্চলে এক নাট্যসমাজ বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় গঠিত হইয়া সুকবি মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) মহাশয়ের রচিত 'রামাভিষেক ও সতী' নাটক অভিনীত হয়। মনোমোহন বাবু একজন সুকবি ও নাট্যকার বলিয়া

বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইংরেজি ১৯১১-১২, বাংলা ১৩১৮-১৯ সালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। 'বিশেষজ্ঞ' নামে এটি লিখতেন সেকালের বিশিষ্ট সমাজসেবী, সাংস্কৃতিক পুরোধা, নাট্যানুরাগী কিরণচন্দ্র দত্ত। ৯টি সংখ্যার পর তিনি স্বনামে লেখেন। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস রচনার প্রাথমিকপর্বে যতগুলি বই প্রকাশিত হয়েছিল এই বইটি নিঃসন্দেহে তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ধারাবাহিক নিবন্ধটি সংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি দীর্ঘকাল। ১৯৯৬ সালে বিশিষ্ট গবেষক প্রভাতকুমার দাসের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সহায়তায় তা বই হিসাবে প্রকাশিত হয়। এখানে প্রকাশিত নিবন্ধটি তারই কয়েকটি অধ্যায়, প্রয়োজন অনুযায়ী সংক্ষেপিত করা হয়েছে, বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অক্ষত রেখে। ভাষা একই আছে, কিন্তু বানান সংস্কার করা হয়েছে। একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া হয়েছে যতিচিহ্ন ইত্যাদির ব্যবহার, গুরুত্বপূর্ণ রচনার সাবলীল পাঠের স্বার্থে। বর্তমান নিবন্ধের শিরোনাম আমাদের দেওয়া।

দীনবন্ধু মিত্র

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

ধর্মদাস সুর

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

পেশাদারি থিয়েটার পর্বের সূচনা

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১.

বাঙালি-পরিচালিত নাট্যশালাব ইতিহাসকে দুই যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, — প্রথম, শখের থিয়েটারের যুগ, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে ১৮৭২ পর্যন্ত; দ্বিতীয়, সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগ, ১৮৭২ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে আজ পর্যন্ত।

বহু বৎসর ধরিয়া সখের থিয়েটার কথার ফলে এ-দেশে নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের উৎপত্তিও ঘটনাচক্রে একটি শখের দল হইতেই হয়। সুতরাং বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের উন্নতি ও প্রসারে শখের থিয়েটারের কৃতিত্ব কম নয়। কিন্তু শখের অভিনয়ে বাঙালি জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোনও না কোনও অভিজাত বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে নিজের বাড়িতে বা বাগানবাড়িতেই হইত। তাহাতে উদ্যোগকর্তার গণ্যমান্য আত্মীয় বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জনেরা সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও সাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না। রবাহূত হইয়া গেলেও বিমুখ হইয়া ফিরিবার ভয় ছিল। সুতরাং তখনকার দিনে ইচ্ছা হইলেই সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখা সম্ভব হইত না। ইহা ছাড়া আর একটি অসুবিধাও ছিল। তখন পর্যন্ত বাংলা দেশে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে নাটকাভিনয় আরম্ভ হয় নাই। কোনও ধনী বা বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে মাঝে মাঝে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের হুজুগ দেখা যাইত বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু, মত-পরিবর্তন ও উৎসাহ-লোপ হইলে সে নাট্যশালাও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইত, এবং আর একজন নাট্যানুরাগী ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। এই সকল কারণে 'শকুন্তলা', 'কুলীন কুলসর্বস্ব', 'শর্মিষ্ঠা' প্রভৃতি

অভিনয় হইবার পরও আমরা বাংলা পত্রিকায় নাট্যাভিনয়ের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ ও ব্যাকুলতা দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সোমপ্রকাশ'-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ১৮৬২ সনের ১২ মার্চ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিতেছেন —

> .... আমাদিগের পূর্ব্বতন অভিনয়াদি পুনরুজ্জীবিত হউক। রত্নাবলী, শকুন্তলা প্রভৃতির অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম, এই সভ্য আমোদ ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হইবে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আর উহার প্রসঙ্গ নাই। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব হালদার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উৎসাহ বিরহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুনরায় তাহাদিগের এ বিষয় চেষ্টাবান্ হওয়া উচিত। স্বভাবের অনুকরণ দর্শন ব্যতিরেকে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের নয়ন ও মনের প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা যে তখনকার দিনে খুবই অনুভূত হইত, উহার প্রমাণ সমকালীন সাময়িক-পত্রে আরও অনেক পাওয়া যায়। ....

বাগবাজারের যে-কয়টি যুবক মিলিয়া 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় করেন, তাঁহাদের দ্বারা পরিশেষে এই অভাব পূর্ণ হয়। তাঁহাদের দলই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া কলিকাতায় প্রথম পেশাদারি নাট্যশালা পত্তন করেন।

ন্যাশনাল থিয়েটার কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও, সর্বপ্রথম ঢাকাতেই টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় প্রদর্শিত হয়। উহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে কলিকাতাতেও এইরূপ একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইয়াছিল। ১৮৬০ সনের প্রারম্ভে আহিরীটোলার রাধামাধব হালদার এবং যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'দি ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার' নামে একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই।

ন্যাশনাল থিয়েটার

এখন ন্যাশনাল থিয়েটারের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। 'লীলাবতী'র অভিনয়েই এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। এই নাট্যশালা কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও অভিনয় দেখাইয়া পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে উহা স্থাপিত হয় নাই। শখের থিয়েটাররূপেই যে ইহা জন্মলাভ করে, সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই দলের অভিনেতা ও উদ্যোক্তারা প্রায় সকলেই সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের যুবক ছিলেন, খুব আড়ম্বর ও পয়সা খরচ করিয়া থিয়েটার করিবারও সঙ্গতি তাঁহাদের কাহারও ছিল না। তাই 'লীলাবতী' অভিনয়ের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় যখন দেখা গেল যে স্থানাভাবে বহু দর্শককে ফিরাইতে হইতেছে, তখন দলের কয়েকজন প্রস্তাব করিলেন, টিকিট বিক্রয় করিয়া নাট্যশালাটিকে স্থায়ী করা হউক। এই প্রস্তাবই কলিকাতায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের মূল।

কিন্তু বিনা মতান্তরে ও মনান্তরে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল না। 'লীলাবতী' অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া বাগবাজারের দল যখন দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের জন্য মহলা দিতে শুরু করেন, তখন এই প্রস্তাব কার্যকর করিবার কথা উঠিল এবং ইহাও বলা হইল যে, এই নূতন নাট্যশালার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ করা হউক। এই প্রস্তাবে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই রাজি হইলেন, হইলেন না কেবল গিরিশচন্দ্র। অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুর পর অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে বলিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার আপত্তির কারণ বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকায় (পৃ. ২১-২৩) পাই —

> নীলদর্পণ শিখাইবার অংশ অদ্যাবধি জীবিত ধর্ম্মদাস বাবু আমাকে কাগজে-কলমে দেন। ... ন্যাসানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাসানাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ, একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাসানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে — এই আমার আপত্তি। ন্যাসানাল

থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে, ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাসানাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ। ন্যাসানাল থিয়েটারের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বলিয়াছি, তখন আমার সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু যখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় যোগ দিতে হয়।

উত্তরে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি বলিলেন, বড় বাড়ি ও ভালো রঙ্গমঞ্চ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, এত ব্যয় করা যখন তাঁহাদের সাধ্যাতীত, তখন তাঁহাদের যেরূপ সামর্থ, সেইরূপ আয়োজনেই নাট্যশালার কাজ আরম্ভ করা হউক। পরিশেষে টিকিট বিক্রয়ের প্রস্তাবই বজায় রহিল, গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়াই অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির উদ্যোগে 'নীলদর্পণ অভিনয়ের আয়োজন চলিতে লাগিল। 'লীলাবতী' অভিনয় করিবার সময় আখড়া বসিত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে। 'নীলদর্পণ' নাটকের মহলা ভুবনমোহন নিয়োগীর আনুকূল্যে রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপর ভুবনবাবুর বাড়ির দোতালায় হইতে লাগিল। এই উদ্যমে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, 'মধ্যস্থ'-সম্পাদক মনোমোহন বসু, 'ন্যাশনাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৮৭২ সনের জগদ্ধাত্রী পূজার সময় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'নীলদর্পণ'-এর ড্রেস রিহার্সাল হইয়া গেল। এই সময়েই (নভেম্বর, ১৮৭২) অমৃতলাল বসু মহাশয় আসিয়া দলে জুটিলেন, তিনি 'লীলাবতী' মহলা দিবার সময় কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্য মাসিক ৪০ টাকা ভাড়ায় চিৎপুরে 'ঘড়িওয়ালা বাড়ি' নামে খ্যাত, মধুসূদন সান্যালের সুবৃহৎ অট্টালিকার বহির্বাটির উঠানটি লওয়া হইল। ওই স্থানেই বিনা আড়ম্বরে নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতে লাগিল। পরে ধর্মদাস সুরের কর্তৃত্বে স্টেজ তৈয়ার হইয়া গেলে ঠিক হইল, ৭ ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনয় হইবে।অভিনয়ের পূর্বে ১০ নভেম্বর ১৮৭২ তারিখের 'সুলভ সমাচারে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা ন্যাসনেল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা আগামী ৭ ডিসেম্বর শনিবার তারিখে শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাটীর সম্মুখে মৃত মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটীতে রঙ্গভূমির ও বঙ্গভাযার অঙ্গপুষ্টির নিমিত্ত রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছুক ও যত্নবান হইয়াছি। সে দিন নীলদর্পণের অভিনয় হইবে।

টিকিটের মূল্য

প্রথম শ্রেণী ... .. ১ টাকা

দ্বিতীয় শ্রেণী ... ... ।।০ আনা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক।

শ্রী ধর্ম্মদাস শূর, ষ্টেজমেনেজর।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ এইমাত্র দেওয়া হইল, উহার সহিত প্রচলিত বিবরণের একটু তফাৎ আছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন —

> রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে আমাদের 'নিজের ষ্টেজে' লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হ'ল। ... কথা উঠল থিয়েটারের কি নাম দেওয়া হবে? ... নবগোপালবাবু আমাদের থিয়েটারের নাম The Calcutta National Theatre রাখবার প্রস্তাব করেন। শেষে মতিবাবুর প্রস্তাব মত Calcutta-টুকু বাদ দিয়ে কেবল The National Theatre রাখা হয়। প্রথম দিন ঐ নামেই অভিনয় হয়।

এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া এ পর্যন্ত সকলেই বলিয়া আসিয়াছেন যে, 'লীলাবতী' অভিনয়ের সময়েই বাগবাজারের দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহণ করেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ যে 'নীলদর্পণ' মহলা দিবার সময়ে হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 'লীলাবতী' অভিনয়ের সময়ে এই দলের নাম ছিল 'শ্যামবাজার

নাট্যসমাজ'। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম ইহার কিছুদিন পরে 'নীলদর্পণ' মহলার সময়ে প্রস্তাবিত হয়। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকায় লিখিয়াছেন —

> রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর 'লীলাবতী'তে অর্দ্ধেন্দুকে 'হরবিলাস' দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না। তাহার পর ন্যাসানাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' অভিনয় আরম্ভ হইল। (পৃ. ৫)

গিরিশচন্দ্রের উক্তি সম্বন্ধে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে, অর্দ্ধেন্দু গিরিশচন্দ্র উভয়ে যখন এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী এবং উভয়ের উক্তিই যখন ঘটনার বহু বৎসর পরে লিখিত তখন অর্দ্ধেন্দুর সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া গিরিশচন্দ্রের সাক্ষ্যকে নির্ভুল মনে করিবার কী কারণ থাকিতে পারে। এ-যুক্তি খন্ডন কঠিন নয়। কারণ, 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহণ লইয়াই গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতির মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে গিরিশচন্দ্র দল ত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র 'লীলাবতী'র অভিনয়ে একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সময়ে তাঁহার সহিত বাগবাজারের দলের কোনও সংশ্রব ছিল না। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়, 'লীলাবতী' অভিনয়ের পরে ও 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পূর্বে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহরের প্রস্তাব উঠে।

'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহণ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের উক্তিই যে ঠিক, তাহার অন্য প্রমাণও আছে। ১৮৭২ সনের ২০ নভেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় —

> *A NEW NATIVE THEATRICAL SOCIETY.* — A few native gentlemen, residents of Bagh Bazar, have established a Theatrical Society named "The Calcutta National Theatrical Society", their object being to improve the stage, as also to encourage native youths in the composition of new Bengali dramas from the proceeds of sales of tickets. The attempt is a laudable one, and is the first of its kind. The first public performance is to take place on the 7th proximo, on the premises of the late Babu Madhusudhan Sandel, Upper Chitpore Road.

উহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ১৮৭২ সনের নভেম্বর মাসের কাছাকাছি 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ ও উহাতে সর্বপ্রথম অভিনয়ের উদ্যোগ হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কাল নির্দ্ধারণের জন্য অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

'ইংলিশম্যান' পত্রিকার এই সংবাদ এবং প্রথম অভিনয়ের পূর্বোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে এ তথ্যটি জানা যায় যে, 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের সম্পূর্ণ নাম ছিল 'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি'। ন্যাশনাল থিয়েটার নাম এই দীর্ঘ নামেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

ন্যাশনাল থিয়েটারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ৭ ডিসেম্বর। ... সংবাদপত্রে এই অভিনয়ের বিস্তৃত ও প্রশংসাপূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইল। ... নবগোপাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রেও (১১ ডিসেম্বর) উচ্চ প্রশংসা করিয়া এই অভিনয়কে 'The event is of national importance' বলিলেন। কিন্তু তিনিও 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদকের মতো অভিনয় বিধিব্যবস্থার দোষ ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রথম রজনীতে টিকিট বিক্রয় করিয়া দুইশত টাকা আয় হয়। ...

'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্যে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক দীনবন্ধুর 'জামাই-বারিক' অভিনীত হয়। পরবর্তীকালে স্মৃতিকথা বিবৃত করিতে গিয়া অমৃতলাল বসু এ বিষয়ে ভুল করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'নীলদর্পণ' দুইবার অভিনীত হইবার পর 'জামাই-বারিক'-এর অভিনয় হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে 'জামাই-বারিক'-এর অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ১৪ ডিসেম্বর শনিবার, — 'নীলদর্পণ' প্রথমবার অভিনীত হইবার ঠিক সাতদিন পরে; 'নীলদর্পণ'-এর দ্বিতীয় অভিনয় হয় ২১ ডিসেম্বর, 'জামাই-বারিক' অভিনীত হইবার পরের সপ্তাহে।

১৪ ডিসেম্বর তারিখে 'জামাই-বারিক'-এর যে অভিনয় হয়, তাহার বিবরণ আমরা ১৮ ডিসেম্বর তারিখের

'ন্যাশনাল পেপার' ও ১৯ ডিসেম্বরের তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় পাই।

'ন্যাশনাল পেপার'-এর বিবরণে রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, দ্বিতীয় দিনে আসন ও আলোর ব্যবস্থা প্রথম দিনের অপেক্ষা ভালো হয় এবং বিলাতি বাদ্যের পরিবর্তে লক্ষ্ণৌয়ের বাদকদের দ্বারা দেশী বাজনার বন্দোবস্ত হয়; তাহা ছাড়া রঙ্গমঞ্চের সান্নিধ্যে ধূমপান বা কোনওরূপ গর্হিত আচরণও নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং রঙ্গমঞ্চ-পরিচালনের সুব্যবস্থার জন্য একটি ম্যানেজিং কমিটিও নিযুক্ত হইয়াছিল। এই পত্রিকাতে ইহাও প্রকাশিত হয় যে, 'জামাই-বারিক'-এর অভিনয়ে আড়াইশত টাকার টিকিট বিক্রয় হয়।

'ন্যাশনাল পেপার' অভিনয়ের বিবরণ দিয়া উদ্যোক্তাদিগকে একটি উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশটি অভিনয় দেখিবার জন্য মহিলাদিগকে আনা সম্বন্ধে। 'ন্যাশনাল পেপার' এ বিষয়ে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, আমাদের সমাজের এখন একটা পরিবর্তনের যুগ, এখনও কাহারও খামখেয়ালকে সংযত করিবার মতো জনমত গঠিত হইয়া উঠে নাই, সুতরাং সর্বসমক্ষে ভদ্রমহিলাদিগকে আনা সুবিবেচনার কার্য হইবে না। ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ 'জামাই-বারিক'-এর অভিনয় দেখিবার জন্য মহিলাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই জনাই এই উপদেশ।

'জামাই-বারিক'-এর পর ন্যাশনাল থিয়েটার পুনরায় 'নীলদর্পণ' অভিনয় করেন। কিন্তু এই অভিনয়ের আগের দিন (২০ ডিসেম্বর) 'ইংলিশম্যান' পত্র সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন যে, এই নাটক ইংরেজদের মানহানিকর, সুতরাং উহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। ইংলিশম্যান লেখেন, —

> A native paper tells us that the play of *Nil Darpan* is shortly to be acted at the National Theatre in Jorasanko. Considering that the Revd. Mr. Long was sentenced to one month's imprisonment for translating the play, which was pronounced by the High Court a libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its representation in Calcutta, unless it has gone through the hands of some competent censor, and the libellous parts been excised.

উত্তরে নাট্যশালার সেক্রেটারি একখানি পত্রে 'ইংলিশম্যান'-এর পাঠকবর্গকে জানান যে, 'নীলদর্পণ' নাটকের মানহানিকর অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য — বাংলা দেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রার চিত্র দেখান, — ইংরেজদিগকে বিদ্রূপ করা নয়, ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। পত্রখানি ২৩ ডিসেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যান'-এ প্রকাশিত হয়।

'নীলদর্পণ'-এর দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ২১ ডিসেম্বর। এইদিন রঙ্গভূমি লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পূর্বাহ্নেই সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় অভিনয়-দিবসে অনেক ভদ্রলোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অভিনয়ে টিকিট বিক্রয়ের দ্বারা ৪৫০ টাকা আয় হয়। ...

নীলদর্পণ অভিনয়ের যে সকল বৃত্তান্ত ও সমালোচনা এ পর্যন্ত উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতে প্রশংসা ও মৃদু সমালোচনা দুই-ই আছে, কিন্তু এগুলি ছাড়া এই অভিনয়ের আর দুইটি সমালোচনাও উদ্ধৃত করা উচিত। এই সমালোচনা দুইটি 'ইন্ডিয়ান মিরার'-এ প্রেরিত পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ... এই পত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দুইটিই আগাগোড়া বিদ্রূপ ও নিন্দায় পরিপূর্ণ। অন্য যে সকল সমালোচক 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের দোষত্রুটি দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের দোষত্রুটি প্রদর্শনে অকারণ ঝাঁজ বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পত্র দুইটিতে এ দুইটি জিনিসই সুস্পষ্ট। পত্রগুলি পড়িয়া মনে হয়, কেহ যেন আগে হইতেই নিন্দা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, উহাতে নিরপেক্ষ সমালোচনার ইচ্ছা বা চেষ্টা কিছুই নাই। প্রকৃত প্রস্তাবেও পত্রগুলি নিরপেক্ষ ব্যক্তির রচিত নয়; কারণ, এগুলির রচয়িতা যে গিরিশচন্দ্র, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়া গিয়াছেন, —

> 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় আমাদের অভিনয়ের একটা বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল। লোকে বলিল, নিশ্চয়ই

ঐ চিঠিখানা গিরিশবাবু লিখিয়াছেন। দু'এক ছত্র আমার মনে আছে, — Up goes the red rag; and appears in view the rickety stage with its repulsive hangings ইত্যাদি। সৈরিন্ধ্রীর বিশ্রী ওষ্ঠবিকৃতির (Sairindhri with her upper lips curved) উল্লেখ উক্ত পত্রে ছিল। — 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১০৮-০৯।

অমৃতলালের উক্তিতে সংবাদপত্রের নাম সম্বন্ধে ভুল থাকিলেও তাঁহার উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হয়। ['বিশ্বকোষ'-এর 'রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩১২ সাল, পৃ. ১৯৩) এই কথার উল্লেখ আছে। শ্রী কিরণচন্দ্র দত্তও লিখিয়াছেন, 'আমরা শুনিয়াছি, স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই গুপ্ত নামে (non de plume) "Fathers" স্বাক্ষর করিয়া *THE INDIAN DAILY NEWS* নামক খ্যাতনামা সংবাদপত্রে এই সকল অভিনয়ের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।' — 'নাট্য-মন্দির', পৌষ ১৩১৯, পৃ. ২৯৩। বলাবাহুল্য, 'বিশ্বকোষ' ও কিরণচন্দ্রের উক্তিতেও সংবাদপত্রের নাম সম্বন্ধে ভুল আছে।] তাহা ছাড়া ১৯ ডিসেম্বরের তারিখের পত্রের একটি ইংরেজি ছত্র গিরিশচন্দ্রের 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকাতেও পাওয়া যায়; পুস্তিকার ছত্রটি এই, — 'নটের কার্য্য To give the airy nothing a local habitation and a name.' অন্তত এই একটি পত্রের সহিত গিরিশচন্দ্রেব কোনও সংশ্রব না থাকিলে এই বাক্যটি এইভাবে দুই জায়গাতেই পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ।

গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া দল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; সেই দলই যখন অপ্রত্যাশিতভাবে খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করিল, তখন তাঁহার পক্ষে ধীরতা হারাইয়া অভিনয়ের নিন্দাবাদ এবং যাঁহারা এই অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তিনি যে-সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদারতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া একটি মাত্র দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। তিনি তাঁহার প্রথম পত্রে অভিনয়ের দ্বারা যুবক ও বালকদের নৈতিক অবনতি হইতে পারে, এই ইঙ্গিত করিয়াছেন। যে গিরিশচন্দ্র 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পূর্বে এবং পরে সর্বদাই অভিনয় ও নাট্যশালার সহিত যুক্ত ছিলেন, এবং পতিতা রমণীদের সঙ্গে অভিনয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি নিশ্চয়ই নৈতিক অবনতির কথা সরল বিশ্বাসের বশে বলেন নাই। তবে গিরিশচন্দ্রের সপক্ষে একটি কথা বলিবার আছে। তিনি যে কেবল ছদ্মনামেই নিজের পূর্ব এবং পর-জীবনের বন্ধুবর্গের এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাই নহে; নিজ নামেও নিন্দা এবং ব্যঙ্গ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। 'নীলদর্পণ' অভিনয় হইয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই তিনি এই অভিনয় সম্বন্ধে একটি ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটি গিরিশচন্দ্রের দুইখানি জীবনী ও অন্যান্য পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতাটি এইরূপ, —

লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার।
ভাতে পূর্ণ অর্দ্ধ-ইন্দু কিরণ সিঁদুর মাখা মতির হার॥
নগ হতে ধারা ধায়,
সরস্বতী ক্ষীণকায়,
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায় ; —
শিব শম্ভুসূত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার॥
কিবা ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান, অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান,
অবিনাশী মুনি ঋষি কর্‌ছে বসে ধ্যান ; —
সবাই মিলে ডেকে বলে দীনবন্ধু কর পার॥
কিবা বালুময় বেলা,
পালে পালে রেতের বেলা,
ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা ; —

মিলে যত চাষা, কোরে আশা, নীলের গোড়ায় দিচ্চে সার॥
কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে,
বুঝি বা দিনের গৌরব যায় খসে,
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার॥

অমৃতলাল বসু এই কবিতা বা গানটির নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, —

লুপ্তবেণী — বেণী মিত্র; অভিনয় করিতেন না, অথচ কমিটির মাথার উপরে প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী-সঙ্গম। তেরোধার — ত্রিধারা। পূর্ণ — পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। অর্দ্ধ-ইন্দু — অর্দ্ধেন্দু। কিরণ — কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মতি — মতিলাল সুর। নগ হ'তে ধারা ধায় — বাস্তবিক নগেন্দ্রই organiser ছিল। সরস্বতী ক্ষীণকায় — মূর্খ। বিগ্রহ — একটা মন্দ গালাগাল। আবার অন্য পক্ষে ত্রিধারা-সঙ্গমে দেবমূর্তি। ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান — ধর্ম্মদাস ও ক্ষেত্রমোহন ষ্টেজ তৈয়ার করিয়াছিল। বিষ্ণু — ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক; নেপথ্যে গান করিতেন। অবিনাশী — অবিনাশচন্দ্র কর। ভুবনমোহন চরে — গঙ্গাতীরে ভুবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখানা-বাটীতে। চাষা — অভিনেতৃদলের মধ্যে অনেকগুলি সদগোপ ছিলেন। দীনবন্ধু — নীলদর্পণ-রচয়িতা। পালে পালে — পালপদবীধারিগণ। শশী — শশিভূষণ দাস। অমৃত — অমৃতলাল বসু।

এই গানটিতে গিরিশচন্দ্রের বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। তিনি তাঁহার 'নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর' শীর্ষক পুস্তিকার একস্থানে লিখিয়াছেন, 'গানের শ্লেষ এই — 'স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার'।' নীচজাতি পয়সা দিয়া অভিনয় দেখিলে, অভিনয়ের সাফল্য বা গৌরব হ্রাস হয়, গিরিশচন্দ্রের সত্য সত্যই এই বিশ্বাস ছিল কি? না তিনি কেবল ন্যাশনাল থিয়েটারকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই এই অযৌক্তিক বা জাতি-বিশেষের প্রতি অপমানসূচক কথার প্রয়োগ করিয়াছিলেন?

'নীলদর্পণ'-এর দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সধবার একাদশী' অভিনীত হয়। একজন গ্রন্থকারেরই নাটক বারবার অভিনয় করাতে দর্শকগণ পাছে বিরক্ত হয়, এই আশঙ্কায় নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ 'সধবার একাদশী'র বিজ্ঞাপন দিবার সময়ে সর্বসাধারণকে জানান যে, অন্য নাটকের অভাবে তাঁহাদিগকে যে-সকল পুস্তক বর্তমান, তাহারই অভিনয় করিতে হইতেছে, তবে তাঁহারা উপযুক্ত লোকের দ্বারা উৎকৃষ্ট নাটক লিখাইয়া লইবার ইচ্ছা রাখেন। সে যাহা হউক, ২৮ ডিসেম্বর দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইয়া গেল।

ইহার পরের সপ্তাহে (৪ জানুয়ারি ১৮৭৩) ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' অভিনীত হয়। .... 'নবীন তপস্বিনী'তে অর্দ্ধেন্দু জলধরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। .... অল্প দিনের মধ্যে এইরূপে নূতন নূতন নাটকের অভিনয় দেখান একটি কারণে সম্ভব হইয়াছিল। এই সময় হইতেই নাট্যশালায় 'প্রম্‌টার' রাখিবার প্রথা হয়। .... 'নবীন তপস্বিনী'র পর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'লীলাবতী' অভিনয় হয় (১১ জানুয়ারি, ১৮৭৩)।

এতদিন পর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে একমাত্র শনিবার অভিনয় হইত। 'লীলাবতী' অভিনীত হইবার পর হইতে বুধবারেও অভিনয় করিবার উদ্যোগ হয়। এই সময় হইতেই বাংলা নাট্যশালায় বুধবার ও শনিবার অভিনয় দেখাইবার রেওয়াজ হয়। প্রথম বুধবারের অভিনয় হয় ১৮৭৩ সনের ১৫ জানুয়ারি। এই অভিনয়ের বিষয় — দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও কয়েকটি প্যান্টোমাইম। .... 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর রাজীবের ভূমিকা লইয়াছিলেন। ....

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয় হইয়া যাইবার পর ন্যাশনাল থিয়েটারে কোনও নূতন পুস্তকের অভিনয় না হইয়া 'নবীন তপস্বিনী'র দ্বিতীয় অভিনয় হইল (১৮ জানুয়ারি), এবং তাহার পর ২২ জানুয়ারি রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইল। কিন্তু এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের মধ্যে একটা বিবাদ উপস্থিত হইল।

১৮৭৩ সনের ২৬ জানুয়ারি (রবিবার) তারিখের 'ইন্ডিয়ান মিরার'-এ প্রকাশিত একখানি পত্রে এই বিবাদের কারণ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। পত্রটি এইরূপ —

A BREACH IN THE NATIONAL THEATRE

Sir. — Owing to a long existing ill-feeling among the members of the National Theatrical Society a disagreement has arisen amongst them. The cause of this faction, as the Secretary of the Society announces, is the failure on the part of the treasurer to render the accounts. The other party ascribes the cause of this faction to some shortcomings on the part of the Secretary .... Believe me, yours truly BROJENDRA NATH BANERJEE.

এই ঝগড়া মিটাইবার জন্য ১৯ জানুয়ারি তারিখের বৈঠকে নবগোপাল মিত্র, মনমোহন বসু ও হেমন্তকুমার ঘোষকে লইয়া একটি সালিশী কমিটি নিযুক্ত হয় এবং এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন ১৮৭৩, ২২ জানুয়ারি তারিখের 'ন্যাশনাল পেপার'-এ প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :

We regret to learn that a breach has of late taken place among the members of the Theatre party. Read the following,

NOTICE

At a meeting held on Sunday last, the 19th Instant, at the meeting house of the National Theatre Office, it was resolved that all proceedings of the Theatre should be postponed, till Thursday next, the 24th Instant, when the differences among the members are to be settled by the following gentlemen appointed as arbitrators at the aforesaid meeting.

Babu Nabagopal Mitter
" Monomohun Bose
" Hemantakumar Ghosh
Mahendro Lal Bose
Mutty Lal Soor
Amrito Lal Pal
Rajendro Lal Pal
Members.

২৪ জানুয়ারি তারিখের বৈঠকেও বিবাদ মিটিবার লক্ষণ দেখা গেল না। পরদিন 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউস' পত্রে এই বৈঠকের যে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়, তাহা এইরূপ —

NOTICE

NATIONAL THEATRICAL SOCIETY

At a Meeting held this day pursuant to notice in that behalf, it has been amongst other things, resolved that Baboo Nogendro Nath Banerjee, the former Secretary of the National Theatrical Society be discharged and that the undersigned be appointed in his place. All persons having dealings and communications to make with the above Society, are requested to address the undersigned.

Calcutta, 24th January,
1873

MUTTY LAL SOOR
SECRETARY

সৌভাগ্যক্রমে এই বিবাদ মিটিয়া গেল — খুব সম্ভব সালিশী কমিটির চেষ্টাতেই। .... এই ব্যাপারের কয়েকদিন পরেই শিশিরকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন।

'ন্যাশনাল পেপার'-এ (৯ এপ্রিল) প্রকাশিত 'অবৈতনিক সেক্রেটারি নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখ-যুক্ত একটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের আপিস বাগবাজার রসিকচন্দ্র নিয়োগীর ঘাট হইতে বাগবাজার নেবুবাগান, ১১ নং আনন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে উঠিয়া যায়।

২৫ জানুয়ারি তারিখে 'নব-নাটক' অভিনীত হইবার পর ন্যাশনাল থিয়েটারে পুনর্বার 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হয় (১ ফেব্রুয়ারি)। ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে একখানি নূতন পুস্তকের অভিনয় হয়। পুস্তকখানি — 'অমৃত বাজার পত্রিকা' সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া'। ... পর-সপ্তাহে (১৫ ফেব্রুয়ারি) ন্যাশনাল থিয়েটারে 'জামাই-বারিক'-এর পুনরভিনয় হয় ও ইহার পর 'ভারতমাতা' নামক একটি রূপক-নাট্যের (Mask) একটি দৃশ্য প্রদর্শিত হয়। ইহা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। .... ইহার পর-দিনই ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক হিন্দুমেলার সপ্তম অধিবেশনে পাইকপাড়ার উত্তরে নৈনানস্থ হীরালাল শীলের উদ্যানে ভারতরাজলক্ষ্মী ও অন্যান্য নাটকের (নীলদর্পণ প্রভৃতির) অংশ বিশেষ অভিনীত হয়।

এই সকল অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারের দল মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করা স্থির করিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল — ভীমসিংহের ভূমিকা কে লইবে? শেষে স্থির হইল, গিরিশচন্দ্র এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন, কিন্তু থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁহার নাম থাকিবে না।

১৮৭৬ সনের ২২ ফেব্রুয়ারি শনিবারে 'কৃষ্ণকুমারী' ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। থিয়েটারের হ্যান্ডবিলে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে লেখা হইল : ভীমসিংহ — By a distinguished amateur। .... 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনীত হইবার কিছুদিন পরেই ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ করিতে লইল। ৮ মার্চ তারিখে যে অভিনয় হয়, উহাই সে-বারের মতো ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয়।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথমপর্বের ইতিহাস সমাপ্ত করিবার পূর্বে দুইটি কথা না বলিলে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রথম কথা এই যে, বাংলা দেশে নাট্যশালার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা বাগবাজারের দলের দ্বারাই হইল। বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ অসমাপ্ত ও অর্ধ-সমাপ্ত ছিল, তাহা অবশেষে কয়েকটি নিঃসম্বল যুবকের আগ্রহে ও অধ্যবসায়ে চিরস্থায়ী হইল। ইহার কৃতিত্ব যে কতটা, তাহা যিনি বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা বা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। এই যুবকদিগকে যে দারিদ্র্য ও অসুবিধার মধ্যে তাঁহাদের সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করিতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা আমরা অনেক জায়গায় পাই। .... বঙ্গীয় নাট্যশালা যদি চিরস্থায়ী হইয়া থাকে, তবে এই কয়েকটি যুবকের যত্নে ও চেষ্টাতেই হইয়াছে, তাহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দ্বিতীয় কথা, দীনবন্ধুর নিকট বঙ্গীয় নাট্যশালার ঋণ অপরিশোধ্য। দীনবন্ধুর নাটক না থাকিলে ন্যাশনাল থিয়েটারের এত প্রতিষ্ঠা হইত কি না সন্দেহ।

২.

ন্যাশনাল থিয়েটার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। গিরিশচন্দ্রের দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া টাউন হলে অভিনয়ের পরেই রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে স্টেজ খাটাইয়া অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় দল কোনও স্টেজ ও সিন্ না পাইয়া 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া লিন্ডসে স্ট্রিটে অপেরা হাউস ভাড়া লইয়া অভিনয় দেখাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই দুই দলের ইতিহাস পরস্পরের সহিত এতটা যুক্ত যে, এক পরিচ্ছেদেই উহা বিবৃত করা উচিত। প্রথমে হিন্দু ন্যাশনালের কথা বলিব।

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতি যে-সকল অভিনয় করেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাহার দুইটি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। অপেরা হাউসের হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৩ সনের

৫ এপ্রিল, শনিবার। .... পরের সপ্তাহে (১২ এপ্রিল, শনিবার) হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার 'বিধবা বিবাহ' নাটকের অভিনয় করেন। ১০ এপ্রিল তারিখের 'ইংলিশম্যান'-এ ইহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই রঙ্গামঞ্চে আরও দু-একটি অভিনয় হইয়াছিল; কিন্তু তাহার কোনও বিবরণ বা বিজ্ঞাপন আমি এখনও পাই নাই। ১৮৭৩ সনের ২৬ এপ্রিল তারিখে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার হাবড়া রেলওয়ে থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের কয়েকদিন পরেই — মে মাসের গোড়ায় হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় চলিয়া যান। হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় গিয়া সেখানকার পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমির বাঁধা স্টেজে খুব কৃতিত্বের সহিত অভিনয় দেখান।

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় 'নব-নাটক' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি নাটকের অভিনয় করেন।

ঢাকায় মাসখানেক থাকিয়া হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কিছুদিন পরে অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রমুখ এই দলের কয়েকজন অভিনেতা 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র সহিত মিলিত হইয়া একবার অভিনয় করেন। উপলক্ষ্য — দিঘাপতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন। .... ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রাজশাহীতে ন্যাশনাল থিয়েটারের এই অভিনয় দেখিয়াছিলেন। .... রাজশাহীতে অভিনয়ের পর এই দল রামপুর বোয়ালিয়া ও বহরমপুরে অভিনয় করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া জুলাই মাসে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার আরও একবার ন্যাশনাল থিয়েটারের সহিত একযোগে অপেরা হাউসে অভিনয় করেন।

১৮৭৩ সনের ১৩ সেপ্টেম্বর হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার চুঁচুড়ায় 'মোহন্তের এই কি কাজ!' অভিনয় করেন। তারকেশ্বরের মোহন্ত ও এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া নাটকখানি রচিত হয়। কলিকাতায় বেঙ্গল থিয়েটারে (ইহার পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে) ইহার অভিনয় খুব জনপ্রিয় হওয়াতে হিন্দু ন্যাশানাল থিয়েটার চুঁচুড়াতেও নাটকখানা অভিনয় করিয়া আসেন। ১৮৭৩, ১৭ সেপ্টেম্বরের 'ইন্ডিয়ান মিরার'-এ প্রকাশিত একখানি পত্র হইতে জানা যায়, প্রথমে 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' হইবার পর 'মোহন্তের এই কি কাজ' অভিনীত হইয়াছিল।

৩.

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার যখন এইরূপে কলিকাতায় ও মফস্বলে অভিনয় দেখাইতেছিল, সে-সময়ে গিরিশচন্দ্রের দলটিরও অভিনয় চলিতেছিল। গিরিশবাবুর নেতৃত্বে ন্যাশনাল থিয়েটারের এই ভগ্নাংশটি 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে অভিনয় করিতে লাগিল। এই নূতন ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় 'নীলদর্পণ' টাউন হলে ১৮৭৩ সনের ২৯ মার্চ অভিনীত হয়। এই অভিনয় নেটিভ হাসপাতালের (বর্তমানে মেয়ো হাসপাতাল) সাহায্যকল্পে হইয়াছিল। থিয়েটারে সাহায্য-রজনীর দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম। এই অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 'ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন'-এর দাতব্য-বিভাগের সাহায্যার্থে টাউন হলে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের তারিখ ৫ এপ্রিল ১৮৭৩। 'সধবার একাদশী'র অভিনয়ের শেষে 'ভারতমাতা' প্রদর্শিত হয়।

ন্যাশনাল থিয়েটার ইহার পর টাউন হল হইতে স্টেজ খুলিয়া আনিয়া শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৩, ১০ এপ্রিল তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে প্রথম অভিনয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ১২ এপ্রিল 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হইবার সাতদিন পরে (১৯ এপ্রিল) রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বিতীয় অভিনয় হয়। পরের সপ্তাহে (২৬ এপ্রিল) ন্যাশনাল থিয়েটার দুইটি প্রহসনের অভিনয় দেখান। উহাদের একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', অপরটি মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা'। সেইদিন অভিনয়ান্তে 'ডিস্পেন্সাবি' ও 'চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারি' নামে আরও দুইটি রঙ্গনাট্য ও ভারতসংগীত ('ভারতমাতা'র সংগীত) হইয়াছিল। রাধাকান্ত দেবের নাট্যমন্দিরে ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় ১০ মে। এইদিন 'কপালকুণ্ডলা' অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয় হইয়া গেলে ২২ মে তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় : গত শনিবার ন্যাশনেল থিয়েটর কম্পানিও অভিনয়ার্থ ঢাকায় গমন করিয়াছেন।

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের দেখাদেখি ন্যাশনাল থিয়েটারও অভিনয় দেখাইবার জন্য ঢাকায় গমন করেন, কিন্তু সে দলে গিরিশচন্দ্র ছিলেন না। .... ঢাকায় গিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার তেমন কৃতকার্য হইলেন না।

ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ন্যাশনাল থিয়েটার এবং হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতা একত্র হইয়া দুইবার অভিনয় করেন — একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই দুই অভিনয়ের প্রথমটি হয় — দীঘাপতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে এবং দ্বিতীয়টি হয় — মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যকল্পে।

ইহার প্রায় দুইমাস পরে, ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি অভিনয় দেখাইবার জন্য মুর্শিদাবাদ যান ও পরবর্তী অক্টোবর মাসে উহার কাশীতে অভিনয় দেখাইবার সংবাদ ১৮৭৩, ২ নভেম্বর তারিখের 'সাধারণী' পত্রে প্রকাশিত হয়।

হিন্দু ন্যাশনাল ও ন্যাশনাল থিয়েটারের মফস্বল-ভ্রমণে দেশে নাট্যাভিনয়ের যে প্রসার হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৪.

১৮৭২ সনের ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই আর একটি সাধারণ রঙ্গালয় কলিকাতায় অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করে। ইহার নাম ওরিয়েন্টাল থিয়েটার। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-লেখকগণ কেহই এ-পর্যন্ত এই নাট্যশালাটির উল্লেখ করেন নাই। এই নাট্যশালাটিও ন্যাশনাল থিয়েটারের মতো ভদ্রসন্তানদের দ্বারাই পরিচালিত এবং তাহারই অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৭৯ সালের ১২ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬) তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রে এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংবাদ এবং তৎসঙ্গে নাম-সম্বন্ধে একটু টিপ্পনীও আছে।

ইহার পূর্বে — ১৮৭৩ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার কর্তৃক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতী-মাধব' অভিনীত হয়। .... 'মালতী-মাধব'-এর পর ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার কর্তৃক মদনমোহন মিত্রের 'মনোরমা নাটক' অভিনীত হয়। ১৮৭৩ সনের ৮ মার্চ মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় হয়। তখন ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের অভিনয়ও চলিতেছিল। ইহার পর ১৮৭৩, ১৫ মার্চ তারিখে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে আর একটি অভিনয় হইয়াছিল।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের আর কোনও অভিনয়ের উল্লেখ আমি পাই নাই। মোটের উপব বুঝা যাইতেছে, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ন্যাশনাল থিয়েটারের অনুকরণমাত্র। উহার কৃতিত্ব খুব বেশি নয়।

৫.

সে যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা সম্বন্ধে এবার আলোচনা করিতেছি। ইহার নাম বেঙ্গাল থিয়েটার।

ন্যাশনাল থিয়েটার যে-সময়ে অভিনয় বন্ধ করে, সেই সময়ে ইহার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছিল। বেঙ্গাল থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ ও অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন প্যারীমোহন রায়। শরৎচন্দ্র সাতুবাবুর দৌহিত্র এবং নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা। এতদিন পর্যন্ত কলিকাতার কোনও রঙ্গালয়েরই নিজের বাড়ি ছিল না। বেঙ্গাল থিয়েটার নিজের রঙ্গমঞ্চ ও খোলার বাড়ি লিউইসের লাইসিয়াম থিয়েটারের আদর্শে নির্মাণ করাইয়া অভিনয় আরম্ভ করে। এই রঙ্গমঞ্চে আর একটু নূতনত্বেরও আমদানি করা হয়। ইতিপূর্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষ কর্তৃকই অভিনীত হইত। এই নূতন নাট্যশালায় সর্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হয়। .... এখন যেখানে বিডন স্ট্রিট ডাকঘর অবস্থিত, সেই জায়গায় এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অভিনেত্রী লওয়া সম্বন্ধে যে আপত্তি এবং আশঙ্কা ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা সমকালীন সংবাদপত্রে কিছু কিছু পাই।

সে যাহা হউক, বেঙ্গাল থিয়েটারের পেশাদার অভিনেত্রী লইয়াই অভিনয় চলিতে লাগিল। এই নাট্যশালায় অভিনীত প্রথম নাটক যে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা', তাহা 'ভারত-সংস্কারক' হইতে উদ্ধৃত বিবরণ পাঠেই জানা যায়। মধুসূদনের

অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যার্থে এই অভিনয় ১৮৭৩ সনের ১৬ অগাস্ট হয়। উহার পরের সপ্তাহেও 'শর্মিষ্ঠা'রই অভিনয় হইল। ১৮৭৩ সনের অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১২৮০) বেঙ্গাল থিয়েটারে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'স্বপ্নধন' নাটক অভিনীত হয়। ১৮৭৪ সনের ১৪ মার্চ বিদ্যাসুন্দর' ও 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' অভিনীত হয়। ১৮৭৪ সনের ১৮ এপ্রিল বেঙ্গাল থিয়েটারে 'মায়াকানন'-এর প্রথম অভিনয় হয়। মধুসূদন মৃত্যুর পূর্বে বেঙ্গাল থিয়েটারের জন্য এই নাটকখানি লিখিয়াছিলেন। অনেকে লিখিয়াছেন যে, 'মায়াকানন' লইয়াই বেঙ্গাল থিয়েটার প্রথম রঙ্গাভূমে অবতীর্ণ হন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ভুল।

পর-সপ্তাহে (২৫ এপ্রিল) 'মায়াকাননে'র দ্বিতীয় অভিনয় হয়। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' বা 'মায়াকানন' লইয়া বেঙ্গাল থিয়েটার তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই এই নাট্যশালায় 'মোহন্তের এই কি কাজ!' নামে একখানি নাটক অভিনীত হয়। নাটকখানি তারকেশ্বরের মোহন্ত ও এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া লিখিত। দেশে তখন এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। এ বিষয়ে নটেক অভিনয় করিয়া বেঙ্গাল থিয়েটারের কপাল ফিরিয়া গেল।

এই বৎসরের শেষের দিকে বেঙ্গাল থিয়েটার বর্ধমান মহারাজের আহ্বানে কালনার রাজবাটীতে অভিনয় করেন। বেঙ্গাল থিয়েটারের অভিনয়ে বর্ধমানাধিপতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কারণ ইহার অল্পদিন পরেই — ডিসেম্বর মাসে তিনি বেঙ্গাল থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক হন। এই উপলক্ষ্যে ১৮৭৪, ১২ ডিসেম্বর তারিখে 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয় হয়। নাট্যশালার ভিতর ও বাহির পরিপাটিরূপে সাজান হইয়াছিল।

পর বৎসর (১৮৭৫) ফেব্রুয়ারি মাসে 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নামে একটি দল বেঙ্গাল থিয়েটারের সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন সম্মিলিত অভিনয় দেখান। এই দলটি 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' হইতে বিচ্ছিন্ন অভিনেতাদের সহযোগে গঠিত। গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীতে অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মণ, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি ছিলেন।

গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী ও বেঙ্গাল থিয়েটার — এই উভয় দলের সম্মিলিত অভিনয় হয় ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ তারিখে। এই দিন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী কি কলঙ্কিনী' নামক গীতিনাট্য অভিনীত হয়। এই উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত অভিনয়গুলির মধ্যে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; উহা মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'। এই অভিনয় হয় ৬ মার্চ ১৮৭৫ তারিখে।

ওই বৎসর (১৮৭৫) অগাস্ট মাসে 'দি নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল) থিয়েটার' নামে আর একটি সম্প্রদায় বেঙ্গাল থিয়েটারের রঙ্গামঞ্চে কিছুদিন অভিনয় করেন। গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীর ন্যায় এই দলটিও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে বিচ্ছিন্ন অভিনেতাদের সহযোগে গঠিত। দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার সর্বপ্রথম বেঙ্গাল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন — ১৮৭৫, ১৪ অগাস্ট তারিখে। এইদিন উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের অভিনয় হয়।

দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার কোম্পানী যে ভূতপূর্ব ন্যাশনাল থিয়েটার, তাহা ২ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'বীরনারী' অভিনয়ের নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যাইবে।

BENGAL THEATRE

Attention Please!

SATURDAY 4th SEPTEMBER 1875

On the Stage of the Bengali Theatre Co.

... ...

বীরনারী

...

উপরে যে সকল অভিনয়ের উল্লেখ করা গেল, তাহা ছাড়া বেঙ্গাল থিয়েটারে আরও অনেকগুলি নাটকের অভিনয়

হয়। এ-সকলের মধ্যে 'গুইকোয়ার নাটকটি' উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবার অপরাধে তদানীন্তন বরোদা-রাজের বিচার হয়। এই বিষয়টি লইয়া নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ মিত্র উভয়ে 'গুইকোয়ার নাটক' রচনা করেন।

১৮৭৬ সনের ২৫ জানুয়ারি তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সময় বেঙ্গাল থিয়েটারের নূতন বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ হয়।

৬.

১৮৭৩ সনের শেষের দিকে 'হিন্দু ন্যাশনাল' এবং 'ন্যাশনাল', এই দুই নাট্যসম্প্রদায়ই মফস্বল-ভ্রমণ শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে হিন্দু ন্যাশনালের দল 'গ্রেট ন্যাশনাল' নাম ধারণ করেন, কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটার পূর্ব নামই বজায় রাখেন।

মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় তারিখ ৭ ডিসেম্বর, ১৮৭২। পর-বৎসর উভয়েই, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উৎসব করেন। গ্রেট ন্যাশনালের সাম্বৎসরিক উৎসবের কোনও বিস্তৃত বিবরণ আমি পাই নাই। কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটারের সভা চিৎপুর রোড মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে হয়। বিখ্যাত নাট্যকার মনমোহন বসু এই সভায় একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশে নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে অনেকগুলি যথার্থ এবং জ্ঞাতব্য কথা বলেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারের দল এই সময়ে আবার তাঁহাদের পুরাতন বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'বিশ্বকোষ'-এর 'রঙ্গালয় প্রবন্ধ (পৃ. ১৯৬) হইতে জানা যায়, মতিবাবু, বেলুবাবু প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল পাল এই দলের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সাম্বৎসরিক উৎসবের পর এখানে তাহাদের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৩ সনের ১৩ ডিসেম্বর। *

১৮৭৪ সনের ৩ জানুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। পরবর্তী ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে সমারোহের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' অভিনীত হয়। ইহার অল্পদিন পরেই ন্যাশনাল থিয়েটারের দল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর সহিত মিলিত হইয়া যান।

ন্যাশনাল থিয়েটার যে দ্বিতীয় বার তাঁহাদের পুরাতন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই সকল অভিনয় করেন, তাহা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-লেখকদের অনেকেই এ পর্যন্ত জ্ঞাত ছিলেন না।

৭.

ন্যাশনাল থিয়েটার গ্রেট ন্যাশনালের সহিত সম্মিলিত হইলে, খুব সম্ভব জোড়াসাঁকো সান্যাল-বাড়িতেই 'জোড়াসাঁকো নববঙ্গ নাট্যশালা' (নিউ বেঙ্গাল থিয়েটার) প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করে। ১৮৭৪ সনের ১২ মার্চ তারিখে এই নাট্যশালা হইতে প্রকাশিত 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' নামে একখানি নাট্যগ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি।

৮.

ন্যাশনাল থিয়েটারে এই সকল অভিনয়ের সময়ে গ্রেট ন্যাশনালের অভিনয়ও পূর্ণবেগে চলিতেছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পরই উহার জন্য ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের জমিতে গড়ের মাঠের লিউইস থিয়েটারের অনুকরণে একটি সুদৃশ্য নাট্যশালা নির্মাণের আয়োজন চলিতে লাগিল। এই কাজের ভার ছিল ধর্মদাস সুরের উপর। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :

---

* 'হেমলতা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। — স.

.... আমার চেষ্টায় ও ভুবনমোহন নিয়োগীর পয়সায় বিডন ষ্ট্রীটে মহেন্দ্রনাথ দাসের জমী ভাড়া লইয়া (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) এক কাষ্ঠের ঘর নির্ম্মাণ করি ও উহার নাম দেওয়া হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। এই বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমি ইংরাজ বা ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য লই নাই, তবে ড্রপ সিন ও আর দু-চারখানি সিন মিঃ গ্যারিক্‌কে দিয়ে আঁকান হয়। — 'নাট্য-মন্দির', ভাদ্র ১৩১৭, পৃ. ১০৩।

১৮৭৩ সনের ২৯ সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে এই নাট্যশালার মূলপ্রস্তর স্থাপন কার্য শেষ হয়। এই ব্যাপারে বহু ভদ্রলেলোকের সমাগম হইয়াছিল।

নাট্যশালা নির্ম্মাণ শেষ হইতে মাস-তিনেক লাগিল। ইতিমধ্যে গ্রেট ন্যাশনাল ও ন্যাশনাল, উভয়েরই সাম্বৎসরিক উৎসব রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে ১৮৭৩, ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। *

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম রাত্রিতেই আগুন লাগিয়া 'কাম্য কানন'-এর অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। এই দুর্ঘটনার পর-দিন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বেলভেডিয়ারে সঙের বাজারে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় করেন।

১৮৭৪ সনের ১০ জানুয়ারি হইতে গ্রেট ন্যাশনাল নিজ রঙ্গামঞ্চে পুনরায় অভিনয় আরম্ভ করিলেন। 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনীত হইল। পরবর্তী ১৭ জানুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মনোমোহন বসুর 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের অভিনয় হয়। ইহার পরের সপ্তাহে ১৮৭৪, ২৪ জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনালে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়।

এই স্থানে দুইটি কথার উল্লেখ করিয়া রাখা উচিত। গ্রেট ন্যাশনাল যখন প্রথম অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করেন, তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলেন। কিছুদিন পরে দুইজনেই এই দলে যোগদান করেন। আর একটি কথা এই, — স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় গ্রেট ন্যাশনালে প্রথম প্রথম পুরুষের দ্বারাই হইত, পরে অভিনেত্রী লওয়া হয়।

১৮৭৪, ৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' সমারোহের সহিত গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয় হয়।

১৮৭৪, ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার পর-পর চারটি শনিবারে নিম্নলিখিত নাটকগুলি অভিনয় করিবেন বলিয়া একটি বিজ্ঞাপন দেন, —

১৪ ফেব্রুয়ারি	....	কপালকুণ্ডলা
২১ ফেব্রুয়ারি	....	মৃণালিনী
২৮ ফেব্রুয়ারি	....	নগরের নবরত্ন সভা
৭ মার্চ	....	বৃষবৃক্ষ

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' প্রথম অভিনীত হয় — ১৮৭৪, ২১ ফেব্রুয়ারি; সকলেই ভুল করিয়া লিখিয়াছেন — ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'মৃণালিনী'র অভিনয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রেট ন্যাশনালে নহে, সান্যাল-ভবনে স্থাপিত ন্যাশনাল থিয়েটারে। ১৮৭৪, ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে পুনরায় 'মৃণালিনী'র অভিনয় হইয়াছিল।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়-রজনীর দুর্ঘটনার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেদিন কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিনামূল্যে দর্শকগণকে একদিন অভিনয় দেখাইবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৮ মার্চ ১৮৭৪ তারিখে 'নবীন তপস্বিনী' অভিনয়ের আয়োজন হয়। ১৮ এপ্রিল তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 'হেমলতা' নাটক অভিনীত হয়। এই সময় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' সম্প্রদায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার দলের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

১৮৭৪, ৩০ মে তারিখে 'কুলীনকন্যা বা কমলিনী' নাটক অভিনীত হইবার পর প্রায় চারি মাসের জন্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়-কার্য বন্ধ থাকে।

ইহার পর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও মফস্বল-ভ্রমণে বাহির হন। এই দল ১৮৭৪ সনের ২২ ও ২৫ জুন তারিখে বহরমপুরে যে-অভিনয় প্রদর্শন করেন, সে-সম্বন্ধে ৫ জুলাই তারিখে 'সাধারণী' পত্রিকায় এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়।

---

* এরপর ৩১ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনালের প্রথম নাটক 'কাম্য কানন' মঞ্চস্থ হয়। — স.

মফস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়া গ্রেট ন্যাশনালের দল মহোৎসাহে নূতন করিয়া অভিনয় দেখাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। এতদিন পর্যন্ত গ্রেট ন্যাশনালে পুরুষদের দ্বারাই স্ত্রী-চরিত্র অভিনীত হইত। এই সময়ে কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী নামে পাঁচটি অভিনেত্রী সংগৃহীত হইল।

১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রেট ন্যাশনালে সমারোহের সহিত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী কি কলঙ্কিনী?' অভিনীত হইয়া গেল। এই সময় হইতে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়েটারের ম্যানেজার হন; তৎপূর্বে ধর্মদাস সুর ম্যানেজার ছিলেন। এই পরিবর্তনের মূলে আয় ও অর্থ-ঘটিত কিঞ্চিৎ গোলযোগ ছিল, অনেকেই এরূপ অনুমান করিয়াছেন। 'সতী কি কলঙ্কিনী?' অভিনয়ের সময় গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনালে ছিলেন না। ইহার পর-সপ্তাহের শনিবারে ২৬ সেপ্টেম্বর আবার 'সতী কি কলঙ্কিনী?'র অভিনয় হয়।

১৮৭৪, ৩ অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকের অভিনয় হয়। ১০ অক্টোবর পুনরায় 'সতী কি কলঙ্কিনী?' ও 'ভারতে যবন' নাটক দুইখানি অভিনয় হইয়া পূজাবকাশ পর্যন্ত থিয়েটার বন্ধ থাকে। ১৩ অক্টোবর তারিখে 'ইংলিশম্যান' শেষোক্ত অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া জানান যে, পূজার ছুটির পর এই নাট্যশালায় শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হইবে। ৪ নভেম্বর তারিখের 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউস্' পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি হইতে আমরা জানিতে পারি যে ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদ 'রুদ্রপাল' নামে ৩১ অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনালে প্রথম অভিনীত হয়।

১৮৭৪ সনের ১৪ ও ২১ নভেম্বর তারিখে 'আনন্দকানন অথবা মদনের দিগ্বিজয়' ও 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র অভিনয় হয়। 'আনন্দকানন'-এ অর্দ্ধেন্দুশেখর একটি ভূমিকা লইয়াছিলেন।

কিন্তু অভিনয় সাফল্যলাভ করিলেও গ্রেট ন্যাশনালের দলটি বেশিদিন একত্র রহিল না। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' যে আত্মকলহ সম্বন্ধে গ্রেট ন্যাশনালকে সাবধান করিযাছিলেন, সেই আত্মকলহে দলটি শীঘ্রই বিভক্ত হইয়া গেল।

১৮৭৪, ২৬ নভেম্বর তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় পরবর্তী ২৮ নভেম্বরের তারিখে 'রুদ্রপাল' এবং ২ ডিসেম্বর বুধবার অমৃতলাল বসুর সাহায্য-রজনী উপলক্ষ্যে 'শত্রুসংহার' নাটক অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দুইটি অভিনয় হয় নাই বলিয়া মনে হয়, অন্তত প্রথমটি যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ আছে। এই সময়েই গ্রেট ন্যাশনালের দলে একটি গোল বাধে। গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচয়িতা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :

> .... লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর 'আনন্দকানন' গীতিনাট্যাভিনয়ের দর্শকগণকে প্রীত করিয়া সম্প্রদায়ও বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিলেন।
>
> এই সময়ে নগেন্দ্রবাবু একদিন ভুবনবাবুকে বলেন, — 'তুমি একখানি এগ্রিমেন্ট পত্রে আমাকে লিখিয়া দাও, যদ্যপি আমাকে কখনও ম্যানেজারের কার্য হইতে ছাড়াইয়া দাও, — আমাকে কুড়ি হাজার টাকা ড্যামেজ দিবে'। ভুবনমোহন বাবুর এরূপ এগ্রিমেন্ট লিখিয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, নগেন্দ্রবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন বর্ম্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান। — 'গিরিশচন্দ্র', পৃ. ১৮৩।

১৮৭৪, ২ ডিসেম্বর তারিখের 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউস্' পত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদেও টাকা-পয়সা সংক্রান্ত গণ্ডগোলের ইঙ্গিত আছে। .... এই সংবাদে অবশ্য কোনও নামোল্লেখ নাই, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই যখন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নাম দিয়া কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী লইয়া বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র অভিনয় করিতে থাকেন, তখন লোকে সন্দেহ করিল, 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউস'-এর উপরি-উক্ত মন্তব্যের লক্ষ্য তিনিই হইবেন।

নগেন্দ্রবাবুর দল পরিশেষে বেঙ্গাল থিয়েটারে যোগদান করেন। সে জন্য উহার পরবর্তী ইতিহাস বেঙ্গল থিয়েটারের প্রসঙ্গো বলা হইয়াছে। কিন্তু গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীর যতদিন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল, ততদিনের কথা এ স্থলে বলিয়া লওয়া সুবিধাজনক।

এ পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ছাড়িবার পর নগেন্দ্রবাবুর দল প্রথমে চুঁচুড়ায় অভিনয় করেন। অতঃপর এই দল 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নামে গড়ের মাঠের সুপরিচিত লিউইস থিয়েটার রয়ালে 'সতী কি কলঙ্কিনী?' ও 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এর অভিনয় করেন। ১৮৭৫, ১২ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) তারিখের 'ইংলিশম্যান'-এ প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে, এই অভিনয় হয় ৯ জানুয়ারি। যোধপুরের মহারাজা, অনেক গণ্যমান্য দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় বেশ সাফল্যলাভ করিয়াছিল। রাধিকার ভূমিকায় যাদুমণি, এবং 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' মাতালের ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন। মদনমোহন বর্মণের নেতৃত্বে কনসার্টও ভালোই হইয়াছিল।

ইহার পর গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী হাবড়া রেলওয়ে স্টেজে অভিনয় করেন। ১৮৭৫ সনের ১৬ জানুয়ারি 'সতী কি কলঙ্কিনী?' এবং ৩০ জানুয়ারি 'আনন্দকানন' ও 'ভারতে যবন' নাটকের অভিনয় হয়। এই সকল অভিনয়ের বিজ্ঞাপন 'ইংলিশম্যান'-এ প্রকাশিত হয়। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শেষের দিনের অভিনয়ে খুব জনসমাগম হয় এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা খুব কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করেন।

১৮৭৫, ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ইংলিশম্যান'-এ বিজ্ঞাপিত হয় যে, ১৯ ফেব্রুয়ারি হইতে অপেরা হাউসে অনেকগুলি গীতিনাট্য অভিনীত হইবে এবং ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা এই অভিনয়ে উপস্থিত থাকিবেন। এই অভিনয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা অনেক দেশীয় অভিনেত্রী কর্তৃক গৃহীত হইবে, তাহাও জানানো হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি 'সতী কি কলঙ্কিনী?' অভিনীত হইবে বলিয়াও এই বিজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে।

অতঃপর গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত হইয়া ৬ ফেব্রুয়ারি হইতে অভিনয় আরম্ভ করে।

আবার গ্রেট ন্যাশনালের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর ধর্মদাস সুর গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার হইলেন। তিনি পূর্বেও ম্যানেজার ছিলেন, মাঝে কিছুদিনের জন্য নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজার হন। নগেন্দ্রনাথ ভিন্ন দল গঠন করিবার কিছুদিন পর পর্যন্ত স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগীর নামে গ্রেট ন্যাশনালের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত। ১৮৭৬, ৭ জানুয়ারি তারিখের বিজ্ঞাপনে আবার ধর্মদাস সুরের নাম দেখা যায়।

এই সকল গোলমাল মিটিয়া যাইবার পর ১৮৭৪ সনের ১২ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনালে 'শত্রুসংহার' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকটি ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' অবলম্বনে হরলাল রায় কর্তৃক রচিত। খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিনোদিনী এই নাটকের অভিনয়ে একটি ছোট ভূমিকা লইয়া সর্বপ্রথম রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন। ১৮৭৪, ১৯ ডিসেম্বর তারিখেও 'শত্রুসংহার'-এর অভিনয় হয় এবং তাহার পরের সপ্তাহে (২৬ ডিসেম্বর) 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকের অভিনয় হয়।

এই সময়ে বঙ্গীয় নাট্যশালায় কোনও বড় জমিদার বা রাজা-মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনয় করিবার একটা রেওয়াজ হয়। বেঙ্গল থিয়েটারই উহার পথপ্রদর্শক। ১৮৭৫, ২ জানুয়ারি তারিখের অভিনয় সম্বন্ধে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি, —

> Under the distinguished and kind patronage
> His Highness, Moharaj Koomar Hurundra
> Kissore Sing Bahadur of Bhettia.
> His highness will be personally present.

এই দিন উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়; অভিনয় খুব সফল এবং উহাতে খুব জনসমাগমও হয়। .... ১৮৭৫, ১৬ জানুয়ারি প্যান্টোমাইম ও রাসলীলা প্রদর্শিত হয়। দৃশ্যগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। এই অভিনয়ে বর্মার রাজার দূত উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে একখানি নূতন নাটকের অভিনয় হয়। উহা প্রমথনাথ মিত্রের 'নগ-নলিনী'।

মার্চ মাসের শেষাশেষি গ্রেট ন্যাশনালের নামে অভিনয় করিবার জন্য পশ্চিম-ভ্রমণে বাহির হন। এই দলে ধর্মদাস সুর, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অবিনাশ কর, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রভৃতি ছিলেন। ১৩৩১ সালের 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রে প্রকাশিত বিনোদিনীর 'আমার অভিনেত্রীজীবন' শীর্ষক প্রবন্ধে এই পশ্চিম-ভ্রমণের অনেক কথা পাওয়া যায়। ....

ইহার অল্পদিন পরেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বিধি-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। এতদিন পর্যন্ত ভুবনমোহন নিয়োগী স্বত্বাধিকারী হইলেও ধর্মদাস সুরও উহার কর্মকর্তা ছিলেন। অগাস্ট মাস হইতে ভুবনবাবু ধর্মদাস সুরের হাত হইতে কার্যভার অপসারিত করিয়া রঙ্গামঞ্চ শ্যামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইজারা দেন। এই সময় ধর্মদাস সুর ও আরও কয়েকজন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। তাঁহারা 'দি নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল) থিয়েটার' নাম লইয়া ১৮৭৫, ১৪ অগাস্ট তারিখে বেঙ্গাল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন।

মহেন্দ্রলাল বসুর অধ্যক্ষতায় ১৮৭৫ সনের ৭ অগাস্ট তারিখে 'পদ্মিনী' নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের বিজ্ঞাপনেও থিয়েটারের নাম গ্রেট ন্যাশনাল বলিয়াই পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তী ১৪ অগাস্ট তারিখের 'ইংলিশম্যান'-এ 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে থিয়েটারের নাম The Indian (late Great) National Theatre বলিয়া দেওয়া আছে। .... ইহার পর এই নূতন নাট্যশালায় 'নীলদর্পণ' অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৭৫ সনের ২১ অগাস্ট। বিজ্ঞাপনে আছে — 'With an entirely new cast.' এই সময়েই অমৃতলাল বসু বেঙ্গাল থিয়েটার হইতে আসিয়া 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে' যোগদান করেন বলিয়া মনে হয়।

১৮৭৫, ৬ নভেম্বর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' অভিনীত হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপিত হয়। পূজাবকাশের পর ইন্ডিয়ান ন্যাশনালে ইহাই প্রথম অভিনয়; কারণ, বিজ্ঞাপনে Grand Opening Night দেখিতেছি। খুব সম্ভব, উহার অব্যবহিত পরেই এই থিয়েটারে আর একটি পরিবর্তন হয়। উহার কথা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'গিরিশচন্দ্র' পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন :

> চারি মাস যাইতে না যাইতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি (কৃষ্ণধন বাবু) ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, থিয়েটারের ভাড়া পর্যন্ত দিতে পারিলেন না। ভুবনমোহন বাবু বাধ্য হইয়া পুনরায় থিয়েটার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন।
>
> এবার গ্রেট ন্যাশনালের ডাইরেক্টর হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাস (হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র) এবং ম্যানেজার হইলেন নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। (পৃ. ১৮৫)

১৮৭৫, ২৩ ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, এই নাট্যশালার 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম উঠিয়া পূর্বনাম আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং মনে হয়, এই সময়েই ব্যবস্থা-পরিবর্তন ঘটে।

অগ্রণী গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৯৭৫-১৮৭৬)' বইটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় বাংলা ১৪০৫ সালে। সর্ব অর্থেই গ্রন্থটি অসাধারণ এবং মূল্যবান।বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচিত বিষয় 'সাধারণ রঙ্গালয়'। মুদ্রিত নিবন্ধটি তার সংক্ষিপ্ত রূপ।

গিরিশযুগ ও শিশিরযুগ

অজিতকুমার ঘোষ

১.

গিরিশচন্দ্রকে বাংলা নাট্যজগতের সর্বপ্রধান পুরুষ বলা যায়। আর সকলের মধ্যে কেউ নট, কেউ বা নাট্যকার। কিন্তু গিরিশচন্দ্র নট ও নাট্যকার। অবশ্য নট ও নাট্যকার আগেকার দিনে এবং বর্তমানে আরও অনেকে আছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাশালী পুরুষ নন। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নটের প্রতিভার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের প্রতিভার মিলন ঘটেছিল। একই সঙ্গে নট ও নাট্যকার বটে, তবে সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে তাঁর নাট্যজীবনের গোড়ার দিকে তিনি নট ও শেষের দিকে প্রধানত নাট্যকার। অভিনেতারূপে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে শিক্ষক, মঞ্চাধক্ষ্য, নাট্যাচার্য, নাট্যকার — একটির পর একটি দায়িত্ব গ্রহণ করতে লাগলেন। সেজন্য যে অসামান্য অভিনয়-প্রতিভা নিয়ে তিনি রঙ্গামঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তার অপরিমেয় সম্পদের অবিচ্ছিন্ন দান থেকে মঞ্চজগৎ বঞ্চিত হয়ে রইল। মঞ্চের সঙ্গে দীর্ঘকালের যোগের মধ্যে কটি ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন? মাত্র ত্রিশ কি বত্রিশটি ভূমিকায়। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। তাঁর মতো নিরাসক্ত উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মঞ্চসেবক খুব কমই ছিলেন। নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধি এবং নাট্যশিল্পীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি মেঘাবৃত বজ্রাগ্নির মতো নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। কখনও মহেন্দ্রলাল বসু, কখনও অমৃতলাল মিত্র, কখনও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আর কখনও বা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), তিনি তাঁর শিষ্যদের তাঁরই প্রাপ্য ভূমিকায় নামবার সুযোগ দিয়েছেন। তাঁরা সমাদর পেয়েছেন, হাততালি পেয়েছেন, আর নেপথ্য থেকে এই আত্মত্যাগী শিষ্যবৎসল গুরু আত্মপ্রসাদ বোধ করেছেন। তবে মাঝে মাঝে

তিনি যখন নেপথ্য থেকে পাদপ্রদীপের সম্মুখে অবতীর্ণ হতেন, তখনই সকলে বুঝতে পারত, 'Girish Babu first and every body else nowhere'[১]। মাইকেল, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি যখন পুরনো হয়ে এল, তখন দায়ে পড়ে গিরিশচন্দ্র নাট্যকারের লেখনী ধারণ করলেন।[২] নাট্যভারতীর সেবা করতে গিয়ে তিনি একরকম মঞ্চভারতীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এর ফলে নাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটল বটে, কিন্তু মঞ্চের ক্ষতি হল অপূরণীয়।

যিনি একটি অভিনয়-যুগের স্রষ্টা ও শিক্ষক, তিনি নিজে অভিনয় শেখালেন কীভাবে, এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। প্রথমেই বলতে হয়, ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা না থাকলে এত বড় অভিনেতা হওয়া যায় না। কিন্তু শুধু ঐশ্বরিক ক্ষমতায় চলে না, শিক্ষা চাই, অনুশীলন চাই। লুইস থিয়েটারের মিসেস লুইসের সংস্পর্শে আসার ফলে তিনি থিয়েটারি-অভিনয় দেখার সুযোগ পেলেন এবং অভিনয় সংক্রান্ত অনেক জ্ঞানলাভ করলেন।[৩] নাটক ও অভিনয় বিষয়ক গ্রন্থাদি থেকেও তিনি অনেক শিক্ষালাভ করেছিলেন।[৪] উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অ্যাটকিনসন সাহেবের অফিসে কাজ করার সময়েই তিনি 'ম্যাকবেথ'-এর অনুবাদ করেছিলেন। 'সধবার একাদশী'র অভিনয়ের আগে এক বছর তিনি বাগবাজারের শখের যাত্রাদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদেশী থিয়েটারি-অভিনয় ও দেশী যাত্রাভিনয়, এই দুই অভিনয়ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মধ্যে দিয়েই তাঁর নিজস্ব অভিনয়চিন্তা ও অনুশীলন চলছিল।

গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ধারার আলোচনা করলে দেখা যাবে, প্রথমে দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকে, তারপর মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও রোমান্সধর্মী নাট্যচরিত্রে, তারপর নিজস্ব পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের চরিত্রে এবং সর্বশেষে নিজের সামাজিক নাটকের করুণরসাত্মক ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মঞ্চে 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকাতেই তাঁর প্রথম অভিনয়। গিরিশচন্দ্রের চেহারা, ব্যক্তিত্ব, স্বভাব, বৈদগ্ধ্য ও মানসিকতা নিমচাঁদ চরিত্রের সঙ্গে এমনই খাপ খেয়ে গিয়েছিল যে, এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েই তিনি বিপুল বিক্রমে তাঁর জয় ঘোষণা করলেন।[৫] পরবর্তী নাটকের, অর্থাৎ 'লীলাবতী'র নায়ক ললিতমোহনের ভূমিকা গ্রহণ করলেন গিরিশচন্দ্র। কিন্তু এই ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি প্রশংসিত হলেও অভিনয় তেমন কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি।[৬] গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যখন 'কৃষ্ণকুমারী'র ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তখন সকলেই তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। স্বয়ং মধুসূদন তাঁর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ট্র্যাজিক চরিত্রেই গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভার অতুলনীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ পায়। এই খ্যাতি ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয়ের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মৃণালিনী'র পশুপতি চরিত্রে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়খ্যাতি আরও বর্ধিত হল।

১৮৭৭ থেকে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় গিরিশচন্দ্র সবচেয়ে বেশি নাটক অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু এই সময়কার অভিনয়ে তাঁর অভিনয় ক্ষমতার কোনও অবিস্মরণীয় নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও কোনও নায়ক চরিত্রে (যথা নগেন্দ্রনাথ, জগৎসিংহে) তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু রোমান্টিক নায়ক চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর আকৃতি, কণ্ঠস্বর ও মানসিকতা কিছুই অনুকূল ছিল না। কয়েকটি অনুল্লেখযোগ্য নাটকে অভিনয়ের পর তিনি পৌরাণিক নাটক লেখা শুরু করলেন এবং ওইসব নাটকের প্রধান চরিত্রে তিনি অবতীর্ণ হলেন, যথা রাম (রাবণবধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণবর্জন ইত্যাদি), যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন (অভিমন্যুবধ), কীচক ও দুর্যোধন (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)। এই অভিনয়গুলিতে তাঁর নিজস্ব গৈরিশী ছন্দে আবৃত্তির সুযোগ ছিল। কিন্তু ধীর, সংযত, কোমল ও আদর্শ চরিত্রের অভিনয়ে তিনি উল্লাস বোধ করতেন না।[৭]

ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর গিরিশচন্দ্র আর কোথাও নিয়মিত অভিনয় করেননি। স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর প্রথম নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'-এ দক্ষের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তারপর আর স্টার থিয়েটারে কোনও অভিনয় করেননি। দশ বছর পরে মিনার্ভায় যোগদানের পর ম্যাকবেথ এবং আরও কয়েক বছর পর সীতারাম এই দুটি ভূমিকা ছাড়া তিনি আর কোনও নায়কচরিত্রে অভিনয় করেননি। নিজের পুত্র দানীবাবুকে নায়কের পার্ট দিয়ে নিজে টাইপ অথবা পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় শুরু করলেন। তবে এই শেষ যুগে প্রতিভার অমর স্বাক্ষর রয়ে গেল কয়েকটি বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত সামাজিক চরিত্রে, যথা কালীকিংকর (মায়াবসান), যোগেশ (প্রফুল্ল) ও করুণাময় (বলিদান) প্রভৃতি

চরিত্রে।

গিরিশচন্দ্রের আকৃতি, কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্ব সব কিছুই এক ক্লাসিক মহিমা ও ধ্রুপদী গাম্ভীর্যে মণ্ডিত ছিল। ঐরাবতের ন্যায় বিশাল দেহ, কণ্ঠস্বরে সিংহের গর্জন, মুখে চোখে মেঘ ও বিদ্যুতের তরঙ্গিত লীলা।[৮] যখন তিনি মঞ্চে আবির্ভূত হতেন তখন মনে হত মহাকাব্য থেকে বুঝি নেমে এসেছেন কোনও অতিকায় বীর। তাঁর বিশাল মুখমণ্ডলের পেশীগুলি প্রত্যেকটি ভাব সচল ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলত।[৯] তাঁর ব্যক্তিত্ব এত অসাধারণ ছিল যে তিনি রঙ্গামঞ্চে এলেই দর্শকদের মধ্যে এক ভয়স্তব্ধ মহাবিস্ময়ের উদ্রেক হত।[১০] গিরিশচন্দ্রের বিশাল ও গম্ভীর আকৃতি রোমান্টিক প্রণয়ী নায়কের উপযোগী ছিল না, মহৎ দুঃখের অন্তর্ভেদী হাহাকার ও আকাশবিস্তারী আর্তনাদের পক্ষেই উপযোগী ছিল। প্রণয়ী চরিত্রের দীনতা, আকুতি ও স্নিগ্ধ পেলবতা তাঁর চেহারা, স্বভাব ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যেন বেমানান ছিল, তিনি যেন চেয়েছিলেন তাঁর অতুলন বৈভবের দ্বারা সকলকে ত্রস্ত ও চমৎকৃত করতে, দুঃখকে আঘাতকে সোজা মাথায় বরণ করে নিতে, ব্রজের আগুনে দগ্ধ হয়েও যেমন বনস্পতি খাড়া হয়ে থাকে। গিরিশচন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই সুরেলা অভিনয় করতেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে কখনও অভিনয়ে একটানা সুর দিতেন না।[১১] আবেগের জন্য কথায় যতটুকু শিল্পসম্মত সুর দেওয়া প্রয়োজন ততটুকুই শুধু দিতেন।[১২]

একই ভূমিকায় কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য ও ভাবাভিব্যক্তির বিভিন্নতার দ্বারা যে নানাভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় তা গিরিশচন্দ্র একাধিক স্থানে বলেছেন। আসলে অভিনেতা তাঁর নিজস্ব চিন্তা দ্বারা কোনও একটি চরিত্রের অদৃষ্ট ও অনুদ্ঘাটিত দিক আবিষ্কার করতে পারেন এবং তাঁর নিজস্ব চরিত্রপরিকল্পনা অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন।[১৩] গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে এই চিন্তাশীলতা ও ভাবপরিস্ফুটনে চিত্তচমৎকারী মৌলিকতাই দেখা যেত। বড় অভিনেতা কয়েকটি আপাত-আকর্ষণীয় অভিনয়-কলাকৌশলের দ্বারা শুধু দর্শকদের ভোলাতে চান না, চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৃত্তি ও উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোলাই তাঁর প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেন। গিরিশচন্দ্রও তাই মনে করতেন। সেইজন্য যেসব ভূমিকায় আগে অভিনেতারা অভিনয় করে ভূমিকাগুলি 'জ্বালিয়ে দিয়ে' গেছেন, নবতর ভঙ্গিতে অভিনয় করে সেগুলির ওপর তিনি নতুন আলোকপাত করেছেন। ভীমসিংহ, যোগেশ, বিদূষক প্রভৃতি চরিত্র গিরিশচন্দ্রের ভূমিকার মধ্যে দিয়ে নবতর তাৎপর্য নিয়ে দর্শকদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। বিভিন্ন বাক্যাংশের ওপর কণ্ঠস্বরের তীব্রতা ও মৃদুতা দ্বারা বাক্যের অর্থের মধ্যে নতুন ব্যঞ্জনা আনা যায়। লয়ের দ্রুততা ও মন্দতা দ্বারাও অর্থের বৈচিত্র্য সম্পাদন করা সম্ভব। কণ্ঠস্বরের সুর, রং ও মেজাজের নানাপ্রকার লীলার মধ্যে দিয়েও দর্শকদের চিত্তে নব নব ভাব ও আবেগ সঞ্চার করা যায়। গিরিশচন্দ্রের এই অভিনয়ে এই সজাগ, সচিন্ত মনের গূঢ়তর ভাবব্যঞ্জনাসৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত। সেজন্য তিনি অভিনীত চরিত্রের দুটি স্তরের দিকে দর্শকদের চিন্তাশীল দৃষ্টিকে জাগিয়ে রাখতেন। কখনও হাস্যরসের গভীরে কারুণ্য (নিমচাঁদ), কখনও কৌতুকের গর্ভে ভক্তি (বিদূষক), কখনও রঙ্গরসের অন্তরালে স্বাদেশিকতা (করিমচাচা) ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের আনন্দবোধের সঙ্গে তাঁদের ভাবনা জাগিয়ে রাখতেন।

শ্রেষ্ঠ নটের ধর্ম হল যে কোনও ভূমিকায় সমান গুরুত্ব দিয়ে অভিনয় করা। গিরিশচন্দ্রও নটের এই কর্তব্যের কথা উল্লেখ করে গেছেন।[১৪] অভিনয়ে সদাসর্তক অভিনিবেশ এবং সচেতন যত্নশীলতা না থাকলে বড় অভিনেতা হওয়া যায় না। প্রতিদিন দর্শকদের সমাদরের আকাঙ্ক্ষা এবং অসন্তোষের ভয় থাকলেই অভিনেতা মঞ্চে তাঁর শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা দেখানোর জন্য সচেষ্ট থাকবেন! গিরিশচন্দ্র যখন মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন তখন এই আকাঙ্ক্ষা ও ভয় তাঁর মনে থাকত।[১৫] হয়তো শেষ বয়সে বার্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য অভিনয়ে ততখানি সযত্ন আগ্রহ আর ছিল না।[১৬]

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাস্পর্শে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি নায়কচরিত্র রঙ্গামঞ্চে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। যে রোমান্টিক চরিত্রগুলির মধ্যে প্রণয়বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতই প্রধান সেগুলিতে তাঁর অভিনয়-প্রতিভা যেন কিছুটা সঙ্কুচিত ও বাধাপ্রাপ্ত, কিন্তু যে চবিত্রগুলি দুর্জয় প্রবৃত্তি, অমিত পরাক্রম ও দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপে দুর্ধর্ষ ও প্রচণ্ড সেগুলিতে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার অসামান্য শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। সেজন্য তাঁর অভিনীত শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমী চরিত্র দুটি হল পশুপতি ও সীতারাম। পশুপতির ভূমিকায় যখন তিনি অবতীর্ণ হন তখন তাঁর নিজের বয়স ত্রিশ, এবং উপন্যাসে বর্ণিত পশুপতির

বয়স পঁয়ত্রিশ। অভিনেতা ও অভিনীত চরিত্রের বয়স এখানে প্রায় এক বলে অভিনেতার অভিনয় এত স্বাভাবিক হয়েছিল। 'মৃণালিনী'র নায়ক হেমচন্দ্র বটে, কিন্তু পশুপতি ওই উপন্যাসের অধিকতর শক্তিমান ও বেগবান চরিত্র। তার প্রচন্ড প্রভাবপ্রতিপত্তি, ক্ষমতালিপ্সা, দেশদ্রোহিতা ও সর্বনাশী পরিণাম এবং অবশেষে তার ভয়াবহ প্রায়শ্চিত্ত দর্শকের মনে প্রবল বিস্ময় ও উত্তেজনার জাগিয়ে রাখে। এই বলিষ্ঠ, শক্তিধর ও ট্র্যাজেডির সর্বগ্রাসী অগ্নিদাহে ভস্মীভূত চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের অভিনয়দাপটে রঙ্গামঞ্চে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। পশুপতি চরিত্রে অভিনয়ের ছাব্বিশ বছর পরে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় সীতারামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই ভূমিকাতেও গিরিশচন্দ্রের অভিনয় চমৎকৃত হয়েছিল।[১৭] তবে গিরিশচন্দ্রের বয়স (৫৬) তখন তাঁর প্রতিকূল ছিল। সেজন্য একই সময়ে ক্লাসিকে সীতারাম চরিত্রে অভিনয় করার সময় অমরেন্দ্রনাথ আস্ফালন করে বলেছিলেন, 'ক্লাসিকের সীতারাম বলদৃপ্ত যুবা।' সীতারাম চরিত্রটি দর্শকের কাছে সহানুভূতির যোগ্য করে তোলার জন্য গিরিশচন্দ্র চরিত্রটির মধ্যে কিছু অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক সংলাপ এবং সীতারাম ও শ্রীর অন্তিম সাক্ষাৎকার দৃশ্য দেখিয়েছেন।[১৮] এই সংযোজিত দৃশ্য ও অতিরিক্ত সংলাপের ফলে গিরিশচন্দ্রের রূপায়িত সীতারাম আরও বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল। গিরিশ পরিকল্পিত নাট্যসমাপ্তি দর্শকদের অভিভূত করে রাখত।[১৯]

গিরিশচন্দ্র কয়েকটি হাস্যরসাত্মক চরিত্রে চিরস্মরণীয় অভিনয় করে গেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে অবিমিশ্রিত হাস্যরসাত্মক চরিত্রের অভিনয় গিরিশচন্দ্রের কোনওদিনই আগ্রহ ছিল না। তাঁর দৈহিক আকৃতি ও কণ্ঠস্বর হালকা ও উতরোল কৌতুকসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল ছিল না। আপাতমৃদু হাসির গভীরে কোনও গুরু ও করুণভাবের অস্তিত্ব রয়েছে যেসব চরিত্রে সেগুলিতে অভিনয় করেই তিনি তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যকাররূপে তিনি তাঁর নাটকে এই ধরনের কতগুলি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এইসব চরিত্রের গূঢ় রহস্য তাঁর নিজস্ব অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এইসব চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর অভিনীত প্রথম চরিত্র নিমচাঁদের কথা। নিমচাঁদ চরিত্রে হাস্যরস রয়েছে তার বাগ্‌বৈদগ্ধ্যদীপ্ত কথার মধ্যে, বিকৃত অঙ্গভঙ্গির মধ্যে দিয়ে এখানে হাস্যরস সৃষ্টি হয়নি। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে, নিমচাঁদ নিজে হাস্যস্পদ নয়, সে হাস্যকার, তার ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সকলের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য গিরিশচন্দ্রের পক্ষে ভূমিকাটি বিশেষ উপযোগী ছিল।[২০] নিমচাঁদের মুখে নাট্যকার বহু ইংরেজি কাব্য-নাটকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এইসব অংশগুলি গিবিশচন্দ্র চমৎকার আবৃত্তি করতে পারতেন।[২১] আবৃত্তিমূলক অংশগুলির অর্থব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি বিশেষ ভাব ও ভঙ্গিসহ সেগুলি বলে যেতেন। গম্ভীরকণ্ঠে অর্থবহ সু-আবৃত্তির জন্য বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির মধ্যে নিমচাঁদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হত। ট্র্যাজিক রসসৃষ্টির স্বাভাবিক প্রবণতার ফলেই গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে হালকাভাষী ইয়ার নিমচাঁদের তরল কথাগুলির মধ্যে দিয়ে তার প্রচ্ছন্ন ট্র্যাজিক সত্তাই ক্ষণে ক্ষণে উদঘাটিত হত। বেতাল (আনন্দ রহো), রঙ্গলাল (ভ্রান্তি) প্রভৃতি চরিত্রগুলি গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে অমর হয়ে রয়েছে। তার কারণ এই সদানন্দময় চরিত্রগুলির ভেতরে যে নিষ্কাম তত্ত্ব ও মানবিকতার আদর্শ নিহিত তা তাঁর অভিনয়ে চমৎকার ফুটে উঠত। তাঁর অভিনীত কঞ্চুকী (পাণ্ডব গৌরব) বিদূষক ও করিমচাচা চরিত্রগুলিতেও বাহ্যলঘুতা ও আন্তরগভীরতার বৈষম্য গিরিশচন্দ্রের ব্যঞ্জনাধর্মী অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠত। কঞ্চুকীর হালকা ও তরল কথার মধ্যে তাঁর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ও প্রভুভক্তি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন বিদূষক চরিত্রে অভিনয় করতেন তখন এর হালকা কৌতুকজনক দিকটিই তুলে ধরতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র যখন এই ভূমিকায় অভিনয় শুরু করলেন তখন আপাতকৌতুকের সংযত অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ভক্তিরসের সংযোগ ঘটিয়ে দিলেন। দর্শকের কৌতুকদীপ্ত চোখ দেখতে দেখতে ভক্তিরসে আর্দ্র হতে লাগল। 'সিরাজদ্দৌলা'র করিমচাচার বাহ্য বিদূষকরূপ একটি ছদ্মরূপমাত্র। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় এই ছদ্মরূপ দিয়ে দর্শকদের ক্ষণকালের জন্য কৌতুকের আনন্দে ভোলায় বটে, কিন্তু নিমেষের মধ্যে চরিত্রটির প্রচ্ছন্ন মানবিকতা ও স্বদেশভক্তি স্থায়ীভাবে দর্শকদের ভাবিয়ে তোলে। কোনও কোনও অভিনেতা দর্শকদের ভোলান, আবার কেউ কেউ তাঁদের ভাবান। গিরিশচন্দ্র ভোলাতে চাননি, ভাবাতেই চেয়েছেন, সেজন্য তাঁর অভিনয় মঞ্চে শেষ হয়ে যেত না, তা দর্শকদের অনুসরণ করত অনেক অনেকদিন ধরে।

ট্র্যাজিক অভিনয়ে গিরিশপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছিল, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর এই ট্র্যাজিক অভিনয়কে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, ঐতিহাসিক ও শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি-রসাশ্রিত অভিনয়; দ্বিতীয়ত, তাঁর নিজের রচিত করুণরসাত্মক সামাজিক নাটকের অভিনয়। ভীমসিংহ ও ম্যাকবেথের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়কে আমরা প্রথম শ্রেণীতে ফেলতে পারি। ভীমসিংহ শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রের অনুরূপ, তার উন্মত্ততা, অসহায় আর্তনাদ ও হৃদয়বিদারক পরিণতি রাজা লীয়র চরিত্রের ট্র্যাজেডি স্মরণ করিয়ে দেয়। গ্যারিক যেমন লীয়রের অপ্রকৃতিস্থ ও শোকোন্মত্ত চরিত্রের অদ্ভুত অভিনয় করতেন, গিরিশচন্দ্রও তেমনই ভীমসিংহ চরিত্রের সঙ্কট, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অসংবদ্ধ আচরণ অত্যন্ত জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলতেন। এই অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির রসই পরিস্ফুট হত, অর্থাৎ এই অভিনয় দর্শকদের করুণাকাতর চিত্তকে দ্রবীভূত করে অশ্রুপ্রবাহ উন্মুক্ত করে দিত না। তাঁদের বিস্ময় ও আতঙ্কমিশ্রিত অন্তরে অশ্রুলেশহীন অগ্নিজ্বালা ধরিয়ে দিত। ভীমসিংহের ভূমিকায় আগে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করতেন। ভীমসিংহের সংলাপের একস্থানে আছে, 'মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ — হুঁ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্লেম।' বিহারীলাল মানসিংহ কথাটি তিনবার একই সুরে উচ্চারণ করতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে প্রথমবার মানসিংহ উচ্চারণে ভীমসিংহের 'মস্তিষ্কে দুঃস্বপ্নের ছায়ার ন্যায় পতিত' হত। দ্বিতীয়বার উচ্চারণে সেই ছায়া যেন কিঞ্চিৎ দীপ্তি পেত, তৃতীয়বার 'ক্ষিপ্তরাজার স্মৃতিপটে মানসিংহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠত, ভীমসিংহ প্রচণ্ড বেগে তাকে বধ করতে ছুটতেন।[২২] বিহারীলালের অভিনয়ে ভীমসিংহ চরিত্রের কান্না ও কোমল কারুণ্য ফুটে উঠত, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে হৃদয়ভেদী ট্র্যাজেডির অশ্রুবিহীন শুষ্ক হাহাকার প্রকাশ পেত।[২৩] গিরিশচন্দ্র অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটকের অভিনয় নানা দিক দিয়ে রঙ্গমঞ্চে স্মরণীয় হয়ে আছে। অপরেশচন্দ্রের মতে এই অভিনয় বাংলা থিয়েটারে অভিনয়ের ধারা পরিবর্তন করে দিয়েছিল।[২৪] নয় মাস ধরে এই নাটকের মহড়া চলেছিল এবং ইংরেজি অভিনয়ের টেকনিকে এর অভিনয় হয়েছিল। হয়তো এই ইংরেজি অভিনয়ের টেকনিক ও নাটকের ইংরেজি নাম তখন দর্শকদের কাছে গ্রহণীয় হয়নি, কিন্তু তখনকার দিনে রঙ্গমঞ্চে এই অভিনয় একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল, সন্দেহ নেই।[২৫]

গিরিশচন্দ্র তাঁর নিজের লেখা সামাজিক নাটকের কয়েকটি করুণরসাত্মক পরিবার-কর্তার ভূমিকায় চিরস্মরণীয় অভিনয় করে গেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্যা ও সঙ্কটের চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি নাটকের মধ্যে করুণরসের আতিশয্য এবং তরল কান্নার প্রাবল্য এনেছেন, কিন্তু তাঁর অভিনয়ে এই অশ্রুতরল কারুণ্যের কোনও চিহ্ন ছিল না, তাঁর নাটকের রস প্যাথেটিক হলেও অভিনয়ের রস হয়ে উঠেছিল ট্র্যাজিক। অমৃতলাল মিত্র গিরিশচন্দ্রের আগে যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরের সুরেলা মাধুর্য ও করুণরসাত্মক অভিব্যক্তি দ্বারা দর্শকদের চিত্ত দ্রবীভূত করেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে কোনও সুর ছিল না, যোগেশ চরিত্রের পরিতাপ, অন্তর্দাহ ও মর্মভেদী হতাশা কান্না ও অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে কোথাও তরল হয়নি, দর্শকদের চিত্তমাঝেও এ অভিনয় শুধু অন্তহীন শুষ্ক শূন্যতা জাগিয়ে তুলত।[২৬] নাটক পড়ার সময় অনেক অকারণ ঘটনা ও অতিনাটকীয় কারুণ্যের উপাদান ট্র্যাজিক অনুভূতির তীব্রতাকে হালকা করে ফেলে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ের মধ্যে ট্র্যাজেডির সেই তীব্রতা দর্শকচিত্তকে এমনই অভিভূত করে ফেলত যে, সে এই চরিত্রের স্মৃতি মন থেকে কখনও ঝেড়ে ফেলতে পারত না, আচ্ছন্ন চিত্তে সব সময় এক নিদারুণ অস্বস্তি ও নিরন্তর যন্ত্রণা অনুভব করত।[২৭] যোগেশের ন্যায় গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ অভিনয়দীপ্ত আর একটি ভূমিকা হল 'বলিদানে'র করুণাময়। কেউ কেউ করুণাময় চরিত্রে তাঁর অভিনয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন।[২৮] গিরিশচন্দ্র কয়েক রাত্রি ওই ভূমিকায় অভিনয় করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তখন ওই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অর্দ্ধেন্দুশেখর। করুণাময় চরিত্রটির মধ্যে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত কন্যাদায়গ্রস্ত একটি পিতার করুণরসে প্লাবিত রূপ ফুটে উঠেছে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে এই করুণাসিক্ত ক্রন্দনপরায়ণ রূপটি খুব ভালোভাবে ফুটেছিল। দর্শকরাও এই অভিনয় দেখে কেঁদে আকুল হয়ে পড়ত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে এই ক্রন্দন ও তরল কারুণ্য প্রকাশ পেত না।[২৯] দর্শকদের কাঁদানোর চেষ্টা, দুঃখের আতিশয্য ব্যক্ত করে তাঁদের সহানুভূতি আদায়ের প্রয়াস সে অভিনয়ে ছিল না। কিন্তু সংযত,

অন্তর্মুখী ভাবাভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে তাঁর দুঃখসন্তপ্ত সমগ্র সত্তা প্রতিফলিত হত।[৩০] তাঁর রাসভারী চেহারা, গম্ভীর কণ্ঠস্বর ও সম্ভ্রমব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে যে বিলাপ ও হাহাকার ব্যক্ত হত তা দর্শকদের চিত্তকে বিরাট দুঃখের এক বিশুষ্ক শূন্যতার স্তব্ধ ও স্তম্ভিত করে দিত। রাজা লীয়র মৃত কন্যা কর্ডেলিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'Her voice was ever soft, gentle and low — an excellent thing in woman'. করুণাময়ও আত্মঘাতিনী হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করে বলেন, 'তাই তো বলি, আমার শান্ত মেয়ে — রাস্তায় যাবে না — লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না।' রাজা লীয়রের মতো শোকাহত করুণাময়ের বিলাপ দর্শকচিত্তের মধ্যে এক মহাশূন্যতার অনিঃশেষিত হাহাকার জাগিয়ে রাখত।[৩১]

২.

গিরিশযুগের পরে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার দ্বিতীয় যুগের শুরু হল। গিরিশচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের তিরোধানের পরেই এই যুগের সূচনা হয়েছিল। সেজন্য বলা যেতে পারে এই নবযুগের আরম্ভকাল ১৯১৬ সালের (অমরেন্দ্রনাথের তিরোধান বৎসর) পর থেকে এবং এর বিস্তৃতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত। অর্থাৎ এই যুগকে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী নাট্যযুগ বলা যেতে পারে। তবে আরও একটু নির্দিষ্টভাবে বছর ধরে বলতে গেলে ১৯২০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগকেই যথার্থভাবে নাট্যশালার দ্বিতীয় যুগ বলা যেতে পারে। এই যুগের নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তিনি অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ প্রয়োগকর্তা। সেজন্য এই যুগকে শিশিরযুগ বলে অভিহিত করাই সঙ্গত। তবে শুধু অভিনয়ের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে শিশিরকুমারের প্রায় সমখ্যাতিমান অভিনেতা ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁরা প্রায় একসময়েই সাধারণ নাট্যশালায় এসেছিলেন এবং প্রায় একই সময়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। প্রয়োগের দিক থেকে শিশিরকুমারের শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত ছিল। কিন্তু অভিনয়ের রীতি, আঙ্গিক, চরিত্ররূপায়ণ ও রসসৃষ্টির দিক দিয়ে তাঁরা দু'জন একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোটেই অশোভন ও বিসদৃশ ছিল না, বরং এর ফলে দর্শকগণ উভয় মঞ্চের প্রতিই আকৃষ্ট হতেন এবং অভিনয়ের বিচিত্র শিল্পকলা এবং নাট্যচরিত্রের অন্তর্নিহিত নব নব রস ও রহস্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতেন। এই দুইজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অভিনয়কলা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা আমরা পরে করব। তবে এঁদের দু'জনের অবিচ্ছিন্ন, দীর্ঘস্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকলাকৌশল-সম্মত অভিনয়সমৃদ্ধযুগকে শিশির-অহীন্দ্র যুগও বলা যেতে পারে।

নবযুগের যখন সূচনা হল তখন পুরাতন যুগের অভিনয়ধারা যে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তা নয়। গিরিশচন্দ্রের শিষ্য ও সহযোগী অমৃতলাল বসু তখনও জীবিত, তবে তিনি তখন রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসরগ্রহণ করেছেন। সেজন্য নবযুগের অভিনেতাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁকে নামতে হয়নি। বরং তিনি এই নবযুগের অভ্যুদয়কে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।[৩২] তবে পুরনো দিনের একজন সেরা প্রতিনিধি নবযুগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি হলেন দানীবাবু। মনোমোহন থিয়েটারে তিনি সগৌরবে পুরনো যুগের প্রদীপ্ত প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করছিলেন। নবযুগের অভিনেতারা তাঁর মূল্য অস্বীকার করতে পারেননি। সেজন্য শিশিরসম্প্রদায় ও আর্ট থিয়েটার উভয় জায়গাতেই প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তিনি সসম্মানে আমন্ত্রিত হতেন। নতুন যুগের অভিনেতাদের সঙ্গে তাঁর অভিনয় দেখে দর্শকসমাজ পুরনো ও নতুন যুগের অভিনয়রীতি নিয়ে তুলনা ও বিতর্কে মেতে উঠতেন। নবীনরা নতুন অভিনয়ধারার সমর্থক ছিলেন, প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই পুরনো অভিনয়রীতির প্রশংসা করতেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যদিও গিরিশযুগের অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু নতুন যুগের অভিনেতাদের সঙ্গে তিনি আশ্চর্যভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী প্রভৃতি পুরনো যুগের অভিনেত্রীও শিশিরযুগে তাঁদের খ্যাতি অক্ষুণ্ন রেখে অভিনয় করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা শিশিকুমারের অভিনয়শিক্ষা গ্রহণ করে নতুন যুগের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলেন। এইসব দিকপাল অভিনেতা-অভিনেত্রী যতদিন রঙ্গমঞ্চে ছিলেন ততদিন পুরনো ও নতুন যুগের অভিনয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক ছিল। ক্রমে ক্রমে এঁরা বিদায় নেওয়ার পর পুরনো যুগের ধারা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং নবযুগের অভিনয়ধারাতেই দর্শকসম্প্রদায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল।

শিশিরযুগের অভিনয়রীতি নিয়ে আলোচনা করতে হলে ওই যুগের দর্শকদের মানসিকতা, মঞ্চের কলাকৌশল ও প্রয়োগপদ্ধতি ও নাটকের সংলাপ ও শিল্পরীতি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সমাজব্যবস্থা যেভাবে চলে এসেছিল মহাযুদ্ধের পরে তার পরিবর্তন শুরু হল। বিধিনিষেধশাসিত গ্রামকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মহাযুদ্ধের আঘাতে সচকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এই যুদ্ধের পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'পুরাতন বেচাকেনা আর চলিবে না'। মহাযুদ্ধের সর্বাত্মক ধ্বংসলীলার ফলে অনেক পুরনো মূল্যবোধ ও সংস্কারের পরিবর্তন ঘটল। বিশ্বের কোনও অংশই বিচ্ছিন্ন নয়, নিরাপদ নয়, স্বাতন্ত্র্যের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ, সকল বিপদ বিপর্যয় ও সুখসম্পদেই বিশ্বের সকল মানুষের অংশ আছে, এই নবজাত চেতনার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ভাবনা, মতবাদ ও আন্দোলনের সঙ্গে আমরা জড়িত হয়ে পড়লাম। নানা ধরনের শ্রমশিল্প আস্তে আস্তে আমাদের দেশে গড়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক-জীবনের প্রসার ঘটতে লাগল। ভূমিস্বত্বের ওপর লোকে যতদিন নির্ভরশীল ছিল ততদিন একান্নবর্তী পরিবারের বনিয়াদ মজবুত ছিল। কিন্তু শিল্পের প্রসার এবং চাকরির ক্রমবর্ধমান সুযোগের ফলে একান্নবর্তী পরিবার বিশ্লিষ্ট হতে শুরু করল এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ক্রমশ পারিবারিক জীবনের অখন্ডতার ওপর আঘাত হানতে লাগল। বিলম্বিত লয়ের জীবনধারা ব্যস্ততা ও কর্মমুখীনতার মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। ধৈর্য ও অবকাশ কমে এল, অভিনয়ের দর্শকদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা আমাদের দেশে প্রসার লাভ করল এবং তার ফলে নাট্যাভিনয়ের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে সমষ্টিগত গুরুত্ব এবং শ্রেণীগত অভিনয়ের মূল্য স্বীকৃত হল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে দর্শকদের রুচিবোধ, বিচারশক্তি ও শিল্পচেতনা পরিণত হল। আগে প্রায় বেকার, হই-হুল্লোড়প্রিয়, স্থূলরুচিসম্পন্ন দর্শকসমাজ অভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকদের এক বৃহৎ অংশ ছিল। রঙ্গালয়ে যাওয়া আর বেশ্যাপল্লীতে যাওয়া প্রায় একই ধরনের নিন্দনীয় কাজ বলে মনে করা হত। কিন্তু নবযুগে থিয়েটারে অভিনয় দেখা শিল্পসংস্কৃতিচর্চার অঙ্গরূপে প্রশংসিত হল। শিক্ষিত, রুচিমান ও সূক্ষ্মবিচারশক্তিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্শকরা অভিনয়ের মধ্যে শুধু কেবল প্রমোদের উপকরণ নয়, শিল্পকলা ও রসের নিদর্শন দেখার জন্য আগ্রহী হলেন।সেজন্য অভিনয়ের মধ্যে অন্তর্মুখীনতা, বুদ্ধিগ্রাহ্য ক্রিয়া ও কলাসম্মত অভিব্যক্তি স্থান পেল। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাব শুধু সাহিত্যে নয়, অভিনয়েও প্রকাশ পেল। সেজন্য অভিনয়ে চরিত্রের ব্যক্তিত্বে সজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হল। বৈজ্ঞানিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দৈববিশ্বাস ও অলৌকিক শক্তির প্রতি ভক্তি কমে এল। পৌরাণিক নাটক তখনও রইল বটে, কিন্তু পৌরাণিক নাটকের মধ্যে মানবিকতার মূল্যই প্রধান হয়ে উঠল, দেবতা অপেক্ষা দেবনির্যাতিত মানুষই বেশি গুরুত্ব পেল। জাতীয় সংগ্রাম আরও তীব্র রূপ নিয়ে দেশের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ ও উদ্দীপিত করে তুলেছিল। সেই বিক্ষোভ ও উদ্দীপনা নাটক, বিশেষ করে ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ে সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল। সেজন্য ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় ভাববেগে দীপ্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। তবে সামাজিক মানুষের দৈনন্দিন বাস্তব সমস্যা রূপায়ণে অভিনেতাকে রোমান্টিক আবেগসর্বস্ব অভিনয় থেকে বাস্তবধর্মী স্বাভাবিক অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হত। কোনও যুগই চিরকাল নতুন থাকতে পারে না, আমাদের আলোচ্য এই নতুন যুগও শেষদিকে জীর্ণ ও পুরনো হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি সমাজজীবনকে এমন উত্তাল, উত্তেজিত করে তুলল যে প্রচলিত নাটক ও অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাকে প্রতিফলিত করা হল না। তার জন্য প্রয়োজন হল নতুন নাট্যধর্ম ও নতুন অভিনয়ধারার। কিন্তু কতা আমার বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়।

শিশিরযুগের মঞ্চকলাকৌশল ও প্রয়োগপদ্ধতি অভিনয়রীতিকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। শিশিরকুমারের আগে বাংলা থিয়েটার ছিল অভিনেতা-নিয়ন্ত্রিত (Actor's theater)। কিন্তু শিশিরকুমারের সময় থেকে থিয়েটার হল প্রয়োগকর্তা-নিয়ন্ত্রিত (Producer's theatre)। অভিনেতা-নিয়ন্ত্রিত থিয়েটারে অভিনেতাই ছিলেন সর্বেসর্বা। প্রত্যেক অভিনেতাই তাঁর নিজস্ব রীতিতে অভিনয় করতেন। অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিলেন নাট্যশিক্ষক ও মোশানমাস্টার। তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে এক একজন অভিনেতাকে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু তখন সকল অভিনেতাকে একটি অখন্ড শিল্পমূর্তিতে

আবদ্ধ করার মতো কোনও প্রয়োগকর্তা ছিলেন না। ইউরোপে প্রয়োগকর্তার আবির্ভাব ঘটল উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে, আমাদের দেশে প্রথম প্রয়োগকর্তারূপে আবির্ভূত হলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর সময় থেকে অভিনেতার কোনও স্বতন্ত্র অভিনয়ের আর মূল্য রইল না, অভিনেতা স্বাধীন নন, তিনি নেপথ্যবর্তী প্রয়োগকর্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তিনি বিচ্ছিন্ন নন, তিনি সমগ্রের অংশ মাত্র, তাঁর অভিনয় একটি মূল পরিকল্পনার অন্তর্গত হয়ে পরিপূর্ণ রসসৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে মাত্র। প্রয়োগকর্তা-চালিত অভিনেতাকে শুধু কেবল আত্মভাবে মগ্ন হয়ে অভিনয় করলে চলে না, তাঁকে সচেতন দৃষ্টি রাখতে হয় সহ-অভিনেতাদের প্রতি এবং মঞ্চে যেসব কলাকৌশল প্রয়োগ করা হয় সেগুলির পূর্ণ সুযোগ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। শিশিরকুমার বলেছেন, 'লোকমুখে শুনি, আমি ভালো অভিনেতা। অনেকে বলেন আমার অভিনয় দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন, — সময় সময় প্রশ্ন করেন, আপনি কি সত্য সীতার বিরহে রামের ভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন? আমি তাহাদের বলি — সত্য সত্যই ভাবে অভিভূত হইলে — চারদিকে বৈদ্যুতিক আলোর পরিবেষ্টনের সম্পূর্ণ সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। যে মুহূর্তে লবের মুখ দেখিয়া আমি সীতার কল্পনায় আত্মহারা হইয়া যাই, সেই মুহূর্তে আমি লবকে আমার দক্ষিণপার্শ্বে সরাইয়া নিজের মুখে ঐ পাঁচশো ওয়াট ক্যান্ডেল পাওয়ারের সবটুকু আলোর সুযোগসুবিধা সম্পূর্ণ নিজেকে গ্রহণ করিতে হয়। আত্মহারা হইলে কি এটা সম্ভব হয়? সু-অভিনয় মানে দৃশ্যপট, স্বকীয় পরিচ্ছদ, পারিপার্শ্বিক আলোকসম্পাত, — সর্ববিষয়ে সজাগ থাকা। এ থাকিতে না পারিলে শুধু ভাবাহত হইতে সু-অভিনয় করা চলে না।' 'সাজাহান' নাটকে প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে পুত্রের অকৃতজ্ঞতায় উন্মত্ত, উত্তেজিত সাজাহান জাহানারাকে বলছেন, 'আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি; তুই মড়ক নিয়ে আয়! আয় ত ; একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে দিয়ে চলে যাই — তার পর কোথায় যাই? — কিছুই যায় আসে না। খধূপের মত একটা বিরাট জ্বালায় ঊর্দ্ধে উঠে বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।' এখানে 'আয় ত' ইত্যাদি সংলাপ বলার সময় অহীন্দ্র চৌধুরী জাহানারাকে নিয়ে মঞ্চের কোণে জোরালো আলো নেবার জন্য স্পট লাইটের কাছে যেতেন। খধূপের মত বলার সময় খধূপের ওপর হঠাৎ জোর দিয়ে ঊর্দ্ধ দিকে তাকাতেন, স্পট লাইটের জোরালো আলো নিষ্ফল ক্রোধে অভিব্যক্ত মুখমণ্ডল ও অগ্নিজ্বালাময় চোখদুটি যেন ঝলসে তুলত। আর 'বিরাট হাহাকারে' ইত্যাদি বলার সময় তাঁর জবিবসানো ঝলমলে পোশাকে আবৃত হাতদুটি যখন তিনি প্রসারিত করতেন তখন প্রতিফলিত আলোকে দ্যুতিমান হাত দুটি দর্শকদের উত্তেজিত করে তুলত এবং তুমুল করতালিধ্বনিতে দৃশ্য শেষ হত। এখানে অভিনেতা আলোর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তাঁর অভিনয়কে এক অসামান্যতার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিতেন। আলোকব্যবস্থা অনেক উন্নততর হওয়ায় অভিনেতারা বাচিক অভিনয় অপেক্ষা অভিব্যক্তির ওপর জোর দিতেন বেশি। কথা অপেক্ষা অভিব্যক্তির শক্তি বেশি। কথা শুধু ব্যক্ত করে, কিন্তু অভিব্যক্তি অব্যক্তকে ধরতে চায়। শুধু কেবল নীরব অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে বহু কথার স্থান পূরণ করা যায়। এই অভিব্যক্তি দৃশ্যমান ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্য নানা রং ও মেজাজের আলোকসম্পাত প্রয়োজন। শিশিরযুগে আলোকসম্পাতেব প্রভূত উন্নতি হয়েছিল বলে শিশিরকুমার ও তাঁর সমসাময়িক শিল্পীগণ ভাবাভিব্যক্তির ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নেপথ্য সংগীত, যন্ত্রসংগীত ও নানাপ্রকার ধ্বনি-প্রক্ষেপের মধ্যে দিয়ে অভিনয়েব পরিপূরকতা করার চেষ্টা হল এই যুগে। সুতরাং অভিনয়ের রসসৃষ্টিতে অভিনেতার একক দায়িত্ব ছিল না, প্রয়োগশিল্পের নানা কলাকুশলীগণও যৌথভাবে এই দায়িত্ব পালন করতেন। দৃশ্যসজ্জা ও রূপসজ্জার দিকে প্রয়োগকর্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল বলে অভিনয়ের রসসৃষ্টিতে কালোপযোগী দৃশ্যসজ্জা ও চরিত্রোপযোগী রূপসজ্জা দ্বারা অনেকখানি সাহায্য করা হত। অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়-সাফল্যের মূলে তাঁর অসাধারণ রূপসজ্জার অনেকখানি সাহায্য ছিল। মঞ্চ-নির্মাণকৌশলের নানা ধরনের বৈপ্লবিক উন্নতির ফলে অভিনয়রীতিও পরিবর্তিত মঞ্চের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। স্থানুমঞ্চে অভিনেতাদের আগমন-নির্গমন ও দৃশ্য পরিবর্তনে অনেক সময় নষ্ট হত। সেজন্য সতু সেন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তন করেন।[৩৩] সিনেমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কর্মব্যস্ত মানুষের রুচি ও চাহিদার দিকে নজর রেখেই এই ধরনের মঞ্চ প্রবর্তিত হয়েছিল, মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিনয়ের মধ্যে গতিশীলতা আনা। সতু সেনের প্রথম পরিচালিত নাটক 'ঝড়ের রাতে'-র অভিনয়-সময় পাঁচ-ছ' ঘন্টার জায়গায় তিন ঘন্টা করে আনা হল। অতঃপর মঞ্চের

অভিনয় এই তিন ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ হল।[৫৫] অর্থাৎ, আগেকার ঢিলেঢালা অভিনয়ের জায়গায় এল সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংহত, দ্রুতগতিসম্পন্ন অভিনয়।

শিশিরযুগে অভিনীত নাটকের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকারদের নাটক এই যুগেও অভিনীত হয়েছে। অর্থাৎ যুগের পরিবর্তন হলেও অতিক্রান্ত যুগের নাট্যরস আস্বাদনের রুচি ও মানসিকতা নবযুগেও ছিল। গিরিশচন্দ্রের 'জনা', 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নবযুগেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি নাটকের অভিনয় বিশ শতকের গোড়ায় গিরিশযুগে হয়েছিল বটে, কিন্তু তার অসামান্য জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শিশিরযুগেই। বলা যেতে পারে, দ্বিজেন্দ্রলাল যেন পরবর্তী যুগের দিকে তাকিয়েই নাটক লিখেছিলেন। তাঁর নাটকে বিস্তারিত মঞ্চনির্দেশ, সূক্ষ্ম জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব, দেবভক্তির স্থলে মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বপ্রীতির আদর্শ প্রচার — এসব পরবর্তী যুগেরই লক্ষণ। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক — নাটকের এই ত্রিধারা নবযুগেও ছিল বটে, কিন্তু তাদের প্রকৃতি ও উপস্থাপনারীতির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে বিশ্বাস ও ভক্তির জায়গায় মানবিক মূল্যবোধের ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। অভিনয়ের মধ্যে দিয়েও জয়ী দেবতা অপেক্ষা পরাজিত দানব অথবা মানবের মহিমাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। ঐতিহাসিক নাটক তখনও জাতীয় ভাবোদ্দীপনাকেই প্রধানত আশ্রয় করেছিল বটে, কিণ্তু জাতীয় ভাব অপেক্ষাও উচ্চতর আন্তর্জাতিক ভাবের উপস্থাপনা কোনও কোনও নাটকে হয়েছিল। অভিনয়ের মধ্যেও স্থূল জাতীয় আবেগ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও জটিল কোনও মানবিক গুণের পরিস্ফুটনের দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের চেয়েও সামাজিক নাটকের প্রাধান্য এই যুগে লক্ষিত হয়। গিরিশযুগে যেমন ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাধান্য, এই যুগেও তেমনই দেখা গেল শরৎচন্দ্রের সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ঘটনাবিস্তার, ক্রিয়াপ্রাধান্য ও দুর্দম আবেগধর্মিতা গিরিশযুগের অভিনেতাদের উচ্চায়িত কণ্ঠস্বরে, অতি নাটকীয় অভিব্যক্তিতে এবং বাহ্যক্রিয়ার দাপটে প্রকাশ পেত। তেমনই শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ বাস্তবধর্মিতা, মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্মুখীনতা ও বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তির জটিলতা শিশিরযুগের শিল্পীদের ছোটখাটো তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়ায়, সংযত ও স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে ও সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বজ্ঞাপক অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পেত। শরৎচন্দ্রের নাটকায়িত রচনাগুলির শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন নিঃসন্দেহে শিশিরকুমার ভাদুড়ী। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি মূর্ত হয়েছে বাহ্য ঘটনা ও ক্রিয়ায় প্রধানত নয়, অন্তর্নিহিত ভাবনায় ও অনুভূতিতে, গোপনচারী বেদনায় ও অলক্ষিত জীবনযন্ত্রণায়। শিশিরকুমার জীবানন্দের ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে শরৎচরিত্রকে যথার্থভাবে রূপায়িত করলেন, আত্মার অজেয় তৃষ্ণা ও তার অচরিতার্থতা, অন্তহীন বেদনার অব্যক্ত ক্রন্দন, সম্ভাবনাময় জীবনের করুণ পরিণাম। শিশিরকুমারের পরে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে। শরৎকাহিনীর এমন এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব রয়েছে, যে সেই কাহিনী মঞ্চে উপস্থাপিত হলেই বাঙালি দর্শকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করত।

শিশিরযুগে পেশাদার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক উপস্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পেশাদার মঞ্চের স্থূলত্ব, আতিশয্য ও উৎকট মনোরঞ্জনবৃত্তি চিরদিনই অপছন্দ করতেন। কিন্তু পেশাদার মঞ্চের প্রযোজকগণ মাঝে মাঝে তাঁর নাটক নিয়ে অদীক্ষিত দর্শকদের নবরুচি ও রসের নাটক দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন। এ-বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'শেষরক্ষা', 'চিরকুমার সভা', 'তপতী', 'যোগাযোগ' প্রভৃতি তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন। 'চিরকুমার সভা' আর্ট থিয়েটারেও বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হয়নি। এর কারণ রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিদীপ্ত ও ব্যঞ্জনাধর্মী সংলাপ ও গূঢ়তত্ত্বময়তা তখনও দর্শকগণ উপলব্ধি করতে পারেননি। তবে রবীন্দ্রনাথের উপস্থাপনার ফলে অভিনেতারা আতিশয্যবর্জিত, রুচিসম্মত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য অভিনয়কলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে পেশাদার মঞ্চে শৌখিন নাট্যকলার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। যেসব নতুন নাট্যকার শিশিরযুগের নাট্যমঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ গিরিশযুগে আবির্ভূত হলেও শিশিরযুগেই তাঁর বেশি নাটক অভিনীত হয়েছিল।

শিশিরকুমারের প্রতিভার স্পর্শে ক্ষীরোদপ্রসাদের অনেক নাটক অমর হয়ে আছে। অপরেশ মুখোপাধ্যায়ও পুরনো যুগের নাট্যকার। কিন্তু আর্ট থিয়েটারে তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক নাটক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। অন্যান্য মঞ্চেও তাঁর কিছু কিছু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। নবযুগে কয়েকজন নবীন নাট্যকারেরও আবির্ভাব হয়েছিল। মন্মথ রায় যে পৌরাণিক নাটকগুলি লিখেছিলেন সেগুলিতে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে প্রবল জাতীয় ভাবাবেগ অথবা নির্যাতিত পুরুষকারের প্রচন্ড বিদ্রোহ পরিস্ফুট করা হয়েছে। কংস, বৃত্রাসুর, চাঁদসদাগর প্রভৃতি দেবদ্রোহী চরিত্রই তাঁর নাটকে মুখ্য হয়ে উঠেছে। মন্মথ রায় এই যুগেই পরবর্তী যুগের জন্য নাটক রচনা করে চলেছিলেন, সে নাটক হল একাঙ্ক নাটক। তাঁর একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' সর্বপ্রথম অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় পেশাদার মঞ্চ স্টারে অভিনীত হয়। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নাট্যআঙ্গিক ও মঞ্চআঙ্গিক নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তবে পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রধানত তিনি নাটক লিখেছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রোমান্টিক আবেগধর্মী অভিনয়ের উপযোগী। তবে সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে আধুনিক জীবনসমস্যা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও মতসংঘর্ষ ইত্যাদি পরিস্ফুট। বিধায়ক ভট্টাচার্যের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে নানা যুগ সমস্যা উপস্থিত, কিন্তু অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগময়তা তাঁর নাটককে আবেগতরল রোমান্টিক অভিনয়ের উপযোগী করে তুলেছে। যোগেশ চৌধুরী, নিশিকান্ত বসুরায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকারের নাটকগুলিও বিভিন্ন পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

শিশিরযুগের নাটকগুলি মোটামুটি শেক্সপীয়রীয় নাটকের অনুকরণে পঞ্চাঙ্ক ও অঙ্কের অর্ন্তগত দৃশ্যসমন্বিত ছিল। কিন্তু শিশিরকুমারই সর্বপ্রথম পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নাটকের ওপর আঘাত হানলেন। 'জনা' নাটককে তিনি সম্পাদনা করে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করে নেন। 'আলমগীর' নাটকও অভিনয়ের সময় অনেকটা কাটছাঁট করেছিলেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের গ্রিক অংশ বাদ দিয়েই তিনি অভিনয় করতেন। অর্থাৎ রোমান্টিক নাটকের বিস্তার ও বৈচিত্র্য বাদ দিয়ে নাটককে সংহত, ঐক্যবদ্ধ ও নায়ককেন্দ্রিক করে তুলতেন। শিশিরকুমার পার্শ্বচরিত্র- গুলির ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না, তাঁর সম্প্রদায়ে সব সময়ে শিল্পীর প্রাচুর্যও ছিল না, সেজন্য তাঁর নাটক অনেক ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক হয়ে পড়ত। 'ঝড়ের রাতে' প্রযোজনার পর নাটকের সময়সীমাও তিন ঘন্টার মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে এল। সেজন্য পঞ্চাঙ্ক নাটকের রীতি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হচ্ছিল। শুধু অঙ্কবিশিষ্ট ইবসেনীয় রীতি অনেক নাটকেও অনুসরণ করা শুরু হল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চে অভিনয়ের জন্য নাটকের আঙ্গিকও মঞ্চোপযোগী করে তোলা হল।

প্রয়োগকর্তার নিয়ন্ত্রণে থিয়েটার আসার পর নাট্যকারের স্বাধীনতা অনেকটা বিলুপ্ত হল। প্রয়োগকর্তা নাটককে কখনও উদ্দেশ্যরূপে মেনে নেন না, নাটককে তিনি তাঁর প্রয়োগের উপায়রূপে মনে করেন। শিশির ভাদুড়ী, ক্ষীরোদপ্রসাদ, যোগেশ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র প্রত্যেকেরই নাটক অনেক জায়গায় অদলবদল করেছিলেন। নাট্যকারেরা আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রয়োগকর্তার সিদ্ধান্তই বজায় ছিল। নাটকের মধ্যে অভিনয়ের ক্রিয়ার খুব কমই উল্লেখ থাকে, প্রয়োগকর্তা সেই ক্রিয়াগুলির নির্দেশ দিয়ে নাটকের মধ্যে যে রস নেই সেই রস সৃষ্টি করে থাকেন। কোনও জায়গায় হয়তো একটি কথা বারবার আবৃত্তি করে, কিংবা ভগ্নকণ্ঠে অর্ধস্ফুট বাক্য উচ্চারণ করে, অথবা শুধু কেবল নীরব নিস্পন্দ চাহনির মধ্যে দিয়ে এমন গভীর ভাব ব্যক্ত করা যায় যা নাটকের বহু কথার মধ্যে দিয়েও ব্যক্ত করা সম্ভব না। নাটকের সাধারণ সংলাপ হয়তো অভিনেতা এমন কণ্ঠস্বর ও অভিব্যক্তিসহ উচ্চারণ করেন যে সাধারণ কথা অসাধারণ রসসৃষ্টি করতে পারে। 'সীতা' নাটকে শিশিরকুমার যখন বলতেন, 'কার কণ্ঠস্বর? কার কণ্ঠস্বর? স্বর্ণময়ী দেবীর প্রতিমা/মানবী হইয়া চিরপরিচিত/পুরাতন কণ্ঠস্বরে আমারে/সান্ত্বনা দিতে এলে!' তখন কথাগুলির বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে এক মর্মরিত বেদনা অমূর্ত হাহাকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। 'তটিনীর বিচার'-এ অহীন্দ্র চৌধুরী 'Seven Years experience in Chicago' এমন কণ্ঠস্বরে মোচড় দিয়ে এবং অদ্ভুত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতেন যে দর্শকরা অত্যন্ত চমৎকৃত হতেন। Chicago কথাটি নানাভাবে উচ্চারণ করে তিনি নিত্যনূতন চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করতেন। 'স্বামী-স্ত্রী' নাটকে একটি দৃশ্যে দুর্গাদাস শুধু গেঞ্জি গায়ে মদের বোতল ও পানপাত্র ইত্যাদি একটি ট্রে-তে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে যখন কপট গাম্ভীর্যে বলতেন, 'মাঝে মাঝে আপনি একটু শেরি খেতে ভালোবাসতেন', তখন দর্শকগণ বিশেষ কৌতুকবোধ করতেন। নাটকে

গুরুত্ব নেই, অথচ দু'একটি সংলাপের স্বরবৈচিত্র্যময় ও অদ্ভুত ভঙ্গিময় উচ্চারণে এক-একটি চরিত্র চিরস্মরণীয় হয়ে ওঠে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে নন্দের রাজসভায় পারিষদের একটি নগণ্য ভূমিকায় দুর্গাদাস চাণক্যকে প্রবেশ করতে দেখে আসন থেকে নেমে এসে সমস্ত শরীরটাকে উপহাসের ভঙ্গিতে বেঁকিয়ে জড়িত কণ্ঠে বলতেন, 'তুমি কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ?' এই একটি সংলাপেই দুর্গাদাস স্মরণীয় হয়ে গেলেন।

শিশিরযুগে অভিনেতারা প্রয়োগনিয়ন্ত্রিত হলেও তখনও মঞ্চাভিনয়ে ব্যক্তিপ্রাধান্য বর্তমান ছিল। এক একজন দিকপাল অভিনেতার অভিনয় দেখার জন্যই দর্শকরা এক এক নাট্যশালায় এসে ভিড় করতেন। নাটকের সংলাপ তখনও কাব্যময়, আবেগরঞ্জিত ও দীর্ঘবিস্তারী ছিল। সেজন্য অভিনেতা তখন আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ করে রসসৃষ্টির সুযোগ পেতেন। অনেক ক্ষেত্রে নাট্যকারগণ বিশেষ বিশেষ অভিনেতার প্রবণতা, পছন্দ ও অভিনয়ভঙ্গি অনুযায়ী চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ প্রয়োগ করতেন। তখনও রোমান্টিক অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যকারগণও তাঁদের নাটকের সংলাপ রোমান্টিক ভাব ও রসযুক্ত করে তুলেছিলেন।

গিরিশযুগের ন্যায় শিশিরযুগের অভিনেতৃগণও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে এসেছিলেন। তবে গিরিশযুগের অভিনেতারা থিয়েটারের জন্য সব কিছু ছেড়েছিলেন, তাঁরা বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে এসেছিলেন, নিন্দা ও ঘৃণা কণ্ঠের ভূষণ করেছিলেন, অত্যন্ত সামান্য টাকায় রঙ্গমঞ্চের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন, পেশাদার রঙ্গালয়ে অভিনয় করলেও তাঁরা পুরোপুরি পেশাদারি হতে পারেননি। কিন্তু শিশিরযুগের অভিনেতারা প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে অভিনয়কে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে এসেছিলেন, তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ না হয়ে বরং বর্ধিত হয়েছিল, তাঁরা পেশাদারি (Professional) হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই নানা ধরনের বৃত্তি থেকে এসেছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে এলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী, স্বচ্ছল ও অভিজাত পরিবার থেকে এলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, ওকালতি ছেড়ে এলেন নরেশ মিত্র, সিমলা সেক্রেটারিয়েটের চাকরি ছেড়ে এলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষকতা ছেড়ে এলেন যোগেশ চৌধুরী, চিত্রশিল্পী জমিদার দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন মঞ্চাভিনেতা। তাঁরা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন, অভিনয় সম্পর্কে অধীত জ্ঞান তাঁদের সকলেরই ছিল গভীর ও ব্যাপক। শিশির ভাদুড়ীর তো তুলনাই নেই, অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো নাটক ও অভিনয়কলা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত কমই দেখা যায়। তাঁরা হঠাৎ সাধারণ মঞ্চে আসেননি, অপেশাদার মঞ্চে এবং কেউ কেউ যাত্রায় অভিনয় করে অভিনয়কলাকোবিদ হয়েই মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন। সুতরাং পেশাদার মঞ্চে তাঁরা পরিণত পেশাদারি নৈপুণ্য নিয়েই প্রবেশ করেছিলেন।

শিশিরযুগের অভিনয় গিরিশযুগের অভিনয়ের পরিণত, পরিপাটি, মার্জিত ও সচেতন শিল্পসম্মত রূপ। দুই যুগের অভিনয়ের মধ্যে একেবারে মৌলিক পার্থক্য ছিল না। কারণ উভয় যুগের অভিনয় রোমান্টিক ভাবরঞ্জিত, আবেগধর্মী অভিনয়। দুই যুগের শিল্পীরা একই নাটক বহু অভিনয় করেছেন, সুতরাং তাঁদের অভিনয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য কীভাবে প্রকাশ পাবে? পার্থক্য ছিল কিছু কিছু অভিনয় পদ্ধতিতে, চরিত্রবিশ্লেষণে, মঞ্চ ও মঞ্চকৌশলের সঙ্গে অভিনয়ের সমীকরণে এবং সহশিল্পীদের সঙ্গে অভিনয়ের সহযোগিতায়। নিছক অভিনয়-শক্তিতে বোধহয় পূর্বযুগ অধিকতর সমৃদ্ধ ছিল, তবে সূক্ষ্ম ও বিচিত্র কলাপ্রয়োগে নবযুগ অধিকতর উন্নত ছিল। নির্মলেন্দু লাহিড়ী দুই যুগের তুলনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই পার্থক্যের প্রধান কারণ আমার মনে হয় যে, পূর্বকালের অভিনেতারা অধিকতর ভাবের অধিকারী ছিলেন। ভাবই অভিনয়ের প্রাণ। চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভাবের অধিকারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। পূর্বকালের অভিনেতারা বর্তমানকালের অভিনেতাদের অপেক্ষা অধিক ভাবুক ও রসিক ছিলেন। আধুনিক যুগে Technique-এর দিকেই বেশি লক্ষ্য দৃষ্টি হয় — ভাবের কিছু অভাব। এইজন্যই অনেক সময় দেখা যায় অভিনয় প্রায় নিখুঁত হইলেও তেমন মর্মস্পর্শী হয় না — চরিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিকে নজর কম। Tricks বা সহজ উপায়ে লোক ভুলাইবার দিকে দৃষ্টিই অধিক।'[৩০] নির্মলেন্দু লাহিড়ীর বক্তব্য সর্বাংশে স্বীকার্য নয়, তবে একটা কথা ঠিক যে আগের যুগের অভিনয়ে ভাবাবেগের গভীরতা ছিল, কিন্তু নবযুগের অভিনয়ে আঙ্গিকের সূক্ষ্মতা বেশি।

সুর ও সুরবিহীন অভিনয় সম্পর্কে গিরিশযুগে দুটি পরস্পরবিরোধী ধারা বর্তমান ছিল। শিশিরযুগে দুই ধারার

অভিনয় সম্পর্কে বিতর্ক ছিল না বটে, কিন্তু অভিনয়ে উভয় ধারারই অস্তিত্ব ছিল। স্বয়ং শিশিরকুমারের অভিনয়ের কথাই ধরা যাক। তাঁর অভিনয় সুরেলা ও সুরবর্জিত দুই-ই ছিল।[৩৫] তাঁর অনুপম কণ্ঠে উচ্চারিত বাণী সুরেব ঝরণায় পরিণত হত এবং তিনি মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর অতুলন আবৃত্তির সম্পদ নিয়ে। অভিনয় আবৃত্তিধর্মী হলে তার মধ্যে সুর আসতে বাধ্য। শিশিরকুমারের অভিনয়েও সেইজন্য সুর আসত, কিন্তু সেই সুর সোনার ওপর মিনের কাজের মতো শোভা পেত। অবশ্য কবিত্বময় সংলাপে স্বভাবতই তাঁর কণ্ঠে যেন সপ্তস্বরা বেজে উঠত। 'সীতা' নাটকে রামের সংলাপ অত্যন্ত কাব্যরসসিক্ত, সেজন্য এই সংলাপ আবৃত্তিতে তাঁর কণ্ঠ থেকে সুরের মধু যেন ক্ষরিত হত। 'সেই নীল-নলিন-নয়ন দুটি!/আঁখিতারকায় সেই স্নিগ্ধ অমৃত পরশ! বালক, বালক,/হেন রূপ কে তোমাবে দিল, —/কোন্ মাতৃবক্ষ হতে উচ্ছ্বসিত স্নেহরস-ধারা/করি পান ভুবনমোহন/দিব্য রূপ পাইয়াছ?' এই অংশ শিশিরকুমার যখন আবৃত্তি করতেন তখন মনে হত সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে যেন সংগীততরঙ্গ ব্যাকুলভাবে ভেসে বেড়াত। আবার 'নরনারায়ণ' নাটকে কর্ণচরিত্রের সংলাপ ছন্দবদ্ধ হলেও ওই চরিত্রে অভিনয়ের সময় শিশিরকুমার সুর দিতেন না। অর্থাৎ শিশিরকুমারের সুরব্যবহার সর্বত্র একই ধরনের ছিল না। চরিত্রবিশ্লেষণের জন্য তিনি সুরকে নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করতেন, কোথাও তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সুর দিতেন, কোথাও বা দিতেন না। সুরের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ কোনও বস্তুকে চিরন্তন সত্যের আকাশে মুক্তি দেওয়া যায়। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সাধারণীকৃত অনুভূতিতে সম্প্রসারিত করা যায়। রামের আর্তি সুরের স্পর্শেই বিশ্বের আর্তিতে পৌঁছে যেত। 'সীতা, সীতা, সীতা, সীতা' যখন সুরের ক্রমোচ্চ তরঙ্গে উচ্চারিত হয় তখন রামের বিরহ বিশ্বমানুষের বিবহে পরিণত হত।[৩৬] আগের যুগের অভিনয়ের সঙ্গে শিশিরকুমারের অভিনয়ের তফাত এখানে যে আগের অভিনেতারা একটানা সুরে আবৃত্তি করে যেতেন আর শিশিরকুমার আবৃত্তির একঘেয়েমি দূর করতেন অভিব্যক্তিব বিরতি দিয়ে। আবৃত্তির সুরে সংলাপের অর্থকে আচ্ছন্ন করা নয়, শব্দ ও বাক্যকে আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে অর্থবহ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেজন্য সেই আবৃত্তির মেজাজ, লয় ও ব্যঞ্জনা ছিল বৈচিত্র্যময়। সুরের আতিশয্য ছিল নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়ে। সেজন্য তাঁকে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ধারার উত্তরসাধক বলা যেতে পারে। তাঁর কণ্ঠে কমনীয় সুরের প্লাবন বয়ে যেত, তখনকার দর্শকদের কাছে তা মন্দ লাগত না।

শিশিরযুগে যেমন সুরেলা অভিনয় ছিল, তেমনই সুরবর্জিত অভিনয়ও ছিল। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ছিল সম্পূর্ণ সুরবর্জিত। তাঁর গলা ছিল সোনা দিয়ে বাঁধানো অর্থাৎ, পরিষ্কার লাবণ্যময় ও মার্জিত। তিনি কথা বলতেন কেটে কেটে, একটু দ্রুত ও সাবলীল ভঙ্গিতে।[৩৮] 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজীবের ভূমিকায় তিনি কীরূপ অভিনয় করতেন তার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, 'ঔরংজীব! এবার তোমার উত্থান না পতন! — পতন? অসম্ভব — উত্থান? কিন্তু কি উপায়ে —! কিছু বুঝতে পারছি না।' কণ্ঠস্বরের খাদে উচ্চারিত কথাগুলি যেন এক একটি শব্দময় বাণেব মতোই এসে দর্শকদের হৃদয়ে বিদ্ধ হত। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গলা ছিল স্বাভাবিক ও সুরবর্জিত।[৩৯] সেই কণ্ঠে আবেগের রঞ্জন ছিল না, কিন্তু দর্শকরা আবেগে আক্রান্ত হত। আর্ট থিয়েটারের অভিনেতারা শিশিরকুমার ও তাঁর সম্প্রদায়ের অভিনেতাদের মতো আবৃত্তিতে পটু ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে পুরনো যুগের অভিনেতা অপরেশ মুখোপাধ্যায় আবৃত্তিতে সবচেয়ে দক্ষ ছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর কণ্ঠে মাধুর্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য ছিল বেশি। সেই কণ্ঠে ছিল শৈলশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত মেঘের গর্জন, আহত সিংহের আর্তনাদ। তবে যেখানে ক্ষতবিক্ষত স্নেহের আর্তি ও বেদনা প্রকাশ পেত সেখানে স্বাভাবিকভাবে সুরের স্পর্শ এসে যেত, যেমন, 'আমার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন করব কোন্ প্রাণে জাহানারা! ঐ চেয়ে দেখ্ — ঐ স্ফটিকে গঠিত ঐ তাজমহলের দিকে দেখ্ — তার পর বলিস তাদের শাসন কর্তে।' কিংবা, 'চেয়ে দেখ্ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে — দেখ্ সে কি স্বচ্ছ। চেয়ে দেখ্ ঐ আকাশের দিকে, দেখ্ সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ্ ঐ কুঞ্জবনের দিকে, দেখ্ সে কি সুন্দর!'

অভিনেত্রীরা আগের যুগের মতোই সুরেলা অভিনয় করতেন। নারীকণ্ঠে Pitch বেশি থাকার জন্য একটু জোরে আবেগ দিয়ে সংলাপ বললেই তাতে সুরের কম্পন এসে যায়। আগের যুগের অভিনেত্রী যাঁরা শিশিরযুগেও অভিনয় করেছিলেন তাঁদের কণ্ঠে সুর তো ছিলই, নবযুগে যেসব নবীনা অভিনেত্রী এলেন তাঁরাও সুরের প্রভাব অতিক্রম করতে

পারেননি। এই যুগের একজন যশস্বিনী অভিনেত্রী সরযূ দেবীর কথা বলা যেতে পারে। তিনি বীররসাত্মক অভিনয়েও জোর দেওয়ার জন্য জায়গায় জায়গায় এমনভাবে দীর্ঘ দম নিতেন যে তাঁর অভিনয় আরও বেশি সুরময় হয়ে পড়ত। রাজলক্ষ্মী (বড়) ও প্রভাদেবী এই দুই অভিনেত্রীর কথা বলা যেতে পারে যাঁদের অভিনয় সুরবর্জিত ছিল। তাঁদের উভয়ের গলা এত ভারী, গম্ভীর ও মাজাঘষা ছিল যে তাঁদের কথা বলার সময় সুব দিয়ে কণ্ঠস্বর বাড়াতে হত না। তাঁদের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরই সকল জায়গা থেকে সুশ্রাব্য ছিল।

গিরিশযুগের অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের উচ্চতাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। হয়তো যাত্রাভিনয়ের প্রভাবে কিংবা উদ্দীপনাময় অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের চমৎকৃত করার আশায় কণ্ঠস্বরকে অতিনাটকীয়ভাবে উচ্চায়িত করা হত। কিন্তু শিশিরকুমার ও তাঁর প্রভাবে সমসাময়িক শিল্পীবৃন্দ কণ্ঠস্বরকে অনেকখানি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে আনলেন। অতিরিক্ত চিৎকারে দর্শকদের শ্রবণেন্দ্রিয় সচকিত ও পীড়িত হয় এবং তাদের দর্শনেন্দ্রিয় অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা সঞ্চালনের রস আস্বাদন করতে পারে না। কিন্তু শিশিরকুমার অভিনয়ের শ্রাব্যতার চেয়ে দৃশ্যতার ওপরে জোর দিলেন বেশি। কণ্ঠস্বরের উচ্চতার মধ্যে একঘেয়েমি আসে, সেই জন্য কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য অথবা modulation-এর মধ্যে দিয়ে সেই একঘেয়েমি দূরীভূত হয়। এক এক রকমের কণ্ঠস্তরে স্বরের তরঙ্গা উৎক্ষেপ, সুরের কম্পন ও আবেগের রঞ্জনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্নরকমের ভাবরস সৃষ্টি করা যায়।[৪০] উচ্চ ও উদাত্ত কণ্ঠে বীরবস, খাদে নাভিমূল থেকে উৎসারিত কণ্ঠস্বরে করুণরস, স্নিগ্ধ, অনুচ্চ ও অস্ফুট কণ্ঠস্বরে শৃঙ্গাররস সৃষ্টি করা সম্ভব। নবযুগেব অভিনেতাগণ এই স্বরবিজ্ঞান ও স্বরশিল্প সম্পর্কে অবহিত হয়েই অভিনয় করতেন। আগের যুগের অভিনেতারা বিরামহীন আবৃত্তি করতেন বলে তাঁদের অভিনয় একঘেয়ে হয়ে উঠত। কিন্তু নতুন যুগের অভিনেতারা pause বা বিরতির ওপর অনেকখানি গুরুত্ব দিলেন। কথা যেমন বলতে হয় তেমনই আবার থামতেও হয়। থামা মানেই দর্শকদের শোনা থেকে ভাবনায় উত্তরণ। অবিচ্ছিন্ন শব্দধ্বনিতে আমাদের ভাবনা, বিচারশক্তি ও রসবোধকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কথার যখন বিরাম তখন নানা অভিব্যক্তির ক্রিয়া। যাঁরা শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেছেন তাঁরা জানেন নীরব হয়ে শিশিরকুমার মুখ, হাত ও পদচারণার মধ্যে দিয়ে এমন বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল ভাবের চলমান তবঙ্গা সৃষ্টি করতেন যে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত ও অভিভূত হয়ে পড়ত। উদিপুরীর সঙ্গো আলমগীরের স্বপ্নদর্শনদৃশ্য গোড়ার দিকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট স্থায়ী হত। এই দীর্ঘস্থায়ী দৃশ্যে শিশিরকুমার কখনও দু'একটি কথা, কখনও নীরব হয়ে অপরূপ ভাবের অভিব্যক্তি দেখাতেন। দর্শকরা প্রতিটি মুহূর্ত বিস্মিত, বিহুল হয়ে এই সাত্ত্বিকরসাত্মক অভিনয় দেখতেন। নবযুগের অভিনেতারা প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তা ব্যক্ত করতেন। সুতরাং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বহিরঙ্গা অভিনয়কলার মধ্যে দিয়ে শুধু কেবল দর্শকদের চোখ ও কানের তৃপ্তিসাধন করে অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁদের ভাবনার মধ্যে সঞ্চারিত করা। অভিনয়ের মধ্যে এই মননশীলতা ও অন্তর্মুখীনতা শিশিরকুমার ও তাঁর অনুবর্তীদের অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল।

অভিনয়ের মধ্যে চিত্রধর্মিতা শিশিরযুগের অভিনয়ের আর একটি লক্ষণ। এই চিত্রধর্মিতা আছে অভিনেতাদের চলাফেবা, দাঁড়ানো এবং নানা ধরনের ক্রিয়াশীল ভঙ্গিার মধ্যে। দূর থেকে দর্শকরা যখন অভিনেতাদের দেখে, তখন একটা ছবির মতো তাঁদের মনে হয়। সেই ছবি কখনও স্থির, কখনও চলন্ত। এই ধরনের চিত্র হয়ে ওঠার জন্য অভিনেতাদের দৈহিক পটুতা, অঙ্গাপ্রত্যঙ্গোর নমনীয়তা, চেহারার আকর্ষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদের জাঁকজমক থাকা দরকার। অভিনেতাদের মঞ্চের আয়তন, পদবিক্ষেপের বিস্তার, সহঅভিনেতাদের সঙ্গো দূরত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 'আলমগীর' নাটকে শিশিরকুমার এমন ভঙ্গি দেখিয়েছিলেন যার জন্য তাঁর অভিনয় অসাধারণত্বের স্তরে পৌঁছেছিল।[৪১] চিত্রধর্মী ভঙ্গিা প্রকাশে অহীন্দ্র চৌধুরী ছিলেন অদ্বিতীয়। 'চন্দ্রশেখর' নাটকের অভিনয়ে মীরকাশিমের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় ইংরেজের কামান গর্জনে সকলের সঙ্গো তকী খাঁও যখন পালানোর চেষ্টা করছেন তখন তিনি বাঘের মতো লাফিয়ে পড়তেন সিংহাসন থেকে। তকী খাঁকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে সিংহাসনের সিঁড়ির একটা ধাপ থেকে একটা পা বাড়িয়ে দিতেন ওর কাঁধে এবং তারপরে ওর বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দিতেন। এই ভঙ্গিামা দেখতে খুব সুন্দর হত। 'রিজিয়া' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সিংহাসনে আসীনা রিজিয়া। বক্তিয়ার সিংহাসনের নিচে

দণ্ডায়মান। রিজিয়ার কথায় উত্তেজিত হয়ে বক্তিয়ার তার দৃঢ় ও বলিষ্ঠ দেহটি ঋজু ভঙ্গিতে উত্তোলিত করে বলছে—

শাহাজাদী! সম্রাটনন্দিনী!
মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে?

বলতে বলতে বক্তিয়ার সিংহাসনের ওপরে কিছুটা উঠে রিজিয়ার দেহের ওপরে ঝুঁকে পড়ে তাঁকে ছোঁ মেরে তুলে নেওয়ার ভঙ্গিতে বলছে —

কিন্তু যদি এই
রক্ষীশূন্য কক্ষে, এই দণ্ডে নিষ্কোষিত
অসি মম দ্বিখণ্ডিত করে তব শির
কি করিতে পার তুমি?

বক্তিয়ারের এই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি যিনি দেখেছেন তিনিই মুগ্ধ হয়েছেন। মঞ্চে দুর্গাদাসের ভঙ্গিও খুব আকর্ষণীয় হত। তাঁর নয়নানন্দন চেহারা, সপ্রতিভ কথা ও সাবলীল চলাফেরা দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখত। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথায়, 'অমন করে দাঁড়াতে, অমন চলাফেরা করতে, আর কাউকে আমি দেখিনি।'[৮১] সাহেবের বাগভঙ্গি ও চলাফেরা নকল করতে প্রথম দিকে রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং পরে ভূমেন রায় ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ।

আগের যুগে কম্পোজিশন বলতে তেমন কিছুই ছিল না। তার কারণ তখন ঝোলানো দৃশ্য ব্যবহৃত হত বলে অনেক ক্ষেত্রে মঞ্চে এত কম জায়গা থাকত যে শুধু কেবল দাঁড়িয়ে পার্ট বলা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু নবযুগে ক্রমে ক্রমে মঞ্চের আয়তন বাড়ল, এবং মঞ্চে অবস্থিত অভিনেতাদের এমন নির্ভুল পারিপাট্যে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করা হত যে দূর থেকে তা ছবির মতো মনে হত। 'সীতা' নাটকে কম্পোজিশন হত অদ্ভুত চমকপ্রদ। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ভাষায়, 'প্রাসাদ-অঙ্গনে উচ্চস্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, নিম্নস্থানে জনসাধারণ, সকলের ওপরে অলিন্দে উপস্থিত অন্তঃপুরচারিণীরা। কেউ উপবিষ্ট, কেউ দণ্ডায়মান। কেউ চলমান এবং সকলেই করছে অভিনয় — কেউ ভাবে, কেউ ভাষায়। আগে এই শেষ দৃশ্যে দেখা দিতেন অন্তত একশ জন নটনটী, বাংলা রঙ্গালয়ে আর কখনও যা হয়েছে বলে শুনিনি।'[৮২] আর্ট থিয়েটারে প্রযোজিত অভিনয়েও কম্পোজিশনের এই চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যেত। 'কর্ণার্জুন', 'বন্দিনী', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি নাটকের নিখুঁত কম্পোজিশনের কথা বলা যেতে পারে। প্রয়োগকর্তারা এই যুগে বোঝাতে চাইলেন, যাঁরা কথা বলছেন তাঁরাই অভিনয় করছেন তা নয়, যাঁরা কথা বলছেন না তাঁরাও অভিনয় করছেন। অভিনয় জিনিসটা হল ব্যক্তিক নয়, সামগ্রিক।

শিশিরযুগের আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের কথা আলোচনা করা হল। ওই যুগের ভাবরসাত্মক সাত্ত্বিক অভিনয়ের কথা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। শিশির ভাদুড়ী ও অহীন্দ্র চৌধুরী এই দু'জন হলেন ওই যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তাঁদের অভিনয়ের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। শিশিরকুমারের অভিনয়ে intellect-এর প্রাধান্য, কিন্তু অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ে emotion-এর গুরুত্ব বেশি। শিশিরবাবু চরিত্রের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্ফুট প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু অহীন্দ্রবাবু তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ্য বিস্ফোরণকে রূপায়িত করেন। শৃঙ্গাররসে শিশিরবাবু অতুলনীয়, কিন্তু বীররসে অহীন্দ্রবাবু অদ্বিতীয়। ট্র্যাজেডির অন্তর্মুখীনতা ও অবরুদ্ধ বেদনা প্রকাশ করতে শিশিরবাবুর সমকক্ষ কেউ নেই। কিন্তু ট্যাজেডির বলিষ্ঠ হাহাকার রূপায়িত করতে অহীন্দ্রবাবু সকলের ওপরে। সহজ সাধারণ পরিবেশে শিশিরবাবুর অসাধারণ অভিনয়দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু অদ্ভুত ও অসাধারণ ভূমিকা অহীন্দ্রবাবুর অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত। শিশিরবাবুর কণ্ঠস্বরে সপ্তস্বরা বীণার সুললিত রাগরাগিনী খেলে যায়। কিন্তু অহীন্দ্রবাবুর কণ্ঠে নিরবচ্ছিন্ন কম্বুধ্বনিই শোনা যায়। রূপসজ্জায় শিশিরবাবু কিছুটা উদাসীন। কিন্তু অহীন্দ্রবাবু রূপসজ্জায় অতিমাত্রায় সচেতন। শিশিরকুমারের অভিনীত প্রত্যেক পার্টে আমরা তাঁকেই দেখতে পাই, কিন্তু অহীন্দ্রবাবু হারিয়ে যান তাঁর ভূমিকার মধ্যে। শিশিরবাবু দর্শকদের কাছে খ্যাতি অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু অহীন্দ্রবাবু দর্শকদের খ্যাতি অর্জন করেন।

শিশিরবাবুর অভিনয় আমাদের নিয়ে যায় ব্যক্ত জগৎ থেকে সুদূর কল্পলোকে, আর অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় আমাদের নিয়ে আসে দূরবর্তী কল্পলোক থেকে প্রত্যক্ষ অভিভবের জগতে।

অন্যান্য অভিনয় শিল্পীর মধ্যে তিনকড়ি চক্রবর্তী ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক অভিনেতা। নটশেখর নরেশ মিত্রের চেহারা ও সরু ভাঙা কণ্ঠস্বর কমিক অভিনয়ের উপযোগী ছিল। 'সরলা'-র নীলকমল ও 'খাসদখল'-এর নিতাই চরিত্রে তাঁর কৌতুকরস ছিল প্রবল ও উতরোল। বাতিকগ্রস্ত ও ঈষৎ-করুণ চরিত্রের দৃষ্টান্ত হল কাত্যায়ন। অপকারী শঠ চরিত্রে তাঁর অভিনয়দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে শকুনি, পানুবাবু ও শ্রীমন্ত চরিত্রে। শেষ বয়সে ভগ্নদেহে অসহায় ও করুণ বৃদ্ধ চরিত্রে মর্মস্পর্শী অভিনয় করে গেছেন। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সুদর্শন অভিনেতা বাংলা মঞ্চ ও চিত্রজগতে আর কেউ এসেছেন কি না সন্দেহ। তাঁর কণ্ঠ ছিল মার্জিত ও পরিশীলিত এবং তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল অতীব আকর্ষণীয়। তিনি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে স্পষ্ট ও কাটা কাটা উচ্চারণে বাক্য বলতেন। তাঁর কমনীয় দেহলাবণ্য নিয়ে তিনি যখন নিতান্তই সাবলীল অভিনয় করতেন তখন সকল শ্রেণীর দর্শকই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। চন্দ্রগুপ্ত, ঔরংজীব, পূর্ণ, ললিত, মি. সেন প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি চিত্তজয়ী অভিনয় করেছিলেন। নির্মলেন্দু লাহিড়ীও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল সুরেলা মাধুর্য। শিবাজী, সিরাজদ্দৌলা ও ভাস্কর পন্ডিতের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হত শক্তি ও সৌন্দর্যে অনবদ্য। চালাক ও চটপটে ভূমিকায় চটকদার অভিনয় কবতেন ভূমেন রায়। রডা, কার্ভালো প্রভৃতি সাহেব ভূমিকায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা। প্রিয়দর্শন ও ব্যক্তিত্ববান অভিনেতা ছবি বিশ্বাস জনপ্রিয় নায়ক ছিলেন। দেবদাস, কাশীনাথ, সতীশ, নটুবিহারী প্রভৃতি ভূমিকা তাঁর অভিনয়ে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তড়বড়ে কথা বলার বৈশিষ্ট্যে সকলের কাছে প্রিয় হয়েছিলেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়। কৌতুক ও করুণ উভয় রসাত্মক ভূমিকাতেই তাঁর সমান পটুতা ছিল। দিলদার ও সুশোভন চরিত্রে অভিনয়ের সময় তিনি দর্শকদের হাসি কান্নায় ভিজিয়ে দিতেন। ফটিক, বনবীর, গিরিশ, যাদব ইত্যাদি ভূমিকায় তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। দীর্ঘদেহী ও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন কমল মিত্র। তেজোদীপ্ত ও বীরত্বমন্ডিত চরিত্রে তাঁর চেহারা ও কণ্ঠস্বর বিশেষ উপযোগী হয়েছে। মহেন্দ্র গুপ্ত আগে ছিলেন নাট্যকার, পরে হলেন অভিনেতা। কণ্ঠস্বরের কমনীয় গাম্ভীর্যে ও দ্রুত সাবলীল বাচনে তিনি দর্শকদের আকর্ষণ করেন। সন্তোষ সিংহ এককালে কূট ও ক্রূর চরিত্রে ভালো অভিনয় করতেন। কৌতুকরসের অভিনেতারূপে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। পরিণত বয়সে ভগ্নদেহ, হতাশচিত্ত বৃদ্ধের ভূমিকায় করুণরস সৃষ্টিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন।

অভিনেত্রীদের মধ্যে গানে, নাচে ও অভিনয়ে সমান পটুতা ছিল নীহারবালার। যে কোনও একটা নতুন ও দুঃসাহসিক পরীক্ষার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণভামিনী ছিলেন আর্ট থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। ছায়া, পদ্মাবতী, সরলা প্রভৃতি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব। শিশির সম্প্রদায়ের দু'জন সেরা অভিনেত্রী ছিলেন কঙ্কাবতী ও প্রভাবতী। ব্যক্তিত্বময়ী প্রভা উচ্ছ্বাস ও আতিশয্যের মধ্যে না গিয়েও গভীর রস উদ্রেক করতে পারতেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির স্নেহময়ী ও বেদনাবিক্ষতা নারীর ভূমিকায় তিনি মর্মস্পর্শী অভিনয় করতেন। উদ্দীপিত ও আবেগমন্ডিত ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেছেন সরযূদেবী। লুৎফা, পার্বতী, পান্না, জাহানারা প্রভৃতি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় জনসংবর্ধিত হয়েছিল। নানা ভূমিকায় অভিনয় করে এযুগে আরও যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজলক্ষ্মী, রাণীবালা, শান্তি গুপ্তা প্রমুখ।

উল্লেখপঞ্জী

১. শিশিরকুমার ভাদুড়ীর উক্তি — শিশির সান্নিধ্যে, পৃ. ১২৪।

২. অবশ্য এখানে কেউ কেউ বলতে পারেন, গিরিশচন্দ্র তো বেদব্যাসের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি তো শুধু বলে যেতেন আর অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় গণেশের মতো লিখে ফেলতেন।

৩. 'প্রতিভাশালিনী প্রৌঢ়া অভিনেত্রী মিসেস লুইসের সহিত নানারূপ বিদেশী নাটক ও অভিনয় সমালোচনায় এবং সেই সঙ্গে প্রায়ই অভিনিবেশসহ লুইস থিয়েটারের অভিনয়দর্শনে গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা ক্রমশ স্ফুরিত হইতে থাকে।

সেই প্রতিভার প্রথম বিকাশ — স্বীয় পল্লীতে সধবার একাদশী নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকাভিনয়ে।' — গিরিশচন্দ্র, অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৩৪

৪. 'অধ্যয়নই তাঁহার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।' — গিবিশচন্দ্র · অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৩৯।

৫. বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যৌবনে 'সধবার একাদশী'র চতুর্থ অভিনয় দেখে কীরূপ অভিভূত হয়েছিলেন তা বর্ণনা করেছেন (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১৩২১), 'বয়োবৃদ্ধিবশত ক্রমশ অনেক জিনিস ভুলিয়াছি আরও কত ভুলিব, ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশেব নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে-রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধহয় কখন ভুলিব না। সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল। অভিনয়ের নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল।'

৬. বাগবাজার শখের দলেব অন্যতম অভিনেতা রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'লীলাবতী ও ললিতের কথা অমিত্রাক্ষর ছন্দে থাকার দরুন অনেকেই পশ্চাৎপদ হইলেন। শেষে গিরিশবাবু আসিয়া যখন ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, তখন আর কোনও বাধা রহিল না।' — পুরাতন প্রসঙ্গ, ২৭০, ১৩৭৩ সং।

৭ অবশ্য কীচকচরিত্র ভালো চরিত্রের ব্যতিক্রম। শিশিরকুমার বলেছেন, 'গিবিশবাবু কীচক খুব ভালো করতেন। কিন্তু প্রথম রাত্রিব পর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন করতেন মতিলাল সুব। তাই নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আবার ধরলেন।' — শিশির সান্নিধ্যে, পৃ. ৫৩।

৮. 'গিরিশবাবুর স্বর বজ্রগম্ভীর এবং উচ্চারণপদ্ধতি যেন গৈরিশী ছন্দেই ঢালা।' — ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পবিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৯।

৯. 'আর চোখে ভাসত তাঁর চৌকো ভারী গাল দুটো যার প্রত্যেক পেশীটা তাঁর কথা শুনত।' — মনে এলো, দেশ, ২৪ ডিসেম্বব, ১৯৫৫।

১০. 'অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন উনি।' — শিশিরকুমারের উক্তি, শিশির সান্নিধ্যে, পৃ. ৫৩।

১১. 'তিনি নিজে তাঁহার নিজের পুস্তকের অভিনয়ে, রাম, মেঘনাদ, দক্ষ প্রভৃতি সাজিয়া, কখনও সুরটানা, একঘেয়ে কমাফুলস্টপহীন অভিনয় করেন নাই ....।' — বঙ্গীয় নাট্যশালা, ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩৩।

১২. গিরিশচন্দ্র অভিনয়কালে ঐ স্বাভাবিক সুরের উপরেই রং চড়াতেন মাত্র, কারণ একেবারে স্বাভাবিক সুর আমরা যা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি, রঙ্গমঞ্চে তেমন যুৎসই হয় না। অভিনয় হচ্ছে আর্ট এবং আর্টের ও বাস্তবিক জীবনের স্বাভাবিকতার মধ্যে তফাৎ আছে যথেষ্ট।' — অভিনয়ে সুর : হেমেন্দ্রকুমার রায়, নাচঘর।

১৩. গিরিশচন্দ্রের নিজের বক্তব্য — 'একই ভূমিকা শ্রেষ্ঠ অভিনেতাগণ স্ব স্ব প্রথায় সুন্দর অভিনয় করিয়া থাকেন। ' — অভিনয় ও অভিনেতা, নাট্যমন্দির, বৈশাখ, ১৩১৮।

১৪. 'অভিনয়কালে প্রকৃত নট কখনও অবহেলার সহিত অভিনয় করিবেন না। ভাবুক দর্শক থাকুক বা নাই থাকুক, অভিনেতার দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা উচিত।' — অভিনয় ও অভিনেতা, নাটমন্দির, চৈত্র, ১৩১৭।

১৫. '.... তিনি অত্যন্ত সাবধানে চলিতেন, পোশাক পরিলে তিনি আর কবি আচার্য নটনক্ষত্র কিছুই নয়, একেবারে সাধারণ নটের ন্যায় সঙ্কুচিত।' — সচিত্র শিশির, অমৃতলাল বসু, বড়দিন, ১৯২৪।

১৬. 'তবে বড্ড ফাঁকি দিতেন। শেখানর ব্যাপারেও তাই, দুবার বলতেন তো, ভাগ্য ভালো।' — শিশির সান্নিধ্যে, পৃ. ১২৪।

১৭ 'আর সীতারাম ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র ছিলেন অতুলনীয়।' — ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৬৯।

১৮. অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গিরিশচন্দ্র (পৃ. ৪৫০) দ্রষ্টব্য।

১৯. 'এই দৃশ্যের অভিনয়ে — সীতারামরূপী গিরিশচন্দ্র এবং শ্রীর ভূমিকায় স্বর্গীয়া তিনকড়ি বা শ্রীযুক্ত তারাসুন্দরীকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এরূপ অভিনয় জগতের যে কোনও রঙ্গমঞ্চকে গৌরবান্বিত করিতে পারিত।' — রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১১৩।

২০. 'সধবার একাদশীতে নিমাই দত্তকে আকৃতি, বেশ, অঙ্গভঙ্গি ও বাচনিক অভিনয়ে গিরিশবাবু এমন একটা বাস্তবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে গিরিশবাবু ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের খ্যাতিলাভ করিতেন তবে লোকে বলিত যে দীনবন্ধুবাবু গিবিশবাবুকে দেখিয়াই নিমাই দত্ত লিখিয়াছেন।' — সচিত্র শিশির, অমৃতলাল বসু, বড়দিন, ১৯২৪।

২১. 'তাঁহার মুখে সেক্সপীয়র-আবৃত্তি শুনিতাম; তাঁহার সে Grand Voice আপনারা শুনিতে পান নাই; সধবার একাদশীও তিনি আবৃত্তি করিতেন।' — অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা, পুরাতন প্রসঙ্গ।

২২. গিরিশচন্দ্রের বজ্রগম্ভীর গর্জন এবং মানসিংহকে বধ করতে অসি হাতে ছুটে যাওয়ার দৃশ্য দর্শকদের কীরূপ ভয়বিহ্বল করে তুলত তা বর্ণনা করে অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : 'শুনিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের উচ্চারিত মানসিংহের গম্ভীর গর্জনে সম্মুখস্থ কয়েকজন দর্শক বিহ্বল হইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন মূর্ছিত হইয়া পড়েন।' — গিবিশচন্দ্র, পৃ. ১১৩-১১৪।

২৩. গিরিশচন্দ্র নিজে বলেছেন, 'কে ও? মহিষী যে। তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ? — এই অংশ প্রথমে কাঁদিতে কাঁদিতে অভিনীত হইত; পরিবর্তিত অভিনয়ে কান্না ছিল না। কৃষ্ণা যেন কোথায় গিয়াছে — রাজা প্রিয় দুহিতাকে খুঁজিতেছেন, এইরূপভাবেই অভিনীত হয়। পরিবর্তিত অভিনয় পূর্বের রোদন অপেক্ষা হৃদয়ভেদী হইয়াছিল।' — অভিনয় ও অভিনেতা, নাটমন্দিব, চৈত্র ১৩১৭।

২৪. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, পৃ. ৩৫।

২৫. 'ইংরাজী খাঁটি অভিনয়ের সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই।' — ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ।

২৬. 'শুষ্ক অন্তর্ভেদী স্বর, মমতার সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে উত্তপ্ত বালুকারাশি, তাহাকে নিংড়াইলেও আর এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না।' — রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, পৃ. ৭৯।

২৭. 'আমার বেশ মনে আছে, বাড়িতে ফিরে আসবার পর দু'তিন দিন যাবত কেমন যেন একটা ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, ভালো করে খাওয়াদাওয়াও করতে পারছি না। মনে হচ্ছিল, সেই যে আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল শুনে সমস্ত দর্শক নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল দেখে এলাম, সেই কান্না বুঝি আমার ভিতরের সবগুলি তন্ত্রীর মধ্যে তখনো ক্রমাগত বেজে চলেছে, তার আর বিরাম নেই।' — নিজেরে হারায়ে খুঁজি, অহীন্দ্র চৌধুরী (১ম) — পৃ. ৮।

২৮. 'বর্তমান গ্রন্থের লেখক মঞ্চোপরি গিরিশচন্দ্রকে নানা ভূমিকায় দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে। করুণাময় ভূমিকার গিরিশ সকল গিরিশকে বোধ হয় ছাড়িয়ে গেছে।' — অথ নটঘটিত।

২৯. 'সাহেবের অভিনয় দেখিয়া চোখের জল পড়িত বটে, কিন্তু তাহাতে গলা শুকাইত না; মনে হইত না যে, বুকের মধ্যে সব যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে; মনে হইত না — পরিচিত কণ্ঠে কে যেন ক্রন্দনের গুঞ্জনরোল কানের কাছে তুলিয়াছে; মনে হইত না যে, কেহ যেন বক্ষের পঞ্জর একখানির পর একখানি খুলিয়া লইতেছে।' — রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, পৃ. ৫৬।

৩০. 'The quiet and subdued manner of his acting was highly touching and from start to finish he well sustained his part.' — The Hindu Patriot, 12 August, 1905।

৩১. 'এ চিত্র দেখিয়ে দর্শকের অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন হাহাকার করিয়া উঠিত, কোন্ অপরিজ্ঞাত শোক — কোথায় ছিল, কখন আসিল --- দমকা ঝড়ের মত অলক্ষ্যে, নিমেষে, সব যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেল।' — রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, পৃ. ৫৬।

৩২. 'সারা জীবন ধ'রে আমি এই কলার সাধনা করে এসেছি, শেষে আমার বৃদ্ধ বয়সে নাট্যকলার অবনতি দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল। কিন্তু আজ যাঁরা বাংলার নাট্যশিল্পে নবযুগ এনেছেন — আর্ট থিয়েটারে যাঁরা অভিনয় করছেন এবং বিশেষ করে শিশিরবাবুই এই নবযুগের প্রবর্তক। যে ব্যথা নিয়ে আমায় ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল, সে বেদনা থেকে এঁরা আমায় মুক্তি দিয়েছেন।' —'অমৃতভাষণ' : অমৃতলাল বসু, বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার — হেমেন্দ্রকুমার রায়।

৩৩. 'স্থানুমঞ্চের উপর একটি দৃশ্য থেকে অপর একটি দৃশ্যে যেতে হলে মঞ্চসজ্জার পরিবর্তন, বিভিন্ন চরিত্রের আগমন ও নিষ্ক্রমণে প্রচণ্ডভাবে সময়ের অপব্যবহার হত। দ্বিতীয়ত নাটকের গতি ও সচলতাও তাতে রীতিমতো বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। উক্ত অসুবিধাগুলি দূর করার প্রয়াসেই আমি ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ নির্মাণে ব্রতী হই।' — আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : সতু সেন, পৃ .৫৯।

৩৪. 'ইতিপূর্বে বাংলা নাট্যানুষ্ঠানের কোনো ধরা-বাঁধা সময় ছিল না। অভিনয় হচ্ছে তো হচ্ছেই, দর্শকরা ইচ্ছেমত প্রবেশ ও প্রস্থান করছেন। পাঁচ-ছয় ঘন্টার আগে কোনো নাটক সমাপ্ত হতো না। প্রযোজনার এই সময় ও পরিস্থিতির অভাব আমাকে একান্তভাবে পীড়িত করে। তিন ঘন্টার নির্দিষ্ট সময়-রেখার মধ্যে আমি ঝড়ের রাতে নাটকটিকে বেঁধে দিই ও প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দু'বার করে প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করি। ঘড়ি ধরে বাংলাদেশে নাটক আরম্ভ হওয়া ও শেষ হওয়ার উদ্ভব এই নাট্যাভিনয় থেকেই শুরু। — ঐ, পৃ. ৫৮।

৩৫. ময়মনসিংহের পতাকা-পত্রে প্রথম প্রকাশিত। পরে নাচঘরে পুনর্মুদ্রিত। নাচঘর থেকে বহুরূপী শিশিরকুমার সংখ্যায় (১ মে, ১৯৭৬) পুনঃপ্রকাশিত।

৩৬. 'শিশিরকুমার কিন্তু এখানে মধ্য পথই অবলম্বন করেছেন — যখন দরকার তখন তিনি সুরকে গ্রহণও করেন আবার ত্যাগও করেন।' — নাচঘর, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

৩৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা স্মরণীয় —

'বেদনার বেদমন্ত্রে বিরহের স্বর্গলোক করিলে সৃজন
আদি নাই, নাহি তার সীমা;
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তবু প্রত্যুষ স্বপন
চিত্তে তব ধ্যানের মহিমা।'

৩৮. 'দুর্গাদাসের গদ্য আবৃত্তি সুমধুর ছিল। কিন্তু তারও আকর্ষণ আবৃত্তির জন্য ততটা নয়, যতটা তাঁর কণ্ঠের মাধুর্যের জন্য। বিশেষত যখন তিনি খাদে আবৃত্তি করতেন।' — বাংলার নাটক ও নাট্যশালা : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

৩৯. 'তাঁর গলা ছিল হাল্কা, একটু চড়ার দিকে। বাচনভঙ্গী ছিল স্বাভাবিক কথা বলবারই মত।' — প্রসঙ্গ নাট্য : শম্ভু মিত্র।

৪০. নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী কণ্ঠস্বরের গুণ সম্পর্কে বলেছেন, 'কণ্ঠস্বরের যে গুণ শ্রোতৃবর্গের কাছে কণ্ঠস্বরকে আরামপ্রদ বা বিরক্তিকর করে তোলে তা তিনটি বিশেষ গুণের উপর নির্ভরশীল।

(ক) সঠিক উচ্চারণরীতি — যার অর্থই হলো স্বরকম্পন-পর্দা সঠিকভাবে কেন্দ্রীভূত করা।

(খ) স্বরের গভীরতা বা তীব্রতাবৃদ্ধির জন্য স্বরযন্ত্রের নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক (প্রতি সেকেন্ডে ছয়বার) ও বিস্তার থাকা চাই।

(গ) ফ্যারিংসের (Pharynx) অনুনাদ ক্ষমতার সঠিক সামঞ্জস্যবিধান — উচ্চগ্রামের স্বর এবং নিম্নগ্রামের স্বর সঠিকভাবে অনুনাদিত হওয়া চাই যাতে অনুনাদ সৃষ্টিকারী গহ্বরগুলি সঠিকভাবে গঠিত হয়।'

৪১. 'আলমগীরের অভিনয়ে কতকগুলো জায়গায় তিনি একটা বিশেষ ভঙ্গি এনেছিলেন, যা তাঁর নিজস্ব স্টাইল, এই ভঙ্গির জন্যই তিনি শিশিরকুমার, এটিকে অতিরঞ্জন বলা হয়, বা বহিরঙ্গের অভিনয় বলা হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু এটা অসাধারণ অভিনয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।' — অভিনেতা শিশিরকুমার প্রসঙ্গে : গঙ্গাপদ বসু — বহুরূপী (শিশিরকুমার সংখ্যা, ১ মে, ১৯৭৬)।

৪২. বাংলার নাটক ও নাট্যশালা, পৃ. ১৪১।

৪৩. বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার, পৃ. ৫৪।

'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস' গ্রন্থে (১৯৯৮, সাহিত্যালোক) ড. অজিতকুমার ঘোষ পৃথক দুটি পরিচ্ছেদে গিরিশযুগ ও শিশিরযুগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর অনুমতিক্রমে নাট্যচিন্তার বিষয়সূচি অনুসারে ও প্রাসঙ্গিকতাকে বজায় রেখে পরিচ্ছেদ দুটিকে একটি অখণ্ড রচনা হিসাবে প্রকাশ করা হল।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আশুতোষ দেব

পেশাদারি থিয়েটারের প্রথম পর্ব

ড. বাসবী রায়

'আমি সেদিনের কথা বলবো .... যা পড়ে আজকালকার পাঠক ও দর্শক বুঝবেন, কি মাটির তাল নিয়ে, পুকুর থেকে পাঁক তুলে — এদেশে যাঁরা থিয়েটার সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা কেমন সব পুতুল গ'ড়েছিলেন' — নির্মাণের এই যে ইতিহাস বিনোদিনী জানান তাঁর 'আমার অভিনেত্রী জীবন'-এ তা শুধু সেকালের থিয়েটারে অভিনেতা অভিনেত্রী তৈরির প্রসঙ্গেই সীমায়িত থাকে না, বরং আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় সেইসব মধ্যবিত্ত যুবকদের কথা যাঁরা সেই ঔপনিবেশিক শাসনের সংকীর্ণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নাট্যস্পৃহার তাগিদে দলবদ্ধ হয়ে নাট্যচর্চার কথা ভাবছিলেন।[১] দলের প্রধান গিরিশচন্দ্র সে ভাবনার কথা লিখেছেনও : 'যে সময়ে 'সধবার একাদশী'-র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত, কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। .... সেইজন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাসানাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না।'[২]

আমরা জানি যে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নিয়েই ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে কলকাতায় নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের শুরু আর ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্ম। এও জানি যে সে প্রযোজনার সঙ্গে গিরিশচন্দ্র যুক্ত ছিলেন না। ন্যাশনাল থিয়েটারে তাঁর আগমন ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়াবি মাসে, তাও স্বনামে নয়।[৩] তবু এই সময় থেকেই তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২) কলকাতা নাট্যজগতের প্রাণপুরুষ গিরিশচন্দ্র, শেষ কয়েক বছর হয়তো তিনি খুব সক্রিয়ভাবে নাট্যপরিচালনায় এবং নিয়মিত অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেননি,[৪] তবু তাঁর পরোক্ষ উপস্থিতিই ছিল

নাট্যপ্রেমীদের একান্ত আশ্রয়। অপরেশচন্দ্র লিখেছিলেন : 'যে অমৃত পানে বাঙ্গলার নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অমৃতভাণ্ড বহন করিয়া অনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাঙ্গলা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা তিনিই।'[৮] এই মন্তব্য কোনও অতিশয়োক্তি নয়। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় কীভাবে নাট্যদলকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাঁর নাটক কীভাবে মঞ্চজগৎকে পুষ্ট করেছে, তাঁর নাট্যশিক্ষা কেমনভাবে বহু নাট্যকর্মী তৈরি করতে পেরেছে বা তাঁর নাট্যভাবনা কতখানি নাট্যপ্রেমীদের অনুপ্রাণিত করেছে তা তাঁর সময়ের বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায়। তবু সেই গিরিশচন্দ্রের পক্ষেও কোনও একক নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি যা নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁরই পরিচালনায় তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চলেছিল।

আসলে নিতান্ত নাট্যচর্চার সদিচ্ছায় টিকিট বিক্রি করে অভিনয় দেখানোর নিয়মিত আয়োজনের যে সূত্রপাত তা খুব দীর্ঘদিন তার আদর্শ ধরে রাখতে পারেনি। প্রথমদিকে অবশ্য দলাদলি বা মতান্তরের মধ্যেও কোথায় যেন প্রত্যয়গত সহাবস্থানের একটা জায়গা ছিল। শুধু ন্যাশনাল বা গ্রেট ন্যাশনাল নয়, বিডন স্ট্রিটের স্থায়ী মঞ্চে নির্মিত বেঙ্গল থিয়েটারের নির্মাণও নিতান্ত ব্যবসায়িক কারণে হয়নি।[৯] ফলে তাদের নাটক নির্বাচনও অনেক সময়েই ছিল এক বিশেষ নাট্যচিন্তার ফসল। একারণেই শুধু দীনবন্ধু নন, মধুসূদনও একান্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয় তাদের। সেকালের নাট্য প্রযোজনার আর এক নির্ভর ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাতীয় ভাবোদ্দীপক' নাটকও এসে গেল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে। এমনকি ১৮৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকেই গ্রেট ন্যাশনাল আর বেঙ্গল থিয়েটারের প্রযোজনায় প্রশাসনের প্রতি ক্ষোভও নিরুচ্চারিত থাকেনি। নীলদর্পণের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাই আমাদের মনে পড়ে যায় 'পুরুবিক্রম' (২২-৮-৭৪, বেঙ্গল), 'ভারতে যবন' (১০-১০-৭৪, গ্রেট ন্যাশনাল), 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৪-১১-৭৪, বেঙ্গল), 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৪-৮-৭৫, বেঙ্গল), 'বঙ্গবিজেতা' (১১-৯-৭৫, বেঙ্গল), 'হীরকচূর্ণ' (২৫-১২-৭৫, গ্রেট ন্যাশনাল) প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের কথা। ঠিকই, এ সমস্ত নাটকে স্বদেশানুরাগের উদ্দীপনা থাকলেও সরাসরি ইংরেজের বিরুদ্ধাচারণ ছিল না। বেশিরভাগ নাটকেই হয়তো পরাধীনতার গ্লানি বা আত্মসম্মান রক্ষার ব্যর্থতা বেদনা যত না অনুভূত হয় তার চেয়েও নাটক ভারাক্রান্ত হয় নায়ক নায়িকার প্রেমের জটিলতায় বা নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার জট উন্মোচনে। তবু এদেরকে কেন্দ্র করেই তো নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের পরিকল্পনা। কিন্তু এই আইন চালু হওয়ার পর থেকেই নাট্যজগতের ছবিটা বদলে যায় অনেকখানি।

থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীরা এবার 'রাজা'র সঙ্গে বিরোধ এড়াতে নাচগানে ভরা প্রেমের উচ্ছ্বাস বা সমকালীন সমস্যার রূপায়ণে তরল কৌতুক (অল্পক্ষেত্রেই যথার্থ শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণ চোখে পড়ে) অথবা ভক্তিরসের প্রাবল্যকে আশ্রয় করতে চাইলেন নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে। যদিও এ ধরণের নাটকের পূর্বসূরী হিসেবে বেঙ্গল থিয়েটারের লক্ষ্মীনারায়ণ দাস বিরচিত 'মোহান্তের এই কি কাজ'-এর জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গ আমাদের জানা, আর একথাও আমাদের অজ্ঞাত নয় যে আগেও রামনারায়ণ তর্করত্নের মতো নাট্যকারেরও 'কুলীন কুলসর্বস্ব' বা 'নবনাটক'-এর তুলনায় 'চক্ষুদান' এবং 'উভয়সঙ্কট'ই অভিনীত হয়েছে অধিকবার। তবু শাসকদলের চোখ-রাঙানিতে রঙ্গজগতের প্রযোজনায় এ জাতীয় নাটকের বহুল অনুপ্রবেশের একটা বাড়তি সুযোগ এসে গেল।

বাস্তবিকই, এ সময়টায় কলকাতার রঙ্গজগৎ এক অস্থির অনিশ্চিত আবহাওয়ায় দিন কাটাচ্ছিল। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ঠিকই লিখেছেন — 'It not only produced at the time a good deal of panic among all who were closely connected with the stage but it threatened to prove to be the very grane of the Bengali theatre.'[১০] ফলে বিগত তিন বছর ধরে নাট্যচর্চার যে ধারাবাহিকতা গড়ে উঠেছিল তাতে বাধা এল। বেঙ্গল থিয়েটারে অবশ্য স্বত্বাধিকারী বা অধ্যক্ষের পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু গ্রেট ন্যাশনালের অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীণ। 'এই সময়ে ক্রমাগত লেসীও বদলাইয়াছে, অধ্যক্ষও বদলাইয়াছে। গিরিশবাবুও এ সময়ে ঠিক থিয়েটারকে পেশা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাহিরে বাহিরেই ছিলেন, প্রয়োজন হইলে দলের লোকেরা সময় সময় তাঁহাকে ধরিয়া আনিত, তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করিত। তবে এই সময়ের শেষাশেষি তিনি গ্রেট ন্যাশনাল ভাড়া লইয়া নিজে কিছুদিনের জন্য স্বত্বাধিকারীও

হইয়াছিলেন।[৮] কিন্তু এ সময়ে গিরিশবাবুর অসাধারণ অভিনয়খ্যাতি ভিন্ন অন্য প্রতিভা বিকশিত হয় নাই। কাজেই এ সময়ে আমরা গিরিশবাবুকে ঠিক রঙ্গালয়ের কর্ণধাররূপে দেখিতে পাই না। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অবস্থাও অনুরূপ। তিনিও স্থায়ীভাবে এ সময়ে থিয়েটারে ছিলেন না[৯] ,... নাটকের অভাব, সুপরিচালনার অভাব, অর্থের অভাব, শৃঙ্খলা ও নিয়মের অভাব — থিয়েটারকে যেন একটা বিভীষিকার স্থল করিয়া তুলিয়াছিল।'[১০]

এরকম পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক হলেন প্রতাপ জহুরি। আয়ব্যয়ের সমতা রেখে নাট্যদল চালালে থিয়েটার থেকে যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করা যায় সেকথা এই ব্যবসায়ী ঠিকই বুঝেছিলেন — তাই নাট্যশালাকে পুরোপুরি পেশাদার করে তুলতে তিনি চাইলেন, শিল্পীরাও সম্পূর্ণ মঞ্চজীবী হন। এই সময়েই গিরিশচন্দ্র তাঁর চাকরি ছেড়ে মাসিক একশ টাকা বেতনে সেই ব্যবসায়িক নাট্যসম্প্রদায়ে যোগ দিলেন। এর পরের তিন দশক গিরিশচন্দ্র শুধু অভিনেতা নন, নিয়মিতভাবেই নাট্য-পরিচালক, অধ্যক্ষ এবং নাট্যকারও; আর এই সে সময় যখন কলকাতার পেশাদারি নাট্যচর্চায় নানা নাট্যদলের নির্মাণ ও বিলুপ্তি। এদের মধ্যে স্থায়িত্বের সুখ পেয়েছে স্টার ও মিনার্ভা এবং অনেকটাই আগে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল থিয়েটার। নয়তো সেই ন্যাশনাল থিয়েটারের আমল থেকেই অল্পদিনে দল ভেঙে যাওয়া আর নতুন দল তৈরির যে কাহিনীর শুরু তার পুনরাবৃত্তি এ পর্বের প্রায় নাট্যগৃহেই ঘটেছে — কখনও ৬নং, কখনও ৯নং, আর বহুবারই ৬৮নং বিডন স্ট্রিটে। তাছাড়া ৩৮নং মেছুয়াবাজার রোডের থিয়েটার বা হ্যারিসন রোডের থিয়েটারও কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। শুধু কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারেই অন্য কোনও নাট্যদল দেখা যায়নি কখনই। অবশ্য ৬নং বিডন স্ট্রিটের মঞ্চেও গ্রেট ন্যাশনাল তথা ন্যাশনালের পর (অক্টোবর, ১৮৮৬)[১১] মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনয়ের যে আরম্ভ (২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩) সেখানেও আর কোনও নাট্যসম্প্রদায় নিয়মিত অভিনয় করেনি। তবে ৯নং বিডন স্ট্রিটে বেঙ্গাল থিয়েটার একাদিক্রমে আটাশ বছর (১৮৭৩-১৯০১) চললেও[১২] তারপর সেখানে অরোরা (১৯০১-১৯০২) , ইউনিক (১৯০৩-১৯০৪), ন্যাশনাল (১৯০৫-১৯১১), গ্রেট ন্যাশানাল (১৯১১) গ্র্যান্ড ন্যাশনালকে (১৯১১-১৯১৪) পাওয়া গেছে, যারা কলকাতার নাট্যচর্চায় কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি। ৩৮নং মেছুয়াবাজার রোডে বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায় (১০ ডিসেম্বর, ১৮৮৭) অবশ্য একটা চমক ছিল,[১৩] যদিও এই রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় নাট্যজগতে যশস্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় স্বাধীনভাবে থিয়েটার পরিচালনা করতে গিয়ে সর্বস্ব পণ করেও না পেলেন প্রথম শ্রেণীর নাট্য-পরিচালকের স্বীকৃতি, না জুটল শীর্ষস্থানীয় নটের প্রতিপত্তি। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাঁর বীণা থিয়েটার হস্তান্তরিত হয়ে যায় — নতুন দল তৈরি হয় ইন্ডিয়ান থিয়েটার, আর তার কিছুদিন পর সেখানে দেখা যায় নীলমাধব চক্রবর্তীর সিটি থিয়েটারকে। এটিও স্থায়ী হয়নি। এর পরবর্তী দল গেইটি থিয়েটার — যার আয়ু মাত্র কয়েকমাস।[১৪] তুলনায় বাংলা রঙ্গালয়েব সেই গিরিশযুগে ৬৮নং বিডন স্ট্রিটে এমন সব নাট্যসম্প্রদায় এসেছে যারা বারেবারেই দলে পেয়েছে সেদিনের নামী-দামি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের, খ্যাতিমান নাট্যপরিচালকদের, যশস্বী নাট্যকারদের এবং অভিজ্ঞ মঞ্চকুশলীদের। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এখানকার প্রতিটি নাট্যদলেই ছিল গিরিশচন্দ্রের সক্রিয় উপস্থিতি। তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেও কোনও দলই মাত্র এক দশকও এখানে নাট্যাভিনয় চালিয়ে যেতে পারেনি। ব্যতিক্রম শুধু স্টার, যদিও এই নাট্যগৃহে তার স্থিতি শুধু চার বছরের জন্য। তবে এখানকার সেই দলই কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে নতুন বাড়িতে একই স্টার নাম নিয়ে অভিনয় করে চলেছিল দীর্ঘকাল।

ন্যাশনাল থিয়েটাবেব পর প্রথম পর্যায়ের সেই স্টার থিয়েটারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন গিরিশচন্দ্র। তাঁর বহু নাটক অভিনীত হয়েছে এখানে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিই প্রধান চরিত্রাভিনেতা, আর নায়িকা বিনোদিনী। নাট্যপরিচালনার ভারও ছিল গিবিশচন্দ্রের। প্রকৃতই বাংলা নাট্যজগতের সে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। স্টারের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তখন বেঙ্গাল থিয়েটার। কিন্তু স্টারের ইতিহাস তো স্থায়ী রঙ্গশালার কাহিনী, আমরা আলোচনা করব এমন কয়েকটি স্বল্পস্থায়ী নাট্যসম্প্রদায়ের কথা যারা অসীম সম্ভাবনা নিয়ে নাট্যাভিনয় শুরু করেছিল, প্রত্যাশাও জাগিয়েছিল স্টার, বেঙ্গাল বা পরবর্তী পর্যায়ের মিনার্ভার মতো রঙ্গালয়ের যোগ্য প্রতিস্পর্ধী হওয়ার। অথচ কিছুদিনের মধ্যেই তাদের দীপ্ত ভবিষ্যতের ছবিগুলো ক্রমশ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এমারেল্ড ও কোহিনুর থিয়েটাবেব ক্ষেত্রে

যে দ্রুততায় রূপান্তরটা সংঘটিত হয়, ক্লাসিক থিয়েটার বরং তার ঔজ্জ্বল্য বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল বেশ কিছুটা সময়।

এমারেল্ড থিয়েটার

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এমারেল্ড থিয়েটারের সূচনা এক নাটকীয় ঘটনা। কলুটোলার নামকরা ধনী মতিলাল শীলের পৌত্র গোপাললাল শীলের নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী হওয়ার শখ হল। গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে স্টার থিয়েটারের জনপ্রিয়তা দেখেই নাকি এই অমিত বিত্তশালী যুবকের এ হেন আকাঙ্ক্ষা। প্রথমেই ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের জমি কিনে নিয়ে মালিক হিসেবে তিনি স্টার কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠান অন্যত্র থিয়েটার খোলার জন্য। অবশ্য 'রিজ অ্যান্ড রায়ত' পত্রিকায় প্রকাশিত[১৫] জমি কেনার কাহিনীটা একটু আলাদা। পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী জানা যায়, গোপাল শীল খবর পান স্টার থিয়েটারের পূবদিকের জমি খালি পড়ে আছে। তিনি মোটা টাকা দিয়ে নতুন থিয়েটার খোলার আশায় ওই জমি বায়না করেন। তখন স্টারের কর্তৃপক্ষের তরফে গিরিশচন্দ্র গোপাললাল শীলকে জানান যে পাশাপাশি দুটি পেশাদার নাট্যসম্প্রদায় থাকলে উভয়েরই ক্ষতি। কিন্তু গোপাললাল শীলের জেদ ওইখানেই থিয়েটার করবেন। তখন তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হল যে ৫০ হাজার টাকা পেলে স্টারই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় নাট্যাভিনয় শুরু করবে। টাকার চিন্তা গোপাললাল শীলের ছিল না। তিনি স্টারের শর্ত মানতে রাজি ছিলেন। কিন্তু তাঁর উকিল বোঝালেন যে স্টারের দাম কোনওমতেই ত্রিশ হাজার টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। ফলে মীমাংসা হল না। কিন্তু চারমাস ধরে টানাপোড়েনের পর ধনীর সঙ্গে বিবাদ বাঞ্ছনীয় নয় এই বিবেচনায় সেদিনের স্টারের প্রকৃত কর্ণধার গিরিশচন্দ্র স্টারের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু ও দাশুচরণ নিয়োগীর সঙ্গে পরামর্শের পর স্থির করলেন থিয়েটারের বাড়ি ওই ত্রিশ হাজার টাকাতেই গোপাললাল শীলকে বিক্রি করা হবে, আর প্রাপ্ত অর্থ নতুন জমি কেনার কাজে লাগবে। শুধু স্টারের 'গুডউইল' হাতছাড়া করা হবে না।

৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের নাট্যগৃহের মালিক হলেন গোপাললাল শীল।[১৬] 'নব বিভাকর সাধারণী' এ ঘটনায় মন্তব্য করে : 'গোপালবাবুর এটা বেশ বোঝা উচিত, স্টার থিয়েটারের এই গৃহ অর্থ সামর্থে যেমন সহজে দখল লইলেন, অর্থ সামর্থে যশের রাজ্যে তেমন সহজে দখল লইতে পারিবেন না। আমাদের শেষ কথা .... যেন নাটকাভিনয় পরিপোষণে ভাগ্যবান গোপালবাবুর বিশেষ দৃষ্টি থাকে।'[১৭] গোপাললাল শীলের নাট্যবোধ কতখানি উন্নত ছিল তা বলা মুশকিল, তবে তাঁর থিয়েটারকে যে স্টারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে হবে সেকথাটা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন। তাছাড়া তিনি ধনী, ফলে অভিলাষ পূরণে অর্থব্যয়ে কোনও কার্পণ্য করলেন না। অর্দ্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল বসু, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, বনবিহারিণী — প্রকৃতপক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটারের বেশিব ভাগ অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে তৈরি হল নতুন দল।[১৮] দলের পরিচালক তথা অধ্যক্ষ হিসাবে দেখা গেল কেদারনাথ চৌধুরীকে। স্টারের মঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ সব নতুন করে সাজানো হল। আলাদা ডায়নামো বসিয়ে আলোর ব্যবস্থা হল থিয়েটারে। বিজ্ঞাপন বেরল : 'Electric light and Electric fountain playing on the stage. .... Magnificent scenaries prepared by renowned painters, to be presented with the help of the latest scientific instrument by that renowned scientist Baboo Jaharlal Dhar."[১৯]

শনিবার ৮ অক্টোবর, ১৮৮৭ সাল ছিল এমারেল্ড থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন। নির্বাচিত নাটক কেদারনাথ চৌধুরীর 'পাণ্ডব নির্বাসন'।[২০] অভিনয় ভালো হলেও, নাটকটির অনাবশ্যক দৈর্ঘ দর্শকদের ক্লান্ত করেছে বলে সমালোচক জানিয়েছেন। তাঁর মতে : 'Much that has been needlessly introduced might with advantage be left out.'[২১] 'পাণ্ডব নির্বাসন' ছাড়া রবিবার, ২৩ অক্টোবর এমারেল্ডে অভিনীত হল ন্যাশনালের পুরনো নাটক 'রাজা বসন্ত রায়'। এই দুটি নাটকের প্রযোজনা কিছুটা দর্শক-দাক্ষিণ্য পেলেও নভেম্বর মাসের নতুন নাট্যাভিনয় 'আনন্দকানন' এবং 'বিধবা সঙ্কট' একেবারেই জমল না। আর এই নতুন থিয়েটারের নাটক নির্বাচন এবং তার উপস্থাপনা যে সঠিক মান অনুযায়ী হচ্ছে না সেকথাও সমালোচকেরা লিখেছিলেন। তাঁদের আশা ছিল : 'with judicious selection of pieces to be put on the board and a more careful training of his company, he (কেদারনাথ চৌধুরী) may shortly

achieve results quite commensurate with the princely resources at his disposal.'[২২]

ক্রমেই গোপাললাল শীল আর কেদারনাথ চৌধুরীর ওপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। তার ওপর বহু শুভানুধ্যায়ী তাঁকে বোঝালেন যে গিরিশচন্দ্রবিহীন থিয়েটার শিবহীন যজ্ঞেরই নামান্তর। এবার গোপাললাল শীল গিরিশচন্দ্রকে প্রস্তাব দিলেন যে কুড়ি হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক গড়ে সাড়ে তিনশ টাকা পারিশ্রমিকে এমারেল্ডে চলে আসতে। তবে শুধু অনুরোধ নয়, সঙ্গে সতর্কবাণীও শোনান যে গিরিশচন্দ্র রাজি না হলে তিনি স্টারের প্রায় সব কলাকুশলীকে এমারেল্ডে নিয়ে আসবেন, তাতে যত অর্থব্যয়ই হোক। সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার পর দলীয় স্বার্থের খাতিরে[২৩] গিরিশচন্দ্র পাঁচ বছরের চুক্তিতে এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দিলেন। কেদারনাথ চৌধুরী অন্যের অধীনে কাজ করতে চাইলেন না। তাঁর সঙ্গে দল ছেড়ে চলে এলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর ও রাধামাধব কর। এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজার হিসাবে প্রথম গিরিশচন্দ্রের নাম দেখা গেল ১৬ নভেম্বর, বুধবারের বিজ্ঞাপনে। তাঁর পরিচালনায় অভিনীত হল আগেকার নাটকই। অবশ্য সমকালীন নাট্য-সমালোচকেরা মনে করেছিলেন এমারেল্ডের অনেকটাই উন্নতি ঘটেছে সুদক্ষ অধ্যক্ষের প্রয়োগ পরিকল্পনায়। 'Babu Girish Chunder Ghose is to be complimented on the remarkable improvement which he has been able to make in his stage within a short time'[২৪]

১৮৮৮ সালের শুরুতেও পুরনো নাটকেরই অভিনয় চলে। বেশিরভাগ প্রযোজনাতেই গিরিশচন্দ্র মুখ্যভূমিকায় আর প্রধান নারী চরিত্রে সুকুমারী। গত নভেম্বর মাসে এমারেল্ডে এলেও গিরিশচন্দ্র এতদিন কোনও নতুন নাটক দেননি — এবার লিখলেন 'পূর্ণচন্দ্র'। শনিবার, ১৭ মার্চ ছিল প্রথমাভিনয়ের রজনী। নামভূমিকায় সেই সুকুমারী। অভিনয়ের সপ্রশংস সমালোচনা বেরোয়।[২৫] 'ইন্ডিয়ান মিরর লেখে' : 'The new play keeps up the reputation of erudite dramatist and present a delightful didactic treat to the serious minded portion of the theatre going community'[২৬] পূর্ণচন্দ্রের অভিনয় এমারেল্ড থিয়েটারে প্রভূত অর্থ নিয়ে আসে। আটশ থেকে হাজার টাকার মতো দৈনিক বিক্রি হত।[২৭] 'রিজ অ্যান্ড রায়ত' পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে 'পূর্ণচন্দ্র' মঞ্চস্থ হওয়ায় গোপাললাল শীলের বিশ হাজার টাকা লাভ হয়।

শুধু গিরিশচন্দ্রের নাটকই নয়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রহসন 'বিজ্ঞানবাবু'ও সে সময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। সমালোচকেরাও প্রশংসা করে লিখেছিলেন, '.... The farce was a decided success and is really an instructive one. The characters were well presented by the actors.'[২৮]

পরবর্তী নতুন প্রযোজনা ছিল গীতিনাট্য 'তুলসীলীলা' (প্রথমাভিনয় রজনী ৯ জুন, শনিবার, ১৮৮৮) — নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র। তুলসীর গানের কল্যাণে দর্শক সমাগম ভালোই হত। পরের নাটকও অতুলকৃষ্ণের লেখা। অজস্র গানের সমাহারে রচিত 'নন্দবিদায়' (২১ জুলাই, ১৮৮৮ প্রথম অভিনীত)। অক্টোবর মাসে আবার গিরিশচন্দ্রের লেখা নতুন নাটক[২৯] 'বিষাদ' (৬ অক্টোবর, ১৮৮৮) মঞ্চস্থ হল। গিরিশচন্দ্র অভিনয় করেননি, তবু এ নাটক মহেন্দ্রলাল বসু ও কুসুমের অভিনয় গুণে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। নামভূমিকায় কুসুমের অভিনয়ের এতটাই সুখ্যাতি হয় যে এরপর থেকে তিনি বিষাদকুসুম নামেই পরিচিত হতেন।[৩০] আর মহেন্দ্রলালের অভিনয় সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখেছেন : 'বিষাদ নাটকে অলর্কের ভূমিকা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহেন্দ্রলালের অভিনয়ের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারাও স্বীকার করেন যে তৎপূর্বে তাঁহার এরূপ অদ্ভুত শক্তি তাঁহাদের অনুভূত হয় নাই। এ অভিনয়ে মহেন্দ্রলাল আপনার সমস্ত অভিনয় পরাজয় করিয়াছিলেন।'

এরপর বেশ কয়েক মাস নতুন নাটক নামালেন না গিরিশচন্দ্র। তখন 'বিষাদ' ও 'নন্দবিদায়'-এর ওপর নির্ভর করেই আর্থিক সাচ্ছন্দ্য পেয়েছিল এমারেল্ড। আর এর সঙ্গেই চলছিল কিছু মঞ্চ-সফল পুরনো নাটকের প্রযোজনা। একমাত্র ২৬ জানুয়ারি শনিবার, ১৮৮৯ অতুলকৃষ্ণ মিত্রের স্যাটায়ার 'গাধা ও তুমি' প্রথম অভিনীত হল। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'দাদা ও আমি'-কে (৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৮ নিউ ন্যাশনাল দল বীণা মঞ্চে এর প্রথম অভিনয় করে) ব্যঙ্গ করে লেখা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর রচনা। পরবর্তী প্রযোজনা 'আনন্দকুমার'-ও (মহারাজা নন্দকুমারের কাহিনীর আদলে লেখা)

কোনও ভালো নাটক ছিল না। 'অনুসন্ধান' পত্রিকা মন্তব্য করে : 'আনন্দকুমারের দ্বারা প্রজার হিতকর কোনও কার্য যদি প্রত্যক্ষে দেখানো হইত, তবে তাঁহার প্রতি লোকের আরও অনুরাগ আকৃষ্ট হইতে পারিত। কেবল 'দেশের জন্য মরিলাম' একথা মুখে বলিলে তত প্রীতিপ্রদ হয় না।'[৩১]

এদিকে মঞ্চ জগতে প্রতিপত্তি লাভের আশায় বহু অর্থব্যয়ে থিয়েটার খুললেও দেড় বছর যেতে না যেতেই নাট্যজগতের প্রতি গোপাললাল শীলের আসক্তি কমে আসছিল। তিনি স্বত্বাধিকারীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে হরিভূষণ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল সুর ও ব্রজলাল মিত্রকে এমারেল্ড থিয়েটার লিজ দিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দল ছাড়লেন গিরিশচন্দ্র। কেননা তিনি শুধু গোপাললাল শীলের এমারেল্ডের সঙ্গেই চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। কাজেই মালিকানার পালাবদলে তাঁর চুক্তি বাতিল হয়ে গেল। আসলে এমারেল্ডে থাকলেও চিরকালই গিরিশচন্দ্রের আন্তরিক টান স্টারের প্রতি। তাই সুযোগ পেয়েই তিনি স্টারে চলে এলেন।

এবার ম্যানেজার হলেন মতিলাল সুর, আর স্টেজ ম্যানেজার ধর্মদাস সুর। অর্দ্ধেন্দুশেখরও যোগ দিলেন। কিন্তু মাস দু'য়েকের মধ্যেই দেখা গেল গিরিশচন্দ্র-বিহনে এমারেল্ডের সাফল্য নিতান্তই স্তিমিত। গোপাললাল শীল আবার থিয়েটারের ভার নিলেন। ম্যানেজার করে আনলেন সেই কেদারনাথ চৌধুরীকে, অধ্যক্ষ হলেন মনোমোহন বসু। অনেকদিন বাদে অভিনীত হল 'মৃণালিনী', 'কৃষ্ণকুমারী'। এঁদের পরিচালনায় প্রথম নতুন নাটক ছিল মনোমোহন বসুর 'রাসলীলা' (প্রথমাভিনয় রজনী ৮ জুন, শনিবার ১৮৮৯)। পৌরাণিক এই গীতিনাট্য রচনায় মনোমোহন বসু কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও অভিনয়ের বেশ বিরূপ সমালোচনাই হয়। 'অনুসন্ধান লেখে' : 'যত দৃশ্য পড়িয়াছে — যত অঙ্ক আসিয়াছে, এবং শেষ পর্যন্ত অভিনয় দর্শন অসহ্য হওয়ায় শেষ না দেখিয়াই, উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।'[৩২] এমনকি কালিন্দীর ভূমিকায় সুকুমারীও সমালোচকের হাত থেকে রেহাই পাননি : 'Kalindi of whom much expectation had been formed did not come wide up the mark'[৩৩] রাসলীলার গানও শ্রোতাদের অসহ্য মনে হয়েছিল : 'গানগুলি যখন গীত হইতে আরম্ভ হইল, তখন বোধ হইল, 'ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা' এই যে সুন্দর প্রাচীন উপমাটি এটি এস্থলে ঠিক খাটিয়াছে।'[৩৪]

পরের নাটক 'সরোজা'ও[৩৫] (ইংরেজি উপন্যাস East Lynne অবলম্বনে লেখা) অবস্থা ফেরাতে পারল না। 'অনুসন্ধান' স্পষ্টই জানিয়ে দেয়, 'নাটকটি কাঁচা হাতের লেখা'।[৩৬] আর স্টেটসম্যান মন্তব্য করে, দেশীয় রুচির কথা মনে রেখে নাট্যকারের অনেক অংশই পরিমার্জন এবং পরিবর্জন করা উচিত ছিল।[৩৭] অবশ্য নাম ভূমিকায় সুকুমারী ভালোই অভিনয় করেন। গীতিনাট্য বা প্রেম-নির্ভর কাহিনী, কোনওটাই দর্শক বা সমালোচককে খুশি করতে পারছে না দেখে এমারেল্ড এবার মঞ্চস্থ করল অতুলকৃষ্ণের প্রহসন 'বক্কেশ্বর'। নাম ভূমিকায় ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর। সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়ে সমাজে যারা নানা কুকীর্তি করে বেড়ায় তাদের বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে রচিত হলেও প্রহসনটির নিম্নরুচির ব্যঙ্গ সেকালের সমালোচকদের খুবই বিরক্তিজনক মনে হয়। স্টেটসম্যান অনুরোধ জানিয়েছিল, '.... There are, however, some objectionable terms which the author would do well to remove.'[৩৮]

কিন্তু 'অনুসন্ধান' তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করে : 'সুবিখ্যাত মনোমোহন বসু থাকিতে, এরূপ প্রহসন অভিনয় করিতে দিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য। এরূপ ব্যক্তিগত অথচ জঘন্য প্রহসন ভদ্রলোকের দেখিবার জিনিস নহে। আমরা যদিও সুরুচির ধ্বজাধারী নহি, তথাপি আশ্চর্য হই যে, কানে আঙ্গুল দিতে হয় .... এরূপ অশ্রাব্য ভাষা যে প্রহসনে, কর্তৃপক্ষগণ কি করিয়া তাহা এত দর্শককে শুনাইতেছেন।'[৩৯]

এই পর্বে এমারেল্ড থিয়েটারের অবস্থাটা একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় সেখানে শুধু নাটক নির্বাচনে অসংগতি বা অভিনয়ের অবনতি নয়, সম্প্রদায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাতেও বিশৃঙ্খলা ঘটছে। এমারেল্ড থিয়েটারের এই অধোগতি দেখে 'অনুসন্ধান' লেখে : 'এরূপ কেলেঙ্কারী অপেক্ষা গোপালবাবু যদি থিয়েটার উঠাইয়া দেন, তাহাই মঙ্গল।'[৪০] সে চেষ্টা অবশ্য গোপাললাল শীল করেননি। ওই একইভাবে এমারেল্ড টিকে রইল। পুরনো নাটকের প্রযোজনার মধ্যেই ২২ সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১৮৮৯ অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'শারদীয় পঞ্চরং' অভিনীত হল।[৪১] অনেকদিন পর প্রশংসা দেখা গেল

সংবাদপত্রে। স্টেটসম্যান লেখে : 'The conception of the whole plot is new and ingenous, and the excution humourous .... the whole representation was a cutting satire on the current follies in the acting and getting up the modern stage.'[৪২] কিন্তু পরবর্তী প্রযোজনার জন্যে আবার বিরূপ মন্তব্য শুনতে হল এমারেল্ডকে। ১৯ অক্টোবর, শনিবার প্রথম অভিনীত হল মনোমোহন বসুর 'কিরণশশী'। দুর্বল নাটক নির্বাচনের জন্য কঠোর ভাষায় সমালোচনা করল 'অনুসন্ধান' : 'অনেক রাত্রি জাগিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক টাকার শ্রাদ্ধের পর এমারেল্ড থিয়েটার এই এক নূতন সামাজিক নাটক দেখাইলেন। আর দেখিয়াও আমরা বুঝিলাম পর্বতের প্রসব বেদনা বলিয়া যে এক প্রাচীন কাহিনী আছে এমারেল্ডের 'কিরণশশী'ও ঠিক তাই-ই।'[৪৩]

দলের এরকমই হতশ্রী অবস্থায় নভেম্বরের গোড়াতেই কেদারনাথ চৌধুরীর পরিবর্তে নতুন তত্ত্বাবধায়ক হলেন মতিলাল সুর। অধ্যক্ষ রইলেন সেই মনোমোহন বসুই। নতুন ব্যবস্থাপনায় পুরনো নাটকের প্রযোজনাও দলে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়ে আনল। একমাসের মধ্যেই নতুন গীতিনাট্য 'গোপীগোষ্ঠ' এবং প্রহসন 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' মঞ্চস্থ হল। প্রথমটি যেহেতু গীতিনাট্য তাই যত্রতত্র গান আর প্রহসনটিতে ছিল অহেতুক অতিরঞ্জন।

এভাবেই শুরু হল ১৮৯০ সাল। বছরের গোড়াতেই জানুয়ারি মাসে প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের আগমন উপলক্ষ্যে কলকাতায় রীতিমতো সাড়া পড়ে যায়। রঙ্গজগতও তাতে মেতে ওঠে।[৪৪] এমারেল্ডও বাদ যায় না। ১০ জানুয়ারি — এমারেল্ডের সামনে দিয়ে যুবরাজ যাবেন, তাই প্রচুর অর্থব্যয়ে থিয়েটার গেটের সামনে ফোয়ারা বসে, চারদিক ফুলে ফুলে সাজানো হয়। নহবতে দেশী সুর বাজে। আর খরচা থিয়েটার কর্তৃপক্ষ করবেন নাই বা কেন? কারণ ততদিনে মতিলাল সুরের তত্ত্বাবধানে এমারেল্ড থিয়েটারে বেশ স্থিতি এসেছে — পুরনো ও নতুন প্রযোজনা মিলিয়ে আর্থিক সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। সমালোচকরাও জানান : ' .... This theatre seems to have been doing very well under the present management '[৪৫] ৭ জুন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' প্রথম এমারেল্ড থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল। মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, গুলফম হরি, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কুসুম (বিষাদ) যথাক্রমে বিক্রমদেব, কুমারসেন, সুমিত্রা, দেবদত্ত ও ইলার ভূমিকায় অভিনয় করেন। অভিনয়ে সব চাইতে প্রশংসিত হন মহেন্দ্রলাল বসু। প্রকৃতই ট্র্যাজিক চরিত্রে, বিশেষত বিষাদময় প্রেমের অভিব্যক্তিতে, তাঁর মর্মস্পর্শী অভিনয় সে যুগে তুলনারহিত। সে অভিনয়ের স্মৃতি দর্শকদের মনে কেমন অম্লান হয়ে ছিল তার স্বীকৃতি পাই পরবর্তীকালের এক প্রখ্যাত নটের বর্ণনায় : ' .... মহেন্দ্রবাবুর গলা একটু গম্ভীর, সুর-বর্জিত, মানিয়ে যেত কুমারসেনে, অদ্ভুতভাবে। তাঁর 'ইলা — ইলা — ফিরে গেনু[৪৬] দুয়ারে আসিয়া' যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বলতেন আজও যেন তা কানে বাজে।'[৪৭] 'রাজা ও রাণী'-র অভিনয় নাট্যরসিক মহলে আলোচিত হলেও, সাধারণ দর্শক সে অভিনয় দেখতে থিয়েটারে ভিড় করবেন কি না তা নিয়ে সংশয় ছিল। আসলে চটুল প্রহসন এবং ভক্তিরসের প্রাবল্যে অভ্যস্ত যে পৃষ্ঠপোষকেরা তাদের এ ধরনের নাটক তারিফ করার মতো মানসিকতা ছিল কি? 'ইন্ডিয়ান মিরর' তাই লিখেছিল : 'Raja O Rani is a piece some what beyond the range of ordinary dramatic themes, and it is feared that its worth may not receive ready recognition at the hands of the average patrons of the professional stage.'[৪৭]

তবে ভালো নাটক প্রযোজনার ধারাবাহিকতা এমারেল্ডও বজায় রাখতে পারেনি। তাই পরবর্তী নতুন নাটক 'ষণ্ড'-এর (প্রথমাভিনয় রজনী ৩০ অগাস্ট, শনিবার/নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র) ভাগ্যে প্রতিকূল সমালোচনাই জোটে। 'অনুসন্ধান' লেখে : ' .... এমারেল্ডের ষণ্ড যাচ্ছেতাই। ওরূপ কদর্য অভিনয় এখনই বন্ধ করা উচিত। ইহাতেই থিয়েটারের অধঃপতন হয়।'[৪৮] তুলনায় অতুলকৃষ্ণের 'আগমনী' (৫ অক্টোবর, ১৮৯০ প্রথম অভিনীত) কিছুটা প্রশংসিত হয়। বছরের শেষ নতুন প্রযোজনা 'অনুপমা' (১৩ ডিসেম্বর, শনিবার)। নামভূমিকায় ভূষণকুমারী এবং গোবর্ধনের চরিত্রে মতিলাল সুরের যথেষ্ট সুখ্যাতি হয়। ১৮৯১ সালের প্রথম নতুন নাট্যাভিনয় 'ঘটক বিদায়' (প্রথমাভিনয় রজনী ৩১ জানুয়ারি, শনিবার) হারাধন চরিত্রে অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রাণবন্ত অভিনয় নাটকটি জমিয়ে দেয়। পাশাপাশি আগেকার নাটকেরও অভিনয় চলছিল। এই সময়ে কলকাতার অন্যান্য রঙ্গালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই নাট্য প্রযোজনা হচ্ছিল

এমারেল্ডে। নাট্যসম্প্রদায়ের কাজে তৃপ্ত সমালোচক লেখেন : ' .... The present company is an exceptionally good one, and the management spares no pains to make each representation a success.'[৪৯]

পরবর্তী তিনটি নতুন প্রযোজনা ছিল সেপ্টেম্বর মাসে। 'লালা গোলকচাঁদ' (৩ সেপ্টেম্বর) আর অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নন্দোৎসব' (৬ সেপ্টেম্বর) এবং 'নিত্যলীলা বা উদ্ধব সংবাদ' (২৫ সেপ্টেম্বর)। কোনওটাই নাটক হিসেবে উজ্জ্বল নয়, তবে গানের সুবাদে দর্শকদের দাক্ষিণ্য থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়নি। পরের বছরের প্রথম নাট্যাভিনয় 'বিধবা কলেজ'-এর নাট্যকারও ছিলেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র। আসলে তিনিই এখন এমারেল্ড থিয়েটারের প্রধান নাট্যকার এবং ম্যানেজার। এরপর তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-র নাট্যরূপ দিলেন। ৪ জুন শনিবার, ১৮৯২ ছিল সে নাটকের প্রথম প্রযোজনা। অপূর্ব অভিনয় করেন মহেন্দ্রলাল (নগেন্দ্র) ও সুকুমারী (সূর্যমুখী)। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (দেবেন্দ্র), ভবতারিণী (হীরা) ও ব্লাকীর (কুন্দ) স্বাভাবিক অভিনয়ও সকলের ভালো লাগে।

'বিষবৃক্ষ'-র সাফল্যে অনুপ্রাণিত অতুলকৃষ্ণ এবার 'কপালকুণ্ডলার' নাট্যরূপ দিলেন। প্রথম অভিনয় ছিল ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২। এখানেও প্রধান ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল (নবকুমার) আর সুকুমারীকে (মতিবিবি) দেখা গেল। প্রযোজনায় প্রীত হয়ে নাট্যসমালোচক লিখেছিলেন : 'The representation of Kapalkundala will meet with the approval of the legitimate drama, and add a fresh feather to the company's cap.'[৫০] বঙ্কিম উপন্যাসের প্রযোজনা এর আগেও রঙ্গামঞ্চকে আর্থিক স্বস্তি এনে দিয়েছে — এমারেল্ডেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তুলনায় এ মাসেই অভিনীত (২৫ সেপ্টেম্বর) অতুলকৃষ্ণের পঞ্চরং 'কলির হাট' দর্শকদের বড়ই হালকা বলে মনে হয়েছিল। ডিসেম্বর মাসে দেখা গেল বঙ্কিম উপন্যাসের তৃতীয় প্রযোজনা এবার, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' — নাট্যরূপ দিলেন অতুলকৃষ্ণই। গোবিন্দলাল, রোহিণী আর ভ্রমরের ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল, সুকুমারী এবং ব্লাকী সুন্দর অভিনয় করলেও প্রযোজনা একদমই জনপ্রিয় হল না;[৫১] কলকাতা নাট্যজগতে বঙ্কিম উপন্যাসের সচরাচর এতটা আর্থিক বিপর্যয় ঘটেনি।

১৮৯৩ সাল এমারেল্ডের পক্ষে নিতান্তই হতাশার সময়। নাট্যাভিনয় বন্ধ না হলেও, নতুন নাটকও বিশেষ মঞ্চস্থ হয়নি। প্রথম নতুন প্রযোজনা ছিল অতুলকৃষ্ণের 'আমোদপ্রমোদ' (প্রথমাভিনয় রজনী, ২৫ মার্চ)। নাটক এবং তার উপস্থাপনা দুই-ই ছিল দুর্বল। তেমনই আর একটি দুর্বল প্রয়াস 'রাজাবাবু' (১৯ অগাস্ট প্রথম অভিনীত হয়)। বরং রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস মাধবীকঙ্কণের নাট্যরূপ সমালোচকদের ভালো লাগে। (প্রথমাভিনয় রজনী ছিল ৭ অক্টোবর) — 'প্রকৃত নাটক দু'একখানি এখনও এমারেল্ডে অভিনীত হয়। এই এক মাধবীকঙ্কণের কথা তুলিলেও, তাই বলা যায়।'[৫২]

এমারেল্ডের আর্থিক অবস্থার অবশ্য ক্রমশই অবনতি ঘটছিল। সে সময়ে নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হলেও আশানুরূপ দর্শক সমাবেশ হত না বলেই মনে হয়। নইলে টিকেটের মূল্যহ্রাসের প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ করতেন না — 'A rare chance for one and all / Single fee for both the rights with presents of genuine gold and silver ornaments'[৫৩]

বছরের শেষ দুটি প্রযোজনা 'মোদক মঙ্গল' বা 'আজব কারখানা' দলের হাল ফেরাতে পারল না। যদিও তখনও দলে যথেষ্ট প্রথিতযশা অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছেন, তবু উত্তম নাটকের অভাবে আর্থিক দৈন্য ক্রমেই এ থিয়েটারকে অচল করে তুলেছিল ভেতরে ভেতরে। তার ওপর কলকাতায় তখন গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে মিনার্ভা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে — একের পর এক নতুন নাটক অভিনয় করছে তারা। সেই সঙ্গে রয়েছে স্টার। প্রকৃতই এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এমারেল্ডের লেসীদের আর ছিল না। দর্শক আকর্ষণের আশায় এমারেল্ড কর্তৃপক্ষ নানা উপহার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন — 'একই টিকিটে দুদিন অভিনয় দেখার সুবর্ণ সুযোগ', অথবা 'লাকি টিকিটের অধিকারীর নগদ ২৫ টাকা বা ২০ টাকা সহ মানিব্যাগ প্রাপ্তি' প্রভৃতি আকর্ষণীয় প্রস্তাব জানিয়ে।[৫৪] কিন্তু উপহার দিয়ে বা টিকিটের দাম কমিয়ে আগে ন্যাশনাল যেমন চালাতে পারেনি, এমারেল্ডও তেমনই ব্যর্থ হল। মহেন্দ্রলাল বসু ও সুকুমারী বেঙ্গল থিয়েটারে চলে গেলেন — নাট্যদলের ভাঙন শুরু হল।

তবে বন্ধ হয়ে গেল না পুরোপুরি। এমারেল্ডের নতুন কর্ণধার হলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, মিনার্ভার নতুন নাটক 'জনা'তে তিনরাত্রি বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করে অর্দ্ধেন্দুশেখর দল ছেড়ে দেন। কিন্তু এ ঘটনার (নভেম্বর, ১৮৯৩) বেশ কয়েক মাস পরেই তাঁর পরিচালনায় এমারেল্ডে নাট্যাভিনয় শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন : 'Old plays in which Mr. Mustafi was at his best were now put on boards after which the theatre was suspended for some time', এবং 're-opened on 22nd Sept.'[৫৬] তবে ঠিক কবে থেকে অর্দ্ধেন্দুশেখরের মালিকানার শুরু আর কেনই বা তাঁর রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী হওয়ার অভিলাষ তার সঠিক কারণ অজ্ঞাত।

২২ সেপ্টেম্বর নতুন নাটকের অভিনয় ছিল। অভিনীত হল অতুলকৃষ্ণ মিত্রের চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী-নির্ভর নাটক 'মা'। নাটকটির প্রশংসাই করেছিলেন সেকালের নাট্যসমালোচকেরা : 'নাট্যাংশে পুস্তকখানির রচনা নৈপুণ্য বর্ণনা পরিপাট্য, বর্ণবিন্যাস, ভাবগাম্ভীর্য্য, রসপ্রাচুর্য্য, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য আদি গুণে অতুল।'[৫৭] পরবর্তী প্রযোজনাও পৌরাণিক নাটক। বৈকুণ্ঠনাথ বসু রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার কাহিনী 'মান' (প্রথমাভিনয় রজনী ৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৪)। এ সময়ে সুকুমারী আবার চলে আসেন রয়েল বেঙ্গাল থিয়েটার থেকে। তাঁর ছিল বৃন্দার ভূমিকা। আর রাধা চরিত্রে অভিনয় করেন বিষাদ কুসুম। এ ধরনের নাটকে গানের বহুল ব্যবহার দর্শকদের ভালোই লাগত। সমালোচকও প্রীত হয়ে লেখেন : 'মান আদ্যোপান্ত মধুর .... সুশিক্ষা প্রদানে মুস্তাফি মহাশয় আমাদের অশেষ ধন্যবাদ ও শ্লাঘার পাত্র।'[৫৮] তিন-চার মাসের মধ্যেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের গুণে এমারেল্ডের সুনাম অনেকটাই ফিরে এল। বস্তুত গিরিশচন্দ্র চলে যাওয়ার পর থেকেই কয়েক বছর ধরে যথেষ্ট নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেই তার দিন কাটছিল। পরিবর্তনের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য কোনও সাফল্য আনতে পারেনি। এতদিনে এমারেল্ড আবার বঙ্গ রঙ্গামঞ্চে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। নাট্যসমালোচকেরা লিখলেন : 'With the new managemant and the new company the Emerald Theatre has now taken its place among the best native houses of entertainment in Culcutta.'[৫৯]

এভাবেই শুরু হল ১৮৯৫ সাল। প্রথম চারমাসে কোনও নতুন নাটক প্রযোজিত হয়নি। পুরনো নাটকের সঙ্গে অনেক প্রহসনও মঞ্চস্থ হয়েছে। তবে সর্বাধিক অভিনীত হয়েছে 'আবু হোসেন'। আর আবুর ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় চিরদিনই তুলনারহিত। হাস্যরসাত্মক চরিত্রেই বেশি অভিনয় করতেন তিনি। আর তাঁর অভিনয় দক্ষতায় সেসব চরিত্র এতটাই প্রাণবন্ত হয়ে উঠত যে নাটক জনপ্রিয় হত সহজেই। এই সময়ে প্রযোজিত 'যেমন রোগ তেমনি রোজা' নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে 'ইন্ডিয়ান মিরর' যেকথা লিখেছিলেন তা বোধহয় এ ধরনের সব নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রেই বলা যায় : 'The comments on the representation may be summed up in four words — 'Alone he did it' And that he did it right up to the expectations of the audience can be asserted without any fear of contradiction.'[৬০] এ পর্বের আর একটি সফল প্রযোজনা 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকে অবশ্য একেবারেই ভিন্ন ধরনের চরিত্রে (প্রতাপাদিত্য) অর্দ্ধেন্দুশেখর অপূর্ব অভিনয় করতেন।

কিন্তু অসাধারণ নট ও নাট্যশিল্পী হলেও মঞ্চব্যবসায়ীর কায়দাকানুন বোধহয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের আয়ত্তে ছিল না। তাই তাঁর আমলে এমারেল্ডের নাট্যাভিনয়ের খ্যাতি হল যথেষ্ট, কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল সেই সুবাদে আশানুরূপ অর্থপ্রাপ্তি ঘটছে না। বছরের প্রথম নতুন প্রযোজনা 'দোকড়ি দত্ত' (প্রথমাভিনয় রজনী, ৬ এপ্রিল) দু'মাস ধরে চললেও ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাটক 'ফুলশয্যা' (৩১ অগাস্ট প্রথম অভিনীত) একেবারেই জনপ্রিয় হল না, বরং লোকসানের পাল্লা আবার ভারি হতে থাকল। ফলে অর্দ্ধেন্দুশেখর কর্তৃত্বের ভার নেওয়ার পর প্রথম কয়েক মাসে এমারেল্ডের সৌভাগ্যের যে সম্ভাবনাটুকু দেখা দিয়েছিল তা আর বাস্তবায়িত হল না। সমালোচকদের প্রশংসাধন্য হয়েও এমারেল্ড কোনওরকম আর্থিক নির্ভরতা পেল না।

তবু হাল ছাড়লেন না অর্দ্ধেন্দুশেখর। ১৮৯৫ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভরসা করে আসরে

নামলেন। অভিনীত হল 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কপালকুন্ডলা'। অবশ্য ততদিনে কর্তৃত্বের হস্তান্তর ঘটে গেছে। মালিক হয়েছেন জনৈক মাড়োয়ারি — বেনারসী দাস। অধ্যক্ষপদে রয়ে গেলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর। বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যাভিনয় অন্তত কিছুটা অর্থনৈতিক স্থিতি ফিরিয়ে এনেছিল। তাই অর্দ্ধেন্দুশেখর আবারও উপন্যাসের নাট্যরূপেই আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এবার নির্বাচিত উপন্যাস রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা'। নাট্যরূপ দিলেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র — প্রথমাভিনয় রজনী ছিল ১৪ ডিসেম্বর, শনিবার। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

১৮৯৬ সাল থেকেই কলকাতায় এমারেল্ডের নাট্যপ্রযোজনা বেশ অনিয়মিত। ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসে আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে হয়তো সঙ্গীন অবস্থা কাটানোর একটা চেষ্টা হয়েছিল, তাতেও বিশেষ সুবিধা হয়নি। কলকাতায় নাট্যাভিনয় শুরু হয় ১৮ মার্চ। কিন্তু মাসখানেক পরেই ২১ এপ্রিল অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় : 'No performance at the pavillion till further notice as the company starts for Mafussil.'[৩] তবে অর্দ্ধেন্দুশেখরের দল মফস্বল থেকে ফিরে এসে আর মঞ্চে অভিনয় করেনি। তাই ১৯ এপ্রিল 'আবু হোসেন' আর 'অদলবদল'-এর অভিনয়ই ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে এমারেল্ডের শেষ অনুষ্ঠান। প্রায় দু'মাস পরে ২০ জুন থেকে এখানে সিটি সম্প্রদায়ের নাট্যাভিনয়ের শুরু।

১৮৮৭ সালের উজ্জ্বল সৃষ্টি এমারেল্ডের আয়ু দশ বছরও নয়। অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রাণপণ প্রয়াস (দুর্ভেদ্য ঋণজালে নিজে জড়িয়ে পড়েও) তার অবসান আটকাতে পারেনি। ঠিকই, এমারেল্ডের দারুণ দুর্দিনেই তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর পরিচালনা পর্বে যোগ্য নাট্যপ্রযোজনায় সাময়িক উন্নতি বা আর্থিক স্থিতি এলেও দলের সার্বিক সঙ্গতি গড়ে তোলার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া অমৃতলাল গিরিশচন্দ্র বা বিহারীলালের মতো কৌশলী নাট্যাধ্যক্ষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবিষয়ী অর্দ্ধেন্দুশেখর জিততে পারেননি। তাই স্টার, মিনার্ভা আর রয়েল বেঙ্গলের রাজত্বে এমারেল্ডের অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে গেল।

এমারেল্ড থিয়েটারের ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখেছি সম্প্রদায়ে গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতির পর্বই সবচেয়ে সাফল্যমন্ডিত। তাঁর 'পূর্ণচন্দ্র' এবং বিশেষত 'বিষাদ'-এর কল্যাণে এমারেল্ড জনপ্রিয়তার প্রায় তুঙ্গে পৌছেছিল। পরবর্তীকালে সেই শীর্ষাসনে সে যে থাকতে পারেনি, সেই অক্ষমতার প্রধান কারণ বোধহয় উপযুক্ত নাটকের অভাব। বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাট্যরূপ এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'র কথা বাদ দিলে এই সম্প্রদায়ের জন্য লেখা এমন ভালো নাটকের নাম করা মুশকিল। যে মনোমোহন বসুর নাটক একদিন এক শখের নাট্যদলকে খ্যাতির জগতে নিয়ে এসেছিল, তাঁর কাছ থেকে এমারেল্ডের বরাতে জুটল 'রাসলীলা'র মতো নাটক। যে অতুলকৃষ্ণ মঞ্চসফল নাটক লিখে বহু দলকে অভাবনীয় আর্থিক সাফল্য এনে দিয়েছিলেন তিনিও দীর্ঘদিন এমারেল্ডে থেকে নিম্নমানের চটুল প্রহসন আর কয়েকটি কৃষ্ণভক্তি রসাশ্রিত নাট্যগীতি ছাড়া (ব্যতিক্রম বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ) আর কিছুই লিখতে পারলেন না। ফলে আমরা দেখেছি অর্দ্ধেন্দুশেখরের সুচিন্তিত নাট্যশিক্ষাও কোনও যোগ্য আধার পেল না। অবশ্য প্রকৃত নাটকের বিরলতা শুধু নয়, সম্প্রদায়ের দলীয় অবস্থাও জীর্ণ করে দিয়েছিল দলকে। প্রত্যক্ষদর্শীর সজীব বর্ণনায় সেই বিশৃঙ্খল আবহাওয়ার যে ছবি আমরা পাই তা থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে এই পরিবেশে লালিত কোনও নাট্যদলের পক্ষেই বেশিদিন রঙ্গজগতে টিকে থাকা, অর্দ্ধেন্দুশেখরের মতো সক্রিয় শুভার্থী থাকলেও, অসম্ভব।

ক্লাসিক থিয়েটার

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্লাসিক' উনিশ শতকের শেষ নতুন থিয়েটার — তার ঠিকানাও ৬৮ নং বিডন স্ট্রিট, এমারেল্ড মঞ্চ। ততদিনে কলকাতার পেশাদারি নাট্যচর্চার দু'যুগ অতিক্রান্ত, আগেকার কয়েকটি নাট্যপ্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত, রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার আর্থিক অস্বচ্ছলতায় বিপন্ন, নানা পরিবর্তনে মিনার্ভারও ভগ্নদশা। শুধুমাত্র সতেজ অস্তিত্ব তখন স্টারের। তবে সেখানে অমৃতলাল বসুর পরিচালনায় নিয়মকানুনের বড় কড়াকড়ি, সাধারণ দর্শক মনোরঞ্জনের উপাদানগুলি ঠিকমতো

উপভোগ করতে পারছিলেন না। তাছাড়া এসব থিয়েটারে নতুন নাটক অভিনীত হচ্ছিল বটে, কিন্তু নায়ক চরিত্রে সেই একই পরিচিত মুখ। 'বেঙ্গল'-এর প্রযোজনায় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বা কোনও সময় মহেন্দ্রলাল বসু, আর স্টার থিয়েটারে অমৃতলাল মিত্রই থাকবেন নায়কের ভূমিকায়। আর মিনার্ভায় সে দায়িত্ব থাকবে প্রবোধচন্দ্র ঘোষের। গিরিশচন্দ্র নাট্যসম্প্রদায়ে থাকলেও তাঁকে তখন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের চরিত্রেই মানাত। এঁরা ছাড়া চুনীলাল দেব বা দানীবাবু থাকলেও 'সাধারণ দর্শক অপেক্ষা করিতেছিল নূতনের জন্য। ঠিক এই সময়েই অমরবাবু থিয়েটার খুলিলেন।'[৬২]

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত শুধু ক্লাসিক থিয়েটারের লেসী এবং ম্যানেজার নন, তিনিই ছিলেন প্রধান অভিনেতা এবং পরিচালক। তবে রঙ্গালয়ের নতুন মালিক হলেও কলকাতার রঙ্গজগতে তিনি একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। কলকাতার সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও থিয়েটারের আকর্ষণে নিজের পারিবারিক সম্পত্তি বিভাজন করে তাঁর 'ইন্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করা বা নটের জীবন বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সে সময়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্য তৈরি করেছিল। তাঁর সেই দলের বেশ কয়েকটি প্রযোজনা প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু নিজস্ব নাট্যগৃহ নেই, তাই অন্যের মঞ্চে (কখনও 'বীণা' বা 'এমারেল্ড' অথবা 'কোরিন্থিয়ান') বিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠান করে দল টিঁকিয়ে রাখা খুবই দুরূহ। নিজস্ব থিয়েটারের আশায় গোপাললাল শীলের জীর্ণ এমারেল্ডের নাট্যভবনই ভাড়া নিলেন অমরেন্দ্রনাথ। সেই মঞ্চের সংস্কার করতেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এদিকে ততদিনে তাঁর কয়েকজন পূর্বতন সহযোগী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় আর নতুন দলের প্রতি উৎসাহ বোধ করছিলেন না। একমাত্র পুরনো সহযোগী ছিলেন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর অমরেন্দ্রনাথের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে তারাসুন্দরী।

দু'মাসের মধ্যেই দল তৈরি করে ফেললেন অমরেন্দ্রনাথ। সে দলের নাম হল 'ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী'। দলের পূর্ণ পরিচিতি দিয়ে প্রকাশিত হল হ্যান্ডবিল — 'A medley of the cream of the staff of some of our Public Theatres, supplemented by infusion of new blood of Actors and Actresses of established reputation.'[৬৩] তাছাড়া স্বল্প সময়ের মধ্যে কোনও নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা যাচ্ছে না, সেই গিরিশচন্দ্রের পুরনো নাটকের ওপরই যে নির্ভর করতে হয়েছে তাও লেখা ছিল হ্যান্ডবিলে : 'Owing to the shortness of time, I have not been able to appear before the public with a New Drama, as I fully intended to do.'[৬৪]

১৬ এপ্রিল, গুড ফ্রাইডে, ১৮৯৭ ছিল ক্লাসিকের উদ্বোধন রজনী — অভিনীত হল 'নলদময়ন্তী' আর 'বেল্লিকবাজার'। নতুন এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সেকালের নাট্যসমালোচকেরা। কিন্তু ক্লাসিক থিয়েটারের প্রথম পাঁচ মাসের প্রযোজনার (প্রথম দিনের দুটি নাটক ছাড়াও অভিনীত হয়েছিল 'পলাশীর যুদ্ধ', 'লক্ষ্মণবর্জন', 'দক্ষযজ্ঞ', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'তরুবালা', 'হারানিধি', 'রাজা ও রাণী', 'হরিরাজ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'বিল্বমঙ্গল') কোনও অভিঘাত তেমন অনুভূত হল না। কলকাতার নাট্যজগতে অভিনয়ের প্রশস্তি হল, কিন্তু যথেষ্ট অর্থলাভ ঘটল না। তার ওপর আবার কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের মতান্তর হলে তাঁরা দল ছেড়ে দিলেন। [৬৫] ভাঙা দল নিয়েই নতুন নাটকের খোঁজ শুরু হল। নাট্যজগতে নবীন হলেও অমরেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে ভাবগম্ভীর পুরনো নাটকের উপস্থাপনায় কোথায় যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রযোজনায়। এমন সময় তাঁর হাতে এল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' — এ সেই নাটক যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা বলে স্টার কর্তৃপক্ষ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ এই গীতিনাট্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তারপর কীভাবে 'আলিবাবা'-র প্রযোজনা (২০ নভেম্বর, শনিবার, ১৮৯৭) নাট্যকার[৬৬] এবং নাট্যপরিচালক উভয়কেই বাংলা নাট্যজগতে শুধু পরিচিত নয়, একান্ত জনপ্রিয় করে তুলল তা আজ ইতিহাস। সেদিনের কলকাতায় এমন কোনও নাট্যামোদী হয়তো ছিলেন না যিনি 'আলিবাবা' দেখেননি, এবং মর্জিনা-আবদাল্লার ভূমিকায় কুসুমকুমারী ও নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নৃত্যগীত উপভোগ করেননি। এর আগেও আরব্য-পারস্যের আখ্যানভিত্তিক গীতিনাট্য রাজকৃষ্ণ রায়ের 'লায়লা-মজনু' (৫ ডিসেম্বর, ১৮৯১, স্টার) বা গিরিশচন্দ্রের 'আবু হোসেন'-এ (২৫ মার্চ, ১৮৯৩, মিনার্ভা) চটকদার দ্বৈত নৃত্যগীতের আয়োজন জনপ্রিয়তা পেলেও, নাট্যসংগীতের এমন সম্ভাবনাময় বিস্তার সেখানে দেখা যায়নি। এক 'আলিবাবা'-ই

অমরেন্দ্রনাথকে লক্ষাধিক টাকা এনে দিয়েছিল।

জনমনোরঞ্জনের তাগিদে অমরেন্দ্রনাথ তাঁর 'কাজের খতম' নাটকে (প্রথমাভিনয় রজনী ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৭) তৈরি করলেন চুরুটওয়ালা-চুরুটওয়ালী, স্যাকরা-স্যাকরাণী। নাটকটি সম্পর্কে 'পুরোহিত ও অনুশীলন' পত্রিকা অভিযোগ করেছিল : 'এই পঞ্চরঙে বিলাত ফেরৎ ডাক্তার, বাঙ্গালী ব্যারিস্টার ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র সম্পাদকের যে চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সর্বত্র স্বীকার্য নয়।'[৬৭] তবে সমালোচকদের মনোভাব তো আর দর্শক সাধারণের মনের কথা নয়। বরং অপরেশচন্দ্র যথার্থই লিখেছেন, 'আলিবাবা প্রভৃতির অভিনয় দেখিতে দেখিতে বিডন স্ট্রীটের দর্শকবৃন্দ বোলচাল কাটিয়া, শিস্ দিয়া, দুই একটা অসঙ্গত ইয়ার্কি কপ্‌চাইয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারকে একটা সর্বজাতীয় আমোদাগারে পরিণত করিলেন।'[৬৮] তার ওপর দর্শক আকর্ষণের জন্য অমরেন্দ্রনাথের প্রচারকার্যও ছিল জোরদার। নিকৃষ্ট কাগজের একরঙা হ্যান্ডবিলের বদলে উত্তম আইভরি ফিনিসের কাগজে বহুবর্ণে লেখা হত ক্লাসিকের অভিনয় সংবাদ। আর সে সংবাদের ভাষা নিছক সাধু, মার্জিত তথ্য পরিবেশনের বাহক নয়, তা ছিল নানা উত্তেজক চটুল শব্দ ব্যবহারে, আমোদ আয়োজনের আহ্বায়ক। — 'হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার, নাট্যজগৎ স্তম্ভিত! নাটকের ঘাত প্রতিঘাতে মানবজীবন দোদুল্যমান! সারি সারি সখীর সাবি; .... ষোড়শী রূপসীর যৌবন তরঙ্গে সন্তরণ'[৬৯] — এরকম আবেদনে বহু দর্শকই ছুটল ক্লাসিকে।

সংগীতবহুল বহু নাটকই অভিনীত হয়েছে ক্লাসিকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয় গিরিশচন্দ্রের 'দেলদার' (১০ জুন, ১৮৯৯) এবং অমরেন্দ্রনাথের লেখা 'নির্মলা' (২৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৯), 'মজা' (১ জানুয়ারি ১৯০০) ও বিদ্যাসুন্দর অবলম্বনে 'দুটি প্রাণ' (২৬ মে, ১৯০০)। একই কারণে পুরাণ-নির্ভর ভক্তিরসাশ্রয়ী নাটকে নাচগানের বাহুল্য দেখা গেল। অমরেন্দ্রনাথ তো তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকে (প্রথমাভিনয় রজনী ২৬ অগাস্ট, ১৮৯৯) — যেখানে প্লট কৃষ্ণের বাল্যলীলা থেকে কালীয়দমন পর্যন্ত বিস্তৃত, সেখানেও শ্রীরাধিকাকে এনে ফেললেন প্রেমের উদ্বেল প্রকাশে গান গাওয়ার জন্য। নাটকে রাধা চরিত্রের আগমন ঔচিত্যের হানি ঘটিয়েছে বলে সমালোচক অভিযোগ করলেও, সেকালের জনসাধারণ কালানুক্রমিক বিচারের এসব ত্রুটি গ্রাহ্য করেনি, তারা ওই ভূমিকায় ভূষণকুমারীর গান শুনতেই ব্যস্ত ছিল। 'ইন্ডিয়ান মিরর' লিখেছিল : 'The introduction of Radha in the play is a daring subversion of chronological sequence, for which the only satisfaction shown is that the representative of the character sings a couple of songs that bring down the audience.'[৭০] অবশ্য এ জাতীয় নাটক অমরেন্দ্রনাথ আগেও লিখেছেন — ১৮৯৮ সালের ৮ মার্চ দোলের দিন মঞ্চস্থ হয়েছিল 'দোললীলা'। সেখানেও গোপ-গোপীর ভূমিকায় ক্লাসিকের জনপ্রিয় জুটি নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও কুসুমকুমারীর নৃত্যগীতে জমে যায় — 'Like Alibaba, their Dole Lila has also been a great success.'[৭১] ১৯০৪ সালের ১০ জুলাই অভিনীত অমরেন্দ্রনাথের 'শ্রীরাধা'ও সমগোত্রেরই নাটক। তবে ক্লাসিকের বড় দুর্দিন, এ নাটকও জনপ্রিয় হয়নি।

শুধুমাত্র চটুল উত্তেজনা আর ব্যাপক নৃত্যগীতের প্রয়োগই ছিল ক্লাসিকের জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ, এরকম সিদ্ধান্ত হয়তো অসঙ্গত। কেননা দলের অভিনয়ের আবেদনও কম ছিল না এবং সেক্ষেত্রেও অমরেন্দ্রনাথই ছিলেন অগ্রণী। তাঁর নায়কোচিত কান্তি, উদাত্ত কণ্ঠস্বর, অনুপম আবৃত্তির ক্ষমতা সব মিলিয়ে মঞ্চে তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ উপস্থিতির এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল দর্শকদের কাছে। সেকথা অমরেন্দ্রনাথও জানতেন। তাই প্রবল আত্মবিশ্বাসে তিনি আগেকার মঞ্চসফল নাটকের প্রযোজনা করেছেন।[৭২] যেমন গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' (ক্লাসিকে প্রথম অভিনয় ১ মে, ১৮৯৭)। অথচ সে নাটকের প্রথম প্রযোজনা যে নাট্যদলের, সেই স্টারও বেলবাবুর মৃত্যুতে (এ নাটকে অঘোরের ভূমিকায় তিনি অসাধারণ অভিনয় করতেন) এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেন।[৭৩] ক্লাসিকের 'হারানিধি'-তে অমরেন্দ্রনাথই অঘোর। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'অমরবাবুর অভিনয় আবৃত্তি প্রধান ছিল। তাঁর অঘোরের অভিনয় আমি একাধিকবার দেখেছি। অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাতেন সেখানে।'[৭৪] সেইরকমই মহেন্দ্রলাল বসুর প্রবাদপ্রতিম চরিত্রচিত্রণ[৭৫]। লক্ষ্মণের ('সীতার বনবাস') ভূমিকাতে অভিনয় করতেন অমরেন্দ্রনাথ, দলে মহেন্দ্রলাল থাকা সত্ত্বেও (একথা ঠিক,

বার্দ্ধক্যজনিত কারণে মহেন্দ্রলাল তাঁর পূর্বের সুনামহানির আশঙ্কায় এসব চরিত্রে অভিনয় করতে চাইতেন না)।

নতুন নাটকের ক্ষেত্রেও তাই। সেইজন্য 'পাণ্ডব গৌরবে' (প্রথমাভিনয় রজনী ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০) নাট্যকার তথা পরিচালক গিরিশচন্দ্রের মতের বিরুদ্ধে[৭৬] নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেই ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। দলে দানীবাবুর উপস্থিতিথেই 'জনা'-য়[৭৭] প্রবীর সেজেছেন। তবে শুধু নায়কের চরিত্রে নয়, টাইপ চরিত্রেও যে তিনি সুঅভিনেতা তা জানা যায় ক্লাসিকে 'মুকুলমুঞ্জরা' (৩০ জুলাই, ১৯৯৮) ও 'প্রফুল্ল' (২৮ অগাস্ট, ১৮৯৮) অভিনয়ের সমালোচনা পাঠে। প্রফুল্লকে অবশ্য যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র একাই একশ — 'Babu Girish Chandra Ghosh stood head and shoulders above the fellow players. This was a very delicate and subdued piece of acting.'[৭৮] কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ ভজহরির চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেন — 'The role of Bhajahari .... is very forcible rendered.'[৭৯] আর 'মুকুলমুঞ্জরা'র বরুণচাঁদও তাঁর অভিনয়গুণে দর্শনীয় হয়ে ওঠে — 'He himself fills the amusing role of Barun Chandra and in doing so, gives striking proof of the versatility of his talent.[৮০] ভক্তপ্রাণ চরিত্রে তাঁর অভিনয় স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হত না। 'নসীরাম'-এর (ক্লাসিকে ২৭ অগাস্ট, ১৯০২ প্রথম অভিনীত হয়) ভূমিকায় তাঁর ব্যর্থতার কথা তিনি নিজেই উপলব্ধি করেন। তখন গিরিশচন্দ্র অভিনয় করেন সেই চরিত্রে[৮১] আর অমরেন্দ্রনাথ করেন অনাথনাথের ভূমিকা।

নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতায় নামতে কোনও কুণ্ঠা বোধ করতেন না অমরেন্দ্রনাথ। তাই মতান্তরের ফলে গিরিশচন্দ্র যখন ক্লাসিক ছেড়ে মিনার্ভায় চলে যান[৮২] তখন অমরেন্দ্রনাথ আক্ষরিক অর্থেই গিরিশচন্দ্রের সঙ্গো প্রতিযোগিতায় 'সীতারাম' মঞ্চস্থ করলেন[৮৩] (মিনার্ভায় প্রথমাভিনয় রজনী ছিল ২৩ জুন আর ক্লাসিকে ৩০ জুন, ১৯০০)। উভয়পক্ষেব প্রচারপত্রে, হ্যান্ডবিলে, নাট্যবিজ্ঞপ্তিতে পরস্পরকে তীব্র আক্রমণ করা হল। অমরেন্দ্রনাথ লিখলেন : 'ক্লাসিকের সীতারাম স্থবির নহে, বলদৃপ্ত যুবা।' প্রত্যুত্তরে গিরিশচন্দ্র জানালেন : howling is not acting ....। অমরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন : 'নট, নর্তকী ও নাপিত — তিন চল্লিশের পার হইলেই কাজের বার হইয়া যায়'।

অবশ্য 'সীতারাম' নয়, ক্লাসিকের বঙ্কিম উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ছিল 'ভ্রমর' (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯, নাঠ্যরূপ : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)। এরও আগে ক্লাসিক 'দেবী চৌধুরাণী' (২৯ মে, ১৮৯৭) এবং ইন্দিরা (২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭) মঞ্চস্থ করেছে। পরেও অভিনয় করেছে 'কপালকুণ্ডলা' (১ জুন, ১৯০১) ও 'মৃণালিনী' (২৭ জুলাই, ১৯০১)। কিন্তু কোনও প্রযোজনাই 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর নাট্যরূপের মতো হয়নি। 'ভ্রমর' আর একবার ক্লাসিককে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিল। অমরেন্দ্রনাথের গোবিন্দলাল আর কুসুমকুমারীর ভ্রমর দেখে সেদিনের দর্শকরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। রোহিণী চরিত্রে প্রমদাসুন্দরীও ভালো অভিনয় করেন। তবে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলালের মঞ্চে আসা, বারুণী পুষ্করিণী থেকে অচৈতন্য রোহিণীকে সিক্তাবস্থায় তুলে আনা এবং নাটকের পরিণতিতে রোহিণীর ছায়ামূর্তি আর ভ্রমরের জ্যোতির্ময়ী মূর্তির উপস্থাপনা। শুধু সেই সময়েই নয়, যখনই ভ্রমর অভিনীত হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিত ক্লাসিক, তখনই টিকিট বিক্রির হিড়িক পড়ে যেত।

বঙ্কিম রচনার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' (২৪ জুলাই, ১৮৯৭) অথবা অনেক পরের 'চোখের বালি' (২৭ নভেম্বর, ১৯০৪) কোনওটাই বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি। তবে মনে হয় প্রযোজনাও কিছু উচ্চমানের ছিল না।

শেক্সপীয়রের নাটকও মঞ্চস্থ করেছে ক্লাসিক। একেবারে গোড়ার দিকেই 'হ্যামলেট' অনুসরণে নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'হরিরাজ' (২১ জুন, ১৮৯৭) অভিনীত হয়েছে। নামভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় ছিল প্রধান আকর্ষণ, অরুণা চরিত্রে তারাসুন্দরীও সুন্দর অভিনয় করেন। কিন্তু এর প্রায় দু'বছর পর অভিনীত হল 'ম্যাকবেথ' (১৮ নভেম্বর, ১৮৯৯)। এবারও নাম ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ (দলে গিরিশচন্দ্র থাকা সত্ত্বেও) আর কুসুমকুমারী লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায়। বলাবাহুল্য, এ চরিত্রে তিনকড়ির সমকক্ষ অভিনয় তিনি করতে পারেননি। ম্যাকবেথের অভিনয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে কোনওদিনও জনপ্রিয় হয়নি।[৮৪] ক্লাসিকেও এ নাটক তিনরাত্রির বেশি চলেনি। ক্লাসিকের প্রায় শেষ পর্বে অভিনীত হয়েছিল 'Comedy of Errors' অবলম্বনে 'কোনটা কে'। কিন্তু সম্প্রদায়ের নিতান্ত হতশ্রী পরিস্থিতিতে সেই

কৌতুকনাট্য জনপ্রিয় হয়নি।

ক্লাসিকের নাট্যাভিনয়ের ধারায় ধ্রুপদী নাটকের চেয়ে বারেবারেই অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে সংগীতমুখর গীতিনাট্য অথবা স্যাটায়ারধর্মী নাটিকা। অমরেন্দ্রনাথের লেখা এ ধরণের নাটক তখন কম জনপ্রিয় হয়নি, যদিও প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের মর্যাদা হয়তো তাঁর প্রাপ্য নয়। তাঁর অনেক নাটকের মতোই গিরিশচন্দ্র ও মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকারকে ব্যঙ্গ করে লেখা 'থিয়েটার' (২৫ অগাস্ট, ১৯০০)[৮৫] সেই সময়ে ক্লাসিককে প্রভূত অর্থ এনে দিয়েছিল। ব্যক্তিগত আক্রমণের ব্যাপারটা সমালোচকদের মনঃপূত না হলেও, প্রযোজনার প্রশংসা সকলেই করেছিলেন : 'The rendering however is characterised with a 'go' such as would strike even the most unsympathetic critic.'[৮৬] প্রকৃতই ক্লাসিকের জনপ্রিয়তা তখন অপরিসীম, এমনকি গিরিশচন্দ্রের পক্ষেও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল ক্লাসিকের তুলনায় মিনার্ভাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। নাট্যজগতে তখন ক্লাসিকের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় কেউ ছিল না। 'রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার' প্রায় সঙ্গাতিহীন,[৮৭] স্টারেরও বেশ দুর্দিন।[৮৮] ক্লাসিকেই রয়েছেন অধিকাংশ প্রথিতযশা অভিনেতা-অভিনেত্রী। এই সময়েই ক্লাসিকের আধিপত্য বজায় রাখতে শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে অমরেন্দ্রনাথ আবারও গিরিশচন্দ্রকে দলে নিয়ে আসতে[৮৯] তৎপর হলেন। কিন্তু সেই 'সীতারাম' সূত্রে হ্যান্ডবিল প্রচার এবং 'থিয়েটার'-এর প্রযোজনার অপমান গিরিশচন্দ্র ভোলেননি। তিনি জানালেন, অমরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে ত্রুটি স্বীকার এবং 'থিয়েটার' ব্যঙ্গনাট্যের অভিনয় বন্ধ না করলে তিনি ক্লাসিকে যোগ দেবেন না। দলীয় স্বার্থে প্রথমটির জন্য অমরেন্দ্রনাথের কোনও আপত্তি ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি ছিল এ ধরনের অর্থকরী প্রযোজনা বন্ধ করে দিলে সম্প্রদায়ের সমূহ লোকসান। বিচক্ষণ গিরিশচন্দ্র এই মত অগ্রাহ্য করতে পারেননি। ২৪ নভেম্বর থেকে তিনি ক্লাসিকে চলে এলেন। অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকের হ্যান্ডবিলে লিখলেন — '.... বাঙ্গালায় যে কয়েটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে সকলগুলিরই সৃষ্টিকর্তা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র। প্রায় সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় গৌরবান্বিত। তাহার মধ্যে আমিও একজন। গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া নিতান্ত ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম'।[৯০] সত্যিই সে সময়ের ক্লাসিকের শিল্পীগোষ্ঠী কলকাতার নাট্যমহলে গর্বের বিষয়। দলে অভিনেতারা হলেন গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, দানীবাবু, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বোস, রাণুবাবু, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় চক্রবর্তী, অহীন্দ্র দে, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন কুসুমকুমারী, প্রমদাসুন্দরী, রাণীসুন্দরী, গুলফমহরি, নগেন্দ্রবালা, ব্লাকী, ফিরোজাবালা, ভুবনেশ্বরী, আর ডিসেম্বর মাসে স্টার থেকে চলে এলেন তারাসুন্দরী। এঁদেরকে নিয়েই শুরু হল ১৯০১ সাল।

প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে যাবে, ক্লাসিকের এই সুদিনে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আপস করলেও, সবার ক্ষেত্রে এরকম নরম মনোভাবের পরিচয় দেননি অমরেন্দ্রনাথ। বঙ্গবাসী পত্রিকার স্বত্বাধিকারী তথা সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের মতান্তর ঘটে। যোগেন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে অমরেন্দ্রনাথ লিখলেন (কৌতুকনাট্য) 'চাবুক' (১ জানুয়ারি, ১৯০১ প্রথম অভিনীত হয়। তেমনই নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গুপ্তকে[৯১] ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন 'গুপ্তকথা' (প্রথমাভিনয় রজনী ৩১ অগাস্ট, ১৯০১) বা এরও একবছর বাদে শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত 'লর্ড গৌরাঙ্গ'-কে প্যারডি করে রচিত হয়েছে 'লাট গৌরাঙ্গ' (প্রথম অভিনয় ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০২)। অবশ্য এবার প্রথমদিনের অনুষ্ঠানের পর পুলিসের নির্দেশ এল অভিনয় বন্ধ রাখার। সে আদেশে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি অমরেন্দ্রনাথ। তিনি 'লাট গৌরাঙ্গ' নাম বদলে করলেন 'ভক্তবিটেল' এবং নিয়মিতই অভিনয় চালিয়ে গেলেন।[৯২]

তবে এই ব্যক্তিগত আক্রমণের সবটাই একতরফা নয়। ক্লাসিকে অভিনীত নাটকের প্যারডি অন্য মঞ্চেও দেখা যায়। ক্লাসিকে অভিনীত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের[৯৩] 'তোমারই'-কে (প্রথম অভিনয় ৭ ডিসেম্বর, ১৯০১) ব্যঙ্গ করে মিনার্ভা মঞ্চস্থ করে 'আমারই' (১৯ জানুয়ারি, ১৯০২)। প্রকৃতপক্ষে মিনার্ভা চিরকালই ক্লাসিকের জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী, এমনকি সেই 'আলিবাবা'-র প্রথম প্রযোজনার যুগে ক্লাসিকের সাফল্যে বিচলিত মিনার্ভা অতুলকৃষ্ণ মিত্রকে দিয়ে নাটক লিখিয়ে 'আলিবাবা'-ই অভিনয় করে, যদিও তাতে লাভ বিশেষ হয়নি। আর পাঁচ বছরের মধ্যে কলকাতার রঙ্গজগতে ক্লাসিকের

যে প্রতিপত্তি তা বহু দলের দীর্ঘ নাট্যচর্চাতেও অনায়ত্ত ছিল। সে কৃতিত্ব নিঃসন্দেহেই অমরেন্দ্রনাথের প্রাপ্য।

আমরা জানি ক্লাসিক সম্প্রদায়ের নাট্যপ্রযোজনা সাফল্যমণ্ডিত করতে অমরেন্দ্রনাথ এক সময়ে সেকালের প্রায় সমস্ত খ্যাতিমান শিল্পীকে তাঁর দলভুক্ত করেন, এজন্য উচ্চহারের পারিশ্রমিক দিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হননি। গিরিশচন্দ্রও ক্লাসিকে যোগ দিয়েছেন কয়েকবার। তাঁর নতুন নাটকের সুবাদে ('দেলদার' ও 'পাণ্ডবগৌরব'-এর পর ক্লাসিকের জন্য লিখেছেন 'অশ্রুধারা', 'মনের মতন', 'অভিশাপ', 'শাস্তি', 'ভ্রান্তি', 'আয়না' প্রভৃতি)[৯৫] ক্লাসিক আর্থিক স্বচ্ছলতা উপভোগ করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম 'সৎনাম'।[৯৬] তবে আবার একথাও ঠিক, এঁদের অনেকের অনুপস্থিতিতেই ক্লাসিক চলেছে সগৌরবে। ক্লাসিকের এই সৌভাগ্যের কথা মনে রেখেই বোধহয় অমরেন্দ্রনাথ দর্শকদের উদ্দেশে লিখতে পেরেছিলেন : 'আমার বিশ্বাস, আমি যদি বনে গিয়া থিয়েটার খুলি, সেখানেও আপনাদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হব না।'[৯৭]

আসলে দর্শক মানসিকতা খুব ভালোই বুঝতেন অমরেন্দ্রনাথ। দর্শকদের নতুন কিছু দেখাতে তাঁর আমলেই সেকালের রঙ্গালয়ের গতানুগতিক মঞ্চসজ্জার ঠ্যালাসিন, বক্সসিন, উইংস, রঙিন আলো, স্পট লাইট বা কেরোসিন বাক্সের তৈরি আসবাবের বদলে আসল চেয়ার টেবিল ব্যবহৃত হল। রঙ্গমঞ্চকে বাস্তব করে তোলার প্রচেষ্টারও সেই শুরু। দর্শকদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে শুধু নাট্যাভিনয় করে যাওয়া নয়, নাট্যপত্রিকাও প্রকাশ করেন অমরেন্দ্রনাথ। তাঁর পরিকল্পিত প্রথম নাট্যপত্রিকা 'সৌরভ' অবশ্য তিনটি সংখ্যার বেশি এগোয়নি, কিন্তু 'রঙ্গালয়' পত্রিকা[৯৮] বহুদিন চলেছিল।

ক্লাসিকের এই প্রতিপত্তির কালেই দ্বিজেন্দ্রলাল লিখে দিলেন নতুন প্রহসন 'বহুত আচ্ছা' (১৮ জানুয়ারি, ১৯০২ প্রথম অভিনীত)। এই সময়েই মনোমোহন গোস্বামীর 'রোশিনারা' নাটকটি পরিবর্তন করে 'শিবাজী' নাম দিয়ে অভিনয় করলেন অমরেন্দ্রনাথ। (প্রথমাভিনয় রজনী ২২ মার্চ, ১৯০২)। নিজেও লিখলেন 'ফটিকজল' (১২ এপ্রিল, ১৯০২ প্রথম অভিনীত)। প্রত্যেকটিতেই প্রধান ভূমিকা তাঁর। বাস্তবিকই ক্লাসিক থিয়েটারের প্রাণশক্তিই ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। তাঁর নামেই সে সময়ে দর্শক উদ্বেল হয়ে উঠতেন। তখন তাঁর মতেই থিয়েটার চলছে। '.... বেলা দুইটায় থিয়েটার — তাহাতেও ক্লাসিকে অসম্ভব ভিড়। বেলা বারোটায় থিয়েটার — তাহাতেও অসংখ্য দর্শক। একবার অতিবর্ষায় কলিকাতা ভাসিয়া গিয়াছিল, হাট বাজার, অন্য থিয়েটার সব বন্ধ, কিন্তু ক্লাসিক খোলা, টিনের ছাদ দিয়া জল পড়িতেছে, বসিবার স্থানে এক হাঁটু জল, তখনও দেখি ক্লাসিকের দর্শক ছাতি মাথায় দিয়া বেঞ্চ ও চেয়ারে পা তুলিয়া বসিয়া থিয়েটার দেখিতেছে।'[৯৯]

অমরেন্দ্রনাথের নাট্যচর্চা, বিশেষত রঙ্গালয় পরিচালনার সংগঠনী দক্ষতা, অভিনয় ক্ষমতা, অফুরন্ত মনোবল যেমন ক্লাসিককে একটা স্বাতন্ত্র্য তথা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিল, দুঃখের বিষয় যে তেমনই নিজের প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বাস এবং রঙ্গজগতে একক আধিপত্য বিস্তারের অপরিণামদর্শিতা সেই থিয়েটারের পতন ডেকে আনল। সে সর্বনাশের সূত্রপাত তাঁর দ্বৈত রঙ্গালয়ের মালিক হওয়ার বাসনায়। ১৯০৩ সালের ১০ মে মিনার্ভা লিজ নিলেন অমরেন্দ্রনাথ দশ হাজার টাকা ও মাসিক সাতশ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে। তাঁব সহকারী হলেন আগেব স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকারের ভাই সতীন্দ্রনাথ সরকাব। প্রথমদিন, ৭ নভেম্বর, ১৯০৩, অভিনীত হল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর'। কিন্তু প্রযোজনার প্রশংসা পেলেও, অমরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যাশা অনুযায়ী আর্থিক সাফল্যলাভ করলেন না।[১০০] ক্লাসিকই ছিল অমরেন্দ্রনাথের আসল ভরসা। সেখানে এর আগেই স্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনি 'প্রতাপাদিত্য' মঞ্চস্থ করেছেন (প্রথমাভিনয় রজনী ২৯ অগাস্ট, ১৯০৩)। স্টারের ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হারাণচন্দ্র রক্ষিতের উপন্যাস 'বঙ্গের শেষ বীর'-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। এ প্রযোজনাও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। নাম ভূমিকায় স্টারের অমৃতলাল মিত্রের তুলনায় অমরেন্দ্রনাথের কম খ্যাতি হয়নি। তিনকড়ি ((যশোহর রাজলক্ষ্মী) ও দানীবাবুও (শঙ্কর) ভালো অভিনয় করতেন। স্টারের সমতুল আর্থিকলাভ না হলেও পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহেই 'প্রতাপাদিত্য' চলেছিল ক্লাসিকে।[১০১] ক্লাসিকে তার পরের নতুন প্রযোজনাই অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'হিরণ্ময়ী' (২১ নভেম্বর, ১৯০১ প্রথম অভিনীত)। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের

নৃত্যশিক্ষায়, কিরণবালার (হিরণ্ময়ী), অমরেন্দ্রনাথের (পুরন্দর, অবশ্য পঞ্চমাভিনয় থেকে, প্রথমে এই চরিত্রে অভিনয় করতেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ) অভিনয়ে এই জমজমাট গীতিনাট্য অসম্ভব জনপ্রিয় হয়। 'হিরণ্ময়ী'-র দাক্ষিণ্যে অমরেন্দ্রনাথের পঁচিশ হাজার টাকার বেশি লাভ হয়েছিল।

১৯০৪ সালে ক্লাসিকের প্রতাপ বিশেষ কমেনি, কিন্তু মিনার্ভার অবস্থা ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়ছিল। মিনার্ভার স্বত্ব নিয়ে মামলা-মকদ্দমায় নাজেহাল হয়ে পড়েন অমরেন্দ্রনাথ। তবু হাল ছাড়েননি তিনি। সেকালের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মনোমোহন পাঁড়েকে মিনার্ভার বড়দিনের সময়ের আট রাত্রির টিকিট বিক্রি করে অর্থ দিলেন, থিয়েটারের মালিকানা সম্পূর্ণ নিজের দখলে রাখতে। এবার মিনার্ভার ম্যানেজার করলেন গিরিশচন্দ্রকে। দানীবাবু এবং চুনীলাল দেব চলে এলেন ইউনিক থিয়েটার থেকে। তবু শেষরক্ষা হল না। এমনকি এরপরে ১৯০৪ সালের এপ্রিলে নাট্যগৃহের মালিককে মাসিক পাঁচশ টাকা দেওয়ার বিনিময়ে যখন চুনীলাল দেব মিনার্ভার দায়িত্ব নিলেন (যদিও সোল প্রোপ্রাইটার হিসাবে অমরেন্দ্রনাথের নামই বিজ্ঞাপিত হত) তখনও অবস্থার কোনও উন্নতি ঘটল না। হাতে 'সংসার' ও 'মুরলা'র মতো নতুন নাটক এবং খ্যাতনামা অভিনেতাদের পেয়েও চুনীবাবু দল চালাতে পারলেন না। দানীবাবু বাধ্য হয়ে চলে এলেন ক্লাসিকে আর মনোমোহন গোস্বামী ক্লাসিক থেকে গেলেন মিনার্ভায় নায়ক সাজতে। কিন্তু ক্রমশই মিনার্ভার খাতে অমরেন্দ্রনাথের দায় বেড়ে চলল, নাট্যপ্রযোজনার খরচ না থাকলেও, বাড়ি ভাড়ার টাকা বাকিই থেকে গেল। তার ওপর ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের 'সৎনাম' (ঔরঙ্গজেবের আমলে সৎনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ছিল নাট্যবিষয়) প্রথম তিন রাত্রি (প্রথমাভিনয় রজনী ২৩ এপ্রিল, ১৯০৪) দানীবাবু (ঔরঙ্গজেব), অমরেন্দ্রনাথ (রণেন্দ্র), কুসুমকুমারী (বৈষ্ণবী) ও রাণীবালার (গুলসানা) সুন্দর অভিনয়ে ভালো চললেও, চতুর্থ অভিনয় রজনীতে মুসলমান জনতার আপত্তিতে অমরেন্দ্রনাথ 'সৎনাম'-এর অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।[১০২] বহু অর্থব্যয়ে 'সৎনাম' মঞ্চস্থ করতে গিয়ে এই সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের ফলে তাঁর প্রায় ছয়-সাত হাজার টাকার ক্ষতি হয়।

অমরেন্দ্রনাথের তখন বড়ই দুর্দিন। মিনার্ভার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। মনোমোহন পাঁড়ের কাছে সেইজন্য দশ হাজার টাকার ধার। আবার গোপাললাল শীলের এস্টেটের অ্যাডমিনিস্ট্রার বেলচেম্বার সেই সময়েই ক্লাসিক নাট্যগৃহের ভাড়া হিসাবে দু'হাজার টাকা দাবি করলেন। নিরুপায় অমরেন্দ্রনাথ এবারও হাত পাতলেন মনোমোহন পাঁড়ের কাছে। টাকা পেলেন, বেলচেম্বারের প্রাপ্য টাকাও দিলেন, কিন্তু ক্লাসিক থিয়েটারের স্বত্ব বিক্রয়ের কবলা লিখে দিতে হল তাঁকে। শর্ত হল, তিন মাসের মধ্যে টাকা শোধ করতে না পাবলে ক্লাসিকের মালিক হবেন মনোমোহন পাঁড়ে, অবশ্য ততদিনে স্বত্ব বিক্রয় সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রি করা হবে না। অর্থের অভাবে 'রঙ্গালয়' পত্রিকাটিও এই সময়ে বন্ধ হয়ে যায়।[১০৩]

ক্লাসিকে অভিনয় অবশ্য নিয়মিত চলছে, সংবাদপত্রে নাট্যাভিনয়ের প্রশংসাও প্রকাশিত হয়েছে। [এই পর্বের নতুন নাটক রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পেয়ার' (৪ জুন, ১৯০৪), অমরেন্দ্রনাথের 'শ্রীরাধা' (১০ জুলাই, ১৯০৪), রাজকৃষ্ণ রায়ের 'তরণীসেন বধ' (২৩ জুলাই, ১৯০৪)[১০৪]] কিন্তু আগেকার প্রযোজনার সে ঔজ্জ্বল্য যেন আর নেই, সাফল্যও সেরকম নয়। আসলে মিনার্ভার ঋণে অমরেন্দ্রনাথ তখন খুবই বিব্রত। হয়তো ভেবেছিলেন মিনার্ভার স্বত্ব থেকে অব্যাহতি পেলে তিনি পূর্ণ উদ্যমে ক্লাসিক থিয়েটারের উন্নতিতে মন দেবেন।

শেষ পর্যন্ত দশ হাজার টাকার দেনার মকুবে অমরেন্দ্রনাথ ২৭ জুলাই মনোমোহন পাঁড়েকে মিনার্ভার লিজ হস্তান্তর করে দিলেন। মনোমোহনবাবুর মালিকানার সময়ে চুনীলাল দেব আবার মাসিক সাড়ে সাতশ টাকায় মিনার্ভা ভাড়া নিলেন। কিন্তু অভিনয়ে স্টার বা ক্লাসিকের তুলনায় তাঁর মিনার্ভা আদৌ সফল হল না। তাই পাল্লা দিয়ে থিয়েটার চালাতে অধিক টিকিট বিক্রির জন্য তিনি বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যবস্থা করে পুস্তক উপহারের সিদ্ধান্ত নিলেন। সুবিধে উপেন্দ্রনাথেরও হল, কেননা তাঁর প্রায় তিন হাজার কপি অতুল গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হয়ে পড়েই ছিল, তার ওপর ঠিক হল দু'জনেই মোট টিকিট বিক্রির অর্ধাংশের মালিক হবেন। উপহারপ্রাপ্তির আশায় দর্শকদের ভিড়ও বাড়তে লাগল মিনার্ভায়, ক্লাসিকের বিক্রি গেল অনেকটা কমে। কিন্তু নাট্যজগতে প্রতিযোগী কাউকে

দেখলেই তাকে পরাজিত করার জন্য অধীর হয়ে উঠতেন অমরেন্দ্রনাথ। তাই কোনও কিছু না ভেবেই ঘোষণা করে দিলেন যে ক্লাসিকে টিকিটের সঙ্গে মাইকেল গ্রন্থাবলী দেওয়া হবে। 'পাল অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' নামক পোশাকের দোকানের মালিক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে টাকা ধার করলেন বই ছাপানোর জন্য। শর্ত হল, রবিবারের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাবেন পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। উপহারের প্রতিযোগিতায় অবশ্য ক্লাসিকের দেনাই বাড়তে লাগল শুধু। লাভ হল দর্শকদের। উপহারের বন্যায় অতুল গ্রন্থাবলী থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, এমনকি শব্দকল্পদ্রুম পর্যন্ত তাদের হাতে এসে গেল। এদিকে অমরেন্দ্রনাথের আরও এক বিপদ দেখা দিল। মনোমোহন পাঁড়ে নিজেকে ক্লাসিকের স্বত্বাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। অমরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, ক্লাসিকের স্বত্ব বিক্রির যে কবলা তিনি দু'হাজার টাকার বিনিময়ে লিখে দিয়েছিলেন — সে টাকা এখন সুদে আসলে আড়াই হাজার টাকা। আর সময়মতো টাকা না পাওয়াতেই মনোমোহনবাবুর এই সিদ্ধান্ত। একে তো তখন ক্লাসিকের রবিবারের বিক্রির টাকা হস্তান্তরিত, বুধ ও বৃহস্পতিবারের অর্থ অর্ধেক তাঁর আর বাকিটা হিতবাদী পত্রিকার। এবার কি দেনা শোধ করতে শনিবারের বিক্রিটাও বন্ধক রাখতে হবে? অমরেন্দ্রনাথ ভাবলেন তবে আর থিয়েটারের মালিকানার প্রয়োজন কী? শেষ অবধি অবশ্য এই সঙ্কট থেকে রক্ষা পেলেন অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের জন্যই। তিনি আড়াই হাজার টাকা ধার দিলেন। তবুও সমস্যা মিটল না। উপহার যোগাতে গিয়ে ক্লাসিকের আয়ব্যয়ের কোনও সমতাই ছিল না। শিল্পীদের অনেকেই পারিশ্রমিক পাননি। গিরিশচন্দ্রও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের প্রাপ্য টাকা পাননি। অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের দেনা মিটিয়ে দিলেও কার্তিক মাস অবধি পারিশ্রমিক দিলেন না। বিরক্ত গিরিশচন্দ্র চুনীলাল দেবের অনুরোধে মিনার্ভায় চলে গেলেন। দানীবাবু এর আগেই চলে গিয়েছিলেন স্টারে।

বাস্তবিকই ক্লাসিকের অর্থসঙ্কট তখন তীব্র। অমরেন্দ্রনাথ নাট্যগৃহ বন্ধক রেখে টাকা নিলেন নাট্যাভিনয় চালিয়ে যেতে। কিন্তু কি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'-র নাট্যরূপ বা শেক্সপীয়র অবলম্বনে 'কোনটা কে' (২৩ জানুয়ারি, ১৯০৫) অথবা নিত্যবোধ বিদ্যারত্নের 'প্রেমের পাথার' (২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৪), কোনও প্রযোজনাই পারল না ক্লাসিকের সুদিন ফেরাতে।

তার ওপর এল নতুন সমস্যা। চুক্তিমতো মাস মাস ভাড়া না পেয়ে বেলচেম্বার সাহেব এবার ক্লাসিককে উচ্ছেদের নোটিশ দিলেন জানুয়ারি মাসে। বাড়ি ভাড়া দিতে আবারও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে টাকা ধার করতে হল অমরেন্দ্রনাথকে। কিন্তু টাকা পেয়েও মামলা তুললেন না বেলচেম্বার, ফলে অমরেন্দ্রনাথও পাল্টা নালিশ জানালেন হাইকোর্টে।

সম্প্রদায়ের এরকম দুর্দিনেও অমরেন্দ্রনাথ অপ্রাণ চেষ্টা করেছেন অভিনয় করে যেতে। নতুন নাটকও লিখেছেন 'শিবরাত্রি'। তবে ২ এপ্রিল সম্ভবত স্বত্বাধিকারীরূপে অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয় ক্লাসিকে। কারণ ততদিনে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীও পাওনা টাকার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন। ৩ এপ্রিল হাইকোর্টে ক্লাসিক থিয়েটারের বিপক্ষে দুটি মামলার শুনানি হয়। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অমরেন্দ্রনাথেরর মধ্যে মামলায় অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করেন বিচারপতি বডিলি। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অতুলচন্দ্র রায় ক্লাসিকের রিসিভার নিযুক্ত হন। অপর মামলাটির রায় অবশ্য অমরেন্দ্রনাথের পক্ষেই ছিল; কিন্তু তাতে লাভ হল না কিছুই। রিসিভার নিযুক্ত হওয়ায় অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটারে আর থাকতে চাইলেন না। তাঁর নিজের হাতে গড়া নাট্যসম্প্রদায় ভেঙে গেল।

অবশ্য ক্লাসিক থিয়েটার টিকে রয়েছে তখনও। ২২ এপ্রিল থেকে নিয়মিত অভিনয়ও শুরু হয়। ধর্মদাস সুর ছিলেন স্টেজ ম্যানেজার আর অধিকাংশ নাটকে নায়ক হতেন প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। কোনওমতে বুধ, শনি, রবিবার অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছিল, তবে নিতান্তই ম্লান সেসব অনুষ্ঠান। অতুলচন্দ্র রায় পরামর্শ দিলেন অমরেন্দ্রনাথকে পুনরায় ক্লাসিকে ফিরিয়ে আনতে। অমরেন্দ্রনাথ ততদিনে গ্র্যান্ড থিয়েটার খুলে[১০৩] নাট্যজগতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। তবু ক্লাসিকের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ। কাজেই সেখানকার ম্যানেজার পদের আমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। মাসিক পাঁচশ টাকা বেতনে ক্লাসিকে চলে এলেন। সঙ্গে এলেন মনোমোহন গোস্বামী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, দেবকণ্ঠ বাগচী,

কুসুমকুমারী, ব্লাকী প্রমুখ।

আবার ক্লাসিকে নতুন নাটকের প্রযোজনা শুরু হল। সুরেন্দ্রনাথ বসুর 'হল কি?' (৪ নভেম্বর, ১৯০৫), অমরেন্দ্রনাথের 'প্রণয় না বিষ' (২৩ ডিসেম্বর, ১৯০৫) এবং 'এস যুবরাজ'-এর (৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৫) পর ২৭ জানুয়ারি, ১৯০৬-তে মঞ্চস্থ হল গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদৌল্লা'।[১০৫] কিন্তু মিনার্ভায় সে নাট্যপ্রযোজনায় তখন যে খ্যাতি তার পাশে আর কারোর পক্ষেই ওই নাটক জনপ্রিয় করে তোলা কঠিন ছিল। ফলে অমরেন্দ্রনাথের উপস্থিতি সত্ত্বেও ক্লাসিকের অর্থাগম হল না। ক্লাসিকের কর্তৃপক্ষ উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করেও কোনও সুরাহা করতে পারলেন না। লোকসানের ভারে জর্জরিত তখন ক্লাসিক। যে আশায় অমরেন্দ্রনাথকে আনা হয়েছিল, লক্ষ্মীর সে কৃপালাভে বঞ্চিত হল ক্লাসিক। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর বাধল অমরেন্দ্রনাথের, আর তিনিও কোনও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে ক্লাসিক ছেড়ে দিলেন (মে, ১৯০৬)। অতুলচন্দ্র রায় শেষবারের মতো অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরীকে এনে থিয়েটার চালাতে চাইলেও সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হল না। শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল ক্লাসিক থিয়েটার।

বাংলা নাট্যজগতে ক্লাসিকের অস্তিত্ব এক দশকও নয়। এই সময়ের মধ্যে একটি নাট্যদল জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেও স্বত্বাধিকারীর জেদের বশে সর্বস্ব ব্যয়ে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। নিজের ক্ষমতায় আস্থাশীল কোনও মেজাজি বড়লোকের থিয়েটারের অভিজ্ঞতা ক্লাসিকের পূর্বে কলকাতার নাট্যরসিকদের ছিল না। আর সেই মেজাজি অমরেন্দ্রনাথ অবিবেচকের পরিচয়ও দিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে, ফলে যে অভাবনীয় লোকপ্রিয়তা তিনি অর্জন করেছিলেন ক্লাসিক থিয়েটারের সূত্রে,[১০৬] তা হারিয়ে গেল তাঁরই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের বা কখনও অপাত্রে নির্ভরতার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে। তাই আট বছরের মধ্যেই অমরেন্দ্রনাথের 'বক্ষের শোণিতে নির্মিত, বড় সাধের ঐকান্তিক ক্লাসিক রঙ্গভূমি'-র[১০৭] পরিসমাপ্তি ঘটে গেল।

কোহিনুর থিয়েটার

গিরিশযুগে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে শেষ নতুন নাট্যদল 'কোহিনুর'। তার সূচনার ইতিহাস কলকাতার নাট্যজগতের এক চাঞ্চল্যকর ভাঙাগড়ার কাহিনী। ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ নদীয়া কুড়ুলগাছির বিদ্যোৎসাহী জমিদার হাইকোর্টের উকিল প্রসন্নকুমার রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎকুমার রায় এক লক্ষ আট হাজার টাকায় প্রকাশ্য নিলামে 'এমারেল্ড' থিয়েটার কিনে নিলেন। এরপর নাট্য সম্প্রদায় তৈরির পালা। প্রথমেই এলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (তিনি তখন স্টারের অ্যামেচার শিল্পী)। দল তৈরিতে তাঁরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। প্রাথমিক পরিকল্পনায় স্থির হল চুনীলাল দেব, তাঁর ভাই নিখিলকৃষ্ণ দেব এবং আরও যে সমস্ত শিল্পী স্থায়ীভাবে কোনও থিয়েটারে যুক্ত নন, তাঁদের নিয়েই নতুন দল তৈরি হবে। কিন্তু চুনীবাবুর সঙ্গে উদ্যোক্তাদের মতান্তর ঘটে গেল।[১০৮] কোহিনুর কর্তৃপক্ষ ভাবছিলেনই অন্য দল থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী ভাঙিয়ে নিয়ে আসা ছাড়া বোধহয় এবার আর কোনও উপায় নেই। তবু তাঁরা স্টারের অভিজ্ঞ নাট্যপরিচালক অমৃতলাল বসুর পরামর্শ চাইলেন। অমৃতলাল চিরদিনই দল ভাঙানোর বিরুদ্ধে। তাঁর উপদেশ ছিল, 'নূতন লোক লইয়া শিখাইয়া দল তৈরি করো।'[১০৯] কোহিনুরের উদ্যোক্তারা সে প্রস্তাবে রাজি হলেন, শুধু তাঁদের শর্ত ছিল, অমৃতলালকেই নাট্যাচার্য হয়ে অভিনয় পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু সেই সময়ে স্টারের বেশ দুর্দিন। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'উলুপী' (প্রথমাভিনয় রজনী ৯ জুন, ১৯০৬), 'প্রায়শ্চিত্ত' (প্রথমাভিনয় রজনী ৪ অগাস্ট, ১৯০৬) এবং 'রক্ষঃ ও রমণী' (প্রথমাভিনয় রজনী ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৬) একেবারেই আশানুরূপ আর্থিক সাফল্য পায়নি। আর যে থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকে অমৃতলাল যুক্ত তার দুর্ভাগ্যের সময় তিনি দল ছেড়ে যেতে চাইলেন না। জানালেন, অন্তত ছ'মাসের আগে তাঁর পক্ষে কোহিনুরে যোগদান অসম্ভব। তাঁদের প্রস্তাব ছিল, 'যদি এক মাসের নোটিশ দিয়া আসিতে সম্মত হন, আমরা ছয় হাজার টাকা বোনাস ও আপনার মর্য্যাদা অনুরূপ এ্যালাওন্সেস দিতে প্রস্তুত আছি'।[১১০]

অমৃতলালকে না পেয়ে উদ্যোক্তরা এবার গিরিশচন্দ্রের দ্বারস্থ হলেন। তিনি সে সময়ে মিনার্ভায় — সেখানে তাঁর 'ছত্রপতি শিবাজীর' মহলা চলছে। গিরিশচন্দ্র পরামর্শ দিলেন, 'একা গিয়া নূতন করিয়া দল গড়িবার মত স্বাস্থ্য ও বয়স

আমার নাই, এবং সেভাবে নূতন দল গড়িতে সময়ও লাগিবে প্রায় এক বৎসর — সে খরচও বড় কম নয়। তার চেয়ে তোমরা অন্য সব থিয়েটার হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোক ভাঙাইয়া লও।'[১১১] এবার দল তৈরি করতে উঠে-পড়ে লাগলেন কোহিনুর কর্তৃপক্ষ। নতুন নাটকের জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদের শরণাপন্ন হলেন তাঁরা। যদিও ক্ষীরোদপ্রসাদ তখন স্টারের নাট্যকার, তবু বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মধ্যস্থতায় তিনি কোহিনুরে এলেন। 'চাঁদবিবি' লেখা শুরু হল। মোটা অর্থমূল্যের বিনিময়ে[১১২] অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নানা দল থেকে (বিশেষত মিনার্ভা ও ন্যাশনাল)[১১৩] একে একে আসতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র এলেন দশ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক পাঁচশ টাকার চুক্তিতে।

১১ অগাস্ট (২৬ শ্রাবণ), রবিবার, ১৯০৭ মহাসমারোহে কোহিনুর থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হল। এই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের নাট্য-নৈপুণ্য দেখার জন্য স্বভাবতই নাট্যমহলে উৎসাহের অভাব ছিল না। সেই প্রথম অভিনয় রজনীর কথা স্মরণ করে পরবর্তী যুগের প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছিলেন : 'অনেক কষ্টে এক টাকার জায়গায় তিন টাকা খরচ করে একখানি টিকিট সংগ্রহ করলুম। তখনকার দিনে তিন টাকা ছিল খুব উচ্চাসনের মূল্য, অত দাম দিয়ে সেই প্রথম টিকিট কিনলুম। কারণ আর সব আসন বিকিয়ে গিয়েছিল। ভিতরে গিয়ে দেখি প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের ঠাঁই নেই — চারদিকে যেন বাদুড় ঝুলছে।'[১১৪] প্রথম রাত্রিতে টিকিট বিক্রির হিড়িক এবং 'চাঁদবিবি'র আর্থিক সাফল্য সম্পর্কে অপরেশচন্দ্র লিখেছিলেন : 'স্থান থাকিলে বোধহয় আরো ছাব্বিশ শত বিক্রয় হইত। সে সময়ে শনি ও রবি উভয় দিনে একই পুস্তক অভিনয়ের রীতি ছিল না, থাকিলে বোধহয়, খুব শীঘ্রই শরৎবাবুর খরচ উঠিয়া যাইত।'[১১৫]

'চাঁদবিবি'-র সাফল্যে উৎফুল্ল কোহিনুর সম্প্রদায় কয়েকটি পুরনো মঞ্চসফল নাটকের অভিনয়ের পর মিনার্ভার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 'ছত্রপতি শিবাজী' মঞ্চস্থ করে প্রথম ১৫ সেপ্টেম্বর (মিনার্ভায় প্রথমাভিনয় রজনী ছিল ১৭ অগাস্ট, ১৯০৭)। নাট্য-রসিকেরা উভয় থিয়েটারেই ভিড় জমান। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় একটি তুলনামূলক সমালোচনা প্রকাশিত হয় : 'উভয় থিয়েটারের অভিনয়ই তুল্যমূল্য, মিনার্ভায় শিবাজী অমরেন্দ্রবাবু, কোহিনুরে শিবাজী দানিবাবু .... এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। উহাদের দুইজনের যে স্বাভাবিক শক্তি, দুইজনের অভিনয়েই তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া গেল।[১১৬] গিরিশবাবুর অভিনয় অবশ্য তুলনা করা অনুচিত — তাঁহারই তুলনা তিনি এ মহী মন্ডলে।' এই প্রযোজনা নিয়ে দুই থিয়েটারের হ্যান্ডবিলের মাধ্যমেও যথেষ্ট বাদানুবাদ বলে। মিনার্ভার তৎকালীন স্বত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ে গিরিশচন্দ্রকে কটূক্তি করে হ্যান্ডবিল ছাপালে প্রত্যুত্তরে কোহিনুরের শিল্পীগোষ্ঠী, বিশেষ করে যাঁরা মিনার্ভা ছেড়ে এসেছেন তাঁরা, মিনার্ভা সম্প্রদায়ের নানা দুর্বলতা, কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচার ও আরও অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশ করে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন যা বেশ কিছুদিন তৎকালের নাট্যমহলে এক সরস আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এদিকে আবার দু-এক মাস যেতে না যেতেই কোহিনুর সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেই গোলমাল দেখা দেয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় নিয়ে মনোমালিন্যে তারাসুন্দরী দল ছাড়লেন আর তাঁর অনুগামী হলেন অপরেশচন্দ্র। এবার তিনকড়িকেই প্রধান নারী চরিত্রে দেখা গেল। নায়ক চরিত্রে দানীবাবু। পুরনো নাটকের প্রযোজনার মধ্যে জনপ্রিয় ছিল 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'য্যায়সা কা ত্যায়সা', 'মীরকাশিম'।

কিন্তু সম্প্রদায়ের গোলযোগ বাড়তেই লাগল। বছর শেষ হওয়ার আগেই স্বত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন, শারীরিক উন্নতির আশায় মধুপুরে গেলেন বায়ু পরিবর্তনে, লাভ বিশেষ হল না। এদিকে গিরিশচন্দ্রও হাঁপানিতে শয্যাশায়ী, থিয়েটারে আসতে পারেন না, বাড়ি থেকেই পরামর্শ দিয়ে নাট্যপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নাট্যশিক্ষার ভার কার্যত দানীবাবুর ওপরেই। এই পরিস্থিতিতে অভিনীত হল নতুন রঙ্গনাট্য ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' (২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৭) বাঙ্গের মোড়কে স্বাজাত্যপ্রীতি প্রকাশের প্রচেষ্টা ভালোই লেগেছিল দর্শকদের। বিশেষভাবে তক্ষকের ভূমিকায় হাঁদুবাবু (মন্মথনাথ পাল) খুবই প্রশংসিত হন।

৩১ ডিসেম্বর শরৎচন্দ্র রায় মারা গেলেন। মাত্র ছয় মাস যেতে না যেতেই সম্ভাবনাময় এই নতুন নাট্যদলের দুর্ভাগ্য শুরু হয়ে গেল। ১৯০৮ সালে কোহিনুর নাট্যদলের কর্ণধার হলেন শরৎকুমার রায়ের ভাই শিশিরকুমার রায়। থিয়েটার চালাতে গেলে যে বিচক্ষণতা এবং সহিষ্ণুতা প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না। ফলে শিল্পীদের এমনকি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গেও

তাঁর মতদ্বৈততা দেখা দিল। কোহিনুর সম্প্রদায়ের এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মিনার্ভার মালিকেরা গিরিশচন্দ্র ও দানীবাবুকে তাঁদের থিয়েটারে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দানীবাবু এলে নায়কেব ভূমিকা বণ্টন নিয়ে মতান্তর বা রেষারেষির সৃষ্টি হবে, মিনার্ভার তদানীন্তন নায়ক অমরেন্দ্রনাথের এই যুক্তি কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তাই পিতা-পুত্র কোহিনুর থিয়েটারেই রয়ে গেলেন।

১৯০৮ সালের প্রথম নতুন প্রযোজনা মার্চ মাসে — ইতিহাসভিত্তিক নাটক 'অশোক' (প্রথমাভিনয় রজনী ৮ মার্চ, ১৯০৮)। নাট্যকার আবারও ক্ষীরোদপ্রসাদ। নাম ভূমিকায় ছিলেন দানীবাবু। তাঁর চণ্ডাশোক দর্শকদের মুগ্ধ ক'রে রাখত। এমনকি বহু বছর পরেও সে অভিনয়ের ছবি প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিতে অম্লান — 'অশোকের ভূমিকায় দানীবাবু যে সুন্দর অভিনয় করেছিলেন আমরা এখনও তা ভুলতে পারিনি। নিবিড় বনের ভিতরে একটি দৃশ্যে ক্ষুধায় উন্মত্ত অশোক অন্যের কাছ থেকে খাবার কেড়ে নিয়েছিলেন, দানীবাবুর তখনকার মুখভঙ্গি এখনও আমাদের মনে আছে ছবির মতো।'[১১৭]

কিন্তু 'অশোক'-এর প্রযোজনায় আশানুরূপ অর্থপ্রাপ্তি ঘটেনি। এর আগে থেকেই বেশ কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে বেতন সংক্রান্ত কারণে শিশিরকুমারের মতবিরোধ হয়। একে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে, তার ওপর খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দল ছাড়তে আরম্ভ করলে বিব্রত শিশিরকুমার রায় অপরেশচন্দ্র আর তারাসুন্দরীকে স্টার থেকে নিয়ে এলেন। ২২ মার্চেই 'বিজিয়া' নাটকের নামভূমিকায়[১১৮] আবার দেখা গেল তারাসুন্দরীকে।

এপ্রিল মাসে আবার নতুন নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাসন্তী' (প্রথম অভিনয় ৪ এপ্রিল শনিবার, ১৯০৯)। এরপরই অভিনীত হল নিত্যবোধ বিদ্যারত্নের 'বাজীমাৎ'। কিন্তু তুলনায় পুরনো নাটক 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'প্রতাপাদিত্য'-র প্রযোজনা অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়। কিন্তু দলের অভিনয়ের খ্যাতি হলেও, অন্তর্বিরোধ ক্রমশই বাড়তে থাকে। আসলে শিশিরকুমার রায়ের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের কোনওদিনই সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আবার কোহিনুরে আসার প্রায় পর থেকেই গিরিশচন্দ্র অসুস্থ। তাই নতুন নাটক না লিখতে পাবা শুধু নয়, নাটক পরিচালনা করাও তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। নাট্যশিক্ষকেব কাজ কিছুটা দানীবাবু চালিয়ে নিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটা কোনওদিনই শিশিরবাবুর মনঃপূত হয়নি। গিরিশচন্দ্রের ক্রমাগত অসুস্থতায় অধৈর্য শিশিরকুমার তাঁর বেতন বন্ধ করে দিলেন। অবশ্য এ সময়েই গিরিশচন্দ্র 'গৃহলক্ষ্মী'[১১৯] লিখতে শুরু করেছেন — প্রায় চার অঙ্ক লেখা হয়ে গেছে। হঠাৎ খেয়াল করলেন যে কোহিনুর থেকে তিনি তিনমাসের বেতন পাননি। সমস্ত অনুরোধ নিষ্ফল হলে গিরিশচন্দ্র আদালতের শরণাপন্ন হলেন। এদিকে এস্টেটের দেনা আর থিয়েটাবের লোকসানে বিচলিত শিশিরকুমার মনে করলেন তাঁর এই দুর্গতির কারণ গিরিশচন্দ্রের অসহযোগিতা। ফলে বিবোধ মেটানোর কোনও চেষ্টাই তিনি কবলেন না। আদালতের রায় গিরিশচন্দ্রের পক্ষেই গেল। এ প্রসঙ্গে হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত লিখেছেন · 'Mr. Justice Fletcher considered the evidence of Girish Chandra as absolutely trustworthy and granted him the decree sought for.'[১২০]

ক্ষতি কোহিনুরেরই হল। গিরিশচন্দ্র জুলাই মাসে মিনার্ভায় যোগ দিলেন, সঙ্গে গেলেন দানীবাবু। তার ওপর অসুস্থ তিনকড়ি গিরিশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে আর কোহিনুরে রইলেন না। নাট্যশিক্ষক হিসাবে শিশিরকুমার রায় তখন অর্দ্ধেন্দুশেখরকে নিয়ে এলেন মিনার্ভা থেকে। তাঁর পরিচালনায় প্রথম নতুন নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বরুণা' (প্রথমাভিনয় রজনী ১১ জুলাই, ১৯০৮)। অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনয় না করলেও প্রযোজনাটি জনপ্রিয় হয়। জুলাই মাসে 'সংসার', 'জেনানা যুদ্ধ' প্রভৃতি নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনয়ে অংশ নেন। তবে ৯ অগাস্ট 'নবীন তপস্বিনী' ও 'প্রফুল্ল' নাটকে জলধর এবং যোগেশের ভূমিকায় তাঁর শেষ মঞ্চাবতরণ। এরপরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

এবার 'কোহিনুর' চলতে থাকে অপরেশচন্দ্রের মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বধানে। ক্ষীরোদপ্রসাদের দুটি নতুন নাটক 'দৌলতে দুনিয়া' (প্রথমাভিনয় ২১ নভেম্বর ১৯০৮)[১২১] এবং 'ভূতের বেগার' (২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৮ সালে প্রথম অভিনীত) বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল বলে মনে হয় না। কোহিনুর সম্প্রদায়ের পরবর্তী নাট্যপ্রযোজনা হরনাথ বসু রচিত 'পাঞ্জাব গৌরব'--এর প্রথম অভিনয় ১৯০৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও, দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে শিখমহলে

প্রবল প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, তাদের বিক্ষোভে বাধ্য হয়ে অভিনয় বন্ধ রাখা হল। একজন সামান্য বারাঙ্গনা শিখ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয় ঠাকুর সিংয়ের জননীর চরিত্রে অভিনয় করছেন — এই ছিল প্রতিবাদের কারণ। চতুর্থ অঙ্কে যে সংলাপ ছিল — 'আমি শুধু ঠাকুর সিংয়ের মা নয়, আমি সমস্ত পাঞ্জাব তথা শিখ সম্প্রদায়ের মা' — একজন বারাঙ্গনার মুখে এই সংলাপ শুনে শিখ সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। গত্যন্তর না দেখে নাট্যকাহিনীর পরিবর্তন ঘটাতে হল। মহারাষ্ট্র বীর রাজারামের জীবনচরিত অবলম্বনে ও মারাঠি চরিত্রের সমন্বয়ে 'পাঞ্জাব গৌরব' রূপান্তরিত হল 'বীরপূজা'-য় (প্রথম অভিনয়, ৩০ জানুয়ারি, ১৯০৯)। নায়ক রাজারাম চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেন অপরেশচন্দ্র। 'বীরপূজা' কোহিনুরের হৃত সুনাম অনেকটাই ফিরিয়ে আনে।

পরবর্তী নতুন প্রযোজনা 'ময়ূর সিংহাসন'-এর নাট্যকারও ছিলেন হরনাথ বসু (প্রথমাভিনয় রজনী ৮ মে, ১৯০৯)। সাজাহানের শেষ জীবনের কাহিনী নিয়ে লেখা এই নাটকে[১২২] সাজাহান ও দারার ভূমিকায় পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও অপরেশচন্দ্র খুবই ভালো অভিনয় করেন। জুন মাসের ৬ তারিখে নতুন নাটক দুর্গাদাস দে-র 'নেড়া হরিদাস' (যোগেন্দ্রনাথ বসুর ওই নামেরই উপন্যাসের নাট্যরূপ) মঞ্চস্থ হল। বিধবা বৃন্দার ভূমিকায় তারাসুন্দরীর অভিনয় প্রশংসিত হয়। নতুন প্রযোজনা জুলাই মাসের তালিকাতেও ছিল — 'প্রতিফল' (প্রথম অভিনয় ৩ জুলাই, ১৯০৯)।

কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না। ২১ অগাস্ট দুর্গাদাস দে-র 'সোনার সংসার' মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই দল ছেড়ে দিলেন অপরেশচন্দ্র আর তারাসুন্দরী।[১২৩] তবে 'সোনার সংসার' বা পরবর্তী নতুন নাটক হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের 'দুর্গাবতী' (প্রথম অভিনয় ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৯) প্রমদাসুন্দরী, ভূষণকুমারী, ক্ষেত্রমোহন মিত্র এবং মন্মথ পালের জোরালো অভিনয়ে (এবং দ্বিতীয় নাটকের আরাবল্লী পর্বতের দৃশ্য পরিকল্পনায়)[১২৪] দর্শকদের ভালোই লেগেছিল। তবু দলের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না। এমনকি দলের কলাকুশলীদের বেনিফিট নাইটের আয়োজনে যে ২৪টি নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসনের নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় নৃত্যগীত সহযোগে পরিবেশিত হবে তার বিজ্ঞাপনে[১২৫] দর্শক সমাগমের জন্য আবেদনও করা হল, কিন্তু যথাযথ সাড়া পাওয়া গেল না।

এবার দলের হাল ফেরাতে চুনীলাল দেবকে নিয়ে আসা হল 'ন্যাশনাল থিয়েটার'[১২৬] থেকে (জুন মাসে তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হল নাট্যশিক্ষক হিসাবে)। কিন্তু জুলাই মাসেই দেখা গেল নাট্যাভিনয়ের চেয়ে এলফিনস্টোন কোম্পানির বায়োস্কোপ, প্রফেসর রামমূর্তির ব্যায়াম বা মিস ফ্লোরার ম্যাজিকের প্রদর্শনীই ছিল কোহিনুর থিয়েটারের মুখ্য অনুষ্ঠান। অভিনীত কয়েকটি নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের চণ্ড'-ই (৩১ জুলাই, ১৯১০) একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন চুনীলাল দেব। তবে এর মাসখানেক বাদেই চুনীলাল দেব দল ছেড়ে দেন আর সে সময় দলের নাট্যপ্রযোজনাও অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

অক্টোবর মাস থেকে আবার নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া গেলেও সাফল্য বিশেষ আসেনি। ২৯ অক্টোবর হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'আকবরের স্বপ্ন' যখন অভিনীত হল, তখন দলে খ্যাতিমান শিল্পী আর প্রায় নেই। তাই বিজ্ঞাপনে যতই প্রচার হোক নাটক সম্পর্কে — 'A drama pulsating with life and actions / A drama bristting with startling situations — Akbar more as a man than an Emperor'[১২৭] — এ ছিল নেহাতই এক অকিঞ্চিৎকর প্রযোজনা।

১৯১১ সালেও অবস্থার পরিবর্তন ঘটল না। নতুন কৌতুকনাট্য শৈলেন্দ্রনাথ সরকারের 'শখের জলপান' (ডুযেনা' অনুকরণে লেখা, প্রথম অভিনয় ৮ এপ্রিল, ১৯১১) বা 'মধুর মিলন' (প্রথমাভিনয় রজনী ৩ জুন, ১৯১১) কোনওটাই দলকে আর্থিক সঙ্গতি যোগাতে পারেনি। তবে দলবদলের সুবাদে আবার অপরেশচন্দ্র মিনার্ভা ছেড়ে কোহিনুরে চলে আসেন। এ সময়েই হরিশচন্দ্র সান্যাল 'বশিষ্ঠ' নামে একটি নাটক লেখেন কোহিনুর সম্প্রদায়ের জন্য, কিন্তু সে নাটক পুরোপুরি অপরেশচন্দ্রের মনোমত হল না। আসলে মিনার্ভায় থাকাকালীন গিরিশচন্দ্রের 'বিশ্বামিত্র' নাটকের পাঠ এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রের তপস্যার শক্তিতে বলীয়ান দৃপ্ত আত্মপ্রকাশ তিনি ভুলতে পারেননি। তাই হরিশচন্দ্র সান্যালের নাটক অভিনয়ের জন্য অনুমোদন করলেও, তা বহুলাংশে পরিমার্জনা করে নাটকের নাম দিলেন তিনি 'বিশ্বামিত্র' - বশিষ্ঠ

আর নায়ক রইলেন না। প্রধান দুই চরিত্রে তারকনাথ পালিত (বিশ্বামিত্র) এবং অপরেশচন্দ্র (বশিষ্ঠ) সুন্দর অভিনয় করলেন, নাটকও জনপ্রিয় হল (প্রথমাভিনয় রজনী ২৬ অগাস্ট, ১৯১০)।[১২৮] কিন্তু শুধু 'বিশ্বামিত্র'-এর আর্থিক সাফল্যে (এর পরবর্তী প্রযোজনা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রহের ফের' (২১ অক্টোবর, প্রথম অভিনীত হয়) একেবারেই দর্শক আনুকূল্য পায়নি) এতবড় একটা নাট্যসম্প্রদায় টিকিয়ে রাখা মুশকিল। তাই নতুন নাটকের জন্য অতুলকৃষ্ণ মিত্রকে নিয়ে আসা হল। শুধু তাই নয়, মিনার্ভার তৎকালীন স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রকুমার মিত্র যাতে নাট্যকারকে নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত করে না ফেলেন, সেজন্য তাঁকে শিশিরকুমারের দেশের বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হল। সেখানেই অতুলকৃষ্ণ কোহিনুরের জন্য গীতিনাট্য লিখলেন 'জেনোবিয়া'! প্রথমাভিনয় রজনী ছিল ২৫ নভেম্বর। নাম ভূমিকায় কুসুমকুমারী আর জোজিয়ফের ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বোস বিশেষ প্রশংসিত হন। নৃত্যগীতমুখর এই নাট্যের নৃত্যশিক্ষক ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। প্রযোজনা সম্পর্কে 'বেঙ্গলি' লিখেছিল[১২৯] : 'The performance of 'Zenobia' has once more brought to the fore the latent energies of the dancing master (Babu N. C. Bose), as indeed, of all concerned in the play.'

কিন্তু এত যত্নে প্রযোজিত অতুলকৃষ্ণের এই নাটকও কোহিনুরকে স্বচ্ছলতার আস্বাদ দিতে পারল না। কোহিনুরের পরের নতুন প্রযোজনা 'প্রাণের টান'-এর নাট্যকারও অতুলকৃষ্ণ (২৫ ডিসেম্বর, ১৯১১ প্রথম অভিনীত হয়)। মলেয়ার অনুসরণে লেখা এই গীতিনাট্যের ভাগ্যেও আর্থিক সাফল্য জোটেনি। অতুলকৃষ্ণ এরপর গোল্ডস্মিথের 'She stoops to conquer'-এর আদলে লিখলেন 'মোহিনীমায়া'। নাটকটি পরিচালনায় বিদেশী পরিচালক Allen Wilkie-কে[১৩০] অনুসরণ করা হল। বিজ্ঞাপন বেরল : 'The representation will take place with the light thrown upon it by the world renowned Actor Manager Mr. Allen Wilkie.'[১৩১] ৩০ মার্চ ছিল প্রথমাভিনয় রজনী। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোনও প্রয়াসই দলের ভাগ্য ফেরাতে পারল না।

এই সময়েই আবার শিশিরকুমারের সঙ্গে এস্টেট নিয়ে পরলোকগত শরৎকুমার রায়ের পত্নী মৃণালিনী দেবীর বিবাদ বাধল। পারিবারিক সম্পত্তির নিষ্পত্তি করতে গিয়ে থিয়েটারেও দেখা দিল চরম বিশৃঙ্খলা। আর্থিক দৈন্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে শিশিরকুমার কোহিনুরকে The Elysium Theatre Limited নামে এক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে সচেষ্ট হলেন। অবশ্য সে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি, কেননা মৃণালিনী দেবী এর প্রতিবাদ করলেন।[১৩২] শেষ পর্যন্ত অবশ্য উভয়পক্ষের মধ্যে মীমাংসায় স্থির হল কোহিনুর বিক্রি করে দেওয়া হবে। নিলামের দিনও স্থির হয়ে গেল — 'আগামী ২৭শে জুলাই কোহিনুর থিয়েটারের ভিটেমাটি নীলামে উঠিবে বলিয়া সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে; এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। সমবায় মূলধনে কোহিনুর ইলিসিয়ম থিয়েটারে পরিণত হইবে বলিয়া ইতিপূর্বে যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল তাহা কি কর্পূরের মত উবিয়া গেল।'[১৩৩] কিন্তু নিলামের খবরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নাটকাভিনয়ের সংবাদও ছিল। ৬ জুলাই প্রযোজিত হল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'খাঁজাহান'। নাম-ভূমিকায় অপরেশচন্দ্র ভালো অভিনয় করলেও সঙ্গতিহীন কোহিনুর সম্প্রদায়ের ভাগ্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি। ২০ জুলাই 'খাঁজাহান' এবং 'পলিন' ও ২১ জুলাই 'বিশ্বামিত্র' — এই দু'দিনই কোহিনুর নাট্যদলের শেষ অনুষ্ঠান। এরপর নির্দিষ্ট দিনেই রঙ্গালয়ের মালিকানা বদলে গেল। 'গত ২৭ জুলাই কোহিনুর থিয়েটার নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে এক লক্ষ এগার হাজার টাকায় কোহিনুর থিয়েটার ক্রয় করিয়াছেন।'[১৩৪]

এবার ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে মনোমোহন থিয়েটারের জন্ম।[১৩৫] মাত্র পাঁচ বছরেই কোহিনুর সম্প্রদায় নিঃশেষিত হয়ে গেল।

ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা পর্বে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিট সম্পর্কে 'ইন্ডিয়ান মিরর' যে মন্তব্য করেছিল তা বোধহয় এই নাট্যগৃহ সম্পর্কে এক যথার্থ ভবিষ্যৎবাণী : 'The Emerald Theatre, taken as a building has during the last few years painfully illustrated the career of the poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more.'[১৩৬]

উল্লেখসূচি

১. বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার : দলে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

২. 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের ভূমিকা।

৩. ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩, 'কৃষ্ণকুমারী'তে ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করলেন, শিল্পীর তালিকায় লেখা থাকল 'distinguished amateur.'

৪. অভিনয়ের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের আধিপত্যের অবসানে আমরা উল্লেখযোগ্যভাবে পেয়েছি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও দানীবাবুকে। নাট্য পরিচালনায় এই সময়ে তাঁর সহকারীর দায়িত্বে অমরেন্দ্রনাথ, কখনও দানীবাবু, আবার কখনও বা হরিভূষণ ভট্টাচার্য।

৫. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : পৃ : ২৯। স্বপন মজুমদার সম্পাদিত সংস্করণ।

৬. নাট্যপ্রেমী দুই বন্ধু শরৎচন্দ্র ঘোষ (ইনি সেকালের কলকাতার প্রসিদ্ধ ধনী আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) দৌহিত্র) ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ৯ নং বিডন স্ট্রিটে (এই জমি শরৎচন্দ্র তাঁর মামা অনাথনাথ দেবের কাছ থেকে লিজ নেন) স্থায়ী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, পন্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে উপদেষ্টা সমিতি গঠন করে বেঙ্গাল থিয়েটার খোলেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য সরে দাঁড়ান, দলে মধুসূদনের পরামর্শমতো মেয়েরা অভিনয় করবেন এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায়। আর নাট্যদলের উদ্বোধন রজনীর অনুষ্ঠানে মধুসূদনও বেঁচে ছিলেন না। তবে স্ত্রী চরিত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাংলা নাট্যজগতে সেই প্রথম। অভিনেত্রীরা হলেন জগত্তারিণী, গোলাপ (সুকুমারী), এলোকেশী ও শ্যামা।

কলকাতার দ্বিতীয় স্থায়ী নাট্যশালা ৬ নং বিডন স্ট্রিটে 'গ্রেট ন্যাশানাল', ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থানুকূল্যে নির্মিত। উদ্বোধন রজনী ছিল ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৩ — অভিনীত হয় 'কাম্যকানন'। কিন্তু আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনায় অভিনয় মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় নিয়মিত অভিনয়ের শুরু ১০ জানুয়ারি, ১৮৭৪ থেকে — নাটক 'বিধবা বিবাহ'। তবে এ দলের অভিনেত্রীরা (কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী) এলেন আরও পরে। ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী কি কলঙ্কিনী'-তে তাঁদেব প্রথম দেখা গেল।

৭. ইন্ডিয়ান স্টেজ, ভল্যুম ২।

৮. ভুবনমোহন নিয়োগী সে সময়ে লোকসানের দায়ে অস্থির। 'পারিজাত হরণ' (নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'আদর্শ সতী' (অতুলকৃষ্ণ মিত্র), বা 'প্রণয়কানন' (রামরতন সান্যাল) জাতীয় নাটকও দল টিকিয়ে রাখতে পারছিল না। গিরিশচন্দ্র স্বত্বাধিকারী হলে (১৮৭৭ সালের জুলাই মাস থেকে) দলে এলেন বিনোদিনী, অমৃতলাল মিত্র। দলের নাম পরিবর্তিত হল ন্যাশনাল। এখানেই তাঁর প্রথম দুটি নাটক 'আগমনী' (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪) ও 'অকালবোধন' (৩ অক্টোবর, ১৮৭৪) অভিনীত হয়। অবশ্য ছয় মাসের বেশি তিনি মালিকানায় থাকেননি। দলে অভিনয় করলেও গিরিশচন্দ্র দ্বারকানাথ দেবকে থিয়েটার ভাড়া দিলেন।

৯. নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন চালু হওয়ার পর থেকেই তিনি ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দল নিয়ে বাংলাদেশের নানা জায়গায় অভিনয় করতেন।

১০. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : পৃ : ২৮

১১. প্রতাপচাঁদ জহুরির সঙ্গে ভুবনমোহন নিয়োগীর মামলা শুরু হয়। তারই পরিণতিতে থিয়েটার নিলামে ওঠে। স্টার সম্প্রদায় ২৫০০ টাকায় নাট্যগৃহ কিনে ভেঙে ফেলে। (হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ইন্ডিয়ান স্টেজ, ভল্যুম ৩)

১২. বেঙ্গাল থিয়েটারের এই স্থায়িত্বের মূলে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের অসীম নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম। সে দলের তিনিই অধ্যক্ষ, নাট্যশিক্ষক, প্রধান অভিনেতা এবং প্রধান নাট্যকারও বটে। কিরণচন্দ্রে লিখেছেন — 'গিরিশচন্দ্রের জীবন অর্থে যেমন বঙ্গের সাধারণ নাট্যশালার জীবন বোঝায়, বিহারীলালের জীবন অর্থে বঙ্গের এই একটি বিশিষ্ট

নাট্যশালা Bengal Theatre-এর জীবন বোঝায়।'

১৩. কলকাতার নাট্যরসিকেরা যখন প্রায় চোদ্দ বছর ধরে স্ত্রী-ভূমিকায় মেয়েদের অভিনয় দেখে অভ্যস্ত এবং সন্তুষ্ট, তখন বঙ্গ রঙ্গালয়ের সুরুচি রক্ষার দায়িত্বে অভিনেত্রীবর্জিত নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করলেন রাজকৃষ্ণ রায়। তাঁর এই অভিনব নাট্যভাবনায় সংবাদপত্রের সমালোচকেরা উৎফুল্ল হলেও, আর্থিক সাফল্য আসেনি। ছয় মাসের মধ্যেই ঋণের দায়ে বিপন্ন রাজকৃষ্ণ রায় 'আর্য নাট্যসমাজ'-এর হাতে রঙ্গভূমির দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। এঁদের নাট্যাভিনয়ও ছিল শুধু পুরুষনির্ভর। দর্শক অভাবে এ দলও টিকতে পারেনি। এরপর 'বীণা' রঙ্গভূমিতে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত উপেন্দ্রনাথ দাস — তাঁর নাট্যসম্প্রদায় হল 'নিউ ন্যাশনাল'। এবার অবশ্য রাজকৃষ্ণ রায়ের সিদ্ধান্ত আর বহাল থাকল না, দলে অভিনেত্রীর আগমন ঘটল। তবে এই নাট্যসম্প্রদায়ও পারেনি বীণাকে স্থায়ী নাট্যশালায় পরিণত করতে। ১৮৮৯ সালের মাঝামাঝি আবার বীণার মালিকানা নেন রাজকৃষ্ণ রায়। তখন অবশ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে, অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয় শুরু করেছেন (এই পর্বের প্রথম প্রযোজনা 'মীরাবাঈ', ২০ জুলাই, ১৮৮৯। নাম ভূমিকায় ছিলেন তিনকড়ি)

১৪. ১৮৯১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সম্ভবত ইন্ডিয়ান থিয়েটারের অভিনয় চলে। ওই বছরই ১৬ মে সিটি থিয়েটারের উদ্বোধন রজনী। সিটি থিয়েটার প্রথম পর্যায় চলেছিল প্রায় এক বছর — ৮ মে, ১৮৯২ ছিল শেষ অভিনয় রজনী। ১৮৯২ সালের শেষের দিকে নতুন মালিকানায় (প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়) বীণা রঙ্গভূমির নামকরণ হয় ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস। বীণা মঞ্চে নীলমাধব চক্রবর্তীর সিটি থিয়েটারের পুনরাবির্ভাব ১৮৯৩ সালের অক্টোবরে — অভিনয় চলে ১৮৯৪ সালের মে পর্যন্ত। এরপব বীণা মঞ্চ বেশ কিছুদিন খালিই থাকে। তারপর সেখানে 'প্যানডোরা থিয়েটার' নামে একটি নাট্য প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। পরবর্তীকালের খ্যাতনামা নট তথা নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক ওই নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নানা কারণে দলটি ভেঙে যায়। ওই সময়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৯৭ সালে ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা) তাঁর নিজস্ব সম্প্রদায় নিয়ে বীণা রঙ্গভূমিতে নাট্যাভিনয়ে সচেষ্ট হন। কিন্তু সে চেষ্টাও ফলপ্রসূ হয়নি। আবারও নীলমাধব চক্রবর্তীই বীণার দখল নিলেন। তবে এবার আর সিটি থিয়েটার নয়। সম্প্রদায়ের নাম হল 'গেইটি থিয়েটার'।

১৫. জানুয়ারি ৭, ১৮৮৮।

১৬. এ বাড়িতে স্টার থিয়েটারের শেষ অভিনয় ৩১ জুলাই ১৮৮৭। অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' ও 'বেল্লিক বাজার'। 'নববিভাকর সাধারণী'-তে এর বিবরণ প্রকাশিত হয় : 'গিরিশবাবু সদলে স্টার থিয়েটার ভবন হইতে বিদায় লইলেন।.... বঙ্গের সর্বপ্রধান রঙ্গালয়ের এই আকস্মিক তিরোভাব বড়ই আক্ষেপের কথা।'

১৭. অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে উদ্ধৃত (৩৫ পরিচ্ছেদ)।

১৮. ১৮৮৬ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী প্রতাপচাঁদ জহুরির সঙ্গে ভুবনমোহন নিয়োগীর মামলা হয়; এরই ফলে ৬ নং বিডন স্ট্রিটের নাট্যগৃহ নিলামে ওঠে। স্টার সম্প্রদায় আড়াই হাজার টাকায় বাড়িটি কিনে তা ভেঙে ফেলে — ন্যাশনাল দলও স্বভাবতই উঠে যায়।

১৯. স্টেটসম্যান : ৮ অক্টোবর, ১৮৮৭।

২০ এ নামের নাটক (বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা) আগেই, ২২ জানুয়ারি, ১৮৮৭ বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে।

২১. হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৭ অক্টোবর, সোমবার, ১৮৮৭।

২২. হিন্দু পেট্রিয়ট : ১৭ অক্টোবর, ১৮৮৭।

২৩. গিরিশচন্দ্র ভেবে দেখলেন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের নতুন কেনা জমিতে স্টার রঙ্গালয় নির্মাণে প্রথম প্রয়োজন অর্থের, আর গোপাললাল শীল তাঁকে যে বোনাসের টাকা দেবেন তা দিয়ে তাঁর সাধের স্টার গড়া যাবে। কুড়ি হাজার টাকা থেকে ষোল হাজার টাকা গিরিশচন্দ্র নিঃশর্তভাবে স্টার কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দেন।

২৪. স্টেটসম্যান, ৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ১৮৮৭।

২৫. অভিনয়ে মতিলাল সুর (দামোদর), সুকুমারী (পূর্ণচন্দ্র) ও ক্ষেত্রমণি (ইচ্ছা) বিশেষ প্রশংসা পান। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন মহেন্দ্রলাল বসু (শালিবাহন), হরিভূষণ ভট্টাচার্য (সেবাদাস), বনবিহারিণী (লুনা) কিরণশশী (সুন্দরা), কুসুম (সারি) প্রমুখ।

২৬. ইন্ডিয়ান মিরর, ২২ মার্চ, বৃহস্পতিবার, ১৮৮৮।

২৭. টিকিটের হার তখন গ্যালারি আট আনা, পিট এক টাকা, স্টল ২ টাকা।

২৮. স্টেটসম্যান, ১৯ মে, ১৮৮৮।

২৯. প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে যায় যে, দলে থাকলেও 'পূর্ণচন্দ্র'র পর যে নাটকটি তিনি লেখেন তা ছিল স্টারের জন্য 'নসীরাম' — গোপাললাল শীলের অজ্ঞাতসারেই তা রচিত। এই নাট্যাভিয়ন ছিল স্টারের দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্বোধন রজনীতে (২৫ মে, ১৮৮৮)।

৩০. এরকম ঘটনা রঙ্গামঞ্চে আগেও ঘটেছে। যেমন 'শরৎ সরোজিনী' নাটকে সুকুমারী চরিত্রে অভিনয় করে গোলাপসুন্দরী ওই নামেই পরিচিত হন। প্রহ্লাদ চরিত্রে অভিনয়ের সাফল্যে কুসুমকুমারী হন প্রহ্লাদ কুসী।

৩১. ১৫ ফাল্গুন, ১২৯৫।

৩২. ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬।

৩৩. ইন্ডিয়ান মিরর।

৩৪. অনুসন্ধান, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬।

৩৫. দুর্গাদাস করের কনিষ্ঠ পুত্র রাধারমণ কর (আর. জি. কর ও রাধামাধব করের ভ্রাতা) সম্ভবত এর রচয়িতা।

৩৬. ১৫ আষাঢ়, ১২৯৬।

৩৭. ১৬ ও ২৫ জুলাই, ১৮৮৯।

৩৮. ২৫ জুলাই, ১৮৮৯।

৩৯. ৩২ আষাঢ়, ১২৯৬।

৪০. ৩২ আষাঢ়, ১২৯৬। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রহসনটিতে ব্রাহ্ম পরিবার সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য আছে, শিবনাথ শাস্ত্রীর এই অভিযোগে এবং অভিনয় বন্ধ করে দেওয়ার আবেদনের ফলে ইংরেজ সরকার এই নাট্যাভিনয় স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়।

৪১. এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে : এরপর অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'ভগবানে ভূত' মঞ্চস্থ হয় মিনার্ভা থিয়েটারে ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৪ সালে। পৃ : ৫০।

৪২ ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯।

৪৩ ১৫ কার্তিক, ১২৯৬।

৪৪. এ সময়েই যুবরাজ সমক্ষে শকুন্তলা নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করে বেঙ্গাল থিয়েটার 'রয়েল' উপাধি লাভ করে।

৪৫. স্টেটসম্যান, জানুয়ারি, ১৮৯০।

৪৬. অহীন্দ্র চৌধুরী : নিজেরে হারায়ে খুঁজি, ১ম খন্ড।

৪৭. ১০ জুন, মঙ্গলবার, ১৮৯০।

৪৮. ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০।

৪৯. স্টেটসম্যান, ৮ এপ্রিল, ১৮৯১।

৫০. ইন্ডিয়ান মিরর, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২।

৫১. অথচ এর প্রায় সাত বছর পরে 'ভ্রমর' (প্রথমাভিনয় রজনী ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯) ক্লাসিক থিয়েটারে অসীম

অর্থ উপার্জন করে।

৫২. অনুসন্ধান : অগ্রহায়ণ, ৭ম বর্ষ, ১৩০০।

৫৩. ইন্ডিয়ান মিরর, ২৫ নভেম্বর, শনিবার ১৮৯৩।

৫৪. ইন্ডিয়ান মিরর, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।

৫৫. একমাত্র চুনীলাল দেবের তত্ত্বাবধানে মিনার্ভাই উপহার দিয়ে নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, কিন্তু ১৯০৫ সালের সে প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্লাসিক।

৫৬. ইন্ডিয়ান স্টেজ, ভল্যুম ৩।

৫৭. অনুশীলন : ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩০১।

৫৮. ওই, ১ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

৫৯. স্টেটসম্যান, ১৯ জানুয়ারি, শনিবার, ১৮৯৫।

৬০. ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫।

৬১. ইন্ডিয়ান মিরর, ২১ এপ্রিল, ১৮৯৫।

৬২. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃ : ২৩।

৬৩./৬৪. হ্যান্ডবিলটি রমাপতি দত্তের 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মুদ্রিত রয়েছে। পৃ : ১৩৮ ও ১৪০।

৬৫. তারাসুন্দরী চলে গেলেন স্টারে। অঘোরনাথ পাঠক৩ তাই।

৬৬. ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাট্যপ্রয়াস 'ফুলশয্যা' এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হলেও একেবারেই জনপ্রিয় হয়নি। দ্বিতীয় নাটক 'প্রেমাঞ্জলি' কোনও মঞ্চেই অভিনীত হয়নি। 'আলিবাবা' তাঁর তৃতীয় নাটক।

৬৭. ৪র্থ ভাগ, ১ম সংখ্যা।

৬৮. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, পৃ : ২০।

৬৯. ওই, পৃ : ২১।

৭০. ১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৮৯৯।

৭১. অমৃত বাজার পত্রিকা : ২৮ মার্চ, ১৮৯৮।

৭২. তাঁর মনোবল এতটাই জোরালো ছিল যে প্লেগের প্রকোপে (মার্চ, ১৮৯৮) যখন স্টারের মতো থিয়েটার বন্ধ রাখা হয় — তখনও নিয়মিত অভিনয় হয়েছে ক্লাসিকে।

৭৩. ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ স্টারে 'হারানিধি' প্রথম মঞ্চস্থ হয়, আর বেলবাবু মারা যান ১৪ মার্চ, ১৮৯০। তবে ক্লাসিকে 'হারানিধি'-র প্রযোজনা দেখে এরপর স্টারেও এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। আর স্টারের সে সময় অসীম পসার — সেকালের অধিকাংশ খ্যাতিমান শিল্পী তখন স্টারে (গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, দানীবাবু, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, মহেন্দ্র চৌধুরী, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কালী কোঁয়ার, প্রমদাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, গঙ্গামণি, নগেন্দ্রবালা)।

৭৪. পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৯।

৭৫. 'সীতার বনবাস' প্রথম অভিনীত হয় প্রতাপ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটারে (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১)। লক্ষ্মণ চরিত্রে মহেন্দ্রলালের অভিনয় প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন (স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু, রঙ্গালয়, ২ চৈত্র, ১৩০৭) : 'সীতাকে বনে রাখিযা উন্মাদ্দবদ সন্তপ্ত হৃদয়াভাবে মহেন্দ্রলাল সকলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, এ অভিনয়ে আমি রাম সাজিয়াছিলাম, অদ্ভুত অভিনয় দর্শনে আমি রঙ্গামঞ্চে প্রবেশকাল বিস্মৃত হই।'

৭৬. মতান্তরের শুরু আগে থেকেই। গিরিশচন্দ্র যখন ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসে ক্লাসিকে যোগ দেন তখন শর্ত হয়, তিনি বছরে অন্তত চারটি নাটক লিখে দেবেন ক্লাসিকের জন্য। অথচ আসার নয় মাসের মধ্যে তিনি 'দেলদার' ছাড়া কিছুই লেখেননি। তার ওপর ক্লাসিকের জনপ্রিয়তা দেখে গিরিশচন্দ্র পারিশ্রমিক ব্যতীত লভ্যাংশও দাবি করেছিলেন। কিন্তু 'ভ্রমর', শ্রীকৃষ্ণ'-র সাফল্যে আত্মবিশ্বাসী অমরেন্দ্রনাথ সে প্রস্তাব তো মানেনইনি, বরং নাটক না লেখার জন্য

অনুযোগ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র বিরক্ত হয়ে থিয়েটারে আসা বন্ধ করে দেন। মিনার্ভায় যোগ দেওয়ার প্রস্তুতিও চলে, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি ক্লাসিকেই থেকে যান। আর মাত্র পাঁচদিনে লেখেন 'পাণ্ডবগৌরব'। গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল নাটকের প্রধান চরিত্রে ভীম করবেন দানীবাবু আর অমরেন্দ্রনাথ হবেন শ্রীকৃষ্ণ। অমরেন্দ্রনাথ রাজি হলেন না। তাঁর প্রস্তাব ছিল মহলায় দু'জনই আলাদা আলাদা 'ভীম'-এর চরিত্রে অভিনয় করবেন, আর যোগ্যজনকেই দেওয়া হবে সেই ভূমিকা। অমরেন্দ্রনাথই নির্বাচিত হলেন। আর অসন্তুষ্ট গিরিশচন্দ্র দানীবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন স্টারে।

৭৭. 'জনা' প্রথম অভিনীত হয় ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৩ মিনার্ভাতে। নাম ভূমিকায় তিনকড়ির অভিনয় ছিল এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। পাশপাশি প্রবীর চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেন দানীবাবু। এই ভূমিকায় দানীবাবুর এত সুনাম ছিল যে পরবর্তীকালে যখন তিনি বার্দ্ধক্যে বিপন্ন তখনও দর্শক চাহিদায় তাঁকে এই ভূমিকায় অংশ নিতে হয়েছে।

৭৮. ইন্ডিয়ান মিরর, ৩ সেপ্টেম্বর, শনিবার, ১৮৯৮।

৭৯. স্টেটসম্যান, ১০ সেপ্টেম্বর, শনিবার, ১৮৯৮।

৮০. ওই, ১৩ অগাস্ট, ১৮৯৮।

৮১. সে অভিনয় সম্পর্কে রঙ্গালয় (২য় বর্ষ, ৬৫ সংখ্যা, ১৪ ভাদ্র, ১৩০৯) মন্তব্য করে : 'গিরিশবাবু এখন অখ্যাতি সুখ্যাতির অতীত। তিনি বাঙালী থিয়েটারেব একজন প্রধান পুরুষ। তাঁহার অভিনয় দেখিবারই বিষয় বটে।'

৮২. গিরিশচন্দ্র প্রথম পর্যায়ে ক্লাসিকে ছিলেন জুলাই ১৮৯৮ থেকে ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৮ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলেন মার্চ ১৮৯৯ থেকে সম্ভবত ৫ এপ্রিল, ১৯০০।

৮৩. মিনার্ভায় 'সীতারাম'-এর নাট্যরূপ দেন গিরিশচন্দ্র এবং ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথ। দু'জনেই নামভূমিকায়।

৮৪. ২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩ ছিল মিনার্ভা থিয়েটারের উদ্বোধন রজনী। ওইদিন গিরিশচন্দ্র অনূদিত 'ম্যাকবেথ' অভিনীত হয়। ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রে গিরিশচন্দ্র এবং তিনকড়ি অসাধারণ অভিনয় করলেও প্রযোজনা একেবারেই অর্থকরী হয়নি। ৪ ফেব্রুয়ারি আবার নতুন নাটক 'মুকুলমুঞ্জরা' অভিনীত হয়। 'ম্যাকবেথ'-এর লোকসান বাঁচাতেই এই মিলনান্তক নাটক লিখেছিলেন গিরিশচন্দ্র।

৮৫. এর প্রত্যুত্তরে মিনার্ভা মঞ্চস্থ করেছিল 'সাধের বাসর', অমরেন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে। প্রথম অভিনীত হয় ১ জুন, ১৯০১। তবে রমাপতি দত্ত তাঁর 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সেই অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতির যে উল্লেখ করেছেন, তা বোধহয় সঠিক নয়। কারণ এর অনেক আগেই মিনার্ভা ছেড়ে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে চলে গেছেন।

৮৬. ইন্ডিয়ান মিরর : ৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১৯০০।

৮৭. কিছুদিন পর এপ্রিল, ১৯০১ সালে এই থিয়েটার একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ২০ এপ্রিল রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ এবং আটাশ বছরের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। (স্টারে এক অমৃতলাল বসুর একাদিক্রমে পঁচিশ বছব অধ্যক্ষরূপে অবস্থিতি ছাড়া এর তুলনীয় আর কোনও উদাহরণ বোধহয় কলকাতার নাট্যজগতে নেই) অবশ্য এ ঘটনার কয়েকবছর আগে থেকেই অন্যান্য রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেঙ্গল তথা রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। দলে প্রথিতযশা কোনও শিল্পীও ছিল না, উল্লেখযোগ্য কোনও নাটকও অভিনীত হয়নি।

৮৮. অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা ক্ষীরোদপ্রসাদের মতো নাট্যকারদের রচনাও দলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেনি। অভিনয় নিয়মিত চললেও স্টারের আগেকার প্রতিপত্তি আর ছিল না। অবস্থার পরিবর্তন হল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য'-র কল্যাণে। প্রতাপাদিত্যের প্রযোজনা (প্রথমাভিনয় রজনী : ১৫ অগাস্ট, ১৯০৩) বহুদিন পর স্টারকে আর্থিক স্বস্তি দিয়েছিল।

৮৯. তৃতীয়বারেই সবচেয়ে দীর্ঘদিন ছিলেন গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে, প্রায় চারবছর। ক্লাসিক থেকে মিনার্ভায় চলে যান সম্ভবত ১৯০৪ সালে নভেম্বর মাসের গোড়ায়।

৯০. রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ (রমাপতি দত্ত) গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ : ২৬৫, ২৬৯ ও ২৭০।

৯১. এর কিছুদিন আগে থেকেই পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের মানহানির মামলা চলছিল। কারণ পূর্ণচন্দ্র

গুপ্ত তাঁর 'নবযুগ' পত্রিকায় অমরেন্দ্রনাথ ও রঙ্গালয় সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটূক্তি করে মন্তব্য করেন। অপমানিত অমরেন্দ্রনাথ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পূর্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করান, আর সে কারণেই ব্যঙ্গানাট্যের প্রধান চরিত্র ছিল অর্ধচন্দ্র।

৯৩. অবশ্য অমৃত বাজার পত্রিকার মতিলাল ঘোষ অমরেন্দ্রনাথের মধ্যমাগ্রজ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের শরণাপন্ন হলে, দাদার অনুরোধেই অমরেন্দ্রনাথ সাতরাত্তির পর 'ভক্ত বিটেল'-এর অভিনয় বন্ধ করে দেন।

৯৪. এঁর লেখা 'সোনার স্বপন' (২৫ অগাস্ট, ১৯০০) গীতিনাট্য ক্লাসিকের খুবই সফল প্রযোজনা।

৯৫. **'অশ্রুধারা'** রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রয়াণে লেখা শোকনাট্য। ভারতমাতা হন কুসুমকুমারী, চার ভারত- সন্তানের অন্যতম ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। চারদিন মাত্র অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় ২৬ জানুয়ারি, ১৯০১।

'মনের মতন' পারস্য উপন্যাসের কাহিনী। অভিনয়ে সবচেয়ে প্রশংসিত হন দানীবাবু (মির্বাণে) ও তারাসুন্দরী (গোলেন্দাস)। তবে অমরেন্দ্রনাথের কাউলফ ও তাঁর প্রণয়িনী দেলেরার ভূমিকায় কুসুমকুমারীও ভালো অভিনয় করেছিলেন। প্রথমাভিনয় রজনী ২০ এপ্রিল, ১৯০১।

'অভিশাপ' (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০১ প্রথম অভিনীত) অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী নিয়ে এক কৌতুক নাটিকা। এই নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার কিছুদিন আগে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বোস দল ছেড়ে মিনার্ভায় চলে যান, তখন গিরিশচন্দ্রের নির্দেশে কুসুমকুমারীই নৃত্যশিক্ষার দায়িত্ব নেন।

'শান্তি' বুয়র যুদ্ধ অবসানে সন্ধিস্থাপন উপলক্ষে লেখা এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ৭ জুন, ১৯০২। বুয়র রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় কুসুমকুমারী, নৃত্য পরিচালনাও তাঁর।

'ভ্রান্তি' প্রথম অভিনীত হয় ১৯ জুলাই, ১৯০২। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রঙ্গলালের ভূমিকায় অভিনয় করেন গিরিশচন্দ্র। সেকালের সমালোচকেরাও লিখেছিলেন (রঙ্গালয় পত্রিকা), 'গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ের পাশে অন্য অভিনেতা বা অভিনেত্রী ভালো খাওয়াইতে পারিতেছেন না।' অনুরূপ অভিজ্ঞতাও ছিল প্রখ্যাত নট শিশিরকুমার ভাদুড়ীর : 'একবার combined night-এ 'ভ্রান্তি' দেখেছিলুম — রঙ্গলাল গিরিশবাবু, দেখে মনে হয়েছিল Girish Babu first and everybody else nowhere.' (শিশির সান্নিধ্যে)।

'আয়না' হালকা রসের নাটক। ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০২ প্রথম অভিনীত। প্রযোজনা জনপ্রিয় হওয়ার প্রধান কারণ বোধহয় চা-ওয়ালা ও চা-ওয়ালির ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও কুসুমকুমারীর দ্বৈত নৃত্যগীত। রঙ্গালয় (২১ মাঘ, ১৩০৯) লিখেছিল, 'নাচে গানে রঙে ঢঙে হাসি তামাসায় আয়নায় যেন চতুঃনাগরী মেল হইয়াছে।'

৯৬ 'সৎনাম'-ই গিরিশচন্দ্রের ক্লাসিকের জন্য লেখা একমাত্র নাটক যার প্রযোজনায় সম্প্রদায়ের লোকসান হয়েছে। তার কারণ অবশ্য সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভে অভিনয় বন্ধ হয়ে যাওয়া।

৯৭. গ্র্যান্ড থিয়েটারের বিজ্ঞাপন · 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ : ২৫।

৯৮. ১ মার্চ, ১৯০১ অমরেন্দ্রনাথের অর্থে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই সাপ্তাহিক নাট্যপত্রিকা হয় ক্লাসিক থিয়েটার থেকে।

৯৯. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর । পৃ : ২৫।

১০০. অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর) লিখেছেন : 'ক্ষীরোদবাবুর 'রঘুবীর' নাটক লইয়া তিনি মিনার্ভা খুলেন, কিন্তু তিনি তাল সামলাইতে পারিলেন না। মিনার্ভায় তাঁহার লোকসান হইল।' তবে সে সময়ে 'রঘুবীর' বেশিদিন না চললেও, ১৯২২ সালে ১২ মার্চ ম্যাডান থিয়েটারে 'রঘুবীর'-এর প্রযোজনা স্মরণীয় হয়ে আছে নামভূমিকায় শিশির ভাদুড়ীর অসাধারণ অভিনয়ে।

১০১. তবে মাসখানেক পরে এক সপ্তাহের জন্য অভিনয় বন্ধ রাখতে হয়, কারণ দানীবাবু হঠাৎ ইউনিক থিয়েটারের অংশীদার হয়ে ক্লাসিক ছেড়ে দেন। এবার আবার মনোমোহন গোস্বামীকে দেখা যায় শঙ্করের ভূমিকায়।

১০২. এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। ক. মিহির ও সুধাকর : ৭ ও ১৪ জ্যৈষ্ঠ,

১৩১১। খ. নবযুগ : ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১। গ. বেঙ্গলি : ৯ ও ১১ জুন, ১৯০৪।

পরবর্তীকালে চুনীলাল দেব 'সৎনাম' নামটি বদলে 'ভারত গৌরব' নাম দিয়ে ন্যাশনালে অভিনয় করেন (প্রথমাভিনয় রজনী ১ মে, ১৯০৯)। রণেন্দ্র ও বৈষ্ণবীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন চুনীলাল দেব ও তিনকড়ি।

১০৩. 'রঙ্গালয়' পত্রিকার খাতে অমরেন্দ্রনাথ ষাট হাজার টাকা ততদিনে খরচ করেছেন, তিনি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধও করেছিলেন পত্রিকাটি চালাতে। কিন্তু পাঁচকড়ি অসম্মত হওয়ায় শেষ অবধি বন্ধই হয়ে যায়।

১০৪. 'তরণীসেনবধ' প্রথম অভিনীত হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে (৫ জুলাই, ১৮৮৪)।

১০৫. হ্যারিসন রোডের কার্জন থিয়েটারের নাট্যগৃহে গ্র্যান্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ৬ মে, ১৯০৫। এপ্রিল মাসে ক্লাসিক থিয়েটার ছেড়ে আসার পর এই থিয়েটার খুলেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। দলে ছিলেন ক্লাসিক সম্প্রদায়েরই অধিকাংশ শিল্পী। প্রথম অভিনীত নাটক মনোমোহন গোস্বামীর 'পৃথ্বীরাজ'।

১০৬. এরপরেও অমরেন্দ্রনাথ 'নিউ ক্লাসিক' থিয়েটার খুলেছিলেন ১৯০৬ সালেই সেই কার্জন নাট্যগৃহে। তারপর কখনও তিনি থেকেছেন স্টারে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসাবে, কখনও মিনার্ভায় অধ্যক্ষ হিসাবে, বা আবারও স্টারে স্বত্বাধিকারী রূপে। কিন্তু অভিনেতা তথা পরিচালকের সম্মান পেলেও কোনওদিনই ক্লাসিকের সেই গৌরবময় দিন আর ফিরে আসেনি তাঁর জীবনে। ৬ জানুয়ারি, ১৯১৬ তাঁর মৃত্যু হয়।

১০৭. গ্র্যান্ড থিয়েটারের হ্যান্ডবিল : 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ : ৩৮৬।

১০৮. এ অবশ্য নতুন কোনও ঘটনা নয়। ১৮৯৩ সালে মিনার্ভা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার সময়ও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মতান্তরের কারণে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও চুনীলাল দেব ও তাঁর অনুগামীরা মিনার্ভায় যোগ দেননি।

১০৯. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : পৃ : ১২৭।

১১০. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : পৃ : ১২৮।

১১১. ওই।

১১২. যেমন তিনকড়ি, তারাসুন্দরীকে এক হাজার টাকা, দানীবাবুকে তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়।

১১৩. এই ন্যাশনাল দলের প্রতিষ্ঠা ১৯০৫ সালে, বেঙ্গল মঞ্চে — শিল্পীরা বেশিরভাগই বিলুপ্ত 'অরোরা' বা ইউনিক সম্প্রদায়ের ছিলেন।

১১৪. কলালাপ : নাচঘর, ১০ম বর্ষ, ১৭ সংখ্যা (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)।

১১৫. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর। পৃ : ১৩০।

১১৬. বঙ্গবাসী। ১১ আশ্বিন, ১৩১৪ (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭)।

১১৭. হেমেন্দ্রকুমার রায় : নাচঘর। ১৩ শ্রাবণ, ১৩০৪। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রাজা অশোককে নিয়ে এর দু'বছর পরে গিরিশচন্দ্র যে নাটক লিখেছিলেন মিনার্ভার জন্য (প্রথমাভিনয় রজনী : ৩ ডিসেম্বর, ১৯১০) সেখানেও নাম ভূমিকায় ছিলেন দানীবাবু।

১১৮. রিজিয়া (রচনা : মনোমোহন রায়) প্রথম অভিনীত হয় ১৭ মে শনিবার, ১৯০২ 'অরোরা' নাট্যদলে। তখন থেকেই এই ভূমিকায় তারাসুন্দরীর অভিনয় প্রবাদপ্রতিম হয়ে আছে।

১১৯. 'গৃহলক্ষ্মী' শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই থেকে যায়। পঞ্চম অঙ্কটি লিখেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ বসু। ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হয়।

১২০. ইন্ডিয়ান স্টেজ : ভল্যুম ৪, পৃ : ১২৯।

১২১. ১৯০২ সালে স্টার থিয়েটারের জন্য কাশ্মীরের পটভূমিকায় যে প্রেমকাহিনী 'সপ্তম প্রতিমা' রচনা করেছিলেন, তারই আদলে মিশরের পরিপ্রেক্ষিতে এই নাটক লিখেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ।

১২২. দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' এর কয়েকমাস পরে (২১ অগাস্ট, ১৯০৯) মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। নামভূমিকায় প্রিয়নাথ ঘোষের অভিনয় সেকালে তুলনারহিত ছিল, অহীন্দ্র চৌধুরীও এই চরিত্রটি রূপায়ণে খুবই

জনপ্রিয় হন।

১২৩. এঁরা সে সময় 'বাণী' থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, কোহিনুরের কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী তাতে যোগ দেন।

১২৪. বিজ্ঞাপনেও এ দৃশ্যের কথা বিশেষভাবে লেখা হত : 'The magnificent cascade and the sunny peaks of the Aravali Mountain are gems of mechanical art.'।

১২৫. বেঙ্গালি, শুক্রবার, ১৮ মার্চ, ১৯১০ : 'It is to be hoped that the appeal of the player who has so conscientiously tried to entertain the patrons of the stage for over two years and a half will meet with suitable response.'।

১২৬. বঙ্গারঙ্গা মঞ্চে এই ন্যাশনাল দলের সূচনা ২ ডিসেম্বর, ১৯০৫, বেঙ্গল মঞ্চে। ১৮৭২ সালে কলকাতার পেশাদার রঙ্গালয়ের সূচনা যে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-কে ঘিরে, নানা সুখ্যাতি এবং বহু বিপত্তি পার হয়ে কখনও 'গ্রেট ন্যাশনাল' ও পুনরায় ন্যাশনাল নাম নিয়ে সে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল — তার সঙ্গে এই নব্য 'ন্যাশনাল' দলের কোনও যোগ ছিল না।

১২৭. বেঙ্গালি, ২৯ অক্টোবর, ১৯১০।

১২৮. কোহিনুরে 'বিশ্বামিত্র'-এর সাফল্যে ব্যস্ত হয়ে মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রলাল মিত্র গিরিশচন্দ্রকে তাড়াতাড়ি তাঁর লেখা 'বিশ্বামিত্র' মঞ্চস্থ করতে অনুরোধ করেন। এদিকে গিরিশচন্দ্র তখন হাঁপানিতে আক্রান্ত, দলের নাট্যশিক্ষার ভার হরিভূষণ ভট্টাচার্যের ওপর ন্যস্ত। কিন্তু মহেন্দ্রলাল অধীর হয়ে সমস্ত কুশীলবকে গিরিশচন্দ্রের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন যাতে তাঁরই তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু অভিনয় সম্পন্ন হয়। মিনার্ভার প্রযোজনায় অবশ্য নাটকটির নাম পরিবর্তিত হয়ে রাখা হল 'তপোবল' — প্রথমাভিনয় রজনী ১৮ নভেম্বর, ১৯১১।

১২৯. শনিবার, ২ ডিসেম্বর ১৯১১।

১৩০. ইনি London Repertory Company-র প্রযোজক ও অভিনেতা। ১৯১১ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় অপেরা হাউসে Macbeth, Olhello, She stoops to conquer প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেন।

১৩১. বেঙ্গলি, শনিবার, ৩০ মার্চ, ১৯১২।

১৩২. বেঙ্গলি, ১৭ ও ২০ এপ্রিল, ১৯১২।

১৩৩. নাট্যমন্দির, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩১৯।

১৩৪. নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৯।

১৩৫. গিরিশচন্দ্রের 'কালাপাহাড়' নাটক মঞ্চস্থ হয় উদ্বোধন রজনীর অনুষ্ঠানে (৭ অগাস্ট, ১৯১৫)। মনোমোহন পাঁড়ে এ থিয়েটারের নাম রাখতে চেয়েছিলেন মিনার্ভা। কিন্তু পরে মিনার্ভার অন্যতম স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মিত্র (মিনার্ভার পূর্বতন স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রনাথ মিত্রের ভাই) ওই একই নাম ব্যবহারের বিরুদ্ধে আদালত থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করানোর ফলে মনোমোহন পাঁড়ে কোহিনুর মঞ্চের নতুন নামকরণ করলেন মনোমোহন থিয়েটার। এই থিয়েটার চলেছিল ১৯২৪ সালের এপ্রিল- মে মাস নাগাদ। তারপর

মনোমোহন নাট্যমন্দির	: লেসী শিশিরকুমার ভাদুড়ী, ১৯২৪-১৯২৫।
মিত্র থিয়েটার	: লেসী জ্ঞানেন্দ্র মিত্র ও শিশির মিত্র, ১৯২৬-১৯২৭।
আর্ট থিয়েটার	: লেসী আর্ট থিয়েটার লিমিটেড, ১৯২৭-১৯২৮।
মনোমোহন থিয়েটার	: লেসী অনাদি বসু, ১৯২৮-১৯২৯।
	: লেসী প্রবোধচন্দ্র গুহ, ১৯২৯-১৯৩১।

শেষ অভিনয় ১ মার্চ, ১৯৩১।

এরপর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের প্রসারে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়।

১৩৬. ২৬ এপ্রিল, শুক্রবার, ১৮৯৭।

ক্ষীরোদপ্রসাদ

অমৃতলাল বসু

শিশিরকুমার ঘোষ

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাট্যশালা

মন্মথ রায়

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে স্বার্থান্ধ রাজপুরুষদের চক্রান্তে বাংলার নবাব হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলার জনপ্রিয় কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে দেশভক্ত মোহনলালের মুখ দিয়ে হৃতসর্বস্ব বাঙালির আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন —

'দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ সিংহাসন, যায় স্বাধীনতা ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর?'

*

'সাম্রাজ্য বণিক এই শত্রুগণ নয়।
দেখিবে তাদের হায় বাজ্য, রাজ্য-ব্যবসায়,
বিপণি সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়।
নিশ্চিত জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব শৃঙ্খল ভার ঘুচিবে না জন্মে আর,
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয়।'

এ আক্ষেপ সত্য হল। পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং ইংরেজদের কূট-কৌশল ও লোলুপ পদক্ষেপ দেখে সাবধান-বাণী

উচ্চারণ করেছিলেন — 'সব লাল হো জায়েগা'। হলও তাই। বণিকের মানদন্ড রাজদণ্ডে পরিণত হল। ক্রমে ক্রমে ভারতের বুক জুড়ে বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলার সমাজব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিচিত্তে ব্যাপক অবক্ষয় দেখা দিল যার আংশিক প্রকাশ ঘটেছে সে দিনের কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের রচনার মধ্যে। দেশের শাসনভার বণিক ইংরেজের কুক্ষিগত হওয়ায় তাদের আনুকূল্য ও প্রসাদে বাংলার শাসন ও সমাজব্যবস্থায় সম্পূর্ণ নতুন ধারা প্রবাহিত হল। শাসনের নামে শোষণই হয়ে উঠল মুখ্য — ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তার সাক্ষ্য। এক কোটি বাঙালি এই মন্বন্তরে প্রাণ হারাল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ার ফলে রাজভক্ত ভূস্বামীদের সৃষ্টি হল। দ্রুত সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটতে লাগল। অনভিজাত দেশীয় বণিকগোষ্ঠী আর কোম্পানির দেশীয় কর্মচারীরা সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার ঘটতে লাগল। প্রতিরোধের স্থানে ক্রমশ এল বশ্যতা এবং অনুরাগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের অনিশ্চয়তা ক্রমে দূরীভূত হয়ে সামাজিক স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। এই স্থিতাবস্থা ও বিদেশী শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রতিষ্ঠায় যাঁরা সর্বাধিক উদ্যোগী ছিলেন, তাঁরা ইউরোপীয় মিশনারি। এই মিশনারি শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী না থেকে দেশীয় সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তার আমদানি করলেন। এশিয়ার ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারার সম্মেলনের জন্য ১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল যার মুখপত্র হল এশিয়াটিক রিসার্চেস। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ খুলে দিল পশ্চিমের দ্বার। বাঙালি মনীষার বিশ্বজ্ঞান পরিক্রমার পথ অবারিত হল। কিন্তু এই পাশ্চাত্য চেতনার সিংহদ্বারে গিয়েই একদিন বাংলার মনীষা আপন দৈন্য অনুভব করল, বুঝতে শিখল আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে দণ্ডে পলে পলে এই আত্ম-অবনতির মধ্যে রয়েছে জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবলুপ্তির বীজ। শিক্ষার মাধ্যমে চিত্তের প্রসার ঘটায় বাঙালি বুঝতে শিখল পরাধীনতার জ্বালা। পিপাসা জাগল আত্মপ্রতিষ্ঠার। ভারতপথিক রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) সেদিন আত্মাবলুপ্তির পথ থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলেন 'ফিরে চল মন আপন ঘরে'। তিনি বুঝেছিলেন জাতিকে সমাজসচেতন করে গড়ে তুলতে হবে, তাতে ঘটবে আত্মজাগরণ, আর আত্মজাগরণের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে জাগবে স্বাধীনতালাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। ধর্মকে তাই তিনি বাস্তব প্রয়োজনের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলেন। রামমোহন জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু গোঁড়া প্রাচীনপন্থী রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রমুখ নিজেদের প্রতিষ্ঠা চাইলেন প্রাচীন প্রথার মধ্যে, অস্বীকার করলেন কালের অগ্রগমনের স্বাভাবিকতাকে; অপরদিকে হিন্দু কলেজের ডিরোজিও-পন্থী আধুনিকেরা ইংরেজিয়ানার ফেনিল মাদকতায় মত্ত হয়ে স্বেচ্ছাচারকেই সভ্যতা বলে গ্রহণ করলেন। সামাজিক অবস্থা যখন এমনই ত্রিধারা প্রবাহে দ্বিধাগ্রস্ত, তখনই ঘটল বিস্ফোরণ সারা ভারত জুড়ে। ইংরেজ শাসনব্যবস্থার মূলে ছিল বণিকীচিন্তা, যার অস্ত্র বঞ্চনা ও শঠতা। যেন-তেন-প্রকারেণ আত্মস্ফীতি ঘটানোই যেখানে লক্ষ্য, সর্বপ্রকার অনাচার ও ব্যভিচার সেখানে নিত্য সহচর। শত বৎসর শোষিত জনসাধারণের বিক্ষোভের ধূমায়মান বহ্নি ১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ নামে অকস্মাৎ দাবানলের মতো বিস্তারিত হয়ে পড়ল সারা উত্তর ভারতে। ভারতের মুক্তিপ্রচেষ্টা এই প্রথম প্রকাশ্য রূপ গ্রহণ করল। কিন্তু এই বিদ্রোহ প্রথম জনবিদ্রোহ হলেও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করেনি। শিক্ষিত সম্প্রদায় তখনও ইংরেজের শৌর্যে, চাতুর্যে, দর্শনে, কাব্যে মগ্ন হয়েছিলেন। সরাসরি সশস্ত্র বিদ্রোহ তাঁদের কাম্য ছিল না। এছাড়া ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক করে রেখেছিল। সুপরিকল্পিত নেতৃত্বের অভাব ও শিক্ষিত চিন্তানায়কদের অসহযোগিতার ফলে ব্যর্থ হল সিপাহী- বিদ্রোহ। কিন্তু নররক্তের আস্বাদ পাওয়া বাঘের মতোই স্বাধীনতার উগ্রকামনা সঞ্জীবিত হয়ে রইল দেশ জুড়ে। যে শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদ্রোহ সমর্থন করেননি, বিপ্লবকে তাঁরা স্বীকার করলেন। ধীরে ধীরে স্বাধীনতার মূল্য ও মর্যাদাবোধ তাঁরা ছড়িয়ে দিতে লাগলেন সাধারণের মধ্যে। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৭) দেশপ্রেমের রসে সিঞ্চিত কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। এই কাব্যে স্বাজাত্যবোধের সুরটি তীব্রভাবে বেজে উঠল। একই সালে প্রকাশিত হল 'নীলদর্পণ' নামে দীনবন্ধু মিত্রের নাটক, সমগ্র দেশের নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনা যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠতে পেরেছিল। বেনিয়া ইংরেজ পৃথিবীর বাজারে অতিরিক্ত মুনাফার লোভে সেদিন সারা বাংলায় নীলচাষ প্রবর্তনে

বদ্ধপরিকর। বাংলার চাষীর পেটের ভাত গেল, ঘরের সম্মান গেল, কুলবতী নারীর শ্রেষ্ঠধন খোয়া যেতে লাগল কামার্ত নীলকরের অত্যাচারে। কিন্তু 'Every dark cloud has a silver lining'. বেনিয়া ইংরেজের এই অত্যাচার ও ব্যভিচারে সমগ্র দেশে সকল মানুষের মধ্যে বিদ্রোহের সত্তা জাগ্রত হল। মার খেয়ে খেয়ে যেমন মানুষ মারকে সহ্য করতে শেখে, তারপর একদিন অনায়াসে তাকে জয় করে, তেমনই এই অত্যাচার থেকেই জন্ম নিল প্রতিরোধ। কিন্তু এই প্রতিরোধ গোড়ার দিকে বাহুর বলিষ্ঠতার থেকে লেখনীর তীক্ষ্ণতাকেই বেশি আশ্রয় করেছিল। সর্বসাধারণের বেদনা ও পারস্পরিক সহানুভূতি সেদিন বাংলার নাটক ও নাট্যশালাকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকের চেয়ে, জাতীয় বেদনাকে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরার অন্য কোনও শ্রেষ্ঠতর মাধ্যম সেদিন ছিল না। সমগ্র দেশের এই অসহায় বেদনাকে প্রকাশ করলেন দীনবন্ধু মিত্র তীব্র বিক্ষোভের রূপ দিয়ে তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে। মাইকেল মধুসূদন এই নাটকের অনুবাদ করে লাঞ্ছিত হলেন এবং পাদরি লঙ্ নাটকটি প্রকাশ করে রাজরোষে দণ্ডিত হলেন, কিন্তু তাতে 'নীলদর্পণ' নিষিদ্ধ ফলের মতো আরও আকর্ষণীয় হল। ১৮৬০-৬১ সালেই 'নীলদর্পণ' ঢাকা শহরের পাড়ায় পাড়ায় বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে অভিনীত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটকের দুঃসাহসিক ও অদম্য অভিযান শুরু হল এখান থেকেই, যার জয়যাত্রার ধ্বনি ঘোষিত হল উজ্জ্বল একটি নাম 'নীলদর্পণ'— ধ্বজাবাহক দীনবন্ধু মিত্র।

'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতাবৎকাল বাংলায় রচিত ও অভিনীত নাটকের গোত্রান্তর ঘটল। ১৭৯৫ সালে গেরাসিম লিয়েবেদেফ পাশ্চাত্য ধরনের বাংলা নাটকের অভিনয় করানোর পর থেকেই কলকাতার বিভিন্ন ধনীব্যক্তির আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু কিছু বাংলা নাটক রচিত ও অভিনীত হচ্ছিল। কিন্তু সেগুলি প্রধানত ইংরাজি বা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং কিছু তৎকালিক সামাজিক সমস্যামূলক। সামাজিক নাটকগুলি ঠিক নাটকাকার ছিল না; ছিল ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রধান নকশা জাতীয়। এই সময় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' এবং বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে রচিত নাটকগুলিই প্রাধান্যলাভ করেছিল। কিন্তু কোনওটিই একত্রে জাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবদমনের বিরুদ্ধে দৃপ্ত আত্মঘোষণা করেনি। 'নীলদর্পণ' নাটকে এই তিনটি দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ ছিল, সেই সঙ্গে ছিল বিদেশী শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রত্যক্ষ আহ্বান! তাই পরবর্তীকালের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কাছে 'গীতা'র যে স্থান হয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম যুগে 'নীলদর্পণ' সেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন লাভ করেছিল।

'নীলদর্পণ' নাটক রচনায় জাতির এক চরম সঙ্কটে বাংলার নাট্যকার যে গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন, তা অবিস্মরণীয়। মানুষের অত্যাচার যে কত নির্মম হতে পারে সেই বর্বরতার একটি জ্বলন্ত কাহিনী রূপায়িত হল জীবননিষ্ঠ এই 'নীলদর্পণ' নাটকে। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শক্তি যে নাটক, তা নতুন করে প্রমাণিত হল জীবনদর্পণ — এই 'নীলদর্পণ' নাটকে। নাটকের একটি প্রধান চরিত্র নবীনমাধবের বিলাপেই সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয় প্রজাসাধারণের মর্মবেদনা :

> 'নবীন ॥ কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি? আইন-কর্তাদিগের বা দোষ কি? যাহাদিগের হস্তে আইন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয় তবে কি দেশের সর্বনাশ ঘটে। আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি নিরাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে — তাহাদের স্ত্রীপুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষ বিদীর্ণ হয় — উনানের হাড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গরু গোয়ালেই রহিয়াছে — ক্ষেত্রের চাষ সম্পূর্ণ হল না, সকলক্ষেত্রে বীজবপন হল না, ধানের ক্ষেত্রে ঘাস নির্মূল হল না, বৎসরের উপায় কি — তাহারা 'কোথা নাথ, কোথা ভাত' শব্দে ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে।'

নবীনের এই বিলাপ সমগ্র নীলচাষীদের বিলাপ। আর এই বিলাপ থেকেই ক্রমে সমগ্র নীলচাষীদের মনে জেগেছিল এক সুদৃঢ় সঙ্কল্প — তারা নীল চাষ করবে না। নীলচাষীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ শুরু হল, তাতে স্বয়ং বড়লাট ক্যানিং পর্যন্ত বিব্রত হয়ে উঠলেন। তিনি একটা ডেসপ্যাচে লিখলেন যে, সিপাহীবিদ্রোহের সময় দিল্লির অবরোধেও তিনি এতটা উদ্বিগ্ন হননি। 'নীলদর্পণ' নাটকের ব্যাপক প্রভাব প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, 'নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল, তাহা কখনও ভুলিব না। আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই

ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহাউদ্দীপনার ফলস্বরূপ নীলকরেব অত্যাচার জন্মের মতো বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইল।' একটি জাতির জীবনে একটি মাত্র নাটক কতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কাম্য ফলকে কত অনিবার্য করে তুলতে পারে, একটি নাটক কেমন করে অর্থ ও অস্ত্রসজ্জিত অত্যাচারী শাসককে পরাভূত করতে পারে, 'নীলদর্পণ' প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সাক্ষ্য স্মরণীয়।

কবির উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে — 'ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে।' ওদের রক্তআঁখি থেকেই জনচিত্তের জাগরণ ঘটল। ইংরেজ ও ভারতীয় দুটি স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে বিদ্বেষ প্রবল হয়ে উঠল। এই বিদ্বেষে ঘৃণাই প্রধান। কিন্তু ফল স্বতন্ত্র। বিজেতার ঘৃণা প্রকাশিত নিপীড়ণে; বিজিতের ঘৃণা রূপায়িত হয় আত্মজাগরণে ও প্রতিরোধে। এই বিদ্বেষকেই বঙ্কিমচন্দ্র 'জাতিবৈর' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন — 'যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, যতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্বগৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতিবৈরের ক্ষমতার সম্ভাবনা নাই। এবং আমরা কায়মনবাক্যে প্রার্থনা কবি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব প্রবল থাকে।' এই জাতিবৈরের পশ্চাতে আছে আত্মসচেতনতা এবং আত্মসচেতনা থেকেই উদ্বোধন ঘটে আত্মজাগরণের। তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) আবির্ভাবে একটি নবযুগের সূচনা হল। বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত করলেন 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় একটি বলিষ্ঠ সুর এই কাব্যে ধ্বনিত হয়ে দেশকে চমকিত করল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে (বঙ্গাব্দ ১২৬৮ সালে) প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। দীনবন্ধু মিত্রের সামাজিক নাটক 'নীলদর্পণ' যদিও ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত নীলকর প্রজাদের দুঃখ-বেদনা, জীবন-যন্ত্রণা রূপায়িত করেছিল, কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং জ্বলন্ত দেশপ্রেমের সার্থক রূপায়ণ আমরা পাই ১৮৬১ সালে প্রকাশিত মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমাবী' নাটকে। সুতরাং 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককে বাংলার প্রথম দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা দেওয়া অসঙ্গত নয়। এই নাটকে দেশের স্বাধীনতাকামী ভীমসিংহের নিম্নলিখিত আক্ষেপটি প্রণিধানযোগ্য :

> 'ভীমসিংহ ।। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ ভারত ভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এদেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই এ ত বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা, বলতে পারিনে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বু-তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে এ দুষ্ট যবন-দলও সেইরূপ এদেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি; আমরা কি আর এ আপদ হতে কখন অব্যাহতি পাবো।'

১৮৬০ সালের পর থেকেই এই জাতীয় জাগরণ বিকশিত হতে হতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় ১৮৬৭ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলায়। এই মেলার উদ্যোক্তা ছিলেন চিন্তানায়ক নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বদেশী শিল্প, সংস্কৃতি, চিন্তা ও মনীষাকে উৎসাহ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই মেলার উদ্দেশ্য। হিন্দুমেলার লক্ষ্য বিষয়ে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘোষণা এই, 'আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারতভূমির জন্য। .... যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।' এই মেলায় দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসতেন শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, মল্লযোদ্ধা, কুটির-শিল্পী, জ্ঞানী-পণ্ডিত, কবি-সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক মনীষী। তাঁদের এই মহান মিলনে, চিত্তের আদান-প্রদানে সাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল, সাধারণ মানুষ আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল।

হিন্দুমেলার স্বাক্ষরকারীদের দ্বারা ন্যাশনাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে সারা দেশের চিন্তানায়করা প্রতি বৎসর মিলিত হয়ে দেশের সমস্যাবলী আলোচনা করে পথ-সন্ধান করতেন। এই মেলায় ১৮৭৩ সালে জাতীয় নাট্যশালার অভিনেতৃগণ 'ভারতমাতার বিলাপ' নাটকের অভিনয় করেন। তদানীন্তন অমৃতবাজার পত্রিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, অভিনয়-দর্শনে 'শ্রোতৃবর্গ মাত্র অশ্রুপতন করেন।'

১৮৭৭ সালে জাতীয় মেলায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ যে স্বরচিত কবিতাটি পাঠ করেন সেটি বিশেষ মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাটির আবেদন এত গভীর হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্নময়ী' নাটকে কবিতাটির 'বৃটিশ' শব্দস্থলে 'মোগল' লিখে সম্পূর্ণ কবিতাটির ব্যবহার করেন। ১৮৭৭ সালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন দিল্লিতে দরবারের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে শিক্ষিত সমাজের অনেকে আনন্দে অধীর হয়ে পড়ায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ বেদনাহত চিত্তে এই কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটির কিছু উদ্ধৃতি গ্রহণ করলে আমরা সেদিনের রবীন্দ্রনাথের মনকে অনুসরণ করতে পারব —

'এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরী, স্বর্গ-রসাতলে জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয় ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে —
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা!
ব্রিটিশ রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ চরণে লোটাতে শির —
ওই আসিতেছে জয়পুররাজ,
ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ,
আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!'

প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি অক্ষরে প্রবাহিত জাতীয় অধঃপতনের মর্মস্পর্শী বেদনা।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আত্মোপলব্ধির ফল ফলল। বাংলার নাটক ও নাট্যশালা 'নীলদর্পণ'-এর পূর্বে ধনী পৃষ্ঠপোষকের মুখাপেক্ষী ছিল। সাধারণ মানুষের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। ধনী ব্যক্তির সহচর ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে অভিনয়ে অংশগ্রহণও সেদিন ছিল কল্পনার অতীত। এই প্রথার অবসান ঘটিয়ে ১৮৭২ সালে বাগবাজারের কতিপয় যুবক সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করে সাধারণের কাছে মুক্ত করে দিলেন রঙ্গালয়ের দ্বার। তাঁদের এই অসমসাহসিকতার ফলেই ক্রমে ক্রমে প্রমাণিত হল যে, নাটক ও অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক জনসাধারণ। নাটক জনসাধারণের জন্য এবং জনসাধারণই নাটকের সত্যকার পৃষ্ঠপোষক! গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪-১৯১২) নেতৃত্বে, অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতায়, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর প্রভৃতির অক্লান্ত ও অদম্য পরিশ্রমে বাংলার নাট্যমন মুক্তির পথ খোলা পেল এবং সাধারণ মানুষ এই রঙ্গালয়ে এসেই লাভ করতে লাগল নবীন উদ্দীপনা — গ্রহণ করল স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র। থিয়েটার প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে একদা বলেছিলেন 'ওতে লোকশিক্ষা হয়' — এটি একটি বৃহৎ এবং প্রমাণিত সত্য। ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সাধারণ রঙ্গালয়ের নামকরণের মধ্যেও জাতীয়তাবোধ ও গণসংযোগের ইঙ্গিত আছে। এই রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে পরিচিত হয়ে যাত্রা শুরু করল জনগণের প্রাণের নাটক 'নীলদর্পণ' নিয়ে। এই নাটকের অভিনয়ে সার্থকতা তথা নাট্যকারের উদ্দেশ্যের বাস্তব সার্থকতা প্রমাণিত হয় বহু ঘটনায়, তার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একদা 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে অত্যাচারী, ব্যভিচারী এক সাহেবের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরকে যে পাদুকা-প্রহার করেছিলেন, অভিনেতা তা অভিনয়ের সার্থকতার পুরস্কার হিসাবে শিরোধার্য করেছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি বিভীষিকামূলক, ঘটেছিল উত্তরপ্রদেশে এই দলের এই নাটকের অভিনয়ের সময়। প্রখ্যাতা অভিনেত্রী বিনোদিনীর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, উত্তরপ্রদেশের এক শহরে এই নাটকের অভিনয়কালে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকরূপে উপবিষ্ট গোরা সৈনিকরা ক্রুদ্ধ হয়ে উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে মঞ্চের উপর লাফিয়ে উঠেছিল, যখন ক্ষেত্রমণির ওপর অত্যাচাররত রোগকে প্রতিহত করার জন্য হাঁসুয়া হাতে কৃষক তোরাপ জানলা থেকে লাফ দিয়ে

পড়ে হাঁক দেয় — 'আয় সুমুন্দির পো'। তোরাপের এই হুঙ্কার সমগ্র নিপীড়িত ভারতবাসীর রণহুঙ্কারের প্রতীক এবং এজন্যই অনেক সাদা চামড়াতেই তা সহ্য হয়নি।

'নীলদর্পণ' যেমন নাটকের গোত্রান্তর ঘটাল, ন্যাশনাল থিয়েটার সৃষ্টি হওয়াব ফলে তেমনই পরপর অনেকগুলি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হল, অল্পদিনের মধ্যেই ভিন্ন জাতের নাটকের সঙ্গে সঙ্গে অভিনীত হতে লাগল দেশাত্মবোধক নাটক, তার কোনওটিতে প্রত্যক্ষ কোনওটিতে বা পরোক্ষভাবে জাতীয় চেতনা মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল। ১৮৭৩ ও ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হরলাল রায়ের 'হেমলতা' ও 'বঙ্গের সুখাবসান', কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' ও 'ভারতে যবন', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' এ সময়ে খ্যাতিলাভ করে। 'ভারতমাতা' ও 'ভারতে যবন' বই দুটি প্রতীক নাটক। ভারতমাতার দুঃখে ভারতসন্তান ম্লেচ্ছবধ করে স্বাধীনতা আনয়নে সতত সচেষ্ট, 'ভারতে যবন'-এর বিষয়বস্তু এই। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় কিরণচন্দ্র লিখেছেন :

'স্বাধীনতা সম কি আছে আর?
পামর যবনে করি কি ভয়?'

নাটকটির প্রধান চরিত্র বাসুদেব উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে :

'বীরপ্রসূ এই ভারত জননী,
কত ক্লেশ আর সহিবে জানিনী?
স্বাধীনতা পদে সঁপ প্রাণ মন
লভিতে সে ধন করবে যতন।

যবন মরিবে এ জ্বালা যাইবে
জননীর দুঃখ আর না থাকিবে
স্বাধীনতা মণি হৃদয়ে ধরিবে
বিলম্ব না আব, হও অগ্রসর —'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৯-১৯২৫) 'পুরুবিক্রম' নাটকটি পূর্ণাঙ্গ। সেকেন্দার ও পুরুর ইতিহাসখ্যাত যুদ্ধ ও পুরুর চিরশ্রদ্ধেয় বীরত্ব এটির বিষয়বস্তু। পার্শ্বকাহিনীতে কুলু পর্বতের রাণী ঐলবিলার স্বদেশপ্রেম ও বীর্যবত্তা বর্ণিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্বে সাহিত্যিকবা দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন, আত্মবিস্মৃত জাতির চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন জাতির অতীত শৌর্যবীর্যের কাহিনী, দেশকে ভালোবেসে যে পূর্বসূরীরা জীবন দিয়েছেন কিন্তু মাথা নোয়ায়নি, তাঁদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে দর্শকদের দেশপ্রেমে অভিষিক্ত করা ছিল উদ্দেশ্য। 'পুরুবিক্রম' নাটকও এ জাতীয় চিন্তার ফল। বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত পুরু সেকেন্দারের সম্মুখে নীত হয়ে যে সদর্প উক্তি করেছিলেন, আজ তা প্রবাদে পরিণত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কুশলী শিল্পী ছিলেন, তাই তাঁর বক্তব্য ঘোষণা রসোত্তীর্ণই হয়েছে। সকলে যখন পুরুকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছে, একক পুরু তখনও তাঁর দৃপ্ত তেজ পরিহার না করে বলেছেন —

'সে নরাধম প্রেম থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেও করতে পারে, কিন্তু সে সহস্র চেষ্টা করলেও, স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য, সংগ্রামে প্রাণ দিতে আমাকে কিছুতেই নিবারণ করতে পারবে না।' নারীপ্রেম স্বভাবতই মানুষকে দুর্বল করে, বিরহ করে তোলে অস্থির উন্মাদ, যার আকর্ষণে মুনিদের ধ্যানভঙ্গ হয়, সেই নারীও পুরুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। আবার পুরুর সংলাপ স্মরণ করি — 'আমি যদি দেশকে উদ্ধার করতে না পারলেম তা হলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আমার কি গৌরব হবে? রাজকুমারি, আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষী নই। কিন্তু আমি সেই কথা ভাবছি যে, যদি আর কেউ আমার সহায় না হয়, সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি ঐ অসংখ্য যবন সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করব।'

কিন্তু হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকখানির আবেদন সে সময়ে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এর একটি কারণ সংলাপের ঋজুতা ও চরিত্রের স্বচ্ছতা এবং দ্বিতীয় কারণ এটির বিষয়বস্তু বাংলার ইতিহাস। বাংলার শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেন এ নাটকের নায়ক। দীর্ঘকাল বিদেশী ইতিহাসকারেরা লক্ষ্মণসেনকে ভীরু, কাপুরুষরূপেই আমাদের কাছে চিত্রিত করেছে। কিন্তু হরলাল রায় তাঁর লক্ষ্মণসেনকে দেশপ্রেমিক বীর অথচ হতভাগ্য রাজা হিসাবেই অঙ্কিত করেছেন। লক্ষ্মণসেন তাঁর নাটকে লাক্ষ্মণ্যসেন। আলোচ্য নাটকেও প্রতিপন্ন হয়েছে জাগতিক সকল কিছুর মধ্যে স্বাধীনতাই শ্রেষ্ঠ। লাক্ষ্মণ্যসেনের গুরু তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেছেন, গণনায় তিনি হিন্দুর অমঙ্গল ও যবনের জয় দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু বৃদ্ধ বীর লাক্ষ্মণ্যসেন পরাজয় নিশ্চিত জেনেও ভীত নন — 'বঙ্গভূমির কি রক্ষক নাই, রাজা নাই, সৈন্য নাই? যবনেরা জয়পতাকা তুলে, জয়বাদ্যে গগন প্রতিধ্বনিত করবে আর বঙ্গভূমি বিনা বাতাসে শুষ্কপত্রের ন্যায় নিঃশব্দে পতিত হবে — এবং কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্য সেন জীবিত থাকবে! রাজ্য, স্বদেশ, জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ করবো না? নরদেহ বিশিষ্ট লাক্ষ্মণ্য সেন কি পাষাণমূর্তি মাত্র? গুরুদেব, লাক্ষ্মণ্য সেন বৃদ্ধ বটে, ভীরু নয়। যুদ্ধ করবো।'

পরিত্যক্ত ও ভাগ্যবিড়ম্বিত লক্ষ্মণসেন বক্তিয়ার খিলজির কাছে পরাজিত হলেন। কিন্তু সেনাপতি বিরাটসেন তখনও অপরাজেয়। বিরাটসেন দেশকে ভালোবেসে যে আনন্দ, যে সম্পদ লাভ করেছিলেন, জগতের সমস্ত প্রলোভন তার কাছে তুচ্ছ। বক্তিয়ার বিরাটসেনকে সর্বপ্রকার মোহে আবদ্ধ রেখে নিস্তেজ করতে চেয়ে ব্যর্থকাম হলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, শাসক ইংরেজ শিক্ষিত বাঙালির নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার চিন্তাকে দমন করতে শুধুমাত্র শাস্ত্রবল ও আইনই প্রয়োগ করেননি, লোভনীয় প্রসাদের মোহপাশে বদ্ধ করে বহু সম্ভাব্য প্রতিভাকে তাঁরা শূন্যগর্ভ করে তুলেছিলেন। কাউকে বা কিছু মিষ্টি কথা বিতরণ করা ব্রিটিশ রাজনীতির অঙ্গ ছিল। বক্তিয়ারের প্রস্তাবে ছিল এই কৌশল, কিন্তু বিরাটসেনের প্রত্যাখ্যানে তা ব্যর্থ হয়। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে উভয়ের কথোপকথন নিম্নরূপ :

'বি॥ যখন জননীর হস্তপদ শৃঙ্খলে বাঁধা হল, তখন আর সন্তানের বেঁচে কি প্রয়োজন?

ব্য॥ তোমার বাক্য আমার অশ্রু আকর্ষণ করছে। আমি তোমাকে জীবন দিচ্ছি, স্বাধীনতা দিচ্ছি, যদি তুমি আমার অধীনে কোনও উচ্চপদ গ্রহণ করতে স্বীকার কর।

বি॥ আমি তোমার অধীনে সর্বোচ্চপদও প্রার্থনা করি না।

ব্য॥ বুঝতে পেরেছি, তুমি পরাধীন দেশে বাস করতে চাও না। চল আমার সঙ্গে আমি তোমাকে চিরস্বাধীন দেশে নে' যাচ্ছি। তুমি সেখানে স্বাধীন লোকের মধ্যে স্বাধীন হয়ে জীবনযাপন কর।

বি॥ আপন মাকে দুরবস্থায় ফেলে কি পরের মাকে মা বলবো? আমি বঙ্গমাতার সন্তান, এ আমার পরম গৌরব। ওহে মুসলমান সেনাপতি, বঙ্গভূমির তুল্য দেশ আর পৃথিবীর মধ্যে নাই। বিদেশের সুখের জন্য বঙ্গভূমিকে ভুলতে পারি না।

ব্য॥ তোমার বাক্য, বাক্য নয়, মধুবর্ষণ। আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিচ্ছি. তুমি স্বদেশে থাক, কিন্তু স্বদেশীয়গণকে বিদ্রোহী করতে চেষ্টা কর না —

বি॥ বিরাট সেনকে স্বাধীনতা দিলে সে স্বদেশীয়গণকে স্বাধীন হতে নিশ্চয়ই উত্তেজিত করবে, অতএব আমাকে স্বাধীনতা দিয়ে কাজ নাই। চল আমি তোমার ভয় নিবারণের জন্য স্বেচ্ছাপূর্বক ফাঁসিকাঠে উঠছি।'

এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পরপর 'স্বপ্নময়ী', 'সরোজিনী' প্রভৃতি কয়েকটি উদ্দীপনাময় অথচ রোমান্টিক নাটক লেখেন। 'সরোজিনী' নাটকেও আমরা দেখতে পাই —

'জ্বল জ্বল চিতা। দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন

জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।।
শোনরে যবন। শোনরে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে
সাক্ষী রবেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পথ ধরে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ দাস, উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি নাট্যকারও বেশ কয়েকটি দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করে জাতীয় কর্তব্য পালন করেন। ১৮৭৫ সালে রচিত উপেন্দ্রনাথ দাসেব 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বিষয়বস্তু রোমান্টিক, কিন্তু কাহিনীর নায়ক সুরেন্দ্র আত্মসচেতন বলিষ্ঠ যুবক, বিদেশীর পদলেহন সে ঘৃণা করে। নাটকটিতে সুরেন্দ্র ও ইংরেজ কর্মচারী ম্যাক্রেন্ডেলের শত্রুতার মধ্যে তীব্রতা আছে এবং উভয়ের বিরোধের মধ্যে স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাক্রেন্ডেল চরিত্রটি 'নীলদর্পণ'-এর 'রোগ' চবিত্রের অনুরূপ এবং আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যেও মিল আছে। এক সময় কলকাতার বাঙালি যুবকেরা সুবিধা পেলেই গোরা ঠেঙিয়ে গায়ের জ্বালা মিটিয়ে তৃপ্ত হতেন। 'সুরেন্দ্র- বিনোদিনী' নাটকে সুরেন্দ্র চরিত্রে তার বীজ অনুসন্ধান কবা যেতে পারে। নাটকটির প্রারম্ভেই এই গানটি আছে —

'হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল।।
শোক সাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি
স্মরি পূর্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে অবিরল,
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব 'জ্বল জ্বল চিতা' এবং সদ্যোক্ত গানটির মতো থিয়েটারের অনেক দেশাত্মবোধক গানই তখন ঘরে ঘরে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৭৫ সালেই বেঙ্গাল থিয়েটারে পর পর কয়েকটি দেশাত্মবোধক নাটক অভিনীত হয়। দরকার মতো নাট্যকারগণ দেশাত্মবোধক উপন্যাস ও কাব্যকেও নাট্যরূপ দিয়ে নিয়েছিলেন। ১৮৭৫ সালের ২২ মে থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'মলহরবাও গায়কোয়ার', রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত 'বঙ্গবিজেতা' ও নবীনচন্দ্র সেন কৃত 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনীত হয়।

কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকই নয়, পৌরাণিক নাটকেও নাট্যকাররা সুযোগমতো দেশাত্মবোধ সঞ্চারের প্রয়াস করেছেন। মনোমোহন বসু রচিত 'হরিশচন্দ্র' নাটকের দুটি গানে তৎকালীন শোষণ ও অত্যাচারের সুন্দর বর্ণনা আছে। আশ্চর্য ও গৌরবের বিষয় এই যে, 'হরিশচন্দ্র' রচিত হয়েছিল ১৮৭৪ সালে — যখন ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রজাদমনে ব্যস্ত, যখন ইংরেজের ঐশ্বর্যে শিক্ষিত সমাজের একাংশ মোহগ্রস্ত এবং সাধারণ মানুষেরা শাসকগোষ্ঠীর দাপটে ভীত, সন্ত্রস্ত। সেই সময় প্রকাশ্যে এমন দু'খানি গানের মাধ্যমে ব্রিটিশের শোষণনীতির প্রতিবাদ করে মনোমোহন বসু হতভাগ্য ভারতবাসীর অসহায়তার বেদনা ও ব্রিটিশের স্বেচ্ছাচারের পরিচয় উদ্ঘাটিত করে যথেষ্ট দুঃসাহস প্রকাশ করেছিলেন, যদিও হরিশচন্দ্রের মতো পৌরাণিক নাটকে গান দুটির অবতারণা একান্তই প্রক্ষিপ্ত।

১

নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর!
দে কর, দে কর, রব নিরন্তর করের দায়ে অন্ধ জ্বরজ্বর!
সিন্ধুবারি যথা শুষে দিনকর,
শোণিত শোষণ করে শত কর,
করদাহে নর নিকর কাতর, রাজা নয় যেন বৈশ্বানর!

আয়কর শুনে গায়ে আসে জ্বর!
অস্থি ভেদী রখ্যা — কর কি দুষ্কর!
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর!
        কত আর কব মুনিবর!
মাদকতা কর ছলে দেশময়
মদ্যের বিপণি; নিত্য বৃদ্ধি হয়,
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়!
হাহাকার রব নিরন্তর!

২

দিনের দিন যবে দীন হয়ে পরাধীন!
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ,
অপমানে তনু ক্ষীণ!
তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে
দেশের লোকের ভাগ্য খোসা ভূষী শেষে
        হায় গো রাজা কি কঠিন!
তাঁতি, কর্মকার, করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার —
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
        হলো দেশের কি দুর্দিন।

ছুঁই সূতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দীয়াশলাই কাঠি, তাও আসে পোতে —
প্রদীপটি জ্বালিতে; খেতে শুতে, যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন!

পরবৎসর অর্থাৎ ১৮৭৬ সালের একটি আকস্মিক ঘটনায় নাট্যশালার অবাধগতি বুদ্ধ হল। ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড তদানীন্তন রাজধানী কলকাতায় এলেন। কিন্তু সে সময় শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজভক্তির প্রাবল্য ছিল না এবং কলকাতায় যুবরাজ সংবর্ধনায় নাগরিকদের মধ্যে উদ্দীপনার অভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রাজপ্রাসাদাকাঙ্ক্ষী উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় কেবল যে যুবরাজকে সংবর্ধনা জানালেন তা নয়, দেশের প্রথা ভঙ্গ করে এবং সর্বসাধারণের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে অন্তঃপুরের নারীদের বাইরে এনে তাঁদের দিয়ে বরণ করালেন যুবরাজকে। এই ঘটনায় সমগ্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ১৮৭৬ সালে বাঙালি সমাজের এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 'গজদানন্দ' নামে একটি প্রহসন রচনা করে ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে মঞ্চস্থ করেন। এই প্রহসনে অংশগ্রহণ করেন : প্রিন্স — মহেন্দ্র বসু, গজদানন্দ — নগেন্দ্র, পিসি — ক্ষেত্রমণি।

প্রথম অভিনয় রাত্রেই পুলিস এসে তার অভিনয় বন্ধ করে দেয়। কিন্তু রঙ্গালয়ে পুলিসের স্থূল হস্তাবলেপেও কর্তৃপক্ষ বিচলিত বা ভীত হলেন না। তাঁরা প্রহসনটির নাম বদল করে ২৬ ফেব্রুয়ারি 'হনুমানচরিত' নাম দিয়ে অভিনয় করলেন। বড়লাট এবার স্বয়ং অবিলম্বে অর্ডিন্যান্স জারি করে রাজভক্ত প্রজাদের মানরক্ষার জন্য এই প্রহসনের অভিনয়

বন্ধের আদেশ দেন। অভিনয় বন্ধ হল, কিন্তু শিল্পীরা দমে গেলেন না। অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়ল; তাঁরা বুঝতে পারলেন, অবিলম্বে নাট্য-দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। এর ফলে ১৮৭৬ সালে Dramatic Performances Act নামে একটি নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরী হল। সরকার ঘোষণা করলেন, পুলিস কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনও নাট্যানুষ্ঠান করা যাবে না, যে কোনও নাটকই অভিনয়ের আগে পুলিসের হাতে জমা দিতে হবে এবং নাটক প্রকাশযোগ্য কি না তার বিচার তাঁরাই করবেন। অর্থাৎ শিল্পের বিচারকের আসনে এসে উপস্থিত হল পুলিস। তারপর শতাব্দী ধরে এই কালাকানুন নাটকের স্বতঃস্ফূর্ততাকে ব্যাহত করেছে, নাট্যকারের স্বাধীন চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে, কিন্তু বাংলার দেশপ্রেমিক নাট্যকাররা এতেও দমিত হননি।

'হনুমানচরিত'-এর অভিনয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গ্রেট ন্যাশনাল উপেন্দ্রনাথের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' পুনরায় মঞ্চস্থ করলেন ১ মার্চ ১৮৭৬ তারিখে। 'সুরেন্দ্র- বিনোদিনী' জনপ্রিয় নাটক ছিল এবং এর পূর্বে বিভিন্ন থিয়েটারে তার অভিনয় হয়ে গেছে। কিন্তু 'গজদানন্দ' ও 'হনুমানচরিত'-ভীত রাজশক্তি এতদিন পরে 'সুরেন্দ্র- বিনোদিনী'কে আপত্তিকর মনে করলেন। নাটকেব একটি দৃশ্যে যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট বিরাজমোহিনীকে রক্তাক্ত বস্ত্রসহ ধরে আনলেন, সেই দৃশ্যটিকে পুলিস অশ্লীল ঘোষণা করে অভিনয় বন্ধ করতে বাধ্য করল এবং নাট্যকা· উপেন্দ্রনাথ দাস ও অধ্যক্ষ অমৃতলাল বসু আদালতে অভিযুক্ত হলেন এবং আদালত কর্তৃক একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পরে উচ্চ আদালতে আবেদন করে তাঁরা মুক্তিলাভ করেন। এই ঘটনা কেবলমাত্র রঙ্গালয়ে নয়, সারা দেশে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং শাসকশক্তিব বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রত্যক্ষতর হয়ে ওঠে । জাতিবৈরের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা অধিকতর তীব্র হল এবং সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গঠনে চিন্তানায়কেরা প্রস্তুত হতে লাগলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ভারত সংগীত' কবিতায় প্রশ্ন তুললেন :

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?

সাহিত্য-শিরোমণি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৃন্ময়ী দেশমাতৃকার রূপ কল্পনা করে চিন্ময়ী মাতৃআবাহনে আহ্বান জানালেন দেশবাসীকে — 'চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি — এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী — অনন্ত রত্নভূষিতা — এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজা — দশদিক — দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না — আজ দেখিব না — কাল দেখিব না -- কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না — কিন্তু একদিন দেখিব — দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ প্রহরিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্য-সিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা। এস ভাই সকল। আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশকোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয়কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি।'

এই সময় ইংরেজের একটি রাজনৈতিক চাল ভারতবাসীর পক্ষে শাপে বর হল। সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুচ্ছ অজুহাতে সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত করা হল। উচ্চ রাজপদগুলি ভারতবাসীদের অধিকারে আসতে আরম্ভ করলে ইউরোপীয় কর্মচারীদের বিশেষ স্বার্থহানির সম্ভাবনা, সুরেন্দ্রনাথের দক্ষতায় তাঁরা ঈর্ষান্বিত ছিলেন। এই হল সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির আসল কারণ।

এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সংবাদপত্রগুলি মুখর হয়ে উঠল এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রতিকারের জন্য বিলাত গেলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। সরকারি কর্মচ্যুতির অজুহাতে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ব্যারিস্টারি করার অনুমতি দেওয়া হল

না। ১৮৭৫ সালের জুন মাসে তিনি ভারতে ফিরে এসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে মেট্রোপলিটন কলেজের ইংরেজির অধ্যাপকপদ গ্রহণ করলেন। সিভিল সার্ভিসের বিধি-নিয়মের বেড়া থেকে মুক্তি পেয়ে সুরেন্দ্রনাথ পেলেন বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্র। ম্যাটসনি ও গ্যারিবল্ডির আদর্শে অনুপ্রাণিত সুরেন্দ্রনাথ তাঁদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও জীবনাদর্শ প্রচার করতে লাগলেন বাংলার জনমানসে। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় ও রচনায় পাঞ্চজন্য বেজে উঠল। অচিরেই সুরেন্দ্রনাথ হয়ে দাঁড়ালেন জনগণমন অধিনায়ক। স্বাধিকার সম্পর্কে দেশবাসী যতই সচেতন হতে লাগল, ততই তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'বেঙ্গালি' কাগজে আদালতের আপত্তিকর কার্যের সমালোচনা করায় ১৮৮৩ সালে ৫ মে দু'মাস দেওয়ানি জেলে কারাবাসের দণ্ড লাভ করলেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ আন্দোলন শুরু করল এবং সমগ্র ছাত্র-সমাজ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ধর্মঘট করে আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হল। কোনও রাজনৈতিক নেতার সমর্থনে সমগ্রদেশের এমন যৌথ আন্দোলন ও ছাত্র-ধর্মঘট এই প্রথম। ১৮৮৩ সালের ভারতসভার কার্যবিবরণীতে আনন্দমোহন বসু লিখলেন —

'অশুভ থেকে শুভের উদ্ভব — বাক্যটির যাথার্থ্য এ ঘটনায় যেরূপ সুষ্ঠরূপে প্রমাণিত হল এমনটি আর পূর্বে কখনও হয় নি। এ ব্যাপারটিতে সর্বত্র যতখানি ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক হয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রদেশের জনগণ পরস্পরের জন্য বেদনাবোধ করতে শিখেছে, এবং ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন অতিদ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।' এইখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ১৮৮২ সালে 'বন্দেমাতরম্'-এর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার নবমন্ত্র ঘোষণা করলেন তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এবং পর বৎসর ১৮৮৩ সালের ৭ মে ন্যাশনাল থিয়েটার কেদার চৌধুরী কৃত 'আনন্দমঠ'-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে মাতৃমন্ত্র ছড়িয়ে দিলেন সাধারণের মধ্যে।সুজলা সুফলা জন্মভূমিকে বাঙালি নতুন করে চিনতে শিখে গভীর আন্তরিকতায় উচ্চারণ করল 'বন্দেমাতরম্'।

সমগ্র দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই ঐক্যের সূচনা ক্রমে বলিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্মলাভ করল স্বাধীনতা সংগ্রামের পথপ্রদর্শক Indian National Congress। এই কংগ্রেস থেকেই জাতীয় ভাবধারার মন্দাকিনী সমগ্র দেশকে অভিসিক্ত করতে লাগল। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। এই অধিবেশনে নানা স্থান থেকে নির্বাচিত ৪৩৬ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নওরোজী। এই অধিবেশনেই যুবক রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধন সংগীত অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল —

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে?
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আর বলে ঐ ডেকেছে কে!
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে?
যখন থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
প্রাণের বেদন জানে না কে?
মান অপমান ঘুচে গেছে,
নয়নের জল গেছে মুছে
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে!

কতদিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে;
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয়রে মাকে!'

দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেম ভারতবাসীকে যত বেশি উদ্বুদ্ধ করতে লাগল ব্রিটিশ শাসনের কঠোরতা তত বেশি প্রকট হতে লাগল। বড়লাট লর্ড কার্জনের স্বৈরশাসনে জর্জরিত ভারতবাসী ১৯০৫ সালে অকস্মাৎ জানতে পারল বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে। রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে অসমের সঙ্গে। এই সংযুক্ত প্রদেশের নাম হল পূর্ববঙ্গ ও অসম প্রদেশ। বাংলার অবশিষ্টাংশ — প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুর বাংলাদেশরূপে বর্ণিত হল। লর্ড কার্জনের উদ্দেশ ছিল দ্বিমুখী। বাঙালি জাতিকে দুই প্রদেশে বিভক্ত করে তাদেব রাজনৈতিক অগ্রগতি রোধ করা, আর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি সঞ্চার করা। বঙ্গভঙ্গের এই নিদারুণ বার্তা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চিৎপুরের পথে পথে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের হাতে মিলনের প্রতীক রাখী বেঁধে দিতে লাগলেন। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে তিনি লিখলেন — 'বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করবে, একথা আমবা কোনো মতেই স্বীকার করিব না। .... প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্রমূর্তি আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে — আঘাত অপমান ও অভাব, সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।'

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান গ্রহণ করল সমগ্র জাতি। রবীন্দ্রনাথ রচিত রাখীবন্ধনের মিলনমন্ত্রে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হল :

'বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান—

রবীন্দ্রনাথের আর একটি গানও বাঙালির জাতীয় সংগীত হল তখন :

'ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে —
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে —
ততই, মোদের আঁখি ফুটবে।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।'

জনগণ সভাসমিতি করে স্বদেশীব্রত উদ্‌যাপন করার সংকল্প নিল। বিলাতি দ্রব্য বয়কট বা বর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাও করল সঙ্গে সঙ্গে। বিলাতি-বর্জন অভাবিত সাফল্য লাভ করল।

জাতীয় সংকটে দেশাত্মবোধের এই উন্মাদনা নাটক এবং নাট্যশালাতে হল প্রতিফলিত। নাট্যশালা যে জাতির দর্পণ তা আবার নতুন করে প্রমাণিত হল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭) প্রসিদ্ধ নাটক 'প্রতাপাদিত্য'তে।

১৯০৩ সালের ১৫ অগাস্ট স্টার থিয়েটারে 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের অভিনয় শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবাহে সেই নাটক কোনও একটি থিয়েটারে আবদ্ধ না থেকে দেশের সর্বত্র অভিনীত হয়ে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই জনপ্রিয়তার মূলে ছিল প্রথমত নাটকের বিষয়বস্তু। বাংলার প্রতাপাদিত্য হিন্দু-মুসলিমের মিলিত শক্তিতে মোগলের আধিপত্য অস্বীকার করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন, নাট্যোক্ত এই ঘটনা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করল — যুগোপযোগী হওয়ায়। দ্বিতীয়ত, ক্ষীরোদপ্রসাদ দর্শকদের হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিলেন। তাঁর আবেগময় সংলাপ মুখে মুখে ছড়াতে লাগল। দেশমাতৃকা যে কত বরেণ্যা, তা এই নাটকের নিম্নোক্ত সংলাপেই সুপ্রকাশ :

সম্মুখ সমরে, দেহত্যাগে যে স্বর্গ, আমি সেই স্বর্গ চাই না। সে কার্যে যদি নরকও অদৃষ্টে থাকে, যদি বুঝতে পারি — মা আমার বেঁচেছে — তাহলে হাসিমুখে নরকেও প্রবেশ করতে পারি।

এই সময়েই বাঙালিরা ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়নের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন, এবং তা কেবল বিলাতি বর্জনের প্রতিবোধ দিয়ে নয়, বাহুবল ও অস্ত্রের কথাও তাঁরা ভাবছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে শক্তিহীনতার অপবাদ বাঙালিকে সহ্য করতে হয়েছে। এবার বাঙালির সশস্ত্র শক্তির প্রস্তুতি শুরু হল। 'প্রতাপাদিত্য'-র প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দেখতে পাই, শরাঘাতে নিহত একটি বাজপাখির ওপর স্বত্ব দাবি করছেন প্রতাপ, শঙ্কর ও বিজয়া। তাঁদের সংলাপের মধ্যেই পূর্বোক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে :

শঙ্কর।। বাঙালী ব্রাহ্মণের চির দুর্বল করে লক্ষ্যভেদের শক্তি আছে কি না পরীক্ষা করছিলুম।

প্রতাপ।। আর আমি দেখছিলুম হিন্দুস্থানের এ সীমান্ত প্রদেশের বনভূমি হতে নিক্ষিপ্ত বাণ কখনও কোনও কালে আগ্রার সিংহাসনে পৌঁছতে পারে কিনা।

এখানে স্মরণযোগ্য, ১৯০৮ সালে ক্ষীরোদপ্রসাদের রূপকনাটক 'দাদা ও দিদি' দেশপ্রেমের স্পর্শদোষেই রাজরোষে নিষিদ্ধ হয়। সে দেশপ্রেম এই নাটকে কতটুকু তা দেখা যাক :

চন্দ্রবিন্দু ।। যখন সকল জাতিই বিদ্যুৎ বেগে উন্নতির পথে চলেছে, তখন আমরাই কেবল আমাদের হট্টমালাকে নিয়ে শ্মশানের আগুনে ঝাঁপ দিব! না, ফিরি। ফেরবার বল কি পাব না? তবে অন্যে পায় কি করে? কে দেয় — কোন অমৃত প্রস্রবিনী থেকে শক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়? শুনেছি — তিনি শ্মশানেই বাস করেন। তাহলে শ্মশানেশ্বরী! আমাকে ফিরিয়ে দাও।'

ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে মাতৃরূপের যে মাধুর্য ব্যক্ত হয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে তা বাঙালির মিলনমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে এই মাতৃমন্ত্রের সাধনা সোচ্চার। দিল্লি প্রত্যাগত প্রতাপ একাকী প্রবেশ করলেন জন্মভূমিতে। দীর্ঘদিনের মাতৃ-অদর্শনের পর দেশের মাটির এই স্পর্শ তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল —

'মা বঙ্গভূমি! তোমার এই প্রাণোন্মাদকর নামের ভিতর এত মধুরতা, এমন কোমলতা, এরূপ ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ছড়ানো আছে তা তো জানতুম না। মা! তোমাকে নমস্কার, কোটি কোটি নমস্কার — আবার নমস্কার। কিন্তু কি করি? কেমন করে যশোরের মর্যাদা রক্ষা করি? করতেই হবে — যেমন করে হোক করতেই হবে। মান যাক, যশ যাক, তথাপি বঙ্গভূমিকে শত্রুপদদলন থেকে রক্ষা করতেই হবে।'

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে যোদ্ধা প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তিনি হলেন মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করে পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি আজ অবিস্মরণীয়। অহিংস অসহযোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর আরও দুইটি কর্মধারা — যার একটি ছিল হিন্দুমুসলমান-মৈত্রী এবং আর একটি ছিল অস্পৃশ্যতা বর্জন। অশুভ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ-সাধনাও তাঁর অন্যতম রাজনৈতিক পন্থা ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে সমগ্র জাতিকে তিনি একতার স্বর্ণসূত্রে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রভূত পরিমাণে সার্থকও হয়েছিলেন।

আমাদের তদানীন্তন নাটকেও গান্ধীজীর এই স্বরাজ আন্দোলন প্রতিফলিত হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিরূপে

ক্ষীরোদপ্রসাদের ১৯২১ সালে প্রকাশিত নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রযোজিত 'আলমগীর' নাটকে আমরা দেখতে পাই ভীম সিং আক্ষেপ করছেন —

'ভীমসিংহ।। হায় মেবার! তুমি আর আমাকে আকর্ষণ কর না। তোমার প্রান্তরের শ্যামলতার আবরণে অসংখ্য বীরত্ব কাহিনী শুভ্রোজ্বল তারকাখণ্ডের মত ছড়িয়ে রয়েছে। তার এক একটা থেকে থেকে প্রদীপ্ত হয়ে আমাকে তোমার কোলে ফিরে যাবার লোভ দেখাচ্ছে। ওই দেবী পদ্মিনীর চির-প্রজ্বলিত কীর্তিনিকেতন, ওই রক্তাক্ত কলেবর বালক বাদলের রণরঙ্গের নৃত্যভূমি। ওই-ওই-ওই — অসংখ্য সৌন্দর্যের স্তরে স্তরে আচ্ছাদিত মেবারীর কীর্তি-কাহিনী। না মেবার! আমাকে আর আকর্ষণ কর না। আমার হৃদয়ে এসো মেবার — ওই সমস্ত দেবতার মহত্ব নিয়ে তুমি আমার হৃদয়-সিংহাসনে অধিকার কর। আমি ত আর তোমার কোলে বসতে পাব না। মেবারীকে ঘরে ফেরবার ডাক পড়েছে। যে যেখানে মেবারী, সেই আহ্বান শুনবে, অমনি সে তোমার কোলে ফিরে আসবে। সুজাতা শুনেছে — চলে গেছে। মার শুনেছে — আর আমার কাছে থাকতে পারছে না। কেবল আমি — কেবল আমি — আমার নূতন মা, সেও বোধ হয় তোমার কোলে আশ্রয় পাবে। পাব না কেবল আমি।'

হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর জন্য তদানীন্তন জাতীয়-আকুতি পরিস্ফুট হয়েছিল এই 'আলমগীর' নাটকের শেষ দৃশ্যে।

'আওরঙ্গজেব ।। মহান রাণা রাজসিংহ! শুনুন — ঈশ্বর এক আলমগীর আর এক রাজসিংহকে এক সময়ে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য। যৌবনে তাঁরা দু'জনে এক সময়ে এ গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে না। যখন উভয়ে প্রবেশ করলে, তখন রাজসিংহ ক্ষত-বিক্ষত দেহ, আর আলমগীর — দেহে, মনে, বাক্যে জরার পীড়নে জর্জরিত। তবুও এ মিলনের অভিলাষ — হে কবি, বছর যাক, যুগ যাক, বহু শতাব্দী চলে যাক্, শতাব্দীর পরে, একদিন তোমার তুলিকা-মুখে আলমগীরের এ মিলন অভিলাষ — হিন্দু-মুসলমানের মিলন-অভিলাষ মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে, এই (ভীমসিংহকে দেখাইয়া) চিরজাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে, এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে — হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি।'

সমসাময়িক অন্য যে নাট্যকার বঙ্গারঙ্গামঞ্চে যুগসূর্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন, তাঁর নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বাংলা নাটক ও নাট্যশালার যে কোনও ইতিবৃত্তে গিরিশচন্দ্র একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর রচনার বৈচিত্র্য ও প্রতিভার বিশালতা সম্বন্ধে অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে মাত্র এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বাংলার নাট্যশালার প্রাণপুরুষ হিসাবে গিরিশচন্দ্র আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেয়ে এসেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্নেহ-নির্দেশধন্য গিরিশচন্দ্র নাটক লিখেছেন শুধু আনন্দ বিতরণের জন্য নয়, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা। তাই পৌরাণিক্ ও সামাজিক নাটকের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশি। কিন্তু যুগন্ধর গিরিশচন্দ্র তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারারও ধারক এবং বাহক ছিলেন। বঙ্গাভঙ্গা পর্বের যুগমানস তাঁর যে চারিখানি নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলি যথাক্রমে ১৯০৪ সালে লেখা 'সৎনাম', ১৯০৫ সালে রচিত 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মীরকাশিম' এবং ১৯০৭ সালে 'ছত্রপতি শিবাজী'। 'সৎনাম' নাটকটি বঙ্কিমের আনন্দমঠের আদর্শে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত, এবং আনন্দমঠের ঘটনা ও চিন্তার অনুগামী ঘটনা ও চিন্তায় সমৃদ্ধ। বঙ্গাভঙ্গের পরে একই বছরে 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশিম' প্রভৃত আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং নাট্যশালায় পুলিসি অত্যাচার আবার দেখা দেয়। মঞ্চস্থ হওয়ার পর অনতিবিলম্বেই সরকার 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক তিনটি বাজেয়াপ্ত করে এই নাট্যত্রয়ের দেশাত্মবোধের তীব্রতা প্রমাণ করলেন, এবং এগুলি রাজরোষে দগ্ধ হয়ে গৌরবোজ্জ্বল হল। ১৯০৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত 'সিরাজদ্দৌল্লা' বাংলার স্বাধীনতা-সূর্যের রাহুগ্রাস রূপায়িত করল — সঙ্গো সঙ্গো স্বেচ্ছাচারী ইংরেজকে শুনিয়ে দিল :

'রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার
নবাব রাজার ভৃত্য প্রভু প্রজাগণ।
প্রজার মঙ্গল কার্য সতত সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।'

ইংরেজ যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, বাঙালি সেদিন তাকে অগ্রাহ্য করেছিল। 'সিরাজদ্দৌলা'য় গিরিশচন্দ্র বাঙালিদের ঐক্যের আহ্বান জানালেন; আবেগব্যাকুল কণ্ঠে সিরাজ বলছেন :

'শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।'

'সিংহাসনে হয় যদি সৌকত স্থাপিত,
বাংলার ক্ষতি নাহি তাহে।
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গলায় বঙ্গবাসী — হইবে নবাব॥
কিন্তু সাবধান!
ফিরিঙ্গিরে নাহি দিও সূচ্যগ্র স্থান॥'

১৯০৩ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাটকের জোয়ার এসেছিল। নাট্যকাররা যে প্রায় সকলেই দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তার পেছনে নাট্যশালাগুলির মালিক ও অধ্যক্ষদের দানও কম ছিল না। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নাট্য পরিচালনা করলেও মালিক বা লেসীরা সাধারণের দাবিকেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁদের এই কাজ দুঃসাহসিক ছিল এই জন্য যে, যে কোনও সময়েই তাঁরা রাজরোষে পড়ে দণ্ডিত হতে পারতেন, ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল। তৎসত্ত্বেও রঙ্গালয়গুলিতে এই দশকে দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ই হয়েছে সবচেয়ে বেশি। মিনার্ভা, স্টার, ক্লাসিক, গ্র্যান্ড, কোহিনুর প্রভৃতি থিয়েটারে 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী', 'প্রতাপাদিত্য'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণাপ্রতাপ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', (অন্যান্য নাট্যকারের 'চাঁদবিবি', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'নন্দকুমার'), অমরেন্দ্র দত্তের 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ অভিনীত হতে থাকে। প্রহসন রচনার মধ্যেও এই জাতীয়তাবোধের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙ্গালী'তে চরকা, বিলাতি বর্জন, স্বদেশী প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আবির্ভাব বাংলার নাট্যজগতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। নাট্যগ্রন্থনে, সংলাপের কাব্যিক আবেগে, সংগীতের মাধুর্যে ও বলিষ্ঠতায়, বক্তব্যের অভিনবত্ব এবং বিশ্লেষণের বাস্তবমুখিতায় তিনি এক নবযুগের সূচনা করলেন। পরবর্তীকালে বাংলা মঞ্চ এই অসাধারণ প্রতিভাধর নাট্যকারের নাটকগুলি সগৌরবে দীর্ঘদিন অভিনয় করেছে। চরিত্রচিত্রণে তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ এবং তাঁর নাটকগুলির বহু চরিত্র অভিনেয়তা গুণে অভিনেতাদের চিরকাম্য হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'রাণা প্রতাপ সিংহ' (১৯০০), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'মেবার পতন' (১৯০৮) ও 'সাজাহান' (১৯০৯) জনপ্রিয়তায় অনন্যতা লাভ করেছিল। এই কবি-নাট্যকারের অনেকগুলি গান লোকের মুখে মুখে ফিরত, সভা-সমিতিতে গীত হত — এমনকি দেশব্যাপী আন্দোলনের সময়ে মিছিলের জনতার মুখে ধ্বনিত হত। তাঁর দেশাত্মবোধক সংগীতমালা 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে,' 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা,' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে', 'ভারত আমার' প্রভৃতি নাট্যসংগীত নাটকের বন্ধন উত্তীর্ণ হয়ে চিরায়ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। গিরিশের পব বাংলা নাট্যশালায় দেশপ্রেমের ভাগিরথী বহন করে আনেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের এই নব ভগীরথ সম্পর্কে এক কথায় বলা যায়, সমগ্র দেশ সঞ্জীবিত হওয়ার জন্য যেন অপেক্ষায় ছিল, অথচ এই দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন একজন রাজকর্মচারী; কিন্তু তাতেই প্রমাণিত হয় তাঁর দুঃসাহসিক অনিবার্য দেশপ্রেম। অবশ্য বৃত্তি-বিরুদ্ধ দেশপ্রেম আরও কয়েকজন রাজকর্মচারীর মধ্যেও পূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি — তাঁরা হলেন দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র সেন।

'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকে মেবারের হতভাগ্য রাণা প্রতাপ সিংহের স্বাধীনতানুরাগ, বিক্রমভাট, মানা, হরিদাস প্রভৃতির জীবনোৎসর্গ বর্ণিত হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দশকে সারা ভারত পরাধীনতা-ক্ষুব্ধ, অসহায়ের জ্বালায় জর্জর। এই ভাবটি শুনতে পাই প্রতাপের মুখে :

'জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসূ মা! এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা! তোমাকে আমার বলে ডাকতে পারি তো তোমায় স্বহস্তে আবার ভূষণ পরিয়ে দেব। নৈলে তোমাকে শ্মশানচারিণী তপস্বিনীর বেশেই রেখে দেব মা। — মা আমার! তোমাকে মোঘলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা।'

এই নাটকেরই চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে মেবারীদের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তাদের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে সারা ভারতের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান :

'ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয় গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।'

'দুর্গাদাস' নাটকের দুর্গাদাস নিহত রাজা যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী-পুত্রদের ঔরঙ্গজীবের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার সংগ্রামে ব্যাপৃত। কিন্তু নাটকের প্রাণ-চরিত্র যশোবন্তের বিধবা রাণী মহামায়া। সারা নাটক জুড়ে তিনিই সকলকে স্বাধীনতা রক্ষায় উৎসাহ দিয়েছেন, প্রজা ও অনুচরদের মধ্যে দেশপ্রীতি ও বিশ্বাসের বীজ রোপণ করেছেন। তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণ : 'তোমাদের দূর করে দলিত করে মোগল এই তোমাদের স্বর্ণভূমি অধিকার কর্বে, তাই তোমরা নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে দেখবে? হা ধিক্। .... ওঠো, এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। একবার দৃঢ়পণ করে ওঠো। ওঠো, যেমন তূরী শব্দে সিংহ জেগে ওঠে! ওঠো. যেমন ডমরু ধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে ওঠে; ওঠো — যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্ঝার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গো কল্লোল ওঠে। ওঠো! রাজস্থান জানুক, ঔরঙ্গজীব জানুন যে, তোমাদের শৌর্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই। .... যদি কারো জন্মভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকো — সে এসো। সে একাই একশ'। .... একবার সকলে এক হয়ে জন্মভূমিকে প্রাণ ভরে ডাক 'মাইজি কি জয়'।

'দুর্গাদাস' নাটকের মহামায়া চরিত্রটিকে তাঁর 'সাজাহান' নাটকেও দেখতে পাই একইরকম তেজময়ীরূপে। এই চরিত্রটির প্রতি নাট্যকারের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তা বোঝা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের বিভিন্ন নাটকে নারীর অধিকার, মর্যাদা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি নারীজাগরণমূলক চিন্তা দেখতে পাই। মহামায়া চরিত্রটি সেই চিন্তার বীর্যময় প্রকাশ। 'সাজাহান' নাটকে যশোবন্তের পরাজয় ও প্রত্যাগমন বার্তা শুনে মহামায়া বলছেন —

'কি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন? একি শুনছি ঠিক! .... যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন, তা হতে পারে। তা হয়ে থাকে ত আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্র মরে পড়ে আছেন। মহারাজা যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কখনও ফিরে আসেন নি। যে এসেছে সে মহারাজা যশোবন্ত সিংহ নয়, — সে তাঁর আকারধারী ছদ্মবেশী। তাকে প্রবেশ কর্তে দিও না। দুর্গদ্বার রুদ্ধ করে দাও।'

এমন একটি কাল এসেছিল যখন সুযোগ পেলেই প্রত্যেক নাট্যকার তাঁদের নাটকের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ প্রচারে ব্যগ্রতা দেখিয়েছেন। হরিপদ মুখার্জির 'রাণী দুর্গাবতী', হরনাথ বসুর 'ময়ূর সিংহাসন', 'গুরুগোবিন্দ', 'মহারাষ্ট্র গৌরব', মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজীরাও', প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'হামির', 'চিতোরোদ্ধার, 'জয় পরাজয়', অতুলানন্দ রায়ের 'পানিপথ', নিশিকান্ত বসু রায়ের 'দেবলাদেবী' ও 'বঙ্গো বর্গী', বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'মিশরকুমারী', অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'অযোধ্যায় বেগম', ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পেলারামের স্বাদেশিকতা' ও 'বাঙালী' এদিক থেকে সমধিক উল্লেখযোগ্য।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজীরাও' নাটকে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা আছে :

'বাজী।। গুরুদেব! এসেছেন — আমার কাজ সমাপ্ত — পদধূলি দিন —

ব্রজেন্দ্র।। কে বলে তোমার কাজ সমাপ্ত? কর্মকাণ্ডের একটা অধ্যায় এই মাত্র শেষ হয়েছে — এখনো বাকী

— অনেক বাকী। মনে নেই দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রচারী ফিরিঙ্গি দস্যুদের উচ্ছেদ করতে তুমি পণবদ্ধ; শোননি — লক্ষ লক্ষ প্রজা নিগৃহীত হচ্ছে তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে। ভারতীয়ের ধর্ম, নারীর নারীত্ব, জাতির বাণিজ্য বিধ্বস্ত হচ্ছে; ওঠ পেশোয়া — ওঠ —ভারতজননী তাকিয়ে আছেন তোমার পানে — শুধু তোমার পানে। তোমার কণ্ঠ থেকে মেঘমন্দ্রে উঠুক ধ্বনি — হর হর মহাদেও — জয় মা ভারতভূমি।'

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে স্বরাজ সাধনায় এমনই সব অগ্নিগর্ভ নাটক জাতির মনে বল গঠনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজ গভর্নমেন্টের সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও তদানীন্তন নাট্যকারগণ পরাধীনতার জ্বালা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে, যে যেখানে যেমন সুযোগ পেয়েছেন, ভাষা দিয়ে গেছেন তাঁদের নাটকে। বঙ্গীয় নাট্যশালার সবচেয়ে বড় গৌরব — দেশপ্রেম বিরোধী কোনও নাটকই লিখিত বা অভিনীত হয়নি জাতীয় সঙ্কটকালে। অমিতবিক্রম দুর্দান্ত রাশশক্তি রাজভক্তির প্রচারক নাট্যরচনায় বাধ্য করতে পারেনি বাংলার নাট্যকারদের, দেশদ্রোহী নাট্যাভিনয়ে বাধ্য করতে পারেননি নাট্যশালার মালিকদের। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দমননীতি তীব্রতর হল। পুলিসের অত্যাচার নিরঙ্কুশভাবে চলতে থাকল। দেশের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মুক্তির সন্ধানে কংগ্রেস ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করলেও কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদন নীতি' চরমপন্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। কংগ্রেস দুটি দলে বিভক্ত হল। নরম দলের নাম হল মডারেট্। গরম দলের নাম হল এক্সট্রিমিস্ট। ইতিমধ্যে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে গেল। বরিশালে পুলিস মহামান্য দেশনেতাদের ওপরেও লাঠির আঘাত হানল। এই কঠোর দমননীতির ফলশ্রুতিরূপে বিপ্লববাদ দেখা দিল বাংলায়। শুধু দেখা দিল না, রাজশক্তিকে বিব্রত উদ্বিগ্ন করে তুলল। ধরা পড়ে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের গান গেয়ে কত তরুণই না বরণ করল মৃত্যু। বহু চরমপন্থী কংগ্রেসীকেও বরণ করতে হল কারাবাস, দ্বীপান্তর। স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করে, আন্দোলনকে স্তিমিত করতে চেষ্টা করল রাজশক্তি। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, ১৯১৮ সালে সেই যুদ্ধ শেষ হল। এই যুদ্ধে পনেরো লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশের হয়ে লড়ে, এক লক্ষ ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দেয়, ভারতীয় কোষাগার থেকে নগদে ও জিনিসপত্রে রাজশক্তির হাজার কোটি টাকা যুদ্ধে খরচ হয় — জয়ীও হয় ব্রিটিশ এবং তার মিত্রশক্তি, কিন্তু যারা রক্ত দিল, অর্থ দিল, সেই ভারত যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রইল, বরং সে তিমির আরও দুঃসহ হয়ে দাঁড়াল যুদ্ধে যোগদানজনিত খাদ্যাভাব এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রাণান্ত পরিণতিতে। ভারতরক্ষা আইন উঠে গেলে তার জায়গায় এল রাওলাট আইন — ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সভাসমিতি করার ক্ষমতাকে নস্যাৎ করতে। সমগ্র ভারতে যেন আগুন জ্বলে উঠল। জাতীয় জীবনের এই চরম সঙ্কটে এলেন পরিত্রাতা। তিনি মহাত্মা গান্ধী। তাঁরই নেতৃত্বে জাতি শুরু করল ১৯২১ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহ। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতি পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প গ্রহণ করল।

ভারত ইতিহাসের এই পটভূমিতাকেও বাংলা নাটক এবং নাট্যশালা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। পালন করেছে সগৌরবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া কর্তব্য। জাতিবৈর যখন প্রবলতর হয়ে উঠেছে তখন এই বিদ্বেষের জ্বালা বহন করে ১৯১৯ সালে আত্মপ্রকাশ করল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'মিশরকুমারী' নাটক। শ্বেতচর্মের অন্ধ অহঙ্কারে সুসভ্য ইংরেজ যে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে কৃষ্ণচর্মের ওপর, তার বাণীরূপ এই নাটকে শোনা গেল। প্রাচীন মিশরের পটভূমিকায় এই নাটকটিতে শ্বেতচর্মশাসক মিশরীদের অত্যাচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়িত কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীদের বিদ্রোহ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে এত প্রত্যক্ষ আবেদনশীল নাটক আর রচিত হয়নি।

ধৃত কাফ্রীনেতা আবনের মুখে সমগ্র কৃষ্ণজাতির তীব্র ধিক্কার ও প্রতিরোধ ধ্বনিত হয়েছে :

'কেন কাফ্রীরা কি মানুষ নয়? তাদের কি সুখদুঃখ নেই? একই আকাশের নীচে, একই সূর্যের উত্তাপে, একই ফলে জলে শস্যে কাফ্রী আর মিশরী কি জীবন ধারণ করে না? তবে কিসের জন্য তোমাতে আমাতে তফাত? তোমার রক্ত রক্ত, আর আমার রক্ত পচা নর্দমার জল? তোমার মাথা মাথা, আর আমার মাথা তোমার লাথি মারবার জায়গা?'

চতুর ইংরেজ বাঙালি জাতিকে দুর্বল করার প্রয়াসে সেদিন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে আরম্ভ করেছিল। বাংলার নাট্যশালায় সেদিন এই বিদ্বেষকে ফুৎকারে উড়িয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনবাণী প্রচারিত হতে থাকে। এমনকি যে ঔরঙ্গজীব তীব্র হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, চরিত্রানুগ হবে না জেনেও তাঁর 'আলমগীর' নাটকে ঔরঙ্গজীবের মুখে হিন্দু-মুসলমানের মিলন অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী স্বাবলম্বনের আহ্বান জানিয়ে ঘরে ঘরে চরকার ব্যবহারের অনুরোধ জানালে অনেক কবি-কণ্ঠেই সেদিন চরকা-বন্দনা ধ্বনিত হয়েছিল। নাট্যকার মনোমোহন রায় কর্তৃক ১৯২৪ সালে রচিত 'জীবনযুদ্ধ' নাটকে এই চরকার গান শোনা গেল :

'খদ্দর পর খদ্দর বোলো গাও খদ্দর বাণী
খদ্দর মোদের দেশের রাজা চরকা মোদের রাণী।'

বাংলা নাটক ও নাট্যশালায় এক নবযুগের শুরু হয় ১৯২৩ সাল থেকেই। এই নবযুগের পরিব্যাপ্তি ছিল বিশ বৎসর, ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত। এ যুগের সামগ্রিক ইতিহাসটি সংক্ষেপে আলোচিত হতে পারে। নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত নাট্যরীতি ও নাট্যকলা ভিন্নতর পথে যে আভিজাত্য অর্জন করে তা রবীন্দ্রনাথের অনন্য কীর্তি। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এক অতুলনীয় ভাবজগতের সন্ধান দেয়। এই ভাবজগতের ভিত্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবনদর্শন। সৌষ্ঠব ছিল তাঁর অপরূপ কাব্যাশ্রয়ী, অপূর্ব ভাষাদ্যুতি এবং প্রাণশক্তি ছিল তাঁর উদার উদাত্ত মানবতাবোধ। রবীন্দ্রপ্রতিভার কল্যাণে অনন্য এক নাট্যধারা প্রবর্তন হল বটে, কিন্তু তার ভাবাদর্শ উচ্চগ্রামে গ্রথিত থাকায় এবং ব্যাপক প্রচেষ্টার অভাবে তা শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই চিত্তানন্দ হয়ে রইল। জনসাধারণের সাংস্কৃতিক আনন্দের পরিবেশক হয়ে থাকল সাধারণ নাট্যশালাগুলিই। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের সুষ্ঠু সুদৃঢ় নাট্যভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল যে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ, তা ম্লান হওয়ার মুখে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ অবসানকালে আবির্ভাব হল নবদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন নাট্যকলাবিশারদ এক নতুন নট সম্প্রদায়ের, যার নায়ক ও নাট্যাচার্য ছিলেন নটকুল শিরোমণি শিশিরকুমার ভাদুড়ী, মধ্যমণি ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী সরযূবালা প্রমুখ নট-নটীগণ। ১৯২০ থেকে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয় হস্তে ক্ষমতা সমর্পণকাল পর্যন্ত অভিনীত নাটকগুলিতে অপ্রাসঙ্গিক না হলেই নাট্যকাররা দেশাত্মবোধ প্রচারের কোনও সুযোগই ছাড়েননি। ১৯২২ সালে মিনার্ভা থিয়েটার অভিনয় করেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গাত্মক নাটক 'পেলারামের স্বাদেশিকতা', ১৮৭৬ সালের কুখ্যাত ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট-এর তিন ধারা বলে নাটকটির অভিনয় বন্ধ হয়।

ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও নাট্য-ইতিহাসের তথ্যের খাতিরে কুণ্ঠিতমনেই বলছি — এই সময়ে পৌরাণিক নাটকের আবরণে সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রকাশ করলেন মন্মথ রায়। মন্মথ রায়ের প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক 'দেবাসুর'। ঋগ্বেদে দেবাসুর সংগ্রামের যে সুপ্রচুর ইঙ্গিত রয়েছে তারই ভিত্তিতে পরিকল্পিত; দধীচির আত্মদানকাহিনী অবলম্বিত এই নাটক স্টার থিয়েটার প্রথম অভিনয় করেন ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে। বৃত্রাসুরের প্রধান ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন আজকের নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী।

দীর্ঘ এক সেতু প্রান্তে বন্দীবৃত দেবগণের মুক্তিপণ নির্ধারণ করল খেয়ালী বৃত্রাসুর, নদীস্নানার্থী দধীচির নিকট এই বলে 'ঐ পৌলমী যে দেবতার মুক্তি চেয়ে তাঁর নাম উচ্চারণ করবেন, তিনি যদি, আপনি যতটুকু সময় নদীতে ডুব দিয়ে থাকবেন, সেই সময়টুকুর মধ্যে ঐ সেতুপথে নদীর পরপারে চলে যেতে পারেন, মুক্ত হবেন তিনি। আপনি ডুব দিয়ে ওঠার পর আমাদের এপারে যে দেবতাকে পাব তৎক্ষণাৎ হত্যা করবো তাকে — সে ইন্দ্রই হোন আর যেই হোন। এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

দধীচি স্বীকৃত হলেন; নদীতীরে গিয়ে জলে নামতে নামতে বললেন, 'আমি ডুব দিলাম শচী। তুমি নাম উচ্চারণ কর,

তুমি নাম উচ্চারণ কর, যদি পার অন্তত একজন দেবতারও জীবন রক্ষা কর। আজ না হয়, একযুগ পরে সেই দেবতার বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার হতে দেবভূমিকে রক্ষা করে দেবভূমির শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন করবে — সেই আশাতে আমি ডুব দিলাম — আমার জাতি অমর হোক — আমার জাতি অক্ষয় হোক — আমার জাতি অমর হোক — আমার জাতি জয়লাভ করুক।' সব দেবতাই ক্রমে ক্রমে ওপারে চলে গেলেন। দধীচি সেই যে ডুব দিলেন আর উঠলেন না। সে যাত্রায় দেবগণ এমনই করে রক্ষা পেলেন এবং এই দধীচির অস্থি থেকে নির্মিত বজ্র-অস্ত্রেই দেবরাজ ইন্দ্র বধ করলেন বৃত্রাসুরকে। দেবতার হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার হল।

মন্মথ রায়ের আর এক দেশাত্মবোধক পৌরাণিক নাটক 'কারাগার'-এর অভিনয় শুরু হয় মনোমোহন থিয়েটারে ১৯৩০ সালের ২৪ ডিসেম্বর। তখন সমগ্র ভারতে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন। জেলে চলো — ভর্তি কর জেল — এই তখন জাতীয় ধ্বনি। কংসের অত্যাচারে জর্জরিত যাদবগণ পরিত্রাতা ভগবানের আবির্ভাব হবে কারাগারে এই জ্বলন্ত বিশ্বাসে দলে দলে চলল সেই মহাতীর্থে — কংস কারাগারে। এই নাট্যাভিনয়ে যে বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি হল, তা লক্ষ করে পরবর্তী ১ ফেব্রুয়ারি অষ্টাদশ অভিনয়ের পর বাংলা সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে কারাগারের পুনরাভিনয় নিষিদ্ধ করেন। শুরু হয় দেশব্যাপী বিক্ষোভ। সুপ্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক ও আইনবিদ ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তখন ছিলেন বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বাংলা কাউন্সিলে ১৯৩১ সালের মার্চ অধিবেশনে Home member Hon'ble Mr. W. D. R. Prentice ঘোষণা করেন —

> 'The Government had prohibited the further performance of the mythological play 'Karagar' as it was likely to excite feelinegs of disaffection towards Governmant. The home member added that ostensibly the play did not relate to present day politics, but actually its bearing on present day politics was beyond doubt.'

এই নাটকে কংসের ভূমিকায় বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর আশ্চর্য অভিনয় বাংলা রঙ্গমঞ্চে এক ধ্রুপদী স্বাক্ষর। মন্মথ রায়ের জন্য দেশাত্মবোধক নাটক 'মীরকাশিম' সেন্সর-ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত হলেও, নটসম্রাট ছবি বিশ্বাসের সু-অভিনয় জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়নি নাট্যনিকেতন মঞ্চে, ১৯৩৮ সালে।

দেশবাসীর উদ্দেশে মীরকাশিমের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের সেই আকুল আবেদন, সেই জেহাদ ঘোষণা আজও কানে বাজছে :

> 'কে আছ শহীদ, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নফর, বিদেশী অত্যাচার অবসানের এই পুণ্য জেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালনের জন্য প্রস্তুত হও। পাটনায় মুঙ্গেরে বাংলা বিহারে কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত সব কুঠী অবরোধ কর, সমগ্র ইংরেজ ব্যবসায়ীকে বন্দী করে শাঠ্যের উচিত শাস্তি দিয়ে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।'

এ যুগের দেশাত্মবোধক নাটকাবলীর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' — প্রথম অভিনয় মনোমোহন থিয়েটারে, ১৯৩০ সালের ১৩ জুলাই। জাতীয়তার তূর্যনাদ ছিল এই নাটকটি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মহারাষ্ট্রের সন্তান, ভারতের চিরপ্রিয় নায়ক তিলকের নেতৃত্বে সারা দেশে তখন স্বাধীনতার পূজারি শিবাজী রাজার স্মরণে 'শিবাজী উৎসব' প্রচলিত হয়। 'গৈরিক পতাকা' নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীরসন্তানের জীবনালেখ্য রূপায়িত হয়েছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই শিবাজীর কণ্ঠে 'এক জাতি' গঠনের ঘোষণা ধ্বনিত হয়েছে :

> 'অসহায় এই জাতির প্রতি শাসনের নামে কি উপদ্রবই নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আর কেমন করেই জাতির প্রতিটি মানুষ মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে নীরবে নিত্য তাই সহ্য করছে। .... আমি তাই শক্তির আরাধনা করছি, আমি তাই তৈরী করতে চাইছি এম্নি একটি জাতি, যার প্রতিটি সবল মানুষ অধিকার আয়ত্ত করে ধরণীর বুকে বেড়ে উঠতে পারে।'

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিভাধব ছাত্র, চিকিৎসাজগৎ থেকে সম্ভাবনাময় চিকিৎসক, গৃহাঙ্গন থেকে কুলবধূ — সকলেই বেরিয়ে এসেছিলেন মিছিলে, যোগ দিয়েছিলেন মহাত্মার নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে। ঘরে ঘরে ঘুরে মহাত্মার এই নবজীবনের সন্ধান রূপায়িত হয়েছে 'গৈরিক পতাকা' নাটকের রামদাস চরিত্রে। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে :

'রামদাস।। এই আগ্রা যাত্রাই মহারাষ্ট্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সূচনা।

শিবাজী।। তাহলে এবার আপনার রাজত্ব আপনিই গ্রহণ করুন গুরুদেব। ভৃত্য আমি, আপনার আদেশ বহন করে নিশ্চিন্ত মনে আগ্রা যাত্রা করি।

রা।। বারবার সেই ভুল কর কেন বৎস। ও সিংহাসন তোমারও নয় আমারও নয় — সকল মারহাটার। তোমার অবর্তমানে মারহাটারাই করবে ওর মর্যাদারক্ষা। স্বেচ্ছায় আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি তা আজও উদযাপিত হয়নি। আজও মহারাষ্ট্রের পল্লীতে পল্লীতে আমাকে মানুষের সন্ধান করে ফিরতে হবে। তাদের শোনাতে হবে মহারাষ্ট্রেব প্রতিষ্ঠার কথা। মহারাজ শিবাজীব আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করে জাতির গৈরিক পতাকাতলে তাদের সমবেত করতে হবে।'

রামদাসের এই আহ্বান মহাত্মা গান্ধীরই আহ্বান; জনতা সেদিন মহাত্মাকে জনগণপতিরূপে স্বীকৃতি দিয়ে বন্দনা করেছিল, উক্ত দৃশ্যেই তার প্রকাশ ঘটেছে একটি গানে :

'জনতার মাঝে জনগণপতি বক্ষের মাঝে দৃপ্তমন,
জাগ্রত হও স্বাধীন ভারত জাগো মারাঠার পুত্রগণ।'

কিন্তু কেবল মহাত্মার পথই সেদিন একমাত্র পথ ছিল না। বাংলার কোণে কোণে সেদিন অগ্নিমন্ত্রও উচ্চারিত হয়েছে অরবিন্দ ঘোষ, সূর্য সেন, বাঘা যতীনের নেতৃত্বে। সে পথ ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন বসু, অনেক অনেক দৃপ্তপ্রাণ সেদিন রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করে গেছেন। যখনই সাধারণের মনে এই মৃত্যু-বিভীষিকা এসেছে, তখনই মৃত্যুর মাঝে মৃত্যুঞ্জয় উজ্জীবনী শুনিয়েছেন নেতারা। 'গৈরিক পতাকা'র পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ — বীর শহিদ তানাজীর মৃত্যুসংবাদে শিবাজী বলে উঠেছেন -- 'দেশের জন্য মরে মরে আমরা দেশকে শ্মশান করে দিয়ে যাব, আর তোরা, ওরে নবীন মারহাটা, তোরাই সেই শ্মশানে নন্দনকানন রচনা করবি।'

শচীন্দ্রনাথের যে দেশাত্মবোধক নাটকটি অমরত্বলাভ করবে তার নাম 'সিবাজদ্দৌলা'। প্রথম অভিনয় হয় নাট্যনিকেতনে ১৯৩৮ সালের ২৯ জুলাই। বাংলার জনসাধারণের কাছে সিরাজ আবেদন জানিয়েছিলেন :

'বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আল্পনা, জাতির সৌভাগ্য-সূর্য আজ অস্তাচলগামী, শুধু সুপ্ত সন্তান — শিয়রে রুদ্যমানা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাঁকে আশা দেবে? কে তাঁকে ভরসা দেবে? কে শোনাবে জীবন দিয়েও রোধ করব মরণেব অভিযান।'

পলাশীর প্রান্তরে নিজ সৈন্যাধ্যক্ষগণের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত এই সিরাজ যখন জনতা কর্তৃক অপমানিত হচ্ছেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কাতর কণ্ঠে তিনি আবেদন জানাচ্ছেন :

'এস ভাই সব, এস আর একবার চেষ্টা করে দেখি পলাশীর প্রান্তরে যা আমরা হেলায় হারিয়ে এসেছি, বঙ্গজননীর কনক কিরীটে আবার তা পরিয়ে দিতে পারি কিনা।'

কিন্তু মহম্মদী বেগ দৌড়ে এসে নবাবের বুকে বসিয়ে দিল ছুরি — ভূপতিত হলেন সিরাজ। একখানি হাত রইল সিংহাসনের ওপর। সমস্ত দেশ যেন কেঁদে উঠল। বাংলার স্বাধীনতার যবনিকাপাত হল।

পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপে ইংল্যান্ডের অবস্থা নানা দিক থেকে দুর্বল হয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের দুর্বলতার সুযোগে একদিকে যেমন কোনও কোনও পাশ্চাত্য শক্তি ইংল্যান্ডকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছিল, ভারতবর্ষেও তেমনই স্বাধীনতা আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠল। ইংরেজ সরকার

অবশ্য বিভেদনীতি সৃষ্টি করে খানিকটা সাফল্য লাভ করেছিল। দেশের নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা কয়েকবার সংঘটিত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, কিন্তু ইংরেজের এই নীতির প্রতিবাদে সেদিন সকল রঙ্গামঞ্চ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মৈত্রীর বাণী ঘোষণা করেছে। মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত 'টিপু সুলতান' নাটকে সমগ্র দেশবাসীর কাছে টিপুর আবেদন লক্ষ লক্ষ শ্রোতার মনে দোলা দিয়েছে —

'যাও ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রে ফিরে যাও, মহারাষ্ট্রে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রতি ঘুমন্ত নাগরিককে জাগরিত করে তোল। প্রতি মারাঠীর কাছে আমার কাতর আবেদন জানিয়ে বল — টিপু সুলতান হোক, পেশোয়া হোক, কিংবা যে কোন হিন্দু অথবা যে কোন মুসলমান হোক, যাকে তারা হিন্দুস্থানের জাতীয় নেতা বলে মানতে চায় তারই পতাকা নিম্নে এসে তারা অবিলম্বে সম্মিলিত হোক। যাও তাদের বুঝিয়ে বলো, এ ঘনায়মান দুর্যোগের দিনে তারা যেন শুধু এই কথাটি ভুলে না যায় যে, এ দেশ ইংরেজের নয়, ফরাসীর নয়, ওলন্দাজ-পর্তুগীজের নয় — হিন্দুস্থানের অধিকারী আমরা মিলিত হিন্দু-মুসলমান একই ধাত্রীমাতার যুগল সন্তান।'

এই সময়ে পলাশীর বেদনা নতুন করে বাঙালির বুকে বেজেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজের শাঠ্য-অর্জিত বিজয়ের বিরুদ্ধে, যে যেখানে যেমনভাবেই হোক না কেন, সংগ্রামে করেছেন, প্রত্যেকেই বাঙালির কাছে জাতীয় বীর হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। একদা মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি নিয়ে এদেশে ও বিদেশে প্রবল আন্দোলন হয়েছিল, নন্দকুমারকে নিয়ে এ যুগে অনেকগুলি নাটক লেখা হল। ইংরেজের শঠতার জঘন্য স্বরূপ এ জাতীয় নাটকগুলিতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশীয় বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের প্রবল ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে নাটকগুলিতে। মহেন্দ্র গুপ্তের 'মহারাজ নন্দকুমার' নাটকে নবাব মীরকাশিম বিশ্বাসঘাতক জগত শেঠ প্রভৃতিকে হত্যার আদেশ জানিয়ে বলছেন :

'আপনার কাছে যে বিশ্বাস গচ্ছিত রেখেছিলুম, সেই বিশ্বাস আপনাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, পাঞ্জা আমি চাই। গঙ্গার অতল জল হতে খুঁজে আনুন।'

'এ জন্মে হোক, জন্মান্তরে হোক — স্বাধীন বাংলার নবাবী পাঞ্জা ফিরিয়ে আনতে হবে। যান জগত শেঠ, মহাতপচাঁদ, স্বরূপচাঁদ, রায়দুর্লভ — ঐ অতল জলস্রোত হতে ফিরিয়ে আনুন আমার গচ্ছিত বিশ্বাস, ফিরিয়ে আনুন স্বাধীন বাংলার নবাবী পাঞ্জা।'

১৯৪২ সাল চিরস্মরণীয় হয়ে রইল গান্ধীজীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের জন্য। দেশের প্রতিটি সীমান্তে জ্বলে উঠল আগুন, দলে দলে মানুষ হাসিমুখে বরণ করল ঘাতকের শাণিত বেয়নেটকে। শাসকের দণ্ড যতই নির্মম হতে লাগল, স্বাধীনতাকামী সৈনিকদের ধৈর্য ও বিশ্বাস ততই প্রখর হয়ে উঠল। এই সময়ের কিছু পরেই রচিত সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'জননী জন্মভূমি' নাটকে একটি বাঈজি চরিত্রে এই ধৈর্য, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে। সে ভূমিকা নিয়েছে চারণীর। বিলাস-শয্যায় গান ভুলে কণ্ঠে তুলে নিয়েছে সঞ্জীবনী মন্ত্র। শত ঝড়েও সে ভেঙে পড়ে না। আঘাতে সে অধিকতর বীর্যবতী হয়ে ওঠে —

'আমি কিন্তু সুখী — লাঞ্ছিতা প্রপীড়িতা বিপন্না মাতৃভূমির ক্ষুদ্রতম সেবায় নিজেকে কায়মনে নিয়োগ করবার এই সুযোগ লাভ করে আমি পরম তৃপ্তিলাভ করেছি। কোথায় চারণীগণ, গাও — আবার গাও মাতৃপূজার সুগম্ভীর বোধন সঙ্গীত! আরাবল্লীর প্রতি শিসাস্তূপ সে সঙ্গীতের অমর রসে সঞ্জীবিত হয়ে, অস্ত্রধারী যৌদ্ধার বেশে ধেয়ে আসুক মেবারের উদ্ধার কামনায়।'

এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক মহেন্দ্র গুপ্তের 'শতবর্ষ আগে'।

সিপাহী যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা এই নাটকটিতে নিকটকালের ঘটনা ও বাস্তবের নেতাদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। নাট্যকার অতি নিপুণভাবে সিপাহীযুদ্ধ, বিদ্রোহের উত্তেজনা, ষড়যন্ত্র ও ব্যর্থতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের যে দুর্বলতায় একদিন আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম, যে দুর্বলতায় আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে দ্রুত সাফল্যলাভ করিনি, নাট্যকার অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তার উল্লেখ করেছেন :

'মনুষ্যত্ব আমরা বহুদিন হারিয়েছি। মনুষ্যত্ব যদি থাকতো আমাদের, তাহলে কি সাধ্য ছিল সমুদ্র পারের মুষ্টিমেয়

ফিরিঙ্গী বেনিয়ার, যে এই ত্রিংশ কোটি ভারতবাসীকে রক্তচক্ষে শাসন করে! আমরা মানুষ নই। মানুষ হলে তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের প্রয়োজন হত না, ভারতের ত্রিংশ কোটি হিন্দু-মসলমানের মিলিত কণ্ঠের ভৈরব-হুঙ্কারে বেনিয়া কোম্পানীর লোলুপ সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ত।'

আলোচিত নাটকগুলি ছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামকালে আরও দেশাত্মবোধক নাটক রচিত হয়েছিল — নাট্যকার এবং নাট্যশিল্পীদের সংযুক্ত সহযোগিতায়। এমন বহু নাট্যশাস্ত্রী এবং নাট্যসমালোচক আছেন, যাঁরা সব নাটককে উচ্ছাসনের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হবেন। হয়তো তাঁরা বলবেন, এসব নাটকে দেশপ্রেমের স্থূল আবেদনই আছে, সূক্ষ্ম নাট্যকারুকার্য কিছু নেই। তা তাঁরা বলুন। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের ও স্বাধীনতারক্ষার মহাসাধনায় এসব নাটকেরও যথেষ্ট মূল্য। দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে কারুকার্যখচিত বন্দুক বা তরবারির অপেক্ষা না করে সহজলভ্য অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। জাতীয় সঙ্কটে আর্টের রসানুভূতির চেয়েও প্রেরণার প্রয়োজন অনেক বেশি। আর্টের কাজ শিরোধার্য, কিন্তু স্থূল হাতিয়ারও উপেক্ষণীয় নয়।

জাতীয় সঙ্কটে নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে একটি গল্প। এক রাজা বহু কষ্টে পাশের রাজ্যটিকে জয় করলেন। জয় করেই বিজয়ী রাজা বিজিত দেশের বাদ্যকরদের ধরে এনে তাদের কোতল করার হুকুম দিলেন। বাদ্যকররা অবাক। জোড়হস্তে তারা বলল, 'মহারাজ! আমাদের কী দোষ? আমরা তো আপনার সঙ্গে লড়াই করিনি।'

রাজা বললেন, 'তোমরাই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। যুদ্ধকালে বাদ্য বাজিয়ে তোমরা তোমাদের দেশের সৈন্যদলকে এমন রণোন্মত্ত করে তুলেছিলে যে, দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও এ দেশ জয় করতে পারিনি আমি।'

জাতীয় সঙ্কটে নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীরা এই বাদ্যকরের দল, দেশের জনসাধারণ — সৈনিক। নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার ও নাট্যশালার কর্তব্য দেশব্যাপী এই সৈনিকদলের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। গর্ব এবং গৌরবের সঙ্গে বাঙালি স্মরণ করতে পারে যে, বাংলার নাটক এবং নাট্যশালা এই সুমহান দায়িত্ব এবং কর্তব্য সার্থকভাবে পালন করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করেছে।

১৯৬৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা। শিরনামে 'নাটক' কথাটিও ছিল। ১৯৮২ সালে [illegible] কা হিসাবে প্রকাশ করে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। এই প্রকাশে বানান সংস্কার করা হয়েছে।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অহীন্দ্র চৌধুরী

সরযূবালা দেবী

মলিনা দেবী

স্বাধীনতা-উত্তর সাধারণ রঙ্গালয়

দেবনারায়ণ গুপ্ত

১৯৪৭ সালেব ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতালাভেব পর, কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। স্বাধীনতালাভেব অব্যবাহত পূর্বে যে রক্তক্ষয়ী সম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল, যে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেল, তাব ধাক্কা সামলে ওঠা স্বাধীনতালাভেব পরেও সম্ভব হয়নি; তাছাড়া দেশ বিভাগ করে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করলাম — তার ফলে দলে দলে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু মানুষ যখন বাঁচার লড়াই করছে, সেই সময় আমোদ-প্রমোদের আসর প্রাণহীন হয়ে পড়ল, ফলে সাধারণ রঙ্গালয়গুলির ধার-দেনায় জর্জরিত হয়ে মঞ্চ-মালিকেরা কোনওরকমে প্রযোজনাবা বাঁচিয়ে বেখেছিলেন। স্বাধীনতালাভের পব যে দুর্যোগের ঝড় সাধারণ রঙ্গালয়গুলির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে — আমি তাব প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সন্ধ্যায় প্রতিটি রঙ্গালয়ে আলো জ্বলত বটে, কিন্তু দর্শক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং রঙ্গালয়গুলিব অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও দৃশ্যপটগুলির ছিল জরাজীর্ণ অবস্থা। সুলিখিত নাটক মঞ্চস্থ করেও এই সময় দর্শকদের মন জয় করা যায়নি।

১৯৪৭ সালেব ১৫ অগাস্টের পর থেকে ১৯৫৩ সালে স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটক খোলার আগে পর্যন্ত এই অবস্থা চলেছিল। অবশ্য 'শ্যামলী' নাটক খোলার আগে এই দুর্দিনেও কয়েকটি ভালো নাটক যে প্রযোজিত হয়নি তা নয়, কারণ বাঁচার তাগিদে মঞ্চ-মালিকেরা ধাব-দেনা করেও থিয়েটারগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

স্বাধীনতালাভের পর ৬০-এর দশক পর্যন্ত একটা মোটামুটি হিসাব করে দেখতে পাচ্ছি মোট ১৪৬ খানা নাটক অভিনীত হয়েছে — তার মধ্যে 'রিজিয়া', 'বঙ্গে বর্গী', 'মেবারপতন', 'প্রফুল্ল', 'সধবার একাদশী', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি পুরনো নাটকের পুনরাভিনয়ের সংখ্যা প্রায় ২৯টি, নতুন মৌলিক এবং উপন্যাসের

নাট্যরূপ অভিনীত হয়েছে ১১৭টি।

বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে —'স্বাধীনতা-উত্তর সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োগধারা'।

এই প্রয়োগধারা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের একটু পেছন ফিরে তাকাতে হবে — কেননা, বিশের দশকে শিশিরকুমারের আবির্ভাব ও স্টার থিয়েটারে 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' কর্তৃক যে সকল নাটক অভিনীত হয়েছে — নিঃসংশয়ে সেগুলি বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের এক নতুন স্বাদ বহন করে এনেছিল। এরপর ১৯৩১ সালে সতু সেন আমেরিকা থেকে ফিরে এসে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের অনেক কিছু নতুনত্ব দেখিয়েছেন, যা শুধু চমকপ্রদই নয় — মঞ্চকারু ও আলোর সুষম প্রয়োগের দ্বারা অতি দুর্বল নাটককেও তিনি দর্শক মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি সর্বপ্রথম ১৯৩৩ সালে রঙমহলে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সৃষ্টি করেন এবং সর্বপ্রথম এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চে 'মহানিশা' নাটকটি অভিনীত হয়। এছাড়া সতু সেন স্থানুমঞ্চের ওপরেও বহু নাটক কৃতিত্বের সঙ্গো প্রয়োগ করেছেন।

নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় অভিনয়ের মাধ্যমে। মহামুনি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের এক জায়গায় বলছেন —

ইষ্টার্থস্য রচনা বৃত্তান্তস্য অনুপক্ষয়ঃ
রাগপ্রাপ্তিঃ প্রয়োগস্য গুহ্যানাং চৈব গুহনম্
আশ্চর্য্যবদবিখ্যাতং প্রকাশ্যানাং প্রকাশন্ ম ....

অর্থাৎ, দর্শকেব মনোবঞ্জনের জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। নাটকের বক্তব্যের সঙ্গো নট-নটীদের সংলাপের একটা নিবিড় যোগাযোগ থাকে। অভিনয় যতই ভালো হোক, নাটক যতই সুগঠিত হোক, প্রয়োগ যথাযথ না হলে সে নাটক কিছুতেই দর্শকদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয় না। ভরত তাঁব নাট্যশাস্ত্রে এক জায়গায় বলেছেন —

কাব্যং যদ্যাপি হীনার্থং সম্যগঙ্গোঃ সমন্বিতম্
দীপ্তত্বাত্তু প্রয়োগস্য শোভামেতি ন সংশয়।
উদাত্তপি যৎকাব্যং সাদদৈঃ পরিবর্জিতম্
হীনত্বাত্তু প্রয়োগস্য ন স সত্যং রঞ্জয়েন্মনঃ।।

এই প্রয়োগ সম্পর্কে ভরত যে নির্দেশ দিয়েছেন — তা সব দেশের সর্বকালের নাট্যকারদের অবশ্য পালনীয় বলে মনে করি। রূপ-উপরূপ প্রভৃতি নিয়ে ভরত ত্রিশ প্রকার নাট্যপ্রয়াসের কথা বলেছেন; কিন্তু তাই বলে তিনি রূপ-উপরূপকে একসঙ্গো মিলিয়ে দেননি। সব কিছু তিনি আলাদা আলাদা করেছেন এবং বিশ্লেষণ করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন; কিন্তু বর্তমানকালে রূপ ও উপরূপকে আমরা আলাদাভাবে দেখি না এবং বিচারও করি না। বহুক্ষেত্রেই আমরা রূপ ও উপরূপকে অরূপ করে তুলি।

যুগে যুগে নাট্য-রচনারীতির পরিবর্তন হয় — যেমন গ্রিক আমলে নাটক ছিল ট্র্যাজেডি-সর্বস্ব ও দীর্ঘায়ত। শেক্সপীয়র তাঁর নাটকে সর্বরসের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। অবশ্য তাঁর নাটকগুলিও হয়েছে দীর্ঘায়ত। পরবর্তীকালে ইবসেন, ইউজিন ওনিল থেকে বার্নার্ড শ এবং ব্রেশট পর্যন্ত নাটকের গঠনবীতির মধ্যে সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি তাঁদের নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনই নাটককেও সংক্ষেপিত করেছেন।

প্রথম ১৯৪৭ সাল থেকে ৬০-এর দশক পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে নতুন যে নাটকগুলি অভিনীত হয়েছে তার মধ্যে থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব।

রঙমহলে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট শচীন সেনগুপ্তের 'বাংলার প্রতাপ' নাটকখানি মঞ্চস্থ হয় এবং স্বাধীনতালাভের পরেও নাটকখানি বেশ কয়েক মাস দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। স্বাধীনতালাভের একদিন আগে এই নাটকখানি অভিনীত হলেও এই নাটকের প্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রসঙ্গো আলোচনা করা আমি উল্লেখযোগ্য মনে করি। এই দেশাত্মবোধক নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। দৃশ্যপট পরিকল্পনার মধ্যে কিছু কিছু বৈচিত্র্যও ছিল। আলোক-নিয়ন্ত্রণের কাজে অহীনবাবুর নির্দেশ অনুসারে রঙমহলের আলোক-বিভাগের কর্মীরা সে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।দৃশ্যপটের মধ্যে কয়েকটি দৃশ্যে নতুনত্বের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। যেমন, নদীর ধারে যুদ্ধক্ষেত্রের

কথা বলা যায়। এই দৃশ্যে 'মনরাজ' রূপে রবি রায় বন্দুকের গুলিতে পায়ে আঘাত লেগে যেখানে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছেন — পাছে বিপক্ষ দল মনরাজকে ধরে ফেলে — সেখানে কার্ভালোবেশী অহীন্দ্র চৌধুরী রবি রায়কে মঞ্চের মাঝখান থেকে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতেন, সে দৃশ্যের আলোকের চমৎকারিত্ব এবং অহীনবাবু শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে যেভাবে ছুটে বেরিয়ে যেতেন — সে দৃশ্যে দর্শকদের উল্লাসে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ত। এছাড়া এইরকম বহু দৃশ্যতেই আলোর সুষম প্রয়োগের দ্বারা নাটকটি দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল। এই নাটকে বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের প্রাধান্য ছিল। গঞ্জালিসের পত্নী অ্যাঞ্জেলিকার সঙ্গে গঞ্জালিস যেখানে প্রেমালাপ করতেন সেখানেও যে মুডলাইট ব্যবহার করেছিলেন অহীন্দ্রবাবু, তাতে নতুনত্বের আভাস পাওয়া যেত। এতে অহীনবাবুর আলোক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আমরা পেয়েছি। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' ও শচীন্দ্রনাথের 'বাংলার প্রতাপ'-এর বিষয়বস্তু এক হলেও শচীন্দ্রনাথের নাটকের বক্তব্য ছিল অন্যরকম। কাজেই দুটি নাটকের ভেতর কোনও সৌসাদৃশ্য ছিল না।

১৯৪৭ সালের ২০ ডিসেম্বর মিনার্ভা রঙ্গামঞ্চে শচীন সেনগুপ্তের 'কালো টাকা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সাদামাটা সামাজিক বক্তব্যের মাধ্যমে শচীনবাবু স্বাধীনতা-উত্তরযুগের কালোবাজারিদের মধ্যেও রবিনহুডের মতো দুর্গতদের সাহায্যে যে মানবিকতাবোধ ছিল, সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। সুষম আলোর প্রয়োগ ও দৃশ্যপটের ব্যবহার করা হয়েছিল এই নাটকে, কিন্তু নাটকটি বেশিদিন দর্শক আকর্ষণে সমর্থ হয়নি।

দক্ষিণ কলকাতার কালিকা থিয়েটারে রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে লেখা তারক মুখোপাধ্যায়ের 'যুগদেবতা' নাটকটি ১৯৪৮ সালের ১৪ এপ্রিল মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি অতীব জনসমাদর লাভ করে। এই নাটকের প্রয়োগকার্যে মণীন্দ্র দাস (নানুবাবু) মঞ্চ এবং আলোক নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি, কালিকামূর্তির অঙ্গ থেকে জ্যোতি-বিকিরণ ইত্যাদি বহু ট্রিক বা বিশেষ অলৌকিক কলাকৌশল এই নাটকে প্রয়োগ করেছিলেন। নানুবাবু ছিলেন পরেশ বসুর (পটলবাবু) অন্যতম শিষ্য। সুষম আলোর প্রয়োগে 'যুগদেবতা'কে তিনি সার্থক করে তুলেছিলেন। নাটকের দুর্বলতাকে প্রয়োগের কলাকৌশলে তিনি ঢেকে দিয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২৫ জুন স্টার থিয়েটারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের পরিচালনা ও রামেশ্বরের ভূমিকায় অভিনয় করেন মহেন্দ্র গুপ্ত। মঞ্চসজ্জা মহম্মদজান ও বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকের কাহিনী বীরভূমের যে মাটিতে গড়ে উঠেছে, তাকে যথাসম্ভব শিল্পনৈপুণ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। আলোক নিয়ন্ত্রণের কাজ কে করেছিলেন তা জানা না গেলেও মনে হয় মহেন্দ্রবাবুর নির্দেশে মঞ্চশিল্পীরাই সে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বলা যেতে পারে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে মঞ্চ ও আলোর কাজ ভালোই হয়েছিল।

১৯৪৯ সালের ১০ অগাস্ট জিতেন মুখোপাধ্যায়ের 'পরিচয়' অভিনীত হয় শ্রীরঙ্গামে। নাটকটি পরিচালনা করেন নাট্যাচার্য স্বয়ং। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন — শিশিরকুমার : রায়বাহাদুর শশাঙ্ক চ্যাটার্জী, ভবানী ভাদুড়ী : ডা. আলি, কমল মিত্র : নরেশ। গতানুগতিক সাধারণত যেরকম নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ হয় — এ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় রাত্রে এ নাটকের অভিনয় আমি দেখেছি। প্রয়োগের কাজ অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু নাট্যাচার্য থেকে প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। নাট্যকার জিতেনবাবুর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলেন?' আমি বললাম, 'আপনার নাটক এক নতুন স্বাদ বহন করে এনেছে। আমার মনে হচ্ছে — আপনার নাটক জনসমাদর লাভ করবে।' কিন্তু নাটকটি জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। জিতেনবাবু ছিলেন ছাপরার উকিল; পরবর্তীকালে তিনি তাঁর জীবন-সংগীত গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন —

> '.... পাঁচ মাস পরে ১০ই আগস্ট নাট্যাচার্য্য আমার নাটক মঞ্চস্থ করলেন। সাহিত্য জগতে কলরব উঠলো। কেন নাট্যাচার্য্য বাইরের একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের বই মঞ্চস্থ করলেন? কলকাতায় কি নাট্যকার ছিল না? ....'

এই কথার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নাটকটি বহু বিরুদ্ধ- সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল, যার জন্য নাটকটি বেশিদিন চলেনি।

১৯৫১ সালের ১০ মে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর ঐতিহাসিক নাটক 'তখত-ই-তাউস' মঞ্চস্থ হয় শ্রীরঙ্গমে। শিশিরকুমার যখন কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে নাট্যমন্দির নাম দিয়ে অভিনয় করছিলেন, সেই সময় এই নাটকটি অভিনয়ের জন্য মনোনীত করেন; কিন্তু নানা কারণে তখন নাটকটি মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি। পরে নাট্যাচার্য যখন নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন, তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, কিন্তু তবুও তিনি মঞ্চ পরিকল্পনা ও প্রয়োগের দিক থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। অভিনয়ে 'জাহাঙ্গীর শাহ'র ভূমিকায় শেষ জীবনে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই নাটকে ইজুদ্দিনের ভূমিকায় অনুপকুমার শিশিরকুমারের শিক্ষায় তাঁর অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কিন্তু 'আলমগীর' বা 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের মতো প্রয়োগ- কৌশলের প্রত্যাশা নিয়ে যে দর্শকেরা গিয়েছিলেন, তখ্‌ত-ই-তাউস তাঁদের হতাশ করেছিল।

ওই বছরের ৩০ মার্চ কালিকা রঙ্গমঞ্চে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বীপান্তর' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও রাজলক্ষ্মী (ছোট)। মঞ্চ-পরিকল্পনা ও আলোক-নিয়ন্ত্রণে মণীন্দ্র দাস (নানুবাবু) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিশেষ করে নাটকের শেষ দৃশ্যে যেখানে 'পদ্ম' চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে, তা দর্শকদের কাছে বিস্ময়ের উদ্রেক করত; কিন্তু মঞ্চের কলাকৌশলই কেবল নাটকের সাফল্য এনে দিতে পারে না, কারণ এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল একটু ভিন্ন ধরনের — অর্থাৎ জমিদার বংশের পারস্পরিক ব্যভিচার দর্শকদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

১৯৫৩ সালের ২৯ জানুয়ারি মন্মথ রায়ের 'জীবনটাই নাটক' ও ৫ মার্চ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝিন্দের বন্দী' (নাটক : নবকুমার গড়াই) মঞ্চস্থ হয় মিনার্ভা থিয়েটারে। দুটি নাটকই পরিচালনা করেন ছবি বিশ্বাস। মঞ্চ ও আলোর দায়িত্বে ছিলেন বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটক দুটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ওই বছর ১৫ অক্টোবর স্টার থিয়েটারে নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' (নাট্যরূপ : দেবনারায়ণ গুপ্ত) মঞ্চস্থ হয়। শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র এই নাটকের যুগ্ম পরিচালক। মঞ্চসজ্জা ও আলোর দায়িত্বে ছিলেন সতু সেন। দৃশ্যপটগুলি যথাসম্ভব অনাড়ম্বর ও নয়নানন্দ করে তুলেছিলেন। সুষম আলোর প্রয়োগ ও দলগত অভিনয়ে নাটকটি অচিরেই প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই জনপ্রিয়তার মূলে জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সমাবেশ। দলগত অভিনয় ও সুষ্ঠ প্রয়োগই একমাত্র কারণ ছিল না। 'শ্যামলী' নাটক মঞ্চস্থ করার পূর্বে স্টার থিয়েটারের লেসী সলিলকুমার মিত্র প্রেক্ষাগৃহ তথা দর্শকাসনগুলির সংস্কার করে একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে দেখা গেল মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ যদি পরিচ্ছন্ন হয়, তাহলে দর্শকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই নাটক দেখতে আসেন। এই সবকিছুর সংমিশ্রণ মুমূর্ষ সাধারণ রঙ্গালয়ের মোড় ঘোরাতে সক্ষম হয়েছিল। 'শ্যামলী' নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ের দিকচিহ্ন হয়ে আছে। অনেকে মনে করেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সরযূ দেবী, জহর গাঙ্গুলি, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পীদের সমাবেশে 'শ্যামলী' সাধারণ রঙ্গালয়ের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমি মনে করি শুধু এইটাই একমাত্র কারণ নয়, মঞ্চ এবং রঙ্গাগৃহটির আমূল সংস্কার এর অন্যতম কারণ।

'শ্যামলী' নাটকের অসামান্য সাফল্য দেখে রঙমহল রঙ্গামঞ্চটিরও সংস্কার সাধন করা হল। যে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ছিল, তা থেকে মুক্ত হয়ে রঙমহলে ১৯৫৪ সালে প্রথমে নরেন মিত্রের দূরভাষিণী (নাটক : সলিল সেন) ৩১ জুলাই মঞ্চস্থ হয়, পরে ২ অক্টোবর ডা. নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' নাটকটি আত্মপ্রকাশ করে। পরিচালনা করেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুরারোপ করেন নচিকেতা ঘোষ। পরিচালকের নির্দেশে রঙমহল কলাকুশলীগোষ্ঠী মঞ্চ এবং আলোক নিয়ন্ত্রণের কাজ করেন। মাতৃপরিত্যক্ত একটি বীভৎস, বিকটদর্শন, সদ্যপ্রসূত সন্তান স্বামীজীর আশ্রমে স্থান পায়। সেই সন্তান ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করে তার পিতৃ-মাতৃপরিচয় জানতে পারে। তখন সে তার পিতা-মাতার সঙ্গে দেখা করতে গেলে যে নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় — তারই সূত্র ধরে রচিত এই আবেগধর্মী নাটকটি অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নাট্যাচার্য ১৯৫৩ সালের ৩ জানুয়ারি শ্রীরঙ্গাম মঞ্চে তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'প্রশ্ন' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন বটে,

কিন্তু বিশেষ জনসমাগম না হওয়ায় নাটকটি বন্ধ করে দিয়ে ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকখানা পুরনো নাটকের পুনরভিনয় করলেন। সেই সঙ্গে কয়েকটি সম্মিলিত অভিনয় করেও শ্রীরঙ্গামের অস্তিত্বকে ধরে রাখতে পারলেন না। এরপর 'সরকার ব্রাদার্স' মঞ্চটি অধিগ্রহণ করে এবং রঙ্গালয়টির সংস্কার সাধন করে 'বিশ্বরূপা' নাম দিয়ে ১৯৫৬ সালের ৭ জুন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাট্যরূপ 'আরোগ্য নিকেতন' মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটি পরিচালনা করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। দলগত অভিনয়, পরিচ্ছন্ন দৃশ্য পরিকল্পনা ও সুষম আলোক নিয়ন্ত্রণে নাটকটি দর্শক সমাদর লাভ করে। বলা যেতে পারে, প্রয়োগের দিক থেকে নাটকটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯৫৭ সালের ১৯ এপ্রিল বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ হল বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা'। পরিচালনা করেছিলেন নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র, সংগীত পরিচালনা নচিকেতা ঘোষ, মঞ্চ ও আলোর দায়িত্বে ছিলেন আশুতোষ বড়ুয়া। বলা যেতে পারে 'আরোগ্য নিকেতন' অপেক্ষা 'ক্ষুধা' সুষ্ঠু প্রয়োগের দাবি রাখে।

পরের সপ্তাহেই ১২ জুন রঙমহলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' নাটকটি আরম্ভ হল। পরিচালনায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং সংগীত পরিচালনা করেন অনিল বাগচী। এ নাটকের প্রধান সম্পদ ছিল সংগীত। প্রধান ভূমিকায় রবীন মজুমদার গানে ও অভিনয়ে দর্শকদের অভিনন্দনলাভে সক্ষম হন। নাটকের বিষয়বস্তুর সঙেগ দৃশ্যপট পরিকল্পনা অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছিল। প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৭ সালের ৭ জানুয়ারি স্টার থিয়েটারে শরৎচন্দ্রের প্রখ্যাত উপন্যাস শ্রীকান্ত (১ম ও ২য় পর্ব অবলম্বনে) নাটকটি (নাট্যরূপ : দেবনারায়ণ গুপ্ত) অভিনীত হল। এই নাটকে মঞ্চ পরিকল্পনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন মণীন্দ্র দাস (নানুবাবু)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই নাটকে একাধারে রিভল্‌বিং ট্রলি ও স্থানুমঞ্চের ব্যবহার করা হয়েছিল। ইন্দ্রনাথেব নিশীথ অভিযানের সময় জলের ওপর নৌকো চালানো দেখানো হয়েছিল। শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে নিশুতি রাতে কুকুরের ডাক শুনে ভয়ে যেখানে নতুনদা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ইন্দ্রনাথ তাকে উদ্ধার করে জল থেকে তুলে আনছে, সেখানে জল শুধু ছিটকোনোই নয়, দু'জনকে সম্পূর্ণ জলসিক্ত অবস্থায় মঞ্চে উঠে আসতে দেখা যেত। কুমারবাহাদুরের ক্যাম্পের দৃশ্যটি ট্রলির সাহায্যে দেখানো হত। শাহুজী ও অন্নদাদিদির কুঁড়েঘর, সাপের ঝাঁপি, সাপ প্রভৃতি দেখানো হত। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের নানা দৃশ্যে যে বর্ণনা আছে, সমগ্র নাটকে তাকে যথাযথ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। অভিনয়ে এবং প্রয়োগের উৎকর্ষে নাটকটি দীর্ঘদিন দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল। নাটকটির পরিচালক ছিলেন শিশির মল্লিক।

১৯৫৮ সালের ২ জুন স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত (৩য় ও ৪র্থ পর্ব) অবলম্বনে রাজলক্ষ্মী। এই নাটকে বৈষ্ণবদের আখড়া এবং গহর গোঁসাইয়ের অসুস্থতায় কমললতার সেবার দৃশ্য ইত্যাদি যথাসম্ভব প্রয়োগ-নৈপুণ্যে নিখুঁতভাবে মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়। সুষম আলোর প্রয়োগ এই নাটকের একটি প্রধান সম্পদ। এই নাটকটিবও পরিচালক ছিলেন শিশির মল্লিক এবং মঞ্চ ও আলোর দায়িত্বে ছিলেন মণীন্দ্র দাস (নানুবাবু)।

১৯৫৯ সালের ৮ অক্টোবর বিশ্বরূপায় কিরণ মৈত্রের কাহিনীর সূত্র ধরে বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাট্য-রূপায়িত 'সেতু' নাটকটি রূপায়িত হয়। পরিচালক ছিলেন নরেশ মিত্রে, সংগীত পরিচালক ভি বালসারা, মঞ্চ নির্মল গুহরায় এবং আলোক নিয়ন্ত্রণে তাপস সেন। প্রয়োগের দিক দিয়ে এই নাটকটি বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই নাটকের চরিত্রানুগ সুঅভিনয় করেছিলেন, কিন্তু তাপস সেন আলোর কলাকৌশল দেখিয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করেছিলেন। রেলইঞ্জিনেব হেডলাইটের আলো দেখে মনে হত যেন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহেব ওপর দিয়ে ট্রেনটি চলে যাচ্ছে। দর্শকেরা এই দৃশ্যটি দেখার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন। এই দৃশ্য পরিকল্পনায় তাপস সেন অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, যার ফলে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বরূপায় 'সেতু' নাটকটি চলে।

এই বছরের ১২ মার্চ মনোজ বসুর 'বৃষ্টি-বৃষ্টি' কাহিনী অবলম্বনে নাট্যরূপ দিয়ে স্টার থিয়েটারে 'ডাকবাংলো' নাটকটি মঞ্চস্থ হল। এই নাটক থেকেই স্টার থিয়েটারের নাট্য পবিচালনা ও অন্যান্য যাবতীয় দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। প্রখ্যাত শিল্পনির্দেশক পরেশ বসুর (পটলবাবু) পুত্র অনিল বসু দৃশ্যপট পরিকল্পনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে থাকেন। পটলবাবুর দৃশ্যপট ও আলোক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে লেখা কিছু কাগজপত্র ছিল, অনিল বসু তারই সাহায্যে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে দৃশ্যপট পরিকল্পনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণের কাজ করেন। প্রখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাস এই 'ডাকবাংলো' নাটকে সুদীর্ঘ ৯ বছর পর আত্মপ্রকাশ করেন। এই নাটকে যেমন জল-বৃষ্টি দেখানো হয়েছিল, তেমনই নাটকের অন্যান্য দৃশ্যপট পরিকল্পনায় যাতে নাটকটি সুষ্ঠুভাবে চলে, সে বিষয়ে অনিলবাবু আমার পরামর্শে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। বিশ্বেশ্বর (ছবিবাবু) রাত্রে তাঁর ঘরে গভীর ঘুমে মগ্ন, সেখানে তাঁর পিতৃদেবের একটি ছবি টাঙানো থাকত, নিদ্রামগ্ন বিশ্বেশ্বরকে উদ্দেশ্য কবে সহসা সেই চিত্র কথা বলতে শুরু করত — এই দৃশ্যটি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করতে আমাব প্রয়াত বন্ধু জাদুকর পি সি সরকারের আমি সাহায্য নিয়েছিলাম। পি সি সরকার থিয়েটারে এসে দৃশ্যটির প্রতিপাদ্য বিষয় শুনে এমনভাবে সেই কাজটি করে দিয়েছিলেন যে দর্শকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তেন। প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'ডাকবাংলো' নাটকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই ১৯৫৯ সালেই উৎপল দত্তের অধিনায়কত্বে মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ নিয়মিত অভিনয় শুরু করল। প্রথম দিকে 'ছাযানট', 'ওথেলো' ও 'নীচেব মহল' অভিনীত হয়। উপরোক্ত নাটকগুলির পরিচালনা করেছিলেন উৎপল দত্ত এবং আলোক নিয়ন্ত্রণে ছিলেন তাপস সেন। প্রয়োগের দিক থেকে নাটকগুলি যথাযথ হলেও দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু এর পরেব নাটক উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত 'অঙ্গার' ৩১ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণ নতুন এক প্রেক্ষাপটে কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত হয়। এই নাটকের আলোকসম্পাত ও কলা-নির্দেশক ছিলেন যথাক্রমে তাপস সেন ও নির্মল গুহরায়। বিষয়বস্তুর সঙ্গে দৃশ্যপটের সামঞ্জস্য এবং আলোক নিয়ন্ত্রণ এক নতুন স্বাদ বহন করে এনেছিল। শেষ দৃশ্যে যেখানে কয়েকজন শ্রমিক কয়লাখনির খাদে ক্রমশ জল বাড়ার মধ্যে মৃত্যুকবলিত হন, সেখানে আলোকের কাজে তাপস সেন সমস্ত দর্শকদের বিহ্বল করে দিতেন। বিষয়বস্তু এবং প্রয়োগের অভিনবত্বে নাটকটি সুদীর্ঘকাল দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ নয়।

১৯৫৯ সালেই রঙমহলে ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক মুঠো আকাশ' ১৫ এপ্রিল এবং 'এক পেয়ালা কফি' ৩১ ডিসেম্বর তরুণ রায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। দুটি নাটকই প্রয়োগের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬১ সালে ২৮ মে মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্তের রচিত ও পরিচালিত 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। প্রয়োগের দিক থেকে নাটকটি উল্লেখের দাবি রাখে।

১৯৬২ সালের ৮ মে স্টার থিয়েটারে শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে 'শেষাগ্নি' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাট্যরূপ ও পরিচালনা দেবনারায়ণ গুপ্ত। দুর্গাপুর টাউনশিপ গড়ার পটভূমিকায় অনিল বসুর সুষ্ঠু দৃশ্যপট পরিকল্পনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল, বিশেষ করে ডিনামাইটের সাহায্যে একটি বিশাল অট্টালিকা ভূমিস্যাৎ করার দৃশ্যটি অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছিল।

১৯৬৩ সালের ১০ মার্চ মিনার্ভায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাহিনী অবলম্বনে উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' মঞ্চস্থ হয়। আলো ও মঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে তাপস সেন ও নির্মল গুহরায়। এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার সময় প্রেক্ষাগৃহের কিছু আসন তুলে দিয়ে মঞ্চটিকে এগিয়ে আনা হয়েছিল — ফলে দর্শকেরা দৃশ্যগুলিকে সুদূরপ্রসারী বলে মনে করতেন। প্রয়োগধারার এটি একটি অভূতপূর্ব সংযোজন। লিটল্ থিয়েটারের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।

১৯৬৪ সালে শেক্সপীয়রের ৪০০তম জন্মবার্ষিকীতে 'এ মিড সামারস্ নাইটস্ ড্রিম'-এর বাংলা রূপান্তর 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন', 'জুলিয়াস সীজার', 'রোমিও জুলিয়েট' মঞ্চস্থ হয় মিনার্ভা থিয়েটারে। নাট্যরূপ ও পরিচালনা উৎপল দত্ত,

আলোক নিয়ন্ত্রণ তাপস সেন, মঞ্চ পরিকল্পনা নির্মল গুহরায়।

১৯৬৬ সালের ২৬ অক্টোবর কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'এন্টনী কবিয়াল' নাটকটি অভিনীত হয়। এই নাটকের নাম ভূমিকায় সবিতাব্রত দত্ত, ভোলা ময়রা চরিত্রে জহর গাঙ্গুলি ও নায়িকা সৌদামিনীর ভূমিকায় কেতকী দত্ত অভিনয় করেন। মঞ্চ ও আলো যথাক্রমে সুরেশ দত্ত ও তাপস সেন। দলগত অভিনয় ও সুষ্ঠু আলোকসম্পাতে তাপস সেন এবং মঞ্চ পরিকল্পনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সুরেশ দত্ত — যার ফলে নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৬৭ সালের ৭ অক্টোবর বিশ্বরূপায় ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'আগন্তুক' নাটকটি অভিনীত হয়। পরিচালনা করেন তরুণ রায়। প্রয়োগকৌশলের দিক থেকে নাটকটি উল্লেখের দাবি রাখে।

ওই বছরেই মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত 'কল্লোল' নাটকটি ১৯ মার্চ মঞ্চস্থ হয়। কাহিনী বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে এই ধরনের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়নি। নাটকটির পটভূমিকায় সূক্ষ্ম শিল্পনির্দেশনা ও সুষম আলোর প্রয়োগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই নাটকের মঞ্চ ও আলোর দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে সুরেশ দত্ত ও তাপস সেন। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রী নাটকটিতে দলগত অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। যাই হোক, উৎপল দত্ত মিনার্ভা থিয়েটারে দশ বৎসরকাল নিয়মিত অভিনয় করে গেছেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের দীর্ঘকালের যে কনভেনশন, তার থেকে সরে এসে বহু নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে তিনি নজির স্থাপন করে গেছেন। আমার বিবেচনায় 'অঙ্গার' অপেক্ষা 'কল্লোল'-এর প্রয়োগ আরও উন্নতমানের।

আমি আলোচ্য নিবন্ধে স্বাধীনতা-উত্তর সাধাবণ রঙ্গালয়ে অভিনীত ৬০-এর দশক পর্যন্ত কয়েকটি নাটকের আলোচনা করলাম। অনেকে মনে করতে পারেন — আলোক নিয়ন্ত্রণ ও শিল্প নির্দেশনার কথাই আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি, কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার -- নাটক একটি যৌথ শিল্প এবং তার সর্বময় কর্তা হচ্ছেন নাট্যপরিচালক। পাত্র-পাত্রীদের অভিনয় শিক্ষাদান, চরিত্রানুযায়ী রূপসজ্জা ও বেশভূষা সবকিছুই যেখানে আমার চোখে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়েছে বলে মনে করেছি, আমি কেবলমাত্র সেই কয়েকটি নাটকের কথাই এখানে আলোচনা করেছি।

ভাবের সঙ্গে ভাষা, এবং ছন্দের সঙ্গে বিষয়ের সামঞ্জস্য রেখে যিনি কবিতা রচনা করতে পারেন, তিনি যেমন প্রকৃত কবি-যশোভোগী, তেমনই নাটকের ক্ষেত্রে বলা যায়, যে নাট্যপরিচালক নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অভিনেতৃবর্গের চরিত্রানুগ যথাযথ অভিনয়, রূপসজ্জা, কোরাস, দৃশ্যপট পরিকল্পনা, সুষম আলোর প্রয়োগে নাটককে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করে প্রশংসাধন্য হন — তিনিই সার্থক নাট্যপরিচালক।

'স্বাধীনতব-উত্তব সাধারণ বঙ্গালয়ের প্রয়োগধাবা' নামে ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত নাট্য আকাদেমি পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় এই নিবন্ধটি মুদ্রিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির অনুমতিক্রমে পুনির্মুদ্রিত হল। শিবনাম থেকে 'প্রয়োগধারা' কথাটি বর্জন করা হয়েছে।

তিনকড়ি

বিনোদিনী

মহেন্দ্রলাল বসু

তারাসুন্দরী

ঢাকার পেশাদারি থিয়েটার

মুনতাসীর মামুন

ঢাকার থিয়েটার শুরু হল কবে থেকে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে ঢাকার থিয়েটার সম্পর্কে একটি খবর পাওয়া গেছে, কলকাতার 'হরকরা' পত্রিকায়। পত্রিকার ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখেছিলেন : 'Our native friends entertain themselves with occasional theatrical performances and 'Nil Darpan' was acted on one of these occations.'[১] এতে নিশ্চিত হয়ে বলা যায় যে, 'নীলদর্পণ' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়ে ঢাকায়ই মঞ্চস্থ হয় প্রথম। সন ১৮৬১। সংবাদটির সূত্র ধরে বলা যেতে পারে, 'নীলদর্পণ'-এর আগেও ঢাকায় অভিনয়কার্য কিছু হয়েছে। কিন্তু এসব ছিল শখের অভিনয়। উপরোক্ত স্বল্প তথ্যাদির ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, আনুমানিক ১৮৬০ সালের দিকে ঢাকা থিয়েটারের যাত্রা শুরু।

ঢাকার থিয়েটারের ইতিহাসে 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' এবং 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

শিশিরকুমার বসাক লিখেছেন, আনুমানিক ১২৭২ সনে (বাংলা সন) 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' বা 'East Bengal Dramatic Hall' গড়ে ওঠে।[২] ১২৭২ সন মানে ইংরেজির ১৮৬৫। আবদুল কাইয়ুম লিখেছেন, '১৮৬৫ সনে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা। পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমির বাঁধা স্টেজ ছিল।'[৩] সৈয়দ মুর্তজা আলী লিখেছেন, '১৮৬২ সনে পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ বা East Bengal Dramatic Hall নামে একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরে গড়ে ওঠে।'[৪] উপরোক্ত তিনজনের কেউই তাঁদের তথ্য নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করেননি। ফলে তারিখটি কোন ভিত্তিতে গ্রহণ করা হল তা বোঝা গেল না।

এছাড়া মনে হয় আর একটি ব্যাপার তাঁরা এক করে ফেলেছেন। সেটা হচ্ছে 'রঙ্গভূমি' এবং 'নাট্য সমাজ'। 'নাট্য

সমাজ' গড়ে তোলা এবং সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 'রঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন ব্যাপার। মনে হয়, উদ্যোক্তারা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' স্থাপন করেন এবং তারপর নিজেদের একটি নাট্য দল গড়ে তোলেন যা পরিচিত হয়ে ওঠে 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' নামে।

'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি সংবাদও এই অনুমান সমর্থন করে। — 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি নামে ঢাকাতে একটি নাট্যশালা আছে। যে সময়ে ঢাকার ধনী ও সম্ভ্রান্তগণ রামাভিষেক নাটকের প্রথম অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন বহুতর টাকার সংগ্রহে ইহা সুনিশ্চিত হইয়াছিল।'[৫] অর্থাৎ প্রথমে একটি হল তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু 'রামাভিষেক' অভিনীত হয় ১৮৭২ সনে। এবং এটিই ঢাকার প্রথম জনপ্রিয় নাটক।

তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, ১৮৭০-৭২ সনের মধ্যে ঢাকায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রথমে একটি হল স্থাপিত করা হয়, সেখানে একটি বাঁধা স্টেজও ছিল। (এ ধারণা যে একেবারে নিশ্চিত তা নয়। কারণ ঢাকার পুরনো সংবাদপত্র কিছু উদ্ধার করা গেলে হয়তো নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তবে 'ঢাকা প্রকাশ'-এর যেসব খণ্ড আমাদের নজরে পড়েছে তাতে উপরোক্ত অনুমান করা যেতে পারে)। এর পর উদ্যোক্তারা গড়ে তোলেন একটি থিয়েটার গ্রুপ। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি সংবাদ এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করে : '.... প্রথমত, রামাভিষেক নাটকাভিনয়ের নিমিত্ত নানা স্থানীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা এক প্রধান অভিনেতৃ দলের সৃষ্টি হয়।'[৬]

পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি স্থাপিত হয়েছিল 'মন্ত্রি সাহেবের কুঠি ও পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যবর্তী স্থানে, বর্তমানে যেখানে জগন্নাথ কলেজ অবস্থিত সেই স্থানে উহা ছিল।'[৭] এটি স্থাপন করেছিলেন, মোহিনীমোহন দাস (সবজি মহলের জমিদার) , অভয় দাস (উকিল), মতিলাল চক্রবর্তী (নর্মাল স্কুলের পন্ডিত), রাম চক্রবর্তী (উকিল) দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশ গাঙ্গুলি।[৮]

এই হলে 'পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ' মঞ্চস্থ করে তাদের প্রথম নাটক 'রামাভিষেক'। মুর্তজা আলী লিখেছেন, তাঁরা প্রথম অভিনয় করেন 'সীতার বনবাস।'[৯] কিন্তু তিনি উৎস উল্লেখ করেননি। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা যায়, প্রথম অভিনীত নাটক 'রামাভিষেক' এবং তা টিকেট কেটে দেখানো হয়েছিল। টিকেটের হার ছিল চার টাকা, দুই টাকা এবং এক টাকা। সেই সময়ের তুলনায় এই হার যে অত্যন্ত উঁচু ছিল তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এই নাটকাভিনয়ের পর চমৎকৃত হয়ে লিখেছিলেন — 'আমাদের দেশে (কলকাতায়?) নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে হয়। যাহার ইচ্ছা সে উহা দর্শন করিতে যাইতে পারে না। ঢাকার অভিনয়ে সেটি হইবে না। অভিনয় কর্তারা উহার নিমিত্ত টিকেট বিক্রি করিবেন। টিকেট চারি দুই এবং এক টাকা মূল্য লাগিবে।'[১০]

অন্যদিকে কলকাতায় টিকেট বিক্রি করে নাটক দেখানো হয় ১৮৭২ সনের ৭ ডিসেম্বর। —

'চিৎপুরে ঘড়িওয়ালা বাড়ি নামে খ্যাত মধুসূদন সান্যালের সুবৃহৎ অট্টালিকার উঠানে মাসিক ৪০ টাকার ভাড়ায় বিনা আড়ম্বরে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করা হয়েছে। সেই রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম গণনাটক নীলদর্পণ অভিনীত হয়। টিকেটের মূল্য ছিল প্রথম শ্রেণী ১ দ্বিতীয় শ্রেণী ।।০'[১১] এ জন্যই বোধহয় 'অমৃত বাজার' এর কয়েক মাস আগে মন্তব্য করেছিল, 'আমাদের দেশে নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই হয়।'

'রামাভিষেক' ঢাকায় হিট করে। এর কারণ থিয়েটার সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের বিনোদন নিয়ে উপস্থিত হয়। তাছাড়া দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখা — ছোট শহরে সেটাও বোধহয় উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন, টিকেটলব্ধ টাকা তাঁরা 'সৎকার্যানুষ্ঠান'-এ ব্যয় করবেন। কিন্তু 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' কি পেশাদারি নাট্য সংস্থা ছিল? নাকি চ্যাবিটির জন্য 'শো' করেছিল? এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে না পারলেও বলতে পারি যে, ঢাকায় সেই প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে থিয়েটার প্রদর্শন শুরু হল। এবং পরবর্তীকালেও সেই ধারা মোটামুটি অব্যাহত থেকেছে।

আগেই বলেছি, 'রামাভিষেক' ছিল ঢাকার প্রথম জনপ্রিয় নাটক (পরবর্তীকালে আরও অনেকবার এই নাটকটি

মঞ্চস্থ হয়েছে)। 'অভিনয় দেখিতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। অনেক অনেক প্রধান মুসলমান, ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট, পোগোজ সাহেব এবং অন্যান্য কয়েকজন খৃস্টান উপস্থিত হন এবং সকলেই অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব এমন আনন্দিত হন যে, তিনি বলেন যে, আবার যখন অভিনয় হইবে তখন আমি মেম সাহেবদিগকে আসিতে বলিব এবং পোগোজ সাহেব বলেন যে, অভিনয়ের টিকেট কিনিতে যে পাঁচ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা তিনি সৎকাজে লাগাইয়াছেন।'[১১]

কিন্তু ঘটনাটি এমনও হতে পারে। 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' স্থাপনের পর কিছু উৎসাহী ব্যক্তি, অমৃত বাজার যাদের 'কৃতবিদগণ' বলে উল্লেখ করেছেন তাঁরা 'রামাভিষেক' মঞ্চস্থ করেন। 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' নামে ফর্মাল কোনও দল ছিল না। কারণ এরপর পত্রিকাতে বা অন্য কারও প্রবন্ধে এই নামটির উল্লেখ দেখা যায় না।

ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থে আমরা 'ঢাকা থিয়েটার কোম্পানী' নামে একটি নাম পাই।[১৩] তারা 'নবনাটক' অভিনয় করেছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য এই নামের আর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার 'ঢাকা প্রকাশ' ১৬-৭-১৮৭৩ সনের এক নিবন্ধে বলছে (অমৃত বাজারের সংবাদ ছাপা হয়েছে ৪-৯-১৮৭৩ তারিখে) : '....প্রথমোক্ত 'রামাভিষেক' নাটকাভিনয়ের কয়েক ব্যক্তি পুনরায় নবনাটকের অভিনয় প্রদর্শনে সমুদ্যোগী হইয়াছেন ...।' তাহলে কি 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' ও 'ঢাকা থিয়েটার কোম্পানী' একই সংস্থা?

তবে এটা ঠিক, 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর একে কেন্দ্র করে ঢাকার থিয়েটারচর্চা শুরু হয়। যেমন আমাদের এখানে এখন মহিলা সমিতি মিলনায়তনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে থিয়েটার আন্দোলন।

'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' শুধু নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য স্থাপিত হয়নি। ঢাকার অধিকাংশ সভাসমিতিই তখন 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে হত। বলা যেতে পারে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নির্মিত হলেও পরে তা টাউন হলে পরিণত হয়। ১৮৬৪ সনে দেখা যাচ্ছে, আট হাজার টাকা চাঁদা তোলা হয়েছে রঙ্গভূমি সংস্কার করার জন্য।[১৪]

১৮৬১ থেকে ১৮৭২ — এই দীর্ঘ দশ বছর কি ঢাকার থিয়েটার নিশ্চুপ ছিল? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু 'নীলদর্পণ' ও 'রামাভিষেক'-এর মাঝামাঝি কোনও থিয়েটারের সংবাদ অথবা তথ্য আমরা পাই না। ১৮৭৩ সনের 'ঢাকা প্রকাশ'-এর এক নিবন্ধে আমরা এই মধ্যবর্তী সময়ের কয়েকটি নাটকের নাম জানতে পারি।

'রামাভিষেক'-এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে '.... বাঙ্গলা বাজারে কতিপয় ব্যক্তি স্বতন্ত্র দলবদ্ধ হইয়া 'প্রাণেশ্বর নাটক' 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন অভিনয় করেন। তদনন্তর আর কয়েক ব্যক্তি সমবেত চেষ্ট হইয়া 'কক্স এণ্ড কক্স' এবং 'চক্ষুদান' প্রহসনের অভিনয় করিয়া উৎসাহিত হন, ইতিমধ্যে আমলীগোলায় আর একদল হইয়া রামাভিষেক নাটকের পুনরাভিনয় করিয়াছেন এবং সেদিন আবার কলেজের কতিপয় বালক রমনীগোপাল নামক অতি জঘন্য একখানি নাটকের অভিনয় করিয়া অনেকেরই বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছেন।[১৫] এক কথায় — ঢাকায়ই এ পর্যন্ত ৪/৫ দলের সৃষ্টি হইয়াছে।'[১৬]

উপরোক্ত নাটকগুলি 'রামাভিষেক'-এর সমসাময়িক। তবে এটা উল্লেখযোগ্য যে সত্তরের গোড়ার দিকেই ঢাকায় বেশ কয়েকটি নাটকের দল গঠন করা হয়েছিল। সবগুলির নাম জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে দু'চারটি নাম জানা গেছে।

১৮৭১ সনে গঠিত হয় 'প্রাইড অব বেঙ্গাল থিয়েটার'।[১৭] এর উদ্যোক্তা ছিলেন রাধাকান্ত চক্রবর্তী, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলি (পালোয়ান), পরেশনাথ ঘোষ (পালোয়ান), ডা. রাজেশ্বর চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী, (মুন্সীগঞ্জ স্কুলের রেকটর), আকমল খাঁ ও ইউসুফ খাঁ (সাবান ব্যবসায়ী) এবং জ্ঞানেশ্বর রায়।[১৮]

এই নাট্যগোষ্ঠী 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভাড়া নিয়ে অভিনয় করত।[১৯] তাহলে কি এই নাট্য সংস্থা পেশাদার ছিল? এ সম্পর্কে তথ্যের অভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে শখের থিয়েটার গোষ্ঠী হলে টাকা খরচ করে নিশ্চয়ই তারা হল ভাড়া করত না। এই অনুমান সত্য হলে বলতে হয়, 'প্রাইড অব বেঙ্গাল থিয়েটার' ঢাকার প্রথম দিককার পেশাদারি নাট্য সংস্থার একটি (যদি আমরা 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ'কে পেশাদার হিসাবে ধরি)।

মুর্তজা আলীর প্রবন্ধ অনুসারে, তারা 'শরৎ সরোজিনী', 'মেঘনাদ বধ', 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' মঞ্চস্থ করেছিল।[২০] কিন্তু 'ঢাকা প্রকাশ'-এ এই নাট্য সংস্থা সম্পর্কে কোনও তথ্য পাইনি।

মুর্তজা আলীর প্রবন্ধ অনুসারে আবদুল কাইয়ুম লিখেছেন, সমসাময়িক কালে ঢাকায় 'নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানী' নামে একটি নাট্য গোষ্ঠী গঠিত হয় যে নাট্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলম' বাংলায় অনূদিত হয় এবং ১৮৭১ সনে তা মঞ্চস্থ হয়।'[২১]

কিন্তু ১৮৮১ সনের 'ঢাকা প্রকাশ'-এ নবাবপুরের এই দলটি সম্পর্কে সংবাদ পাই। এবং ২৪-৭-১৮৮১ সনে পত্রিকা লিখেছে, 'ঢাকা নবাবপুর এমেটিয়ার কোম্পানী অভিনয় কার্যে সবিশেষ যশ আহরণ করিয়াছেন।' এবং ৪-৯-১৮৮১ সনের সংবাদে দেখা যায় তারা শকুন্তলা মঞ্চস্থ করেছে। তাহলে মুর্তজা আলী বা আবদুল কাইয়ুমের অনুমান কি সঠিক বলে মেনে নেব?

বসাক পরিবারের চৌদ্দজন সদস্যের সমন্বয়ে (দ্রষ্টব্য ৪-৯-১৮৮১ সনের সংবাদ) এই দলটি গড়ে ওঠে। যদিও এর নামের শেষে কোম্পানী যুক্ত, কিন্তু মনে হয় না এটি পেশাদারি সংস্থা ছিল। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল তাঁতীবাজারের এক অ্যামেচার থিয়েটার দলের। দলাদলি বা গোষ্ঠীগত কারণেই দলটি গড়ে উঠেছিল। তবে এদের একটি সদিচ্ছা ছিল, তা হল, সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ করে তা মঞ্চস্থ করা।

আর একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৮ সনের একটি সংবাদে আমরা জানতে পারি, 'নবাবপুরে সকের অভিনয় দ্বারা অনেক কাল পূর্ব হইতে অনেকবার ঢাকাস্থ ভদ্রমণ্ডলীর প্রীতি সম্পাদন করা হইয়াছে। এবারও উত্তর নবাবপুরে সকের থিয়েটারে বুদ্ধদেব চরিত্রের অভিনয় হইতেছে (২-১০-১৮৯৮)।' তাহলে কি ধরে নেব নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার এত দীর্ঘকাল ধরে টিকে ছিল? যদি তাই হয়, তাহলে ঘটনাটি খুবই আশ্চর্যজনক বলতে হবে।

১৮৮৮ সনে ঢাকায় আর একটি পেশাদারি নাট্য সংস্থা স্থাপিত হয় — 'ইলিশিয়াম থিয়েটার'। এ সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধকারত্রয় নতুন কোনও তথ্য দিতে পারেননি। ১৮৯১ সনের 'ঢাকা প্রকাশ'-এ একটি সংবাদ-সূত্র ধরে এই নাট্য সংস্থা সম্পর্কে কিছু অনুমান করা যায় — 'ঢাকায় স্থানীয়রূপে আমোদ আহ্লাদের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। কিন্তু কতকদিন হইতে নবাবপুরে অত্রত্য জজকোর্টের পেস্কার বাবু কৃষ্ণকিশোর বসাকের ঐকান্তিক যত্নে একটি নাট্য সমাজ গঠিত হইয়া সাধারণকে নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইতেছে।'[২২]

তাতে মনে হয় নবাবপুর অ্যামেচার থিয়েটারের উদ্যোক্তা বসাক পরিবারের একজন সদস্য কৃষ্ণকিশোর ওই অ্যামেচার কোম্পানী ভেঙে গেলে উদ্যোগ নিয়ে 'ইলিশিয়াম' গঠন করেন। তবে প্রথম দিকে 'ইলিশিয়াম'ও শখের দল ছিল। পরে পেশাদার গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। এই অনুমানের ভিত্তি নিচের সংবাদটি :

'নবাবপুরে পূর্বে কয়বার নাটকাভিনয় হইয়াছে তাহাতে কাহারও নিকট অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই, কিন্তু এরূপ সদাব্রত চলা কঠিন। তাই এবার রীতিমত অর্থ গ্রহণ করিয়া অভিনয় প্রদর্শন হইতেছে।'[২৩] নবাবপুরেই কোনও এক জায়গায় বোধ হয় নাটক মঞ্চস্থ হত। সপ্তাহে দু'দিন, বুধ ও শনিবার অভিনয় হত।[২৪]

মুর্তজা আলী জানিয়েছেন, ইলিশিয়াম 'বিল্বমঙ্গল', 'শকুন্তলা', 'জটিল চরিত', 'সীতার বনবাস', 'প্রভাসমিলন', 'নীলদর্পণ' ইত্যাদি মঞ্চস্থ করে।[২৫] এতে মনে হয় 'ইলিশিযাম' নবম দশকের গোড়ার দিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল।

ইলিশিয়াম থিয়েটারের জনপ্রিয়তার মূলে জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগের অবদান কম নয়। তিনি ছিলেন এর পরিচালক।[২৬] কুঞ্জলাল ছিলেন রক্ষণশীল। কিন্তু তিনিই ছিলেন নাট্য সংস্থার পরিচালক। ব্যাপারটি স্ববিরোধী মনে হতে পারে। মনে হয়, পৌরাণিক নাটকের প্রচার মানে ধর্মভাব প্রচার, এই ভেবে হয়তো তিনি নাট্য পরিচালকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। কারণ আমরা দেখি, ইলিশিয়ামে মঞ্চস্থ প্রায় নাটকের বিষয়বস্তুই ছিল পৌবাণিক।

'বিল্বমঙ্গল' ছিল ওই সময়ের জনপ্রিয় নাটক। গিরিশ ঘোষের বিখ্যাত 'বিল্বমঙ্গল' নাটক গীতিনাট্যের আকারে রূপান্তরিত করে কুঞ্জলাল নাগ ১৮৮৮ সনে[২৭] প্রকাশ করেন।

নাটকটি শুধু মঞ্চায়নের জন্যই নয়, পুস্তকাকারেও জনপ্রিয় ছিল। বইয়ের মুখবন্ধে লেখা ছিল — 'নাট্য সমুদায়ের মোহর ও স্বাক্ষর ভিন্ন কোনও পুস্তক ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ। যদি কাহারও হস্তে এরূপ পুস্তক দৃশ্য হয় তবে ক্রেতা বা বিক্রেতা ধর্মাধিকরণে দণ্ডনীয় হইবেন। কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্তরূপ ক্রয় বিক্রয়ের সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়া সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিলে তাহাকে দশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।'[২৮]

এই নাটকের একটি গান লোকের মুখে মুখে ফিরত —

'পর কি আপন চিনলি না মন/পথ ভুলে যাও কোথারে/ ওরে মন মূঢ় মন, গরল তুলে দিচ্ছ মুখে কি করে/আপন হাতে করে/বিষয় বিষে রঙ্গরসে/ভেসে আছরে সুখাবিলাসে/কর কি, ভাব কি, যবে ধরবে তোর কেশে/ উপায় কি হবে শেষে/রাখে হরি পদে গতি মতিরে (ভবেত রবে যদি)/যারে তুমি সদা ভাবিছ আপন/সে কি তোর কখন হবেরে আপন/হল কি, কর কি, মায়া মোহে অচেতন/ঘোর আধারে মগন।[২৯]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের অপরাধেই এই দলের নাটক অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সময় স্থানীয় সরকার পক্ষ থেকে নাটকের বিশেষ অংশ নিয়ে আপত্তি উপস্থাপিত হয়। এবং এরপর নবাবপুরের দলটি ভেঙে যায়।

ওই একই সময়ে দক্ষিণ মৈশুণ্ডীতে 'সনাতন নাট্য সমাজ' নামে একটি নাট্যদল গড়ে ওঠে। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি সংবাদ অনুসারে — 'ঢাকায় আর একটা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দক্ষিণ মৈশুণ্ডীতে ঢাকার শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন সাহা ও মনি মোহন সাহার উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে 'সনাতন নাট্য সমাজ' নামে ওই নাট্যশালা গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি তথায় প্রহলাদ চরিত্র নামক একখানি নাটক বিরচিত হইয়া অভিনয় হইতেছে।'[৩০]

শিশিরকুমার বসাক উপরোক্ত উদ্যোক্তাদের নামের সঙ্গো আরও দু'টি নাম যোগ করেছেন। নাম দু'টি হল ভজহরি সাহা শঙ্খনিধি ও রাখালচন্দ্র বসাক।[৩১]

পেশাদারি নাট্য সংস্থা ছিল না 'সনাতন নাট্য সমাজ'। এর চরিত্র ছিল শৌখিন। একই পরিবারের কিছু উৎসাহী নাট্যকর্মী নিয়ে দলটি গড়ে উঠেছিল শৌখিন কারণে এবং তাই 'প্রহলাদ চরিত্র' অভিনয়ের পর তাদের মতবিরোধ দেখা দেয়।[৩২] এবং ওই সময় ঝড়ে ঘর ভেঙে গেলে দলও ভেঙে যায়।

৮৯ সনে 'ঢাকা প্রকাশ'-এ আর একটি নাট্য গোষ্ঠীর নাম পাই। এই দলটির কথা শিশিরকুমার বা মুর্তজা আলী লেখেননি। পত্রিকার খবরটি এইরকম — 'ঢাকায় আর একটি থিয়েটার কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অত্রত্য সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় — যাঁহাদের আদি নিবাস পশ্চিম বঙ্গে এবং এখনও তাঁহারা পশ্চিম বঙ্গের কথাবার্ত্তাই ব্যবহার করেন। তাহাদের দ্বারাই উহা সম্পাদিত হইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেককেই শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি। ইহারা পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে 'দক্ষযজ্ঞ' নামক নাটকাভিনয় দেখাইতেন।[৩৩]

এর দু'সপ্তাহ পর আর একটি সংবাদ — 'অত্রত্য সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের অলিম্পিয়ান থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞ নাটক সুন্দর রূপ অভিনীত হইতেছে। প্রতি বুধ ও শনিবারে অভিনয় হইয়া থাকে।'[৩৪]

এই নাট্য সম্প্রদায়ের নাম পরে আর খুঁজে পাইনি। 'অলিম্পিয়ান থিয়েটার' কি তাদের নাম ছিল? কারণ ওই নামে আর কোনও 'হলের' নাম পাওয়া যায় না। তাছাড়া তারা কি শৌখিন না পেশাদার ছিল? সপ্তাহে দু'দিন অভিনয় দেখে মনে হয় এই সংস্থা পেশাদার ছিল।

এখন ঢাকা শহরে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নাটক মঞ্চস্থ হয়, এবং দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখতে হয়। থিয়েটারের ব্যাপারে প্রফেশনালিজম এসেছে। ঢাকায় এই জিনিসটির সূত্রপাত ঘটে নব্বইয়ের দশকে। তখন থেকে পরবর্তী দশ বছর, ঢাকায় দু'টি পেশাদারি রঙ্গামঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটির পর একটি নাটক অভিনীত হতে থাকে। এই দুটো দল হল ডায়মন্ড এবং ক্রাউন।

সত্যেন সেন লিখেছেন, 'কিশোরীলাল রায় চৌধুরী ১৮৮৭ সনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য শাসনকালের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। .... ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার ঢাকার প্রথম পেশাদার নাট্য

ভবন .... ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর চারের বাদে ক্রাউন থিয়েটারের সৃষ্টি।'[৩৫] উপরোক্ত কোনও তথ্যই ঠিক নয়।

'সনাতন নাট্য সমাজ' ভেঙে গেলে তার উদ্যোক্তাদের নিয়েই ক্রাউন থিয়েটার গড়ে ওঠে। সনাতনের ভজহরি ও লালমোহন সাহা এ দলে যোগ দেননি। কিন্তু অন্যান্য সবাই, অভিনেতা দলও ক্রাউন থিয়েটারে যোগ দেয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে নতুন একটি নাম যোগ হয় — কলতাবাজারের হরিদাস বসাক। খুব সম্ভব বসাক পরিবারেরই লোক।

'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভেঙে সেখানে ক্রাউন থিয়েটারের উদ্বোধন করা হয়।[৩৬] ('নবাব বাড়ীর কাছে ইতিপূর্বে যেই বরফ কলটি ছিল তারই পাশে একটি টিনের বাড়ীতে ...'[৩৭])। তবে ক্রাউন থিয়েটার কখন স্থাপিত হয়েছিল তার তারিখ পাওয়া যায়নি। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ ক্রাউন থিয়েটার সম্পর্কে প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় ২১-৫-১৮৯৩ সনে। 'সনাতন নাট্য সমাজ' ভেঙে যায় আশির শেষ দিকে। ফলে আমরা ধরে নিতে পারি ১৮৯০-৯২ সনের মধ্যে ক্রাউন থিয়েটার স্থাপিত হয়।

ক্রাউন থিয়েটার শুধু রঙ্গমঞ্চ ছিল না, এদের সঙ্গে নাট্য গোষ্ঠীও সংশ্লিষ্ট ছিল এবং প্রথম থেকেই এরা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ শুরু করে। শুধু তাই নয়, নাটককে সফল করে তোলার জন্য এবং দর্শকদের 'স্টান্ট' দেওয়ার জন্য তারাই প্রথম ঢাকার মঞ্চে স্থানীয় অভিনেত্রী আনে। ঢাকার নাট্যাভিনয়ে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৮৯৩ সনের দিকে ক্রাউনে প্রতি সোম, বুধ ও শনিবার অভিনয় হত।[৩৮] ১৮৯৪ সনে দেখা যাচ্ছে সপ্তাহে দু'দিন, শনি ও বুধবার অভিনয় হচ্ছে। প্রথমদিকে সারা রাত ধরে অভিনয় চলত। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মন্ডি এ ব্যাপারে আপত্তি করেন এবং ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট অভিনয়ের সময় রাত এগারোটা পর্যন্ত বেঁধে দেন।[৩৯] এসব কারণেই বোধহয় এই রঙ্গমঞ্চ পরে ইসলামপুরে স্থানান্তরিত করা হয়।[৪০]

ক্রাউন ও ডায়মন্ডে চার ধরনের টিকেট ছিল। প্রথম শ্রেণী (গদি) দু'টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী (চেয়ার) এক টাকা, তৃতীয় শ্রেণী (টুল) আট আনা এবং চতুর্থ শ্রেণী (গ্যালারি) চার আনা।[৪১] মুর্তজা আলী লিখেছেন, ১৮৯৪ সনের ফেব্রুয়ারিতে ক্রাউনে গিরিশ ঘোষের 'পূর্ণচন্দ্র' অভিনীত হয়। তথ্যটি ঠিক নয়। কারণ 'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি সংবাদে জানা যায়, ১৮৯৩ সনে 'পূর্ণচন্দ্র' অভিনীত হয় — 'অত্রত্য পটুয়াটুলিস্থ ক্রাউন থিয়েটার মধ্যযোগে চৈতন্য লীলা অভিনীত হইয়া পুনরায় পূর্ণচন্দ্র নাটক অভিনয় হইতেছে।'[৪২] এই নাটকেই স্থানীয় অভিনেত্রী নামানো হয়। তার নাম ছিল দুনিয়া, এবং নায়ক ছিলেন ললিতচন্দ্র দাস।[৪৩] দুনিয়া অবশ্যই বারবণিতা ছিল। কারণ এ ছাড়া তখন আর অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। আর তাছাড়া ঢাকায় বাঈজিরা ঐতিহ্যগতভাবেই নৃত্যগীতে পটু ছিল। তবে মঞ্চে অভিনেত্রীর আগমন নিয়ে ঢাকায় তখন তুমুল হইচই শুরু হয়েছিল। 'ঢাকা প্রকাশ' তখন মন্তব্য করেছিল, 'মনোহরিণী বারবণিতাগণ অভিনয় করে বলিয়া যাহারা আপত্তি করেন তাহারা এই নাট্যাভিনয়েব সুখ সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হইতে পারেন। কিন্তু সর্বসাধারণে যখন তাঁহাদের ভদ্রমহিলাগণের নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণে সমর্থ নহে; .... অপিচ এই অভাববশতঃ লোককে যখন বাইখেমটাওয়ালার নৃত্যগীত যোগ দিতেই হয় তখন তাহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এই নাটক অভিনয় দর্শন আমরা কাহারও পক্ষে অন্যায় মনে করি না।'[৪৪]

তবে আমাদের মনে বাখতে হবে, এই কটাক্ষ পত্রিকা কর্তৃপক্ষের থিয়েটারপ্রীতিসঞ্জাত নয়, এই কটাক্ষ ছিল ব্রাহ্মসমাজের প্রতি, যারা থিয়েটার, বিশেষ করে মঞ্চে খেমটাওয়ালি আনয়নের বিরুদ্ধে ছিল।

সত্যেন সেন[৪৫] ক্রাউনের তৎকালীন জনপ্রিয় কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম জানিয়েছেন। তাঁরা হলেন, হরিপদ দে, বিনুবাবু, বিনোদবাবু, নুটু রায়, রাধামাধব চক্রবর্তী, গৌরচন্দ্র দাস, বর্ধমানের রানি (স্টান্ট নাম), কনক সরোজিনী, এবং সরলা। কনক সরোজিনী ছিল রাখাল দাসের রক্ষিতা।

১৮৯৩ সনে[৪৬] ক্রাউন কলকাতা থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী আমদানি করে। সত্যেন সেন লিখেছেন,[৪৭] অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী কলকাতা থেকে ডায়মন্ডে এসে যোগ দেন। কিন্তু পত্রিকা অনুসারে[৪৮] বলতে পারি, অর্দ্ধেন্দু প্রথমে ক্রাউনে যোগ দেন, তারপর বোধহয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ডায়মন্ডে যোগ দেন। মুর্তজা আলী ক্রাউনে অভিনীত

বারোটি নাটকের নাম দিয়েছেন। সেগুলি হল 'চৈতন্যলীলা', 'নলদময়ন্তী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'জনা', 'লায়লি মজনু', 'তুলাবাঈ', 'আনারকলি', 'সতীসুকন্যা', 'নৈশবালা', 'বা অষ্টবক্র মিলন', 'কেদার রায়' ও 'সুর সুন্দরী'।[৪৯]

'ঢাকা প্রকাশ' থেকে প্রাপ্ত আরও কয়েকটি নাম এর সঙ্গে যোগ দিতে পারি। সেগুলি হল : 'মীরাবাঈ', 'রাজাবাহাদুর', 'আবু হোসেন' এবং 'প্রফুল্ল'।

ক্রাউনের মালিকানা কয়েকবার বদল হয়। একবার যুগীনগরের দ্বারকানাথ কর্মকার এবং বনগ্রামের ব্রজলাল সাহা রাখালচন্দ্রের কাছ থেকে রঙ্গমঞ্চটি কিনে নেন।[৫০] কিন্তু বেশিদিন তাঁরা তা চালাতে না পেরে ফের রাখালচন্দ্রের কাছে বিক্রি করে দেন।

ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার চালু হলে ক্রাউনের একাধিপত্য হ্রাস পায়। কিন্তু আস্তে আস্তে ঢাকায় থিয়েটার বিলুপ্তির কারণ আমরা খুঁজে পাব ১৬-৪-৯৮ সনের 'ঢাকা প্রকাশ'-এর এক সংবাদে যেখানে বলা হয়েছে, ক্রাউনে বায়োস্কোপ দেখান হবে। থিয়েটারের জনপ্রিয়তা হ্রাসের প্রধান কারণ হিসাবে এই বায়োস্কোপের কথা বলা যেতে পারে। ১৮৯৭ সনে বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরী ক্রাউন থেকে কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী ভাঙিয়ে আনেন এবং ক্রাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ডায়মন্ড জুবিলির প্রতিষ্ঠা করেন। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ এই সম্পর্কে লেখা হয়েছে[৫১] : 'এখানে ক্রাউন থিয়েটার আছে। ক্রাউনের অধ্যক্ষরা কলকাতা হইতে যে ক'একজন অভিনেতা অনিয়াছিলেন, মনান্তর হওয়াতে তাঁহারা ক্রাউন থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া এই অপরিচিত স্থানে একটা বিপদে পড়িয়াছিলেন। সেই বিপদে জগন্নাথ কলেজাধিকারী বাবু কিশোরী লাল রায় চৌধুরীর সাহায্য প্রার্থী হওয়াতে কিশোরী বাবু সাহায্য করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহারা থিয়েটার ব্যবসায়ী — সুতরাং আর একটা নূতন থিয়েটার করার সঙ্কল্প জানাইলে কিশোরী বাবু তাহাতে ক'একশত টাকা ধার দিয়াছেন। ....' এবং তাতে 'অপ্রশংসার কি?' পত্রিকা প্রশ্ন তুলেছে। তবে পত্রিকার সংবাদাদি দেখে মনে হয় কিশোরীলালের প্রতি তাদের কিঞ্চিৎ সহানুভূতি ছিল এবং তাই উপরোক্ত সংবাদটি এভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

ডায়মন্ডও ক্রাউনের মতো রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে নিজেদের একটি দল গঠন করে। প্রথমে তারা অভিনয় শুরু করে রাজাবাবুর মাঠের এক ঘরে। ১৮৯৮ সনে ইসলামপুরে আজ যেখানে লায়ন সিনেমা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তারা নিজেদের রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে। ডায়মন্ড কলকাতা থেকে অভিনেত্রী এনেছিল এবং প্রয়োজন হলে স্থানীয় বাঈজিদের সাহায্যে তারা কাজ চালিয়ে নিত। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ তাদের অভিনীত যেসব নাটকের নাম পাওয়া যায় সেগুলি হল, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'দেবী চৌধুরানী', 'বিজয় সেন', 'প্রমোদরঞ্জন', 'আলীবাবা', 'নবীনতপস্বিনী', 'স্ত্রী', 'প্রভাসমিলন', 'বাবু', 'বিল্বমঙ্গল' এবং 'নন্দদুলাল'।

১৯০০ সালে ক্রাউনের এককালীন অংশীদার দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ডায়মন্ডের মালিক হন। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি সংবাদ এই অনুমান সমর্থন করে — 'অত্রত্য ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারের মালিকের নাম শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্তী। লোকে অন্যরূপ কথা রটাইতেছে বলিয়াই একথাটা বলিতে হল।'[৫২]

বিশ শতকেও পেশাদারি থিয়েটার টিকে ছিল। শখের পেশাদার দলও অনেক গড়ে উঠেছিল। ১৯২৫-২৬ সনের দিকে ঢাকায় পেশাদারি থিয়েটার লোপ পায়।[৫৩]

উল্লেখসূচি

১. হরকরার সংবাদী, ১২-৬-১৮৬১ উদ্ধৃত, সৈয়দ মুর্তজা আলী, উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন, সাহিত্য পত্রিকা, ১৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১৩৮০, পৃ. ৩৫

২. শিশিরকুমার বসাক : ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস, আজাদ সাহিত্য মজলিস, দৈনিক আজাদ, ১০-১০-১৯৬৪, পৃ. ৬-৭।

৩. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম : সাময়িক পত্রে সেকালের ঢাকা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা,

এপ্রিল-জুন ১৯৭০, পৃ. ৫১।

৪. সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪.

৫. ঢাকা প্রকাশ, ২৮-১১-১৮৮৫।

৬. ওই, ১৬-৭-১৮৭৩।

৭. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।

৮. ওই।

৯. সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

১০. অমৃত বাজার পত্রিকা, ১৮-৩-১৮৭২।

১১. মমতাজ উদ্দীন আহমদ : বাংলা থিয়েটারের বিবর্তন, শিল্পকলা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, গ্রীষ্ম, ১৩৮৭, পৃ. ৪৪-৪৫।

১২. অমৃত বাজার পত্রিকা, ৪-৪-১৮৭২, উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৬৯।

১৩. ওই।

১৪. ঢাকা প্রকাশ, ২৭-৪-১৮৬৪।

১৫. ঢাকা প্রকাশ, ১৬-৭-১৮৭৩।

১৬. ওই।

১৭. সৈয়দ মুর্তজা আলী ও শিশিরকুমার বসাকের প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।

১৮. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত, ১০-১০-১৯৬৪, পৃ. ২।

১৯. ওই।

২০. সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

২১. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

২২. ঢাকা প্রকাশ, ১৭-৫-১৯২১।

২৩. ওই, ২২-৭-১৮৮৮।

২৪. ওই।

২৫. সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

২৬. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত, ১০-১০-১৯৬৪, পৃ. ৩।

২৭. সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

২৮. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

২৯. ওই।

৩০. ঢাকা প্রকাশ, ৬-১-১৮৮৯।

৩১ শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

৩২. ওই।

৩৩. ঢাকা প্রকাশ, ১১-৮-১৮৮৯।

৩৪. ওই, ২৫-৮-১৮৮৯।

৩৫. সত্যেন সেন, ঢাকা শহরের নাট্য আন্দোলন, শহরের ইতিকথা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ২৪।

৩৬. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত, ১৭-১০-১৯৬৪, পৃ. ১।

৩৭. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৩৮. ঢাকা প্রকাশ, ৩-১২-১৮৯৩।

৩৯. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত, ১০-১০-১৯৬৪, পৃ. ৩৬।
৪০. সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৪১. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
৪২. ঢাকা প্রকাশ, ২১-৫-১৮৯৩।
৪৩. সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৪৪. ঢাকা প্রকাশ, ২১-৫-৯৩।
৪৫. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।
৪৬. ঢাকা প্রকাশ, ২২, ১৮৯৩।
৪৭. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
৪৮. ঢাকা প্রকাশ, ২-৭-১৮৯৯।
৪৯. সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৫০. ওই।
৫১. ঢাকা প্রকাশ, ১৯-১২-১৮৯৭।
৫২. ওই, ৪-২-১৯০০।
৫৩. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল, বাংলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে, ১৯৭৯ সালে, 'উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার' নামে। এখানে প্রকাশিত নিবন্ধটি ওই গ্রন্থের একটি অধ্যায়।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

৬৮ নং বিডন স্ট্রিট, কলকাতা
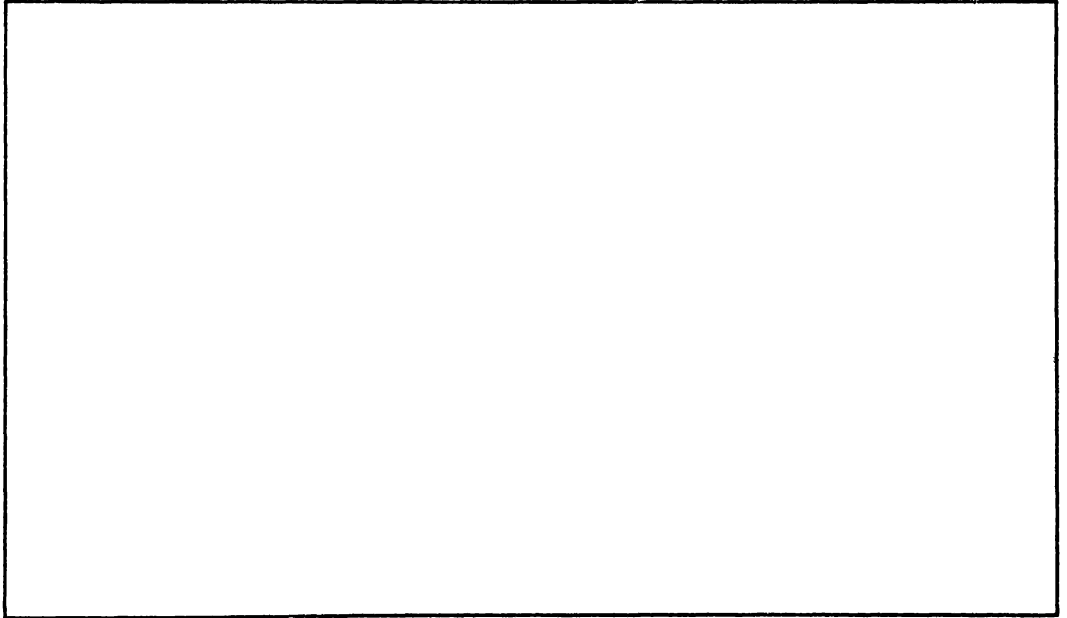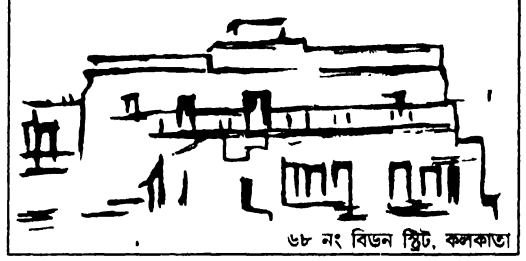
স্টার থিয়েটারের ইতিহাস

দর্শন চৌধুরী

৭৫/৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিধান সরণি), কলকাতা

শেষ পর্বে স্টার থিয়েটাব যখন চলছিল

অগ্নিকাণ্ডের পরে স্টাব থিয়েটার
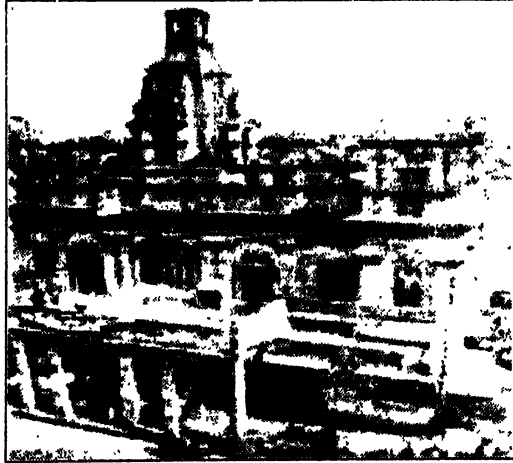
স্টার থিয়েটারের ষষ্ঠ পর্বের সূচনা : 'শ্যামলী' নাটকে উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও রবি রায়

প্রাককথন

বাংলার সবচেয়ে ঐতিহ্যশালী থিয়েটারের নাম স্টার থিয়েটার। একশ বছরের ওপর অপ্রতিহতভাবে কোনও থিয়েটারের নাট্যাভিনয় অব্যাহত রেখে চলা যে কোনও দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

ওই স্টার থিয়েটার আসলে দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিট, কলকাতায়। গুর্মুখ রায়ের অর্থানুকূল্যে ও মালিকানায়। চলেছিল সর্বমোট চার বৎসর। ২১ জুলাই, ১৮৮৩ থেকে ৩১ জুলাই, ১৯৮৭। তারপর সেই স্টার থিয়েটারের বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। সেখান দিয়ে এখন 'চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ' তৈরি হয়েছে।

দ্বিতীয় স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে। ৭৫/৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, বর্তমান বিধান সরণি। বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার বিক্রি করে স্বত্বাধিকারীরা যে টাকা পেয়েছিলেন তাই দিয়ে এবং গিরিশচন্দ্রের সাহায্যে হাতিবাগানে নতুন থিয়েটার বাড়ি তৈরি করেন। আবার স্টার থিয়েটার বিক্রি করলেও, নামটির 'গুডউইল' তাঁরা হাতছাড়া করেননি। নতুন থিয়েটারটির নাম তাই রয়ে গেল স্টার থিয়েটার। ২৫ মে, ১৮৮৮ থেকে একনাগাড়ে চলেছিল ১২ অক্টোবর, ১৯৯১ পর্যন্ত। গত শতকের শেষ দশকে এই ঐতিহ্যপূর্ণ থিয়েটার বাড়িটি আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ভস্মীভূত স্টার থিয়েটার যেন পেশাদারি বাণিজ্যিক থিয়েটারের যুগশেষের প্রতীক হিসাবে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

দুই স্টার থিয়েটারের ইতিহাস সম্পূর্ণ জানা না থাকলে একটির ঘটনা আর একটির ওপর চেপে বসতে পারে। সে ভুল প্রায়শই হয়। এখনও দেখছি অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে।

সূচনা

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করল বাগবাজার অঞ্চলের কিছু নাট্য-উৎসাহী যুবক। এখান থেকেই বাংলায় সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা হল। এতদিন ধনী বাঙালির প্রাসাদমধ্যে গৃহকর্তার অর্থে ও আনুকূল্যে নাটক অভিনীত হত। নিমন্ত্রিত ও আমন্ত্রিত নির্বাচিত দর্শকবৃন্দই সেই নাটকাভিনয় দেখার সুযোগ পেত। সর্বসাধারণের সেখানে

প্রবেশের অধিকার ছিল না। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রাসাদ-মঞ্চের প্রাচীরের ঘেরাটোপ ভেঙে, ধনীব খেয়ালখুশি, শখ-আহ্লাদ, উৎসাহ ও আনুকূল্য থেকে বাংলা নাটকাভিনয়কে সর্বসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দিল। শুরু হল সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগ।

তিন মাসের মধ্যে ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে গেল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দুইভাগে ভাগ হয়ে চলল এক বছর। তারপর উঠে গেল।

ন্যাশনাল থিয়েটারে টিকিটের ব্যবস্থা ছিল। যে কেউ পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে সেখানে প্রবেশ কবতে পারত। দর্শক নিয়ন্ত্রণ ও নিজেদের অভিনয়ের খরচ-খরচা চালানোর জন্যই এই ব্যবস্থা তারা করেছিল। ন্যাশনাল থিয়েটার উঠে গেলেও এই শিক্ষা দিয়ে গেল যে, থিয়েটাবে নাটকাভিনয় করলে, লোকে পয়সা দিয়ে দেখতে আসে। অর্থাৎ কলকাতাব বিদেশী রঙ্গালয়গুলির মতো এদেশী থিযেটারও বিনিময় মূল্যে চালানো যায়। এইখান থেকেই বাণিজ্যিক ভাবনা বাংলা থিয়েটারে এসে গেল। ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়াব পরপরই মালিকানাভিত্তিক কয়েকটি থিয়েটার কলকাতাব বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। যেমন বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৩), গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটাব (১৮৭৩) এবং নতুন নামে ন্যাশনাল থিয়েটার।

প্রথম দিকের মালিকেরা থিয়েটারে এসেছিল অনেকটাই নাটকেব প্রতি আগ্রহে ও ভালোবাসায় এবং অনুরোধে। ধীরে ধীবে অন্য ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীবা বুঝতে পারল যে, থিয়েটার একটি বেশ ভালো বিনিময়যোগ্য পণ্য। ব্যবসা যেভাবে চলে থিয়েটারকেও সেইভাবে চালানো যেতে পাবে। ব্যবসার মূল সূত্র কি? মালিক মূলধন বিনিয়োগ করে কোনও কিছু উৎপাদন করে সেটি বাজাবে ছাড়ে। লোকেরা অর্থ দিয়ে সেই পণ্য কেনে। মালিক দেখে নেয়, যে অর্থ সে ঢেলেছিল সেই অর্থ এবাব ফেরত এল কি না। বেশি এলে লাভ, কম এলে ক্ষতি। থিয়েটাবে পয়সা ঢাললে বেশি করে অর্থ ফেরত আসতে পাবে, এই আশায় কেউ কেউ অন্য ব্যবসাব উপার্জিত অর্থ থিযেটারে বিনিয়োগ করলেন। গোপীচাঁদ শেঠি প্রমুখ বেশ কিছু অবাঙালি ব্যবসায়ীও তাই প্রথম দিকে থিয়েটাবেব মালিক হয়েছিলেন।

কিন্তু প্রথম দিককার প্রায় সব মালিকই সর্বস্বান্ত হলেন। অভিনেত্রী বিনোদিনী তাঁর স্মৃতিকথায় একেই বলেছেন, 'থিয়েটাবেব অশুভ গ্রহ'। নাটকেব উৎসাহে কিংবা/অথবা অর্থলাভ বা অন্য লাভের থিয়েটাব কবলেও, থিয়েটারকে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেব মতো শক্ত হাতে পবিচালনা না কবলে, সেই প্রতিষ্ঠান থেকে লাভের মুখ দেখা খুব শক্ত।

সাধারণ রঙ্গালয় বাণিজ্যিক থিয়েটারে পরিণত হলেও পেশাদারি মনোবৃত্তি তখনও আসেনি বলে প্রথম দিককার থিয়েটারগুলির এই অবস্থা হয়েছিল। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এক দুঁদে ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদ জহুবি 'ন্যাশনাল থিয়েটাব'-এর মালিকানা গ্রহণ করে শক্ত হাতে থিয়েটার-পবিচালনার দায়িত্ব নিলেন। থিয়েটারকে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেব ধাঁচে নিয়ে এসে সেইরকম নিয়মকানুন চালু করলেন। দারোয়ান থেকে ম্যানেজার, শিফটার থেকে প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যকার থেকে নাট্যপরিচালক – সবাইকে পেশাদাবি চুক্তিতে নিযুক্ত কবলেন। চুক্তিবদ্ধ পেশাদারিভাবে সবাই থিয়েটারের কাজে নিযুক্ত হলেন। সেই সময়ের বাংলা থিয়েটারের প্রাণপুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর নিরাপদ-মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারকেই সারাজীবনেব পেশা হিসাবে গ্রহণ করে প্রতাপচাঁদ জহুরির থিয়েটারে যোগ দিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দেই প্রতাপচাঁদ থিয়েটার ছেড়ে দেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও প্রতাপচাঁদেব যুগ্ম চেষ্টায় ততদিনে বাংলা থিয়েটার পুরোপুরি পেশাদারি থিয়েটারে পরিণত হয়ে গেল। সাধারণ রঙ্গালয়গুলি চলছিল বাণিজ্যিক থিয়েটারের ভঙ্গিতে; এবারে পেশাদারি মনোভাব যুক্ত হয়ে বাংলা থিয়েটার অনেকখানি নিরাপত্তা পেল। বোধকরি 'শুভগ্রহ' দেখা দিল। এরপর থেকে বাংলা থিয়েটার একটানা অপ্রতিহতভাবে একশ বছর ধরে নানা উত্থান-পতনেব মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে ভালো-মন্দয় মিলিয়ে জড়িয়ে গেছে।

● এক. স্টার থিয়েটার

৬৮ নং বিডন স্ট্রিট, কলকাতা

১৮৮৩ সালের গোড়ায় গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদে' থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। নানা দিক দিয়ে গিরিশের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের মনোমালিন্যের কারণে গিরিশ বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে প্রতাপচাঁদের থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলেন। অমৃতলাল মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, নীলমাধব চক্রবর্তী প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে গিরিশ খুললেন 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানী'। এঁরা গিরিশের নেতৃত্বে বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চ ভাড়া নিয়ে তিন রাত্রি (২৮ মার্চ, ৩১ মার্চ, ৭ এপ্রিল, ১৮৮৩) অভিনয়ও করলেন। কিন্তু নিজস্ব থিয়েটার না থাকাতে সব দিক দিয়ে অসুবিধে হচ্ছিল।

এই সময়ে সুযোগ এল অন্য দিক দিয়ে। কলকাতার ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র গুর্মুখ রায় থিয়েটারে প্রমোদের মোহে এবং বিশেষ করে অভিনেত্রী বিনোদিনীর আকর্ষণে নিজেই থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর পুরো নাম গুর্মুখ রায় মুসাদ্দি। পিতা গণেশদাস মুসাদ্দি হোরমিলার কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন। তাঁরা রাজস্থানের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। গণেশদাসের বখাটে ছেলে গুর্মুখ রায় প্রতাপচাঁদের ন্যাশনাল থিয়েটারে নিত্য নাটকের অভিনয় দেখতেন। মাঝে মাঝে তাঁর আচরণের জন্য সেখানে তিরস্কৃত ও অপমানিতও হয়েছিলেন। সেখানেই অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে নিজস্ব করে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু বিনোদিনী তখন এক ধনী বাঙালি তরুণের রক্ষিতা ছিলেন। তাই গুর্মুখের সাধ পূর্ণ হয়নি।

এমন সময়ে গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনী প্রমুখ প্রতাপচাঁদের থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁদের নিজস্ব কোনও থিয়েটার নেই। নতুন একটি থিয়েটারের আশায় তখন এঁরা অপেক্ষা করছিলেন। 'ক্যালকাটা স্টার থিয়েটার কোম্পানী' খোলার চেষ্টা তারই অন্যতম। গুর্মুখ রায় গিরিশচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দিলেন নতুন থিয়েটার খোলার। শর্ত একটাই — অভিনেত্রী বিনোদিনীকে তাঁর আশ্রিতা হতে হবে। বিনোদিনী তখন অন্য একজনের আশ্রিতা। সেই জমিদার-পুত্র তাঁকে নিয়ে ঘর বাঁধার প্রস্তাব দিয়েছেন। বিনোদিনী সেই জমিদার-পুত্রের সঙ্গে প্রতারণা করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু খবর পাওয়া গেল যে সেই তরুণ নিজের গ্রামে বিবাহ করে সংসারী হয়েছেন। বিনোদিনী আঘাত পেলেও গুর্মুখ রায়ের প্রস্তাবে রাজি হতে সময় নেন। তখন তাঁকে বোঝানো হয় যে, এই নতুন থিয়েটারের নাম হবে বিনোদিনীর নামে — 'বি-থিয়েটার'। গুর্মুখ রায়েরও তাই ইচ্ছা ছিল। গিরিশচন্দ্র প্রমুখের অনুরোধে বিনোদিনী একটি নতুন থিয়েটারের আশায় শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। তাছাড়া তাঁর নিজের নামে হবে এই নতুন থিয়েটার এবং সেখানে তাঁর অভিনয় করার কোনও বাধা থাকবে না — এইসব আশায় বিনোদিনী গুর্মুখ রায়ের আশ্রিতা হয়ে যান।

বাগবাজারে কীর্তিচন্দ্র মিত্রের ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটের খালি জমি ইজারা নিয়ে গুর্মুখ রায়ের অর্থে এবং গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী প্রমুখের তত্ত্বাবধানে নতুন 'ইষ্টকনির্মিত' পাকা রঙ্গালয় তৈরি হল। বিনোদিনীর নামে নামকরণ না হয়ে, শেষ মুহূর্তে 'স্টার থিয়েটার' নামে রেজিস্ট্রি করা হল।

বিনোদিনী কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে একটি নিজেদের নতুন থিয়েটার চেয়েছিলেন এবং সেই থিয়েটার হবে তাঁর নামে — এই ধরনের এক রঙিন আশায় তিনি গুর্মুখ রায়ের আশ্রিতা হয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীদের চক্রান্তে তাঁর সব আশা নষ্ট হয়ে গেল। এই নতুন থিয়েটারের নাম যে 'স্টার' দেওয়া হবে এমন একটা পরিকল্পনা গিরিশচন্দ্রের মধ্যে ছিল এবং তাঁদের অস্থায়ী নাট্যদলের নাম তাঁরা 'ক্যালকাটা স্টার থিয়েটার' আগেই রেখেছিলেন। নতুন থিয়েটারের বাসনায় তাঁরা বিনোদিনীকে 'টোপ' হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। বিনোদিনীও নতুন থিয়েটার ও নিজের নামাঙ্কনের প্রতি স্বভাবতই দুর্বল ছিলেন। পূর্বের আশ্রয়দাতা 'বাবু'র আচরণও তাঁকে বিচলিত করেছিল। তাছাড়া বিনোদিনীর নামে নামকরণ না হওয়ার আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ অনেকে দেখিয়েছেন, তা হল, সামাজিক বাধা। বারাঙ্গনা এক অভিনেত্রীর নামে একটি পাবলিক থিয়েটারের নামকরণ হবে, তাও তাঁর জীবৎকালেই, এতখানি দুঃসাহস তখনকার সামাজিক প্রেক্ষিতে অনেকেরই ছিল না। তার ওপর বিনোদিনীর প্রতি অনেকেরই ঈর্ষা এবং সন্দেহ থাকাও স্বাভাবিক ছিল। বিনোদিনী সব মেনে নিয়েছিলেন, দুঃখও পেয়েছিলেন সহকর্মীদের আচরণে — এবং এ ব্যথা ভুলতে পারেননি সারাজীবন। বিনোদিনী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন :

'আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, উহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমনভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এত টাকার স্বার্থত্যাগ করিতে আমার যে কষ্ট না হইয়াছিল তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার অতিশয় মনোকষ্ট হইয়াছিল, যদিও এ সম্বন্ধে আর কখনও কাহাকেও কোনও কথা বলি নাই, কিন্তু ইহা ভুলিতে পারি নাই। ওই ব্যবহার বরাবর মনে ছিল।'

শুরু হল বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার। মালিক গুর্মুখ রায় হলেও এই রঙ্গালয়ের সর্বেসর্বা হলেন গিরিশচন্দ্র। তিনিই ম্যানেজার, নাট্যকার, পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতা। প্রথম চার বছর একচ্ছত্রভাবে গিরিশচন্দ্রের সব পৌরাণিক নাটক, পঞ্চরং-গীতিনাট্য এখানে অভিনীত হয়েছে। স্টেজ ম্যানেজার জহুরলাল ধর, সংগীত পরিচালক বেণীমাধব অধিকারী, কোষাধ্যক্ষ হরিপ্রসাদ বসু। প্রধান অভিনেতা ছিলেন গিরিশচন্দ্র নিজে, তাছাড়া সে যুগের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, দাসুচরণ নিয়োগী, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, গুণবিহারিণী প্রমুখ।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই, শনিবার বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হল মহাসমারোহে। গিরিশচন্দ্রের লেখা 'দক্ষযজ্ঞ' পৌরাণিক নাটক দিয়ে যাত্রা শুরু হল। The Indian Daily News পত্রিকায় ২১ জুলাই, ১৮৮৩ তারিখে বিজ্ঞাপন বেরল :

GRAND OPENING NIGHT
STAR THEATRE Beadon Street
Proprietor : Baboo Goormuk Roy
SATURDAY, 21st July,
Baboo J. C. Ghose's New Drama
DAKSHYA YAGNA
Everything grand and wonderful
J C. Ghose, Manager.

উদ্বোধন রজনীতে গিরিশচন্দ্রের লেখা 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে অভিনয় করলেন : দক্ষ — গিরিশ। মহাদেব — অমৃতলাল মিত্র। দধীচি — অমৃতলাল বসু। ব্রহ্মা —নীলমাধব চক্রবর্তী। বিষ্ণু — উপেন্দ্রনাথ মিত্র। সতী —বিনোদিনী। তপস্বিনী — ক্ষেত্রমণি। প্রসূতি — কাদম্বিনী।

দক্ষ, মহাদেব ও সতীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় হয়েছিল। বিশেষ করে মহাদেবরূপী অমৃতলাল মিত্র তাঁর অভিনয়ে সকলকে বিমোহিত করে দিয়েছিলেন। অভিনয়, সংগীত, দৃশ্যসজ্জা, আলোর ব্যবহার, কারসাজি দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে স্টারের গৌরবময় যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ।

গুর্মুখ রায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্টারের মালিক হিসাবে ছিলেন মোটমাট ছয় মাস। তাঁর সময়কালীন স্টারে অভিনীত হয়েছিল বেশ কয়েকটি নাটক। 'দক্ষযজ্ঞ'র সাফল্যের পর গিরিশচন্দ্র লিখলেন 'ধ্রুবচরিত্র'। স্টারে অভিনীত হল ১৮৮৩-এর ১১ অগাস্ট। তারপরে গিরিশচন্দ্রের লেখা যে নাটকগুলি অভিনীত হল : 'রামের বনবাস' (২৯ অগাস্ট), 'সীতার বনবাস' (২৬ সেপ্টেম্বর), 'রাবণবধ' (৮ ডিসেম্বর), 'নলদময়ন্তী' (১৫ ডিসেম্বর)। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপ দেওয়া মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের অভিনয় হয়েছিল ২১ নভেম্বর।এছাড়া রামনারায়ণ তর্করত্নের 'চক্ষুদান' (২৭ অক্টোবর) , দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (৫ ডিসেম্বর), অমৃতলাল বসুর 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (২৬ অক্টোবর)।

এই ছয় মাসে রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, অমৃতলালের একটি নাটক, মাইকেলের 'মেঘনাদবধ'-এর নাট্যরূপ ছাড়া আর সবই গিরিশের লেখা নাটক। এবং গিরিশচন্দ্রের সব নাটকই পৌরাণিক নাটক। 'দক্ষযজ্ঞ'র পর 'ধ্রুবচরিত্র' ও 'নলদময়ন্তী'ও খুব সাফল্যলাভ করে। 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকেই গিরিশচন্দ্র প্রথম বিদূষক চরিত্র সৃষ্টি করেন এবং অমৃতলাল বসু সেই চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করে তাকে প্রতিষ্ঠা করেন। 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকে ভূষণকুমারী গানে ও অভিনয়ে মাতিয়ে

দিয়েছিলেন। 'নলদময়ন্তী' নাটকের অভিনয়ও উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। অমৃতলাল মিত্র (নল), অমৃতলাল বসু (বিদূষক) , বিনোদিনী (দময়ন্তী) প্রমুখের অভিনয়ের প্রশংসা সংবাদপত্রের সমালোচনায় দেখা যায়।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে গুর্মুখ রায় আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের লোকজনের চাপে এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে স্টারের স্বত্ব ছেড়ে দিতে চান। বিনোদিনীর সঙ্গেও আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তবুও, বিনোদিনীর জন্যই এই থিয়েটার, তাই তাঁকেই এর স্বত্ব, অন্তত অর্ধেক স্বত্ব দিতে চান। কিন্তু আবার গিরিশচন্দ্র প্রমুখের প্রতিবন্ধকতায় বিনোদিনী কোনও স্বত্ব পেলেন না। গুর্মুখ রায় হতাশ হয়ে মাত্র এগারো হাজার টাকায় স্টার থিয়েটারের স্বত্ব বিক্রি করে দিলেন স্টারেরই অন্য চারজনকে — অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃতলাল বসুকে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মালিকানা হস্তান্তরিত হল। গিরিশচন্দ্র পারিবারিক শর্তের কারণে মালিকানায় অংশ নেননি। বাণিজ্যিক থিয়েটার চালু হওয়ার প্রথম দিকে গিরিশচন্দ্র একবার 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর মালিক হয়েছিলেন। সে যুগে থিয়েটার করাটাই ছিল নিন্দনীয়, বারাঙ্গনা মেয়েদের নিয়ে এই অভিনয়কে সমাজের অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। তার ওপরে তখন যাঁরাই থিয়েটারের মালিক হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বাগবাজারের বনেদি কায়স্থ পরিবারের সন্তান গিরিশচন্দ্র নাটকাভিনয় করার জন্য তাঁদের বাড়ির মেয়েদের বিবাহ নিয়ে সমস্যা হয়েছিল, তার ওপরে মালিক হয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার বিভীষিকাও ছিল। গিরিশচন্দ্র অভিনয় ছাড়তে পারেননি, কিন্তু কথা দিয়েছিলেন কোনও দিনই তিনি কোনও থিয়েটারের মালিক হবেন না। সেই কারণে স্টারে প্রধান মালিক হওয়ার সব সুযোগ তাঁর থাকলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। এবং সেই সময়ে 'দক্ষযজ্ঞ' ছাড়া স্টারের অন্য কোনও নাটকে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অভিনয়ও করেননি।

এদিকে বিনোদিনীর মূল্যে যে থিয়েটার তৈরি হল, বিনোদিনীর সেখানে কোনও স্বত্ব রইল না। অভিনেত্রী হিসাবেই তিনি রয়ে গেলেন স্টারে। গুর্মুখ রায় চলে গেলেন স্টার থিয়েটার থেকে। ভগ্ন-মনোরথ গুর্মুখ রায় এরপর কিছুদিন পিতার কর্মস্থানে বেনিয়ানের কাজ করেন। তারপর কাশীতে গিয়ে সাধুসঙ্গ ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানেই মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে, গুর্মুখ রায়ের মৃত্যুর পর ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে অমৃতলাল বসু ও মিত্র প্রমুখ স্টার কিনে নেন। তথ্য সঠিক নয়। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসেই গুর্মুখ জীবিতাবস্থায় নিজেই থিয়েটার বিক্রি করেছেন। মৃত্যু নয়, সমাজ ও পরিবারের চাপেই গুর্মুখ নিজে স্টার হস্তান্তরিত করেন।

চারজন নতুন মালিকের তত্ত্বাবধানে স্টার আরও চার বছর চলেছিল। গিরিশচন্দ্র রইলেন সর্বেসর্বা হিসাবেই। ম্যানেজার, অভিনয়-শিক্ষক, নাট্যকার হিসাবে। এবং তাঁরই লেখা বেশিরভাগ নাটক এখানে অভিনীত হল।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব অভিনীত নাটকগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করা হয়। এছাড়া গিরিশচন্দ্রের লেখা অভিমন্যু বধ (১৬ মার্চ), বৃষকেতু (২৬ এপ্রিল), হীরার ফুল (২৬ এপ্রিল), শ্রীবৎসচিন্তা (৭ জুন), চৈতন্যলীলা (২ অগাস্ট), প্রহ্লাদ চরিত্র (২২ নভেম্বর) অভিনীত হল। তার ওপর অমৃতলাল বসুর লেখা প্রহসন দুটি 'চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে' (২৬ এপ্রিল) ও 'বিবাহ বিভ্রাট' (২২ নভেম্বর), দীনবন্ধু মিত্রের 'কমলেকামিনী' (২৯ মার্চ) এবং অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'আদর্শ সতী' (২১ মে) অভিনয় করা হয়েছিল। এই বছরেও অমৃতলাল বসু, অতুলচন্দ্র মিত্র এবং দীনবন্ধু মিত্রের একটি করে নাটক ছাড়া বাকি সব নাটকই গিরিশচন্দ্রের লেখা। এর সবই পৌরাণিক নাটক।

এই বছরে নতুন নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। পুরাণের বিষয় নিয়ে এতদিন নাটক লিখে গিরিশচন্দ্র ধর্মীয় কাহিনী বলছিলেন। চৈতন্যলীলা নাটকে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন আশ্রয় করে তিনি এই নাটকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জয়গান এবং ধর্মীয় ভক্তিবাদের প্রবল স্রোত বইয়ে দিলেন। ধর্ম ও ভক্তির ভাবাবেগে হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাবাদ একাকার হয়ে গেল।

অভিনয় করলেন নিমাই চরিত্রে বিনোদিনী এবং নিতাই চরিত্রে বনবিহারিনী। এঁরা দু'জনেই, বিশেষ করে চৈতন্যরূপিণী বিনোদিনী নৃত্যে, গীতে ও অভিনয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন। এই নাটকে সুরসৃষ্টি করেন ও নৃত্যশিক্ষা

দেন বেণীমাধব অধিকারী। এই নাটক তখন সারা দেশকে মাতিয়ে দিয়েছিল। দূরদূরান্ত থেকে দর্শকেরা এই নাটক দেখতে ছুটে এলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 'চৈতন্যলীলা' দেখতে আসেন ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে। স্বভাবতই, তিনি নাট্যরসের চাইতে ধর্মীয় ভক্তিবাদের উন্মাদনায় আপ্লুত হন এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদেব, বিশেষ করে চৈতন্যরূপী বিনোদিনীকে, আশীর্বাদ করেন। সমাজে নিন্দিত এবং শিক্ষিত মহলে অপাঙক্তেয় বাংলা থিয়েটার রামকৃষ্ণদেবের পদার্পণে পবিত্র ও গৃহীত হতে থাকে। সেই থেকে বাংলা সাধাবণ রঙ্গালয়ে রামকৃষ্ণদেব অবশ্যস্মরণীয় ও পূজনীয় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। থিয়েটারের গ্রিনরুমে প্রখ্যাত কোনও নাট্যব্যক্তিত্বের ছবি না থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষিত হতে থাকল।

এখানে গিরিশচন্দ্রের লেখা 'প্রহ্লাদচরিত্র' তেমন জমেনি। তুলনায় প্রায় একই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদচরিত্র' অনেক বেশি সমাদর পেয়েছিল। স্টারে বরং অমৃতলালেব মজার নাটক 'বিবাহ বিভ্রাট' খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র লিখে ফেললেন চৈতন্যলীলাব ২য় ভাগ 'নিমাই সন্ন্যাস', স্বভাবতই ১ম ভাগের সাফল্যেব উৎসাহে। অভিনীত হল স্টারে ১০ জানুযারি। অভিনীত হল গিরিশচন্দ্রেরই 'দোললীলা' (১ মার্চ), 'প্রভাসযজ্ঞ' (৩০ মে), 'বুদ্ধদেবচবিত' (১৯ সেপ্টেম্বর)। এছাড়া গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপ দিলেন নবীনচন্দ্র সেনের বিখ্যাত 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের এবং সেটি এখানে অভিনয় কবা হল ২৬ এপ্রিল। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ গিরিশচন্দ্র দিলেন এবং অভিনয় কবলেন ১ এপ্রিল।

এই ১৮৮৫-র বছরেও গিরিশচন্দ্রেব লেখাই প্রায় সব নাটক, এবং সবগুলি পৌরাণিক। শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ, নবীনচন্দ্র সেনের নাট্যরূপ দুটি ব্যতিক্রম। যদিও এই দুটি নাট্যরূপ গিরিশচন্দ্রেরই দেওয়া।

'চৈতন্যলীলা' প্রথম ভাগের অভিনয়ের সার্থকতায় এবং বিক্রি ও খ্যাতিব সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তার দ্বিতীয় ভাগে নিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আশানুরূপ হল না। 'প্রভাসযজ্ঞ' কিছুটা চললেও সবচেয়ে সার্থক হল 'বুদ্ধদেবচরিত'। স্যার এড্‌উইন আর্নল্ডের কাব্য 'লাইট অফ এশিয়া' অবলম্বন কবে গিরিশচন্দ্র এই নাটকটি লেখেন। অভিনয় করেছিলেন : সিদ্ধার্থ — অমৃতলাল মিত্র। শুদ্ধোধন — উপেন্দ্রনাথ মিত্র। বিদূষক — শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য। সুজাতা — প্রমদাসুন্দরী। গোপা — বিনোদিনী।

সৌভাগ্যবশত স্যার আর্নল্ড সে সময়ে কলকাতায় থাকার ফলে নাটকটির অভিনয় দেখেন। তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল। তিনি এই অভিনয়ের ও নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সংবাদপত্রে চিঠিও লিখেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে পুরনো নাটকগুলির অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে অভিনীত হল গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (১২ জুন), 'বেল্লিকবাজার' (২৬ ডিসেম্বর)।

এই বছরেও সবই গিরিশচন্দ্রের লেখা পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়েছে। তবে সবচেয়ে সফল প্রযোজনা 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'। এই নাটকেই গিরিশচন্দ্র প্রথম দেখালেন ইন্দ্রিয়জ প্রেম কীভাবে সাধনার পথে ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমোন্মাদনায় পরিণত হয়। 'ভক্তমাল' গ্রন্থ থেকে কাহিনী গ্রহণ করলেও গিরিশচন্দ্র তাঁব নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা, অনুভব এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে নাটকটিকে নতুন করে রচনা করলেন। শুধু ভাবময় চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেন। এই নাটকেব বড় সম্পদ এর গানগুলি। যেমন কথা, তেমনই সুর এবং নটনটীদের গায়নভঙ্গি। স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়শই 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের গানগুলি গেয়ে নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও আনন্দ দিতেন। কাহিনী, ভাব, চরিত্র, সংগীত ও অভিনয়ে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' একটি সফল প্রযোজনা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অভিনয় করেছিলেন : বিল্বমঙ্গল — অমৃতলাল মিত্র। সাধক — অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। ভিক্ষুক — অঘোরনাথ পাঠক। চিন্তামণি — বিনোদিনী। পাগলিনী — গঙ্গামণি। পাগলিনী, চিন্তামণি এবং বিল্বমঙ্গলের চরিত্রের অভিনয় সেদিন দর্শকের মুখে মুখে প্রশংসায় প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

এছাড়াও 'বেল্লিকবাজার'-এর রঙ্গরস ও ব্যঙ্গ এবং অমৃতলাল বসুর (দোকড়ি সেন) রঙ্গ ও শ্লেষাত্মক অভিনয়ে

নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। 'বেল্লিকবাজার' অভিনয়ের প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য খবর হল, এই নাটকেই বিনোদিনীর মঞ্চে শেষ অভিনয়।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে সবই পুরনো নাটক অভিনীত হল। নতুনের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের লেখা 'রূপসনাতন' (২১ মে) প্রথম অভিনয় হল। এই বছরেও গিরিশচন্দ্রেরই সব নাটক অভিনীত হল। নতুন নাটকের মধ্যে 'রূপসনাতন' খুবই সাফল্যলাভ করেছিল। বিশেষ করে চৈতন্যের ভূমিকায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের ভাববিহ্বল অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

১৮৮৭ সাল স্টার থিয়েটারের পক্ষে ভালো যায়নি। ১৮৮৭ সালের জানুয়ারি বিনোদিনী সহকর্মীদের দুর্ব্যবহারে শেষ পর্যন্ত স্টার ছেড়েই দিলেন। স্টারে তাঁর শেষ অভিনয় গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিকবাজার' নাটকে রঙ্গিনীর ভূমিকায়, ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৮৬। বিনোদিনী ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে শুধু স্টার থিয়েটারই ছাড়লেন না, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ থেকেই চিরতরে বিদায় নিলেন। অথচ তখন তাঁর মোটে ২৪ বছর বয়স। তারপরেও তিনি দীর্ঘজীবন বেঁচেছিলেন (মৃত্যু ১৯৪১), কিন্তু কখনই আর পাদপ্রদীপের আলোর সামনে আসেননি।

বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে শেষ অভিনয় : ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই। নাটক ছিল 'বুদ্ধদেবচরিত' এবং 'বেল্লিকবাজার'। অভিনয় শেষে অমৃতলাল বসু মর্মস্পর্শী ভাষায় সেদিনের দর্শকদের বিদায় সম্ভাষণ জানান।

স্টার তখন এমনিতেই ভালো চলছিল না। অন্যদিকে ধনকুবের মতিলাল শীলের নাতি গোপাললাল শীল থিয়েটার করার শখে মত্ত হয়ে কৌশল করে স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নিলেন। স্টারের স্বত্বাধিকারীদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হল। তাঁরা বাধ্য এবং নিরুপায় হয়ে ত্রিশ হাজার টাকায় এই থিয়েটার বাড়ি ছেড়ে দেন গোপাললাল শীলকে। থিয়েটার বাড়ি ছেড়ে দিলেও তাঁরা 'স্টার থিয়েটার' নামটি ছাড়লেন না। নামটির 'গুডউইল' তাঁদের কাছে রইল। প্রাপ্ত ত্রিশ হাজার টাকায় তাঁরা অন্য কোথাও নতুন থিয়েটার বাড়ি তৈরি করে নেবেন এবং 'স্টার থিয়েটার' নামটি সেখানে ব্যবহার করবেন।

এদিকে বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের বাড়িতে গোপাললাল শীল খুললেন এমারেল্ড থিয়েটার। ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের প্রায় পাঁচ বছরের ইতিহাস শেষ হল।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা দু'দিক দিয়েই রয়েছে। তারই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক :

এক. মধ্যবিত্ত যে যুবক সম্প্রদায় একটা জাতীয় আবেগে ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২) তৈরি করেছিল, সেই দলেরই বেশ কিছু উৎসাহী তরুণ এই স্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই স্টার থিয়েটার আদি ন্যাশনাল থিয়েটারেরই ধারাবাহী, উত্তরসূরি। প্রধান শিল্পী ও কর্মীরা একই। পার্থক্য মালিকানায়। গোড়ার 'ন্যাশনাল —' ছিল শিল্পী ও কর্মীদের। 'স্টার —' হল একজন মালিকের। থিয়েটারশিল্পে অনাগ্রহী একজন নটীলোলুপ মালিকের। স্টারের মধ্যে পূর্বতন ন্যাশনালের উত্তরাধিকার ছিল বলেই বাঙালির অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।

দুই স্টার থিয়েটারের পূর্বেকার সব থিয়েটারের নামকরণের মধ্যেই একটা জাতীয়তাবোধের আবেগ ছিল। ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ওরিয়েন্টাল ইত্যাদি। ১৮৭৬ সালের কুখ্যাত নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের ফাঁস চেপে বসার ফলে থিয়েটারে নাট্যাভিনয় ও নাটক থেকে জাতীয়তার আবেগ দূরে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের নামকরণ থেকেও পূর্বের সেই অনুরাগ ফিকে হয়ে গেল। স্টার থিয়েটার থেকে (১৮৮৩) নামকরণ হতে থাকল অন্যরকম — স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর, অরোরা ইত্যাদি।

তিন. এই স্টার থিয়েটারেই গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যকার জীবনের সেরা নাটকগুলি রচনা করেন। 'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'বুদ্ধদেবচরিত', 'রূপসনাতন', 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'প্রভাসযজ্ঞ', 'নলদময়ন্তী', 'অভিমন্যুবধ' প্রভৃতি সেরা পৌরাণিক নাটকগুলি এই স্টারের জন্যই লিখিত এবং প্রথম অভিনীত হয়। এইখান থেকেই গিরিশ পূর্ণোদ্যমে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি রচনা শুরু করেন।

চার. বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ও এই স্টার থিয়েটারেই। নানা চরিত্রে অসামান্য অভিনয় তাঁকে খ্যাতির উচ্চশিখরে নিয়ে যায়। গিরিশচন্দ্র ও বিনোদিনীর যুগলবন্দী বাংলা থিয়েটারেব এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

আবার এই স্টার থিয়েটারেই বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হয়ে যায়। খ্যাতির তুঙ্গে থাকতে থাকতেই তিনি এই স্টার থিয়েটারে জীবনের শেষ অভিনয় করেন।

পাঁচ. এখানেই 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখতে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসেন। শুধু চৈতন্যলীলা নয়, এই বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদচরিত্র' (২৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৪), গিরিশচন্দ্রের 'বৃষকেতু' এবং অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' (২৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৫) দেখতে আসেন। 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখে অভিভূত তিনি 'সোনার আতা ও শোলার আতা'র বিভেদ ভুলে (তাঁর কাছে আসল-নকল এক হয়ে গিয়েছিল) থিয়েটারের সকলকে আশীর্বাদ করেন। বিশেষ করে চৈতন্যরূপী বিনোদিনীকে 'মা, তোর চৈতন্য হোক' বলে আশীর্বাদ করেন। বিনোদিনীর ব্যক্তিগত ঘৃণিত জীবনে এইরকম এক মহাপুরুষের আশীর্বাদ তাঁকে মোহাবিষ্ট করে তোলে। তারপর থেকেই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবোন্মাদনা দেখা দেয়।

এই সময়েই বিনোদিনীর কন্যা শকুন্তলার মৃত্যু, স্টার থিয়েটারের সহযোগীদের বিরূপ ব্যবহার, গিরিশের চক্রান্ত ও ছলনার প্রতি অভিমান এবং গুর্মুখ বায়ের পরবর্তী নতুন আশ্রিত 'বাবু'র থিয়েটারে অভিনয়ের অনিচ্ছা বিনোদিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে তখন থেকেই মানসিক বিচলিত বিনোদিনী ভক্তির দিকে চলে যেতে থাকেন এবং এক সময়ে অভিনেত্রী জীবন ত্যাগ করে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জীবনচর্চায় নিমগ্ন হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর (১৬ অগাস্ট, ১৮৮৬) পরে পরেই তিনি থিয়েটারে সঙ্গে সবরকমের সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

বাংলা থিয়েটার তার সেরা অভিনেত্রীব অভিনয় প্রতিভা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হল।

ছয়. শ্রীরামকৃষ্ণদেব থিয়েটারে আসেন ধর্মভাবের আকর্ষণে। তাতে বাংলা থিয়েটারের লাভ ও ক্ষতি দুটোই হল :

ক. লাভ।। এতদিন বাংলায় যে থিয়েটার ভদ্র ও ধর্মীয় মানুষের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদার্পণে তা ধন্য, পবিত্র ও গৃহীত হল। এরপর থেকে থিয়েটারের প্রতি মানুষের বিমুখ মনোভাব অনেকাংশে দূরীভূত হল। সামাজিকভাবে থিয়েটার পাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠল।

খ. ক্ষতি।। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদার্পণে ও আশীর্বাদে বিনোদিনীর শুধু নয়, ধীরে ধীরে গিরিশচন্দ্রের জীবনেও ভাবের পরিবর্তন আসে। তাতে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে যে শান্তিই আসুক না কেন, বাংলা থিয়েটারের ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়। বিনোদিনী অভিনয় ছেড়ে দিলেন, শৈব গিরিশ 'ভক্ত ভৈরব'-এ রূপান্তরিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রকে থিয়েটার ছাড়তে বারণ করেছিলেন, কেননা 'ওতে লোকশিক্ষে' হয়। গিরিশচন্দ্রও গুরুর এই ঐকান্তিক কামনায় লোকশিক্ষার তাগিদে তাঁর নাটকে পৌরাণিক বিষয়ের মধ্যে অহৈতুকি ভক্তিবাদ এবং শ্রীবামকৃষ্ণ প্রচারিত ভক্তিতত্ত্ব প্রধান করে তুলতে লাগলেন। ধর্মপ্রাণ বাঙালি দর্শকের জন্য মর্মাশ্রয়ী পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে তাবপর থেকে শুধু পৌরাণিক নাটকই নয়, তাঁর সব নাটকেই, এমনকী সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটকেও ভক্তিধর্মের তারল্য ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতবাদ এবং সেই অনুকরণে চরিত্রও সৃষ্টি হতে থাকে। বলাবাহুল্য, তাতে গিরিশচন্দ্রের নাটকের শিল্পগুণ বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও, এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারেই এসেছিলেন। সেই থিয়েটার অনেক হাত ফেরতা হয়ে শেষে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পরে তার অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কখনই পদার্পণ করেননি, করা সম্ভবও ছিল না। কেননা হাতিবাগানের স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। এখনও অনেককে দেখি, তাঁদের লেখায় বা বক্তৃতায় হাতিবাগানের

স্টার থিয়েটার প্রসঙ্গো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদার্পণের কথা তুলে ধরেন। মনে রাখতে হবে, হাতিবাগানের স্টাব থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদার্পণ ঘটেনি।

সাত. স্টার থিয়েটারে ছোট-বড় মিলিয়ে সর্বমোট কুড়িটি নাটকের অভিনয় হয়। তার মধ্যে পঁচানব্বই ভাগ নাটকই পৌরাণিক নাটক। পুবাণের ভাব ও ধর্মীয় বিষয় জাতীয় জীবনে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। হিন্দু ধর্মভাব ও জাতীয়তাবোধ তখন যেন একাকার। রঙ্গাক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল।

আট. স্টাব থিয়েটাব একজন ব্যবসায়িক মালিকানাধীন হয়ে শুরু হলেও ছয় মাসের মধ্যেই অভিনেতা ও কর্মীদের স্বত্বাধীনে চলে আসে। সেইভাবেই বাকি সময়টা চলে। তবে ১৮৭২ সালের ন্যাশনাল থিয়েটার শিল্পী ও কর্মীদের যৌথ প্রয়াসে চলত। স্টার কিন্তু সকলের নয়, নির্দিষ্ট চারজনের মালিকানাতেই চলেছিল।

নয় অনেক হাত ঘুরে স্টার থিয়েটাবের ৬৮ নম্বব বিডন স্ট্রিটের বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার ওপর দিয়ে 'চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ' তৈরি হয়েছে।

● **দুই. স্টার থিয়েটার**

৭৫/৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিধান সরণি), কলকাতা

প্রথম পর্ব . (১৮৮০-১৯০০)

৬৮ নম্বব বিডন স্ট্রিটের স্টাব থিয়েটারের বাড়ি গোপাললাল শীলকে ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়ে গিরিশচন্দ্র এবং থিয়েটাবের স্বত্বাধিকারী চারজন (অমৃতলাল বসু, দাসুচরণ নিয়োগী, অমৃতলাল মিত্র এবং হরিপ্রসাদ বসু) শুধুমাত্র 'স্টার' নামটিব 'গুডউইল' সঙ্গো নিয়ে চলে আসেন। তাঁরা কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে (বর্তমান বিধান সরণি) হাতিবাগানেব কাছে রণেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের ত্রিশ কাঠা জমি সাতাশ হাজার টাকায় কেনেন। জমি পাওয়া গেলেও থিয়েটার বাড়ি তৈরি করবার মতো টাকা তাঁদের হাতে ছিল না। এই সময় সুযোগও এসে গেল। গোপাললাল শীল গিবিশচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দিলেন, তাঁর এমারেল্ড থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র যেন ম্যানেজার হিসাবে যোগ দেন। এর জন্য তাঁকে এককালীন বোনাস হিসাবে কুড়ি হাজাব টাকা এবং ম্যানেজার, নাট্যকাব ও অভিনেতা হিসাবে মাসে ৩৫০ টাকা করে দেবেন। গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাবে ব্যক্তিগতভাবে রাজি না হলেও, স্টাব থিয়েটারের নতুন বাড়ি তৈরি করার টাকা পাওয়া যাবে, এই ভেবে রাজি হয়ে যান। এবং বোনাস হিসাবে পাওয়া কুড়ি হাজার টাকার সবটাই তাঁদের হাতে তুলে দেন। গিবিশচন্দ্রের ভাই অতুলকৃষ্ণ এতে খুশি হননি। পরে তিনি অনেক চেষ্টা করে তাঁদের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত চাব হাজার টাকা ফেরত নিয়ে নেন।

একেবারে বিনাশর্তে গিরিশচন্দ্র এইভাবে শুধুমাত্র নতুন থিয়েটারের আশায় তাঁর ষোল হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। আরও টাকার দবকার। তাই নতুন থিয়েটারবাড়ি তৈরি করতে দিয়ে স্টারের দল কলকাতার বাইরে অভিনয় করতে বেরিয়ে গেল অর্থোপার্জনের আশায়। মাত্র পাঁচ মাসের চেষ্টায় নতুন বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। এই থিয়েটার- বাড়ি তৈরির যাবতীয় পবিকল্পনা, রূপদান, নির্মাণকার্য এবং অলঙ্করণ করলেন ইঞ্জিনিয়ার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং মঞ্চঅভিজ্ঞ ধর্মদাস সুর। গ্যাসবাতি দিয়ে উজ্জ্বল আলোব ব্যবস্থা করলেন পি. সি. মিত্র অ্যান্ড কোম্পানি। দৃশ্যসজ্জাকর ছিলেন দাসুচরণ নিয়োগী। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রামতারণ সান্যাল এবং নৃত্য পরিকল্পনায় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ম্যানেজার : অমৃতলাল বসু। দেড় হাজার দর্শকাসনবিশিষ্ট এই রঙ্গালয়ে প্রবেশ মূল্য ছিল : রয়েল বক্স (পাঁচজন) — একশ টাকা। বক্স (চারজন) — চোদ্দ টাকা। বক্স (দু'জন) — আট টাকা। ড্রেস সার্কেল — চার টাকা। অর্কেস্ট্রা স্টল — তিন টাকা। স্টল — দু'টাকা। পিটসিট — এক টাকা। গ্যালারি — আট আনা। জেনানা বক্স (চারজন) — দশ টাকা। জেনানা সিট — দু'টাকা।

মহিলাদেব একেবারে আলাদা আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উদ্বোধনের দিনে বিজ্ঞাপন দিয়ে ম্যানেজার

অমৃতলাল জানালেন, অভিনয় শেষে হাতিবাগান থেকে বড়বাজার পর্যন্ত ছ'পয়সা ভাড়ায় দর্শকদের জন্য স্পেশাল ট্রামগাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে, শুক্রবার ফুলদোলের দিন (১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) মহাসমারোহে হাতিবাগানের নবনির্মিত দ্বিতীয় স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হল। নাটক গিরিশচন্দ্রের লেখা 'নসীরাম'। এমারেল্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকাতে গিরিশচন্দ্র লুকিয়ে বাগবাজারের খালপাড়ে বসে এই নাটকটি লিখে দেন। গভীর রাতে এমারেল্ড কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে গোপনে নাটকটি লিখতে হয়েছিল গিরিশচন্দ্রকে। এবং নিজের নাম গোপন রেখে 'সেবক প্রণীত' বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। 'নসীরাম' নাটকে অভিনয় করলেন স্টার থিয়েটারের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ : নসীরাম — অমৃতলাল বসু। অনাথনাথ — অমৃতলাল মিত্র। শম্ভুনাথ — অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। কাপালিক — অঘোরনাথ পাঠক। বিরজা — কাদম্বিনী। সোনা — গঙ্গামণি। পরবর্তীকালের প্রখ্যাত অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এই নাটকেই পাহাড়িয়া বালকের ভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। সেখানে একটি মাত্র সংলাপ — 'ওরে হরি বল, নইলে কথা কি কইবে না।' — দিয়ে তাঁর নাট্যজীবন শুরু করেন।

উদ্বোধনকালে অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্রের লেখা কবিতা পাঠ করেন, তার একটি লাইন : 'হিন্দুপ্রাণ কোমলতায়/ধর্মপ্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়/ধর্মরঙ্গালয়।' বোঝা যাচ্ছে জাতীয় রঙ্গালয়ের উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে, হয়ে গেল ধর্ম রঙ্গালয়। 'হিন্দু' ও 'জাতীয়' প্রায় সমার্থক তখন অনেকেরই কাছে।

প্রতিষ্ঠার (১৮৮৮) পর থেকে উনিশ শতকের শেষ তেরো বছর স্টার থিয়েটার খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় চালিয়ে যায়। প্রথম বছর গিরিশচন্দ্র স্টারে ছিলেন না, তবুও তাঁর পুরনো নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এখানে অভিনীত হয়ে চলল। 'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'সীতার বনবাস', 'নলদময়ন্তী', 'রাবণবধ' ভালোই চলল। কিন্তু প্রচুর সাফল্য পেল 'সরলা'র অভিনয়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র নাট্যরূপ দেন অমৃতলাল বসু এবং 'সরলা' নামে তা অভিনয় হয় ২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮। বাংলা থিয়েটারে ঠিক এইরকম ঘরোয়া পারিবারিক ও সামাজিক নাটক কখনও অভিনীত হয়নি। 'Domestic Tragedy' নামে খ্যাত 'সরলা'র অভিনয় জনমনে নতুন সাড়া ফেলে দিয়েছিল। সে যুগে অভিনয় এবং টিকিট বিক্রির রেকর্ড করেছিল 'সরলা'। এই নাটকে অসামান্য অভিনয় করেন : বিধুভূষণ — অমৃতলাল মিত্র। গঙ্গাধর — অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। শশিভূষণ — নীলমাধব চক্রবর্তী। সরলা — কিরণবালা। গোপাল — তাবাসুন্দরী। শ্যামা — গঙ্গামণি। প্রমদা — কাদম্বিনী।

এর মধ্যে গিরিশচন্দ্র 'এমারেল্ড' থেকে চুক্তিমুক্ত হয়ে ফিরে এলেন স্টারে। গোপাললাল শীল তাঁর এমারেল্ড থিয়েটার এই সময়ে অন্য মালিককে লিজ দেওয়ার ফলে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর করা চুক্তি বাতিল হয়ে গেল। গিরিশচন্দ্র স্টার থিয়েটারে ফিরে এলেন ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯, কিন্তু 'অফিসিয়ালি' যোগ দিলেন ২৭ এপ্রিল। হলেন ম্যানেজার। 'সরলা' নাটকের সাফল্য গিরিশচন্দ্রকে এই ধরনের নাটক লিখতে প্ররোচিত করল। এর আগে গিরিশচন্দ্র কোনও সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক লেখাকে 'নর্দমা ঘাঁটা' বলে মনে করতেন। কিন্তু এবারে উপায়ান্তর না দেখে লিখেই ফেললেন 'প্রফুল্ল'। রঙ্গামঞ্চের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ 'প্লে-রাইট'দের এরকমই করতে হয়। একান্নবর্তী পরিবারে ভাইয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, পারস্পরিক পারিবারিক সম্পর্কের হানি, মদ্যপানের বিষময় ফল কীভাবে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে ভেঙে তছনছ করে দিল — তারই কাহিনী। কলকাতার নিচুতলার সমাজজীবনের ছবি ও চরিত্রও এখানে বাস্তবসম্মতভাবে আঁকা হল। আর সবার ওপরে রইল বিশ্বাস ও আদর্শের জ্বলন্ত প্রতীকরূপে প্রফুল্ল নামের বধূটি। নাটকটি অভিনীত হল ২৭ এপ্রিল। মুহূর্তে পূর্ববর্তী 'সরলা'র সব রেকর্ড ভেঙে দিল 'প্রফুল্ল'। গিরিশচন্দ্র তখন কোনও চরিত্রে অভিনয় করেননি। যাঁরা অভিনয় করলেন : যোগেশ — অমৃতলাল মিত্র। রমেশ — অমৃতলাল বসু। সুরেশ — কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভজহরি — অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। পীতাম্বর — মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী। কাঙালিচরণ — শ্যামাচরণ কুণ্ডু। মদন ঘোষ — নীলমাধব চক্রবর্তী। প্রফুল্ল — ভূষণকুমারী। উমাসুন্দরী —গঙ্গামণি। জ্ঞানদা — কিরণবালা। জগমণি — টুম্পামণি।

অমৃতলালের যোগেশ চরিত্রে অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অমৃতলাল বসুর খলচরিত্র রমেশ রূপায়ণে নতুন মাত্রা যুক্ত হল। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের দুষ্ট ভজহরি চরিত্রাভিনয়ে কৃতিত্বও সবাই স্বীকার করেছেন।

১৮৮৯ সালে 'প্রফুল্ল' ছাড়া আর অভিনীত হল গিরিশচন্দ্রেরই সব পুরনো নাটক, 'ধ্রুবচরিত্র', 'দক্ষযজ্ঞ'; 'অমৃতলাল বসু'র তাজ্জব ব্যাপার। গিরিশচন্দ্রের নতুন নাটক 'হারানিধি' (৭ ফেব্রুয়ারি) প্রফুল্লের মতোই সামাজিক নাটক। কিন্তু সেরকম সাফল্য পেল না।

১৮৯০-তে সবই গিরিশচন্দ্রের পুরনো নাটক। যেমন 'রূপসনাতন', 'চণ্ড' (১৩ সেপ্টেম্বর) অভিনীত হল। অমৃতলালের 'বাঞ্ছারাম', 'তরুবালা' (২০ ডিসেম্বর) এবং গিরিশচন্দ্রের 'মলিনা-বিকাশ' (১৩ সেপ্টেম্বর) এবং 'মহাপূজা' (২৪ ডিসেম্বর)। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে 'মহাপূজা' মঞ্চস্থ হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) 'চণ্ড' নাটকের রঘুদেবজীর চরিত্রে প্রথম অভিনয় শুরু করেন। গিরিশচন্দ্রের 'মলিনা-বিকাশ' গীতিনাট্যে বাংলা মঞ্চে প্রথম দ্বৈত নৃত্যগীতের প্রচলন হয়। বিকাশ — গোলাপ (সুকুমারী দত্ত) এবং মলিনা — মানদাসুন্দরী। রামতারণ সান্যালের সুর ও কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্যশিক্ষায় এবং অভিনেত্রী দু'জনের নৃত্যগীত কুশলতায় 'মলিনা- বিকাশ' সাফল্যলাভ করে। দেখাদেখি, এই ধরনের দ্বৈত নৃত্যগীতের অভিনয় অন্য সব মঞ্চেই শুরু হয়ে গেল।

১৮৯০ সালেই স্টার থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের (১১ মার্চ) এবং অভিনেত্রী কিরণবালার (এপ্রিল) মৃত্যু হয়। দু'জন খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তিনমাস স্টারে অভিনয় বন্ধ থাকে। পরে অমৃতলাল বসুর নাটক 'তরুবালা' মঞ্চসাফল্য লাভ করে। ঠাকুরদা — নীলমাধব চক্রবর্তী। ঠানদিদি — গঙ্গামণি অভিনয়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তরুবালার ভূমিকায় প্রমদাসুন্দরীও খ্যাতি অর্জন করেন। সামাজিক ব্যঙ্গ নাটকে 'তরুবালা'র মাধ্যমে অমৃতলালের কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়।

এই ক'বছরে স্টার থিয়েটারের অভিনয়ের ধারাবাহিক সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। তাই সেদিন 'অনুসন্ধান' পত্রিকা (১৫ শ্রাবণ, ১২৯৭) লিখেছিল :

> 'আজকাল থিয়েটারের বাজারে স্টার থিয়েটারের বড়ই নামডাক। কাগজে-কলমে চারিদিকে সুখ্যাতির ছড়াছড়ি, আর সে জন্যই স্টার থিয়েটারের কোনও কিছু অভিনয় হইবে শুনিলেই লোক আর ধরে না — তিনি-উনি সকলেই অভিনয় দেখিতে ছুটেন।'

১৮৯১ সালে গিরিশচন্দ্র স্টারের ম্যানেজারের পদ থেকে বরখাস্ত হন। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যু, শিশু-সন্তানের মারাত্মক অসুখ ইত্যাদি কারণে গিরিশচন্দ্র মধুপুরে চলে যান এবং বেশ কিছুদিন থিয়েটারে আসতে পারেননি। গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে তখন এমনিই গোলমাল চলছিল, এই সুযোগে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বরখাস্তের নোটিস পাঠান। ১৮৯১-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্ষুব্ধ গিরিশচন্দ্র স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন :

> 'যে গিরিশচন্দ্র আত্মগোপন করিয়া একদিন স্টারের জন্য নাটক লিখিয়া দিয়াছিলেন, যে গিরিশচন্দ্র পাঁচ বছরের জন্য নিজেকে বিক্রয় করিয়া ষোল হাজার টাকা স্টারকে দিয়াছিলেন — স্টার থিয়েটার সেই গিরিশচন্দ্রকে বরখাস্ত করিয়া চিঠি পাঠাইলেন।'

বরখাস্ত হয়ে গিরিশচন্দ্র চলে যাওয়ার সময়ে সঙ্গে নিয়ে যান নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরলাল পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, দানীবাবু, শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানদাসুন্দরী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে 'সিটি থিয়েটার' খোলা হয় এবং গিরিশচন্দ্র অন্তরাল থেকে এদের সাহায্য করতে থাকেন। এইভাবে স্টারের দল ভেঙে যাওয়াতে সেখানে নাট্যাভিনয়ের ধারা ব্যাহত হয়।

গিরিশচন্দ্রের পরিবর্তে ম্যানেজার হলেন অমৃতলাল বসু। এবং নাট্যকার হিসাবে যোগ দেন রাজকৃষ্ণ রায় (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১), মাসিক একশ টাকা বেতনে।

১৮৯১-তে তাই গিরিশচন্দ্রের পরিবর্তে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকগুলিই অভিনীত হতে থাকে। তাঁর 'নরমেধযজ্ঞ' (১৩ মে), 'লয়লা-মজনু' (৫ ডিসেম্বর) মোটামুটি চলল। এছাড়া অমৃতলাল বসুর 'সম্মতি সঙ্কট' (২১ মার্চ), 'রাজাবাহাদুর' (২৪ ডিসেম্বর) চালানো হল। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে (১৯ জুলাই, ১৮৯১) স্টার থিয়েটারে অমৃতলাল বসুর লেখা 'বিলাপ বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন' অভিনীত হল (২২ অগাস্ট)।

১৮৯২-তে সবই প্রায় রাজকৃষ্ণের নাটক। 'বলবীর' (২৬ নভেম্বর), 'ঋষ্যশৃঙ্গ' (২৪ ডিসেম্বর) কিছুটা সাফল্য পেল। অমৃতলালের 'কালাপানি' (২৫ ডিসেম্বর) প্রথম অভিনীত হল। এখানে 'কৃষ্ণবিলাস' নামে হিন্দি ভাষায় একটি অপেরা অভিনীত হয় (৬ অগাস্ট)। বাংলা মঞ্চে হিন্দি ভাষায় রচিত নাটকের এই প্রথম অভিনয়। এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পরের বছর গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' নাটকের হিন্দিরূপ 'রামাশ্বমেধ' স্টার থিয়েটার অভিনয় করেছিল (২৭ মে, ১৮৯৩)। 'কৃষ্ণবিলাস'-এ রাধিকা চরিত্রে তারাসুন্দরী স্বচ্ছন্দ ও প্রাণবন্ত অভিনয় করেন।

১৮৯৩-তে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বেনুজীর বদরেমুনীর' (২৩ ডিসেম্বর) এবং অমৃতলালের বিমাতা বা বিজয়বসন্ত (২৬ অগাস্ট) অভিনীত হল।

১৮৯৪-তে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনীত হল। নাট্যরূপ দিলেন অমৃতলাল বসু। 'চন্দ্রশেখর' খুবই আর্থিক সাফল্য লাভ করে। অভিনয়ও দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। অভিনয়ে ছিলেন : চন্দ্রশেখর — অমৃতলাল মিত্র। শৈবলিনী — তারাসুন্দরী। প্রতাপ — অক্ষয়কুমার কোঙার। দলনী — নরীসুন্দরী।

রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হয় ১১ মার্চ, ১৮৯৪। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ৮ এপ্রিল, ১৮৯৪। তাঁদের মৃত্যুতে স্টারের অভিনয় বন্ধ থাকে ১৪ মার্চ এবং ১৮ এপ্রিল। রাজকৃষ্ণের অভাবে স্টারে আর কোনও নির্দিষ্ট নাট্যকার রইল না। এই বছর অমৃতলাল বসুর 'বাবু' (১ জানুয়ারি), নৃত্যগোপাল কবিরাজের 'অন্নদামঙ্গল' (৪ অগাস্ট), অমৃতলালের 'একাকার' (২৫ ডিসেম্বর) মঞ্চস্থ হয়ে অভিনয়ের ধারাটিকে বজায় রাখা হয়েছিল মাত্র।

১৮৯৫ সালের ১৩ জুলাই এখানে আবার গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নামানো হল। একই দিনে মিনার্ভা থিয়েটারে 'প্রফুল্ল' অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র তখন মিনার্ভায়, তিনি যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। স্টার থিয়েটারে যোগেশ সাজেন আগের মতোই অমৃতলাল মিত্র। প্রতিযোগিতা জমে ওঠে। বাংলা নাট্যশালায় একই নাটক একই সময়ে একাদিক্রমে দুটি মঞ্চে অভিনয়ের সূত্রপাত হল। যোগেশের ভূমিকায় গুরু-শিষ্যের (গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল মিত্র) অভিনয়ের প্রতি-তুলনায় দর্শকেরা মেতে উঠলেন।

এই বছরে 'প্রফুল্ল' ছাড়া (নৃত্যগোপাল কবিরাজের 'স্ত্রীবুদ্ধি', ৫ অক্টোবর) তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য নাটকের অভিনয় হয়নি। বাদবাকি সবই পুরনো নাটক, এগুলি আগেই স্টারে অভিনীত হয়েছে।

১৮৯৬-তে গিরিশচন্দ্র সসম্মানে স্টারে ফিরে এলেন, মিনার্ভা ছেড়ে দিয়ে (১৫ এপ্রিল, ১৮৯৬) এবং পুরোপুরি 'ড্রামাটিক ডিরেক্টর' হিসাবে যোগ দিলেন। বাংলা থিয়েটারে এই পদ প্রথম গিরিশচন্দ্রের জন্যই তৈরি হল।

১৮৯৬-তে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নাট্যরূপ (অমৃতলাল বসু কৃত) ১১ জানুয়ারি অভিনীত হল। এপ্রিল মাসে গিরিশচন্দ্র স্টারে ফিরে এসে তাঁর নতুন নাটক 'কালাপাহাড়' লিখে খুব যত্ন সহকারে অভিনয় করালেন (২৬ ডিসেম্বর)। অভিনয় করলেন : চিন্তামণি — গিরিশচন্দ্র। কালাপাহাড় — অমৃতলাল মিত্র। ইমান — নগেন্দ্রবালা। দোলনা — নরীসুন্দরী। চঞ্চলা — প্রমদাসুন্দরী।

অমৃতলাল বসুর 'বৌমা'ও এই বছর অভিনীত হয়। বিলিতি মঞ্চের অভিনেতা দেবকার্সন সাহেবের মৃত্যুতে (২৪ ফেব্রুয়ারি) স্টার অভিনয় বন্ধ রাখে এবং দু'দিন পরে তাঁর স্ত্রীর সাহায্যার্থে অভিনয়ের আয়োজন করে। বিদেশী হলেও, অভিনেতার প্রতি অভিনেতাদের এই সম্মান প্রদর্শন থিয়েটারের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। আবার ৮ জুলাই, ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির সম্মানে স্টার থিয়েটার তাঁর পরিবারের সাহায্যে তাঁরই উপন্যাসের নাট্যরূপ 'সরলা' অভিনয় করে।

১৮৯৭-তে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও নাটকের অভিনয় হয়নি। রানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যশাসনের অষ্টম বর্ষপূর্তি

স্মরণে অভিনীত হয় 'হীরক জুবিলী' (২১ জুন)। গিরিশচন্দ্রের দুটি নতুন রচনা 'পারস্যপ্রসূন' ও 'মায়াবসান' যথাক্রমে ১১ সেপ্টেম্বর এবং ১৮ ডিসেম্বর প্রথম অভিনীত হল। 'মায়াবসান' গিরিশচন্দ্রের নতুন সামাজিক নাটক, এতে গিরিশচন্দ্র নিজে কালীকিঙ্করের ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায় দানীবাবু (হলধর), অক্ষয় কোঙার (গণপতি), তারাসুন্দরী (অন্নপূর্ণা), নরীসুন্দরী (রঙ্গিনী) ও নগেন্দ্রবালা (বিন্দু) অভিনয় করেন। 'হীরক জুবিলী'তে নটচরিত্রে অমৃতলাল মিত্র এবং এক মাতালের ভূমিকায় দানীবাবু অসামান্য অভিনয় করেন।

১৮৯৮-তে শুধুমাত্র অমৃতলাল বসুর 'গ্রাম্য বিভ্রাট' (১ জানুয়ারি) প্রথম দিকে অভিনীত হল।

এই বছরেই আবার গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য শুরু হয় এবং গিরিশচন্দ্র ১১ মে, ১৮৯৮ অভিনয়ের পর স্টার থিয়েটার ছেড়ে দেন। তাঁর এই স্টার থিয়েটার শেষবারের মতো ছেড়ে যাওয়া, আর কখনও তিনি স্টার থিয়েটারে ফিরে এসে যোগ দেননি।

এই বছর এমনিতেই স্টারের অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না। তার ওপরে গিরিশচন্দ্র চলে গেলেন। নাটক নেই, ভালো অভিনেতা নেই। উপরন্তু ১৮৯৮-এর মার্চ মাস থেকে কলকাতায় প্লেগ রোগ মহামারীরূপে দেখা দিল। লোকে আতঙ্কে কলকাতা ছেড়ে পালাতে থাকে। ফলে ১৫ মে থেকে টানা চল্লিশ রাত স্টারে অভিনয় বন্ধ থাকে। আবার অভিনয় শুরু হয় ২৫ জুন থেকে। গিরিশচন্দ্রের পুরনো 'চৈতন্যলীলা' নাটক দিয়ে। তারপরে মঞ্চস্থ হল অমৃতলাল বসুর 'হরিশ্চন্দ্র (১০ সেপ্টেম্বর) এবং 'বাবু' (২৯ অক্টোবর)। অমৃতলালের 'হরিশ্চন্দ্র' নতুন নাটক হিসাবে প্রথম অভিনীত হল। হরিশ্চন্দ্র চরিত্রে অমৃতলাল মিত্র এবং বিদূষক চরিত্রে অক্ষয় কোঙার অভিনয়ে খুবই প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

এই দুর্দিনে থিয়েটারকে বাঁচাতে স্টার এক অভিনব ব্যবস্থা নেয়। নাট্যাভিনয়ের পূর্বে 'বায়োস্কোপ' দেখানোর ব্যবস্থা করে। ২৯ অক্টোবর, ১৮৯৮, স্টারে বায়স্কোপ দেখানো শুরু হয়। নেলসনের মৃত্যু, ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলির শোভাযাত্রা, গ্লাডস্টোনের শবানুগমন দেখানো হয়। পরে অমৃতলালের 'বাবু' দেখানো হয়। এরপর থেকে প্রতিটি নাট্যানুষ্ঠানের সঙ্গে 'বায়োস্কোপ' প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন। বাংলা থিয়েটারে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে প্রথম 'বায়োস্কোপ' (Animatograph) দেখানো শুরু হয় মিনার্ভা থিয়েটারে, ৩১ জানুয়ারি, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। তারপরে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারে ১৯ মার্চ, ১৮৯৮। পরে স্টার থিয়েটারে ২৯ অক্টোবর, ১৮৯৮। বেঙ্গল থিয়েটারে ৪ ডিসেম্বর ১৮৯৮। [দ্র. শঙ্কর ভট্টাচার্য — বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, ১৯৮২, পৃ. ৫০১]

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলা রঙ্গালয়গুলি তাদের নাট্যাভিনয় দিয়ে যখন দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন ইউরোপে চালু হয়ে যাওয়া 'বায়োস্কোপ' এদেশে আমদানি করে বিজ্ঞানের এই নবাবিষ্কৃত চমক দিয়ে দর্শকদের আকর্ষণের চেষ্টা হয়েছিল। বোঝাই যায়, এইরকম প্রয়াসের দ্বারা রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষরা অর্থ উপার্জন করলেও, বাংলা থিয়েটারে নাট্যাভিনয়ের দুর্দশাই চলছিল।

১৮৯৯ সালে পুরনো নাটকগুলির সঙ্গে সঙ্গে নতুন কিছু নাটকও অভিনীত হল। সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বাংলা রূপান্তর (নৃত্যগোপাল কবিরাজ কৃত) 'বসন্তসেনা' নামে অভিনীত হল ২৬ অগাস্ট। অমৃতলাল বসুর 'সাবাস আটাশ' (২৩ সেপ্টেম্বর) এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিরহ' (৪ নভেম্বর) প্রথম অভিনীত হল এখানে।

দেখা যাচ্ছে নাট্যকারের অভাবে স্টার থিয়েটারে অমৃতলাল বসু পরপর নাটক লিখে চলেছেন। গিরিশচন্দ্র না থাকাতে স্টার থিয়েটার নতুন ও আকর্ষণীয় নাটকের অভাবে ভালো অভিনয় করতে পারছিল না।

১৮৯৯-এর ২৮ এপ্রিল থেকে, 'আদর্শ বন্ধু' নাটক অভিনয়ের সময়ে স্টার থিয়েটার প্রথম বিদ্যুৎ-আলোর (Electricity) ব্যবস্থা করে। কলকাতায় তখন সবে (১৮৯৯-এর ১৭ এপ্রিল থেকে) নবাবিষ্কৃত বিদ্যুৎ-আলোর ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং রঙ্গালয়গুলির মধ্যে প্রথমেই স্টার থিয়েটার তার ব্যবহার শুরু করে। [দ্র. দর্শন চৌধুরী — উনিশ শতকের নাট্যবিষয়, ১৯৮৫] এই নতুন আলোর ব্যবহারের ফলে থিয়েটারে আলোক নিয়ন্ত্রণ অভিনব হয়ে উঠল। বাংলা থিয়েটার থেকে ক্রমে গ্যাসবাতির আলোর ব্যবস্থা দূর হল।

১৯০০ সালে অমৃতলাল বসুর 'আদর্শ বন্ধু' যেমন অভিনয় হল, তেমনই তাঁর 'কৃপণের ধন' (২৬ মে), মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা' (১০ নভেম্বর), 'হরিশচন্দ্র', দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী', রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কিরণশশী' (২৫ অগাস্ট), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ত্র্যহস্পর্শ' (২৪ ডিসেম্বর), অমৃতলাল বসুর 'যাদুকরী' (২৫ ডিসেম্বর) মঞ্চস্থ হল।

নাটকের অভাবে অমৃতলাল বসুর নাটক যেমন অভিনীত হচ্ছে, তেমনই পুরনো নাট্যকার মনমোহন বসুর নাটকগুলিও ফিরিয়ে অভিনয় করতে হচ্ছে। নতুন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা রঙ্গালয়ে গৃহীত হচ্ছেন, যদিও তাঁর সার্থক নাটকগুলি এখনও রচিত হয়নি।

উনিশ শতক শেষ হয়ে বিশ শতক শুরু হল। স্টার থিয়েটার নানা সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে তার অভিনয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

এই পর্বে কলকাতায় একই সঙ্গে স্টার, মিনার্ভা ও ক্লাসিক থিয়েটার সমানে পারস্পরিক পাল্লা দিয়ে চলেছে। গিরিশচন্দ্র তখন বহুরূপী প্রতিভা নিয়ে খ্যাতির মধ্যগগনে। তিনটি থিয়েটারই গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে টানাটানি করছে এবং গিরিশচন্দ্র যখন যে মঞ্চে অবস্থান করছেন, তারই সৌভাগ্য ফিরেছে। স্টার থিয়েটার সব সময় গিরিশচন্দ্রের আনুকূল্য পায়নি, এক সময় থেকে একেবারেই আর পায়নি। তবুও, শত অসুবিধে সত্ত্বেও স্টার থিয়েটার তার অব্যাহত অভিনয়ধারাকে রক্ষা করেছে। তুলনায় ক্লাসিক কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে, মিনার্ভা থেকে থেকেই নির্জীব হয়ে পড়েছে!

দ্বিতীয় পর্ব : (১৯০১-১৯২০)

বিশ শতকের গোড়া থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল পর্যন্ত (১৯০১-১৯২০) স্টার থিয়েটার চালিয়েছিলেন কখনও অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী কিংবা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সময়কালের মধ্যেই অর্ধেন্দুশেখর (১৯০৮) এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯১৬) মারা যান। কিন্তু স্টারের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রও চলে গেলেন ১৯০৮ সালে। দীর্ঘায়ু অমৃতলাল বসু তারপরেও বহুদিন সব সময়েই স্টারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নরমেধযজ্ঞ' ও অমৃতলালের 'যাদুকরী' অভিনীত হয় (১ জানুয়ারি)। তাছাড়া গিরিশের 'বুদ্ধদেবচরিত' ও অমৃতলালের 'তাজ্জব ব্যাপার' (৫ জানুয়ারি), রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ঋষ্যশৃঙ্গ' (৬ জানুয়ারি), দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৩ জানুয়ারি), মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা' (১৯ জানুয়ারি), দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' (১৬ ফেব্রুয়ারি), বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নাট্যরূপ (অমৃতলাল বসু, ১৩ এপ্রিল), 'সরলা' প্রভৃতি নাটকের ঘুরে ফিরে অভিনয় হয়। ২৫ ডিসেম্বর অমৃতলালের 'অবতার' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে পুরনো নাটকগুলিরই অভিনয় চলতে থাকে। নতুনের মধ্যে অমৃতলাল বসুর 'নবজীবন' প্রথম অভিনীত হল (১ জানুয়ারি), বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নাট্যরূপ (অমৃতলাল কৃত, ২ ফেব্রুয়ারি), অমৃতলালের 'তরুবালা' (৯ ফেব্রুয়ারি) এখানে প্রথম অভিনয় করা হল। এছাড়া সপ্তম এডওয়ার্ডের মুকুটোৎসব হিসাবে বিশেষ অভিনয় করা হল 'সাত খুন মাপ' নামে নাটক, ২৫ জুন। এটি 'Seven murders perdoned' নাটকের বাংলা রূপান্তর। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'সাবিত্রী' প্রথম অভিনীত হল (৪ অক্টোবর), 'বেদৌরা' প্রথম অভিনীত হল ২৫ ডিসেম্বর।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ বাংলার ইতিহাসে খুবই উল্লেখযোগ্য। এই বছরেই ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। জনমনের এই দাবিতে রঙ্গালয়গুলিও পিছনে থাকতে পারেনি। নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের (১৮৭৬) ভয়ে বাংলা মঞ্চ থেকে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশানুরাগের নাটক প্রায় অন্তর্হিত হয়েছিল। আজকের এই গণ-উন্মাদনার দিনে রঙ্গমঞ্চগুলি আবার সাহস ভরে জাতীয় ভাবাবেগের নাট্যাভিনয় শুরু করে দেয়। রঙ্গমঞ্চের উৎসাহে নাট্যকারেরাও আবার এই ধরনের নাট্যরচনা শুরু করে দেন। বাংলা থিয়েটারে আবার স্বদেশ ও জাতীয়তাবোধের বিষয় নিয়ে নাটক রচনার জোয়ার এল।

গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' ইত্যাদি স্বদেশপ্রেমের নাটকগুলি অভিনয় করে বাঙালিকে মাতিয়ে দিলেন। স্টার থিয়েটারও এতদিন বাদে সাহস ভরে পৌরাণিক নাটক ও গীতিনাট্য ছেড়ে স্বাদেশিক ভাবানুরাগের নাটক অভিনয় শুরু করল। ঠিক এই সময়ে (মে, ১৯০৩) অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী স্টারে যোগ দেন এবং তাঁরই উদ্যোগে এই জাতীয় অভিনয় হতে থাকল। এবং স্টার থিয়েটারের ভাগ্য ফিরে গেল। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' (১৫.৮.০৪), 'রঞ্জাবতী' (৩.৯.০৪) প্রথম অভিনয় করল স্টার। এই ধারা বেয়েই ক্রমে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (৪.৬.০৬), 'নন্দকুমার' (২৪.০৮.০৭), 'পদ্মিনী' (২৩.১২.০৫), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণাপ্রতাপ' (২২ ৭.০৫), অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙালি' (২৫.১২.০৫) মনোমোহন গোস্বামীর 'কর্মফল' (৩.৭.০৯) অভিনীত হল। অনেকদিন বাদে বাংলা রঙ্গালয় জাতীয় ভাবোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ফিরে এল 'নীলদর্পণ', অভিনীত হতে থাকল বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর', রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'জীবনসন্ধ্যা' নামে (নাট্যরূপ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত), (২১.১১.০৮), অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'রানী ভবানী'। অনেক দিন বাদে ঝিমিয়ে পড়া রঙ্গমঞ্চ প্রাণাবেগে চঞ্চল হয়ে উঠল। স্টার থিয়েটারে অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ, মীরকাশিম প্রভৃতি ইতিহাসের 'জাতীয় বীরদের' চরিত্রাভিনয়ে বাঙালি দর্শকদের আবেগাপ্লুত করে তুললেন।

এই জাতীয় নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছিল স্টারে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকেই, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসের অভিনয়েব (অমৃতলাল বসু কৃত, ০৪.০৪.০৩) মধ্য দিয়ে। রাজসিংহের ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্র এবং দরিয়ার চরিত্রে নবীসুন্দরী জনগণকে মাতিয়ে দিতে শুরু করলেন। 'রাজসিংহ' স্টারে আগেও অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান যুগমানসের আকাঙ্ক্ষায় এবারকার রাজসিংহ নতুন মাত্রা পেয়ে গেল।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নতুন রচিত 'প্রতাপাদিত্য' সেই ধারাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলল। অভিনয়ে ছিলেন : বিক্রমাদিত্য ও বডা — অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। বসন্ত রায় — অক্ষয়কালী কোঙার। প্রতাপাদিত্য — অমৃতলাল মিত্র। গোবিন্দদাস — কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিজয়া — নরীসুন্দরী। গয়লাবৌ — ক্ষেত্রমণি।

১৯০৩ থেকে ১৯০৫, এই উন্মাদনার মধ্য দিয়ে বাঙালি যেমন চলেছিল, বাংলা রঙ্গমঞ্চগুলিও সেইভাবে এই জাতীয় নাটকগুলি অভিনয় করে চলেছিল। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন, ১৬ অক্টোবর থেকে 'বঙ্গভঙ্গ' কার্যকর হবে। বাংলাকে ভেঙে দু'টুকরো করে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ যুক্ত হবে অসম প্রদেশের সঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হবে বিহার-ওড়িশার সঙ্গে। এর প্রতিবাদে সারা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। আন্দোলন শুরু হয়। 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে খ্যাত এই প্রতিবাদ আন্দোলনে সেদিন সারা দেশ স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নেয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চগুলির সঙ্গে স্টার থিয়েটারও সেদিন নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে বাঙালির স্বদেশপ্রেমের আন্দোলনে শামিল হয়েছিল।

১৯০৫-এব ৬ সেপ্টেম্বব, যেদিন 'বঙ্গভঙ্গ' করার কথা ঘোষণা করলেন লর্ড কার্জন, সেদিন সমগ্র বাঙালি জাতির সঙ্গে বাংলা রঙ্গালয়ও অশৌচ পালন করেছিল। সেদিন স্টার থিয়েটারেও অভিনয় বন্ধ রাখা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তি মারফত :

MOURNING AT THE 'STAR'!!!
PARTITION OF BENGAL
NO AMUSEMENT WORK AT THE
STAR THEATRE
ON
Wednesday, the 6th September
AMRITALAL BOSE
MANAGER
[Amritabazar Patrika, 6-9-1905]

তবে এই সময়কালে শুধু যে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ ভাবানুরাগের নাটকগুলিই অভিনীত হয়েছে, তা নয়। এই ধরনের নাটক ছাড়াও এই পর্বে 'সৎসঙ্গ' (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'খাসদখল' (অমৃতলাল বসু), 'পরপারে' (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়), 'ধর্মবিপ্লব' (মনমোহন গোস্বামী), 'জয়পতাকা' (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), 'অহল্যাবাঈ' (মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), 'অকলঙ্ক শশী' (রবীন্দ্রনাথের দিদি গল্পের নাট্যরূপ : রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), 'সওদাগর' (শেক্সপীয়রের মার্চেন্ট অব ভেনিস নাটকের বাংলা রূপান্তর ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'ওথেলো' (অনু. দেবেন্দ্রনাথ বসু) প্রভৃতি অভিনয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময়ে স্টার থিয়েটার শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকটি মূল ইংরেজিতেই অভিনয়ের ব্যবস্থা করে (২৩.৯.০৯) Maurice E. Bandmann-এর তত্ত্বাবধানে। বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা স্যার হেনরি আরভিংয়ের বন্ধু ও শিষ্য Charles Vane হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এর আগেই (১২ জুন, ১৯০৯) স্টার অবশ্য 'হ্যামলেট' অবলম্বনে বাংলায় 'হরিরাজ' (নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী) অভিনয় করেছিল। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা উপন্যাসের নাট্যরূপ (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত) এখানেই প্রথম অভিনীত হল (২৭.২.০৯)।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক যেমন এই সময়ে স্টারে অভিনীত হতে থাকে, তেমনই নাট্যকার হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রতিষ্ঠাও এখানে শুরু হল। 'প্রতাপাদিত্য' থেকেই তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলকান্ত' নামের রচনার নাট্যরূপ দেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। এটি ১৯০৯-এর ১২ জুন অভিনীত হয়। কমলাকান্তরূপী কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রসন্ন গোয়ালিনীর ভূমিকায় কুসুমকুমারী রঙ্গরসে জমিয়ে দেন।

১৯০৯ থেকেই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কুসুমকুমারীসহ স্টার থিয়েটারে অভিনয় করছিলেন। পরে ১৯১১ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি স্টার মঞ্চের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১৯০৯-এর ৪ মে থেকে স্টার থিয়েটারে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহার শুরু হয়। তখন ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রক্ষ ও রমণী' এবং অমৃতলাল বসুর 'একাকার' অভিনয় হচ্ছিল।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পুরনো নাটকগুলি অভিনীত হয়ে চলল। মাঝে মাঝে অভিনীত হল অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'যৎকিঞ্চিৎ' (২৫ জুন), হারাণচন্দ্র রক্ষিতের উপন্যাস অবলম্বনে 'কামিনীকাঞ্চন' (নাট্যরূপ : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত), রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস রাজপুত জীবনসন্ধ্যা অবলম্বনে 'জীবনসন্ধ্যা' (নাট্যরূপ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২১ নভেম্বর), অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'কেয়া মজাদার' (২৫ ডিসেম্বর)। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ চলল একইভাবে। নতুন নাটকের মধ্যে 'ইন্দিরা', মনোমোহন গোস্বামীর 'কর্মফল', নিত্যবোধ বিদ্যারত্নের 'কুসুমে কীট' (২০ জুলাই) অভিনীত হল। স্টারেই 'কর্মফল' প্রথম অভিনীত হয়। ব্রিটিশ সরকার এই নাটকের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করে দেয়।

১৯১০ সালে প্রথম অভিনীত হল 'দশচক্র', রবীন্দ্রনাথের মুক্তির উপায়-এর নাট্যরূপ (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৬ ফেব্রুয়ারি)। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'রানীভবানী' (৬ অগাস্ট), 'গুরুঠাকুর' (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ সেপ্টেম্বর) , হরনাথ বসুর 'বেহুলা' (১০ ডিসেম্বর)। নতুন এই নাটকগুলির সঙ্গে পুরনো নাটকগুলি তো চলছিলই।

১৯১১-তে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'সুলতান' এবং 'নাগেশ্বর' (২৯ এপ্রিল) এখানে প্রথম অভিনীত হল। এছাড়া পুরনো সব নাটকের পুনরাভিনয় চলছিল। ১৯১১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর এখানে অভিনয় বন্ধ ছিল। তারপর অভিনীত হল ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সৎসঙ্গ' (১১ নভেম্বর), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মজার নাটক 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়িযাত্রা' (২৫ নভেম্বর), নরেন্দ্রনাথ সরকারের 'জীবনসংগ্রাম' (২৬ ডিসেম্বর)। 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়িযাত্রা' নাটকে মঞ্চে দেখানো হয়েছিল আস্ত একটা ট্রেন। এই ট্রেন থেকে যাত্রীরা ওঠানামা করছে, তারপরে ট্রেন ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। মঞ্চের এই কৌশল সেদিন দর্শকদের আকর্ষণের ও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর হল গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু (৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২) [৮ ফেব্রুয়ারি রাত্রি বারোটার পর ১টা ১০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়, সে জন্য ইংরেজি মতে ৯ ফেব্রুয়ারি হওয়াই বিধেয়।] গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু বাংলা রঙ্গালয়ের পক্ষে বিরাট ক্ষতি। তাঁর নাট্যজীবনের প্রায় ৪০ বছর তিনিই ছিলেন বাংলা মঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালক ও মঞ্চাধ্যক্ষ। এবং অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় নাট্যকার। টাউন হলে বিরাট স্মৃতিসভা হয়। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র

সমাজপতি স্মৃতিচারণ করেন। সভাপতি ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব। কথাটি উল্লেখ করা এই কারণে যে, এই সভায় থিয়েটারের অভিনেত্রীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। অথচ তখনকার প্রায় সব অভিনেত্রীই গিরিশচন্দ্রের হাতেগড়া। তাই অমরেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিসভায় আয়োজন করা হয় (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১২) এবং সেখানে অভিনেত্রীবৃন্দ তাঁদের স্মৃতি ও সম্মান জানান গিরিশচন্দ্রের প্রতি। সভাপতি অমরেন্দ্রনাথ।

১৯১২-তে পুরনো নাটকেরই অভিনয় চলছে। তার মধ্যে অমৃতলাল বসুর নতুন নাটক 'খাসদখল' প্রথম অভিনীত হয় ৩০ মার্চ। অভিনয় করলেন : অমৃতলাল বসু — নিতাইচরণ। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত — মোহিতমোহন। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় — মনোমোহন। ক্ষেত্রমোহন মিত্র — সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কুঞ্জলাল চক্রবর্তী — ঠাকুর্দা মহাশয়। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় — ডা. ডি. মিত্র। কার্তিকচন্দ্র দে — পাকড়াশি। বসন্তকুমারী — মোক্ষদা। সুশীলাবালা — গিবিবালা। কুমুদিনী — আহ্লাদী। মৃণালিনী — বিধু ঝি।

এই নাটকের অভিনয় সব দিক দিয়ে আলোড়ন তুলেছিল। অভিনয়, সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, হ্যান্ডবিল — সব বিষয়েই রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিল। নিতাইচরণের মুখে (অভিনেতা : অমৃতলাল) 'is the' বাংলা ভাষায় প্রবাদবাক্য হয়ে উঠেছিল। 'নিতাই অমৃতলালেব এক অভিনব ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। স্বল্পবুদ্ধি এই মানুষটি তাহার 'ইজ দি'র বাহুল্যে কৌতুকের প্রবাহ অনর্গল করিয়া দিয়া নাটকের শেষের দিকে একটি পুরা মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন ... মোহিত ও গিরিবালার পুনর্মিলনে আনন্দিত হইয়া চলিয়াছে — 'Beg your pardon is the, মোহিতের সঙ্গে ইজ দি আমার ঝগড়া ছিল, নন্দবাবুর সঙ্গো ইজ দি নয়। You are is the গিরিবালা — মা'র বর, You is the beg your pardon.' এখানে হাস্যরস ও করুণরস এক হইয়া গিয়াছে।' [অরুণলাল মিত্র — অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য, পৃ. ১৯৯-২০০] গিরিবালার ভূমিকায় সুশীলাবালার কণ্ঠে গান — 'ওগো কেউ বল না গো ভাতার কেমন মিষ্টি'— সেকালে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল।

মনোমোহন বসুর 'রূপকথা' (১৫ জুন), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' (১৭ অগাস্ট), মনোমোহন গোস্বামীর ধর্মবিপ্লব (২৯ মার্চ), রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালপরিণয়' (২৫ ডিসেম্বর) এখানে প্রথম অভিনীত হয়।

এখানে একটি ঘটনাব উল্লেখ অবশ্যই প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা কৌতুক গীতিনাট্য 'আনন্দ বিদায়' স্টার থিয়েটারেই প্রথম অভিনীত হল ১৬ নভেম্বর, ১৯১২ সালে। সঙ্গো দ্বিজেন্দ্রলালেরই 'পরপারে' অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। 'আনন্দ বিদায়' গীতিনাট্যে রূপকের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করাই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। এই নিয়ে 'আনন্দ বিদায়' অভিনয়ের প্রথম দিনেই গন্ডগোল শুরু হয়। শঙ্কর ভট্টাচার্যের 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' (১৯১০-১৯১৯) গ্রন্থ থেকে ঘটনাটি উদ্ধার করি :

> 'এইদিন অভিনয়ের পূর্বেই নাটকের বিষয়বস্তুর কথা প্রচারিত হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী একটি দল স্থির করেন যে, নাটকটি চলাকালীন গন্ডগোল পাকিয়ে অভিনয় বন্ধ করে দেবেন। সেই অনুযায়ী টিকিট কেটে স্টার থিয়েটারের দর্শকাসনে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর আসন গ্রহণ করেন। যেন গন্ডগোল হওয়ার সময়ে মনে হবে যে, প্রেক্ষাগৃহের প্রায় সমস্ত দর্শকই নাটকটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালও দোতলায় রয়্যাল বক্সে বসে। প্রথম অঙ্ক নির্বিঘ্নে শেষ হল। দ্বিতীয় অঙ্কে রূপক কৃষ্ণের ভূমিকায় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি গানের প্যারোডি আরম্ভ করা মাত্র পূর্ব থেকে প্রস্তুত দর্শকরা সমস্বরে নাটকটি বন্ধ করে দেওয়ার দাবি করতে থাকেন এবং রঙ্গামঞ্চে অগ্নিসংযোগ করে দেওয়ার ভয়ও দেখাতে থাকেন। কর্তৃপক্ষ তখনি যবনিকা ফেলে দিলেন। এদিকে রয়্যাল বক্স থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেই উত্তেজিত দর্শকরা তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। সেই অবস্থায় দ্বিজেন্দ্রলালকে মঞ্চের এক নিভৃত অংশে লুকিয়ে রাখা হল। শেষে দ্বিজেন্দ্রলাল বিরোধী নট-নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী মঞ্চে এসে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার বিভিন্ন দোষত্রুটি দেখিয়ে এক ভাষণ দেন এবং তাতেই উত্তেজিত দর্শকরা শান্ত হয়ে যান। সেদিনকার মতো নাটকটির অভিনয়

বন্ধ হয়ে গেলেও ৫ ডিসেম্বর, ১৯১২ নাটকটি পুনরাভিনীত হয়।' সঙ্গো অ্যানি অ্যাবটের প্রদর্শনী ও 'আবুহোসেন'-এর অভিনয় হয়েছিল।'

মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের মতো খ্যাতকীর্তি একজনের বিরুদ্ধে এইরকম ব্যঙ্গবিদ্রূপ রচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল, সে সময়ে যতই রবীন্দ্র-বিরোধী হোন, পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় দেননি। আরও মনে রাখতে হবে, এই নাটকটি অভিনয়ের সময়ে স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত ও পারিবারিক পরিচিত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অনারারি 'ড্রামাটিক ডিরেক্টর' ছিলেন অমৃতলাল বসু।

দ্বিতীয়বারের পর 'আনন্দ বিদায়' স্টারে তো নয়ই, অন্য কোনও রঙ্গামঞ্চেও আর কখনও অভিনীত হয়নি।

১৯১৩-তে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু হয় (১৭ মে)। পুরনো নাটকগুলিরই অভিনয় হয়ে চলেছে। মঞ্চে 'বায়োস্কোপ'ও দেখানো চলছে। টাকার জন্য বাইরে গিয়ে আমন্ত্রিত অভিনয়ও চলছে। সে কারণে কলকাতায় অভিনয় বন্ধ থাকছে। তার মধ্যে মনোমোহন গোস্বামীর 'ধর্মবিপ্লব' ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক প্রথম অভিনীত হল (২৯ মার্চ) । অমরেন্দ্রনাথের কৌতুক গীতিনাট্য 'কিসমিস' (৩ মে), অনেকদিন বাদে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' (১৭ মে) অভিনীত হল। অমরেন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্য 'রোকশোধ' (১ নভেম্বর) প্রথম অভিনয়। কোনও কোনও দিন নাট্যাভিনয়ের সঙ্গো প্রফেসর চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর হাস্যকৌতুক, ম্যাজিক, টেলিপ্যাথি, গোপালচন্দ্র সিংহরায়ের ক্যারিকেচার ও ভেন্ট্রিলোকুইজম, এম. এল. সেনের রয়্যাল বায়োস্কোপ প্রোগ্রামে থাকত।

১৯১৪-তে উল্লেখযোগ্য অভিনয় রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের নাট্যরূপ (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত) 'অভিমানিনী' (১৩ জুন)। অভিনয়ে ছিলেন : মন্মথনাথ পাল — ছিদাম। ক্ষেত্রমোহন মিত্র — দুখীরাম। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় — রামলোচন। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — সিভিল সার্জেন। কুসুমকুমারী — চন্দরা। নরীসুন্দরী — ললিতা। মৃণালিনী — রাধা।

এই সময়ে অমরেন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়ে 'থিয়েটার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম প্রকাশ ১০ জুলাই, ১৯১৪। আট মাস চলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহল্যাবাঈ' প্রথম অভিনীত হল (১৫ অগাস্ট)। ৩১ অক্টোবর অভিনীত হল 'অকলঙ্ক শশী', রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পের নাট্যরূপ (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)। অভিনয় করেছিলেন : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত — জয়গোপাল। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় — দুর্লভ। কুঞ্জলাল চক্রবর্তী — কেদার নন্দী। হীরালাল দত্ত — মধু ডাক্তার। কুসুমকুমারী — শশী। বসন্তকুমারী — তারা। মৃণালিনী — সুভাষিণী। এছাড়া ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্ষত্রবীর' (৫ ডিসেম্বর) মহাভারতের যুদ্ধ নিয়ে লেখা হলেও ইউরোপের বর্তমান বিশ্বযুদ্ধকে তুলে ধরে। মনে রাখতে হবে, ১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, চলেছিল ১৯১৮ পর্যন্ত। যদিও প্রথম এই মহাযুদ্ধের কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব এ দেশে পড়েনি। তবুও পরোক্ষ প্রভাব ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভিনেত্রীর রূপ' এখানে প্রথম অভিনীত হল (২৬ ডিসেম্বর)। তাঁর একই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ তিনি নিজেই দিয়েছিলেন।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দও স্টারের পক্ষে ভালোমন্দ মিলিয়ে চলে। পুরনো সব নাটক অভিনয় করা হচ্ছে। বছরের গোড়াতেই (৩ জানুয়ারি, ১৯১৫) স্টারের প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুশীলাবালা মারা গেলেন। তাই সেদিন স্টারে অভিনয়ের আগে হরিসংকীর্তন হয়েছিল।

এই বছরে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য অভিনয় নেই। ভালো নাটকও তেমন রচিত হচ্ছে না। তার মধ্যেও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'প্রেমের জেপলীন' (৬ ফেব্রুয়ারি), রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেলোয়ারী' (৬ ফেব্রুয়ারি), স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কনেবদল' (৬ ফেব্রুয়ারি), মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাধব রাও' (২৭ এপ্রিল), জগৎচন্দ্র সেনের 'রাজা চন্দ্রধ্বজ' (২১ অগাস্ট), মনোমোহন গোস্বামীর 'ভীলেদের ভোমরা' (২৫ ডিসেম্বর) প্রথম অভিনীত হল। এর মধ্যে Wilson Barret-এর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'The Sign of the Cross' অবলম্বনে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই নামেই বাংলায় নাট্যরূপ দেন ও সেটি স্টারে অভিনীত হয়েছিল (২৭ ফেব্রুয়ারি)। অমৃতবাজার পত্রিকা (২৩ মার্চ,

১৯১৫) প্রশংসা করে লিখেছিল : 'The Sign of the Cross on the whole, as produced by this company, marks a distinct epoch in dramatic production.' এই বছরেই একবার স্টারে বহুখ্যাত মার্কিনী নাট্যশিল্পী Denever Bill তাঁর Allstrar Co. নিয়ে কলকাতায় এসে স্টারে 'Red Indian War Drama' অভিনয় করে যান (২৪ মার্চ)। তাঁরা বারকয়েক অভিনয় করেছিলেন। স্টার একদিন (১২ অক্টোবর) ইংরেজিতে 'দা সাইন অফ দা ক্রস' নাটকটির নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় করে। বাংলায় ওই নাটকেরই একই দৃশ্যের অভিনয় কবে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

৪ ডিসেম্বর মহাসমারোহে অভিনীত হল শেক্সপীয়রের Marchant of Venice নাটকের বাংলা রূপান্তর (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) 'সওদাগর' নামে। অভিনয় করেছিলেন : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত — কুসীরক (Shylock)। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — অনিলকুমার (Antonio)। কুঞ্জলাল চক্রবর্তী — বসন্তকুমার (Bassanio)। লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায় — রাজা বিক্রমসিংহ (Duke of Venice)। কুসুমকুমারী — প্রতিভা (Portia)। নারায়ণী — নিরজা (Narissa)। আশ্চর্যময়ী — যূথিকা (Jessika)। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় — নটবর (Launcelot gobbo)

১৯১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজেবের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি শেষ অবধি অভিনয় করতে পারেননি। তৃতীয় অঙ্ক শেষ হওয়ার আগেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মঞ্চে এই তাঁর শেষ অভিনয়। এর মাসখানেকের মধ্যে ৬ জানুয়ারি ১৯১৬ অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর স্টার কর্তৃপক্ষ কোনওরকমে কিছুদিন থিয়েটার চালান এবং পুরনো নাটকগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করতে থাকেন। তখন ম্যানেজার হয়েছেন অমৃতলাল বসু। উল্লেখযোগ্য নতুন অভিনয়ের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুরুদক্ষিণা' (১১ মার্চ), হেমেন্দ্রলাল একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ এপ্রিল), যোগেন্দ্রনাথ দাসের 'বল্লালসেন' (১৩ মে), হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'জড়ভরত' (২৪ জুন), মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চশর' এবং মনোমোহন গোস্বামীর 'সাধনা' (২৫ ডিসেম্বর) প্রভৃতি।

১৯১৭-তে পুরনো নাটক সব অভিনীত হচ্ছে। নতুন নাটক অভিনীত হল ১৪ এপ্রিল। মাইকেলের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর পঞ্চাঙ্ক নাটক 'দেববালা'। চন্দ্রশেখর নাট্যরূপের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে স্টারে তা অভিনীত হল ১৪ জুলাই। একই দিনে মিনার্ভা ও মনোমোহন থিয়েটারেও চন্দ্রশেখর অভিনীত হল।

১৯১৭ সালের ৮ অগাস্ট 'চন্দ্রশেখর' ও 'খাসদখল' নাটকে প্রথম মঞ্চাবতরণ করলেন অমৃতলাল বসুর কনিষ্ঠ পুত্র অসিভূষণ বসু। তিনি 'চন্দ্রশেখর'-এ প্রতাপ এবং 'খাসদখল'-এ মোহিত চরিত্রে অভিনয় করেন।

স্টার থিয়েটারের অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীন। ভালো নাটক নেই, ভালো অভিনেতা নেই। দর্শকও কমে আসছে দিনকে দিন। এই অবস্থায় ১২ অগাস্ট, ১৯১৭ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থিয়েটারে অভিনয় বন্ধ রাখতে হয়। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ নিজেরা দায়িত্ব নিলেন না। অনঙ্গমোহন হালদারকে 'লেসী' করা হল। ম্যানেজার হলেন নরেন্দ্রনাথ সরকার। ২২ সেপ্টেম্বর ডা. নারায়ণ বসুর লেখা মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে 'কুরুক্ষেত্র' নাটক দিয়ে নতুন করে স্টার থিয়েটার চালু হল। এবং পরপর পুরনো নাটকের মাঝে মাঝে কুরুক্ষেত্র সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে চলল। অভিনয় করলেন : নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু — শ্রীকৃষ্ণ। লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায় — ভীষ্ম। পুষ্পকুমারী — উত্তরা। কুঞ্জলাল চক্রবর্তী — ভীম। হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) — দ্রৌপদী।

আবার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে থিয়েটারের। তাই ৩১ অক্টোবর অভিনয়ের পর ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্টার থিয়েটার বন্ধ থাকে। ২৯ ডিসেম্বর থেকে আবার পুরনো নাটকগুলির অভিনয় শুরু হয়।

১৯১৮ সালেও স্টার থিয়েটার কোনওক্রমে চলছিল। 'রণভেরী' নাটক দিয়ে ১ জানুয়ারি শুরু হল। দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের লেখা নাটক। এই নাটকটি দেখতে সেদিন বালগঙ্গাধর তিলক স্টারে এসেছিলেন। ১৩ জানুয়ারি 'Sole Lesee' হলেন অনঙ্গমোহন হালদার, আর ম্যানেজার হলেন এম. এল. মুখার্জী। এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম'-এর নাট্যরূপ অভিনীত হয় (১৯ জানুয়ারি)। মুচিরামের ভূমিকায় কুসুমকুমারীর অনবদ্য অভিনয় সেদিনের পত্র-পত্রিকায় উচ্চ

প্রশংসিত হয়েছিল। ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে স্টার আবার বন্ধ হয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত অভিনয় চলেছে। গওহরজানের গান, ম্যাজিক, বায়স্কোপ ইত্যাদি দিয়ে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা চলেছে। তবে ২৮ এপ্রিলের অনুষ্ঠানের পর একেবারে ২৮ জুন অবধি স্টার একটানা বন্ধ থাকে। ২৯ জুন থেকে পুরনো নাটক এবং সংগীত, নৃত্য, বায়স্কোপ ইত্যাদির অনুষ্ঠান চলতে থাকে।

এরপর ৩ অগাস্ট থেকে গিরিমোহন মল্লিকের কর্তৃত্বাধীনে স্টার থিয়েটারের ভাগ্য ফেরানোর জন্য নামানো হয় শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বিরাজ বৌ-এর নাট্যরূপ (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। সাধারণ রঙ্গালয়ে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর এই প্রথম নাট্যরূপ অভিনীত হল। অভিনয় করেছিলেন : অমৃতলাল বসু — যদু। মি. পালিত — নীলাম্বর। ক্ষেত্রমোহন মিত্র — পীতাম্বর। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় — নিতাই। হীরালাল দত্ত — ভুলু। মনোমোহন গোস্বামী — নরহরি। কুসুমকুমারী — বিরাজ বৌ। বসন্তকুমারী — সুন্দরী। নরীসুন্দরী — মোহিনী।

বাংলা থিয়েটারের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ একাদিক্রমে নানা মঞ্চে অভিনীত হয়ে রঙ্গালয়ে নাটকের অভাব পূরণ করেছিলেন। দর্শকও ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ঘটনার নাটকীয়তায়, চরিত্রের জটিলতায় এবং নতুনতর জীবন ভাবনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি তখন সবে প্রকাশিত হচ্ছে এবং রঙ্গালয়গুলি তৎক্ষণাৎ তার নাট্যরূপ অভিনয় করে চলেছে। এইভাবে রঙ্গালয়ের নাটকের চাহিদা যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি মিটিয়েছিল, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি করেছিল রঙ্গালয়।

শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের কয়েক বছর পরেই স্টার তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করে শরৎচন্দ্রকে থিয়েটারে নিয়ে এল। এরপরে দেখা যাবে, বিভিন্ন থিয়েটার শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ অভিনয় করে চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

'বিরাজ বৌ' স্টার থিয়েটারের ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। প্রচুর অর্থোপার্জন করে গিরিমোহন নতুন উৎসাহে স্টার থিয়েটার চালাতে লাগলেন। পুরনো নাটকের ফাঁকে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রহসন 'বিদ্যাধরী' (২১ সেপ্টেম্বর), যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক 'আরব অভিযান' (২ নভেম্বর) অভিনয় করা হল।

ব্রিটেনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ উপলক্ষে স্টাব বিশেষ অভিনয় (Victory celebration performance) করেছিল ২৯ নভেম্বর ১৯১৮। নাটক ছিল পুরনো 'খাসদখল' ও 'জয়দেব'। উল্লেখ্য, এইদিন দরিদ্রদের জন্য প্রবেশমূল্য ছিল না।

গিরিমোহন মল্লিক স্টার থিয়েটারকে আরও ভালোভাবে চালানোর জন্য অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন (৪ ডিসেম্বর)। অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে মিনার্ভা থিয়েটার থেকে চলে এলেন তারাসুন্দরী ও নীরদাসুন্দরী। 'Sole Proprietor' হলেন গিরিমোহন। অপরেশচন্দ্র দায়িত্ব নিয়ে নতুন নাটক প্রস্তুতির জন্য থিয়েটার কয়েকদিন বন্ধ রাখলেন। দৃশ্যসজ্জার দায়িত্বে রইলেন প্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতা। তারপরে ১৪ ডিসেম্বর অভিনয় করলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'কিন্নরী'। এটি আগেই অপরেশচন্দ্র মিনার্ভায় অভিনয় করেছিলেন (১৭.৮.১৮)। স্টারে অভিনেতা-অভিনেত্রী হলেন : তারকনাথ পালিত — সুধন। তারাসুন্দরী — উৎপল। বসন্তকুমারী — মকরী। নীরদাসুন্দরী — কিন্নরী। হরিসুন্দরী (ব্লাকী) — রমাবতী। মৃণালিনী — বিতস্তা। রানীসুন্দরী — চতুরিকা। মিনার্ভাও 'কিন্নরী' অভিনয় করে চলল। একসঙ্গে দুই থিয়েটারে কিন্নরী 'হাউসফুল' হতে লাগল। মিনার্ভার মালিক উপেন্দ্রনাথ মিত্র স্টারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দিলেন। কিন্তু স্টারেও 'কিন্নরী'র অভিনয় চলতে লাগল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মিটে গেছে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ শুরু হল সেই 'কিন্নরী' দিয়ে। চলল আরও সব পুরনো নাটক। ১৯১৯ সালের ২ মার্চ আদালতের আপত্তিতে স্টার 'কিন্নরী'র অভিনয় বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

এখানে একটি কথা জানিয়ে রাখি। উনিশ শতকের শেষের দিকে গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে এইরকম এক মামলা হয়। গিরিশচন্দ্র তখন (১৮৯১) স্টার ছেড়ে নীলমাধব চক্রবর্তীকে নিয়ে সিটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির অভিনয় শুরু হয়। সেই নাটকগুলি স্টারেও চলছিল। স্টার কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে মামলা করেন। স্টার কর্তৃপক্ষ

হেরে যান। বিচারপতি উইলসন তাঁর রায়ে বলেন, কোনও মুদ্রিত নাটক দোকানে বিক্রি হতে শুরু করলেই সে নাটক সকল থিয়েটারই বিনা বাধায় অভিনয় করতে পারবে।

এই রায় মেনেই এতদিন সব থিয়েটারে অভিনয় চলত। কিন্তু 'কিন্নরী' নাটক খুব সাফল্য লাভ করায়, মিনার্ভা ও স্টারে একই সঙ্গো অভিনয় চলতে থাকায় মিনার্ভার উপেন্দ্রনাথ মিত্র হাইকোর্টে মামলা করে জেতেন এবং স্টারে 'কিন্নরী' অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। ২৬ বছর ধরে প্রচলিত ও অনুসৃত আইন পাল্টে যায় এবং এক থিয়েটারে অভিনীত নাটক বিনানুমতিতে অন্য থিয়েটারে অভিনয় করা যাবে না — এই আইন চালু হয় (5A of British Copy-Right Act of 1912)। এখন অবধি বাংলা থিয়েটারে এই আইন চালু আছে।

১৯১৯ — পুরনো নাটকের মধ্যেই নতুন নাটক প্রথম অভিনীত হল 'ওথেলো' (৮ মার্চ) এবং 'মুখের মতো' (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ মার্চ)। শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের বঙ্গীয় রূপান্তর করেন দেবেন্দ্রনাথ বসু। অভিনয়ে ছিলেন : তারকনাথ পালিত — ওথেলো। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — ইয়াগো। লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায় — ব্রাবানসিও। প্রবোধচন্দ্র বসু — কেসিও। তারাসুন্দরী — ডেসডিমোনা। নীরদাসুন্দরী — এমিলিয়া। মণিমালা — বিয়াঙ্কা। অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — ডিউক।
প্রবোধচন্দ্র বসুর নির্দেশে পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু) দৃশ্য পরিকল্পনা করেছিলেন। 'ওথেলো'র অভিনয় দর্শকদের সমাদর লাভ করে। এবং বেশ কিছু রাত্রি 'ওথেলো'র অভিনয় চলেছিল। তারাসুন্দরীর ডেসডিমোনার ভূমিকায় অভিনয় খুবই প্রশংসালাভ করেছিল। তবুও প্রচুর পরিশ্রম, মহার্ঘ সাজসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদিতে যা খরচ হয়েছিল, তা পূরণ হল না।

এবারে অপরেশচন্দ্র নিজের লেখা গীতিনাট্য 'উর্বশী' নামালেন। কালিদাসের সংস্কৃত 'বিক্রমোর্বশীয়ম' অবলম্বেনে এটি লেখা। নাচগানে ভরা এই নাটক নামিয়ে অপরেশচন্দ্র আর্থিক ক্ষতিপূরণ করলেন। তারপরে অপরেশচন্দ্র নিজের লেখা 'দুমুখো সাপ' নাটক অভিনয় করলেন। এটি William Congreve-এর The Double Dealer অবলম্বনে লেখা। এই নাটকও ভালোই চলল। অভিনয়ে : কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় — স্ফূর্তিবাজ। হীরালাল দত্ত — দাগাবাজ (দুমুখো সাপ) । সত্যেন্দ্রনাথ দে — বাহার। লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায় — কেরামৎ। নীরদাসুন্দরী — আতুসী। মণিমালা — খরিরা। স্টার ১ নভেম্বর অভিনয় করল দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'। তাতে উল্লেখযোগ্য খবর হল নিমচাঁদের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী। এই অভূতপূর্ব প্রয়াসের কথা কর্তৃপক্ষ সগর্বে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে জানিয়েও দিয়েছিলেন। এবং এক রাত্রি নয়, বেশ কয়েক রাত্রি নীরদাসুন্দরী নিমচাঁদের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। যদিও বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, এই 'Lady artist quite unacquainted with the English Alphabet' এবং এই অভিনেত্রী যে তা সত্ত্বেও 'নিমচাঁদ'-এর অভিনয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাও বিজ্ঞাপনে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এরপরে অভিনীত হল রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মহরাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' অবলম্বনে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত নাট্যরূপ 'জীবনপ্রভাত' (২৯ নভেম্বর)। তারপর ভূপেন্দ্রনাথের মিলনান্তক নাটক 'বৈবাহিক' (২৫ ডিসেম্বর)।

১৯২০-তে গিরিমোহন মল্লিক স্টার থিয়েটারের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। এবারে অপরেশচন্দ্র 'লেসী' হলেন এপ্রিল মাস থেকে। পুরনো নাটকের মাঝে নতুন নাটক মঞ্চস্থ হল 'রাখীবন্ধন' (২২ জুন), দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'কুহকী' (১৯ জুন), এবং অপরেশচন্দ্রের নিজের নাটক 'ছিন্নহার' (২৬ অগাস্ট)। ছিন্নহার সে সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দও চলল কোনওরকমে। অপরেশচন্দ্রের 'বাসবদত্তা' (১৫ জানুয়ারি), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'মন্দাকিনী' (২ এপ্রিল), এবং অপরেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক 'অযোধ্যার বেগম' (৩ ডিসেম্বর) মঞ্চস্থ হল।

১৯২২ সালেও একই অবস্থা। নতুন নাটকের মধ্যে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবাবী আমল' (১ জুলাই), অপরেশচন্দ্রের দুটি নাটক 'অপ্সরা' (১৯ অগাস্ট), এবং 'সুদামা' (২৩ সেপ্টেম্বর)।

এই সময়কালে দেখা যাচ্ছে, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অভিনেতা ও ম্যানেজার হয়ে স্টারে যোগ দিয়ে ধীরে ধীরে

নাট্যকার হয়ে উঠলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করছেন, নাট্যরূপ দিচ্ছেন এবং মৌলিক নাটক লিখে চলেছেন। এই মন্দা অবস্থায় অভিনেতা অপরেশচন্দ্র ক্রমে মঞ্চের তাগিদে নাট্যকার হয়ে উঠলেন। তখনকার প্রচলিত নাটকের ধরন এবং বিষয়বস্তু নিয়েই তাঁর নাটকগুলি তৈরি হয়েছিল। সমসাময়িক চাহিদা মিটিয়েই সেগুলির মূল্য শেষ হয়ে গেছে।

তৃতীয় পর্ব : (১৯২৩-৩৩)

আর্ট থিয়েটার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর থেকেই হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ১৯২০ সালে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবোধচন্দ্র গুহের সহায়তায় এবং অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর আনুকূল্যে স্টার থিয়েটার 'লিজ' নিয়ে চালাতে থাকেন। ক্রমে অপরেশচন্দ্র এবং প্রবোধচন্দ্র উদ্যোগী হয়ে 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' নামে এক যৌথ প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। সহায়তা পেলেন তখনকার বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পরিচালক ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে (ইনি নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ নন)। এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সেন, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ম্যানেজার), প্রবোধচন্দ্র গুহ (সেক্রেটারি)। এই যৌথ প্রতিষ্ঠান স্টার থিয়েটার 'লিজ' নিয়ে সেখানে চালু করল 'আর্ট থিয়েটার'। অভিনেত্রী তারাসুন্দরীও এই থিয়েটারের আংশিক মালিক ছিলেন। এইভাবে কলকাতার কয়েকজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আনুকূল্য পেয়ে অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র দ্বিগুণ উৎসাহী হয়ে উঠলেন। অবশ্য আর্ট থিয়েটারের মূল ব্যক্তি ছিলেন অপরেশচন্দ্র। তিনি ম্যানেজারের দায়িত্বের সঙ্গে একাধারে নাট্যশিক্ষক, নাট্যকার ও অভিনেতা।

এইভাবে স্টার থিয়েটারের বাড়িতে গড়ে উঠল আর্ট থিয়েটার, ৩০ জুন ১৯২৩ থেকে চলল সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ পর্যন্ত।

প্রথমে কিছুদিন শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' স্টারের পুরনো নাটক হিসাবে চালিয়ে যাওয়া হল। তারপর ১৯২৩ সালের ৩০ জুন অপরেশচন্দ্রের লেখা নতুন নাটক 'কর্ণার্জুন' দিয়ে আর্ট থিয়েটারের পাকাপাকি উদ্বোধন হল। অভিনয় করলেন : তিনকড়ি চক্রবর্তী — কর্ণ। অহীন্দ্র চৌধুরী — অর্জুন। নরেশ মিত্র — শকুনি। অপরেশচন্দ্র — পরশুরাম। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বিকর্ণ। কৃষ্ণভামিনী — পদ্ম। নীহারবালা — নিয়তি। নিভাননী — দ্রৌপদী। এঁরা ছাড়াও ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরমা প্রমুখও অংশগ্রহণ করেন। পরে গিরিশচন্দ্রের পুত্র দানীবাবু এখানে যোগ দেন ও নানা ভূমিকায় অভিনয় করেন। ২৬০ রাত্রি একাদিক্রমে 'কর্ণার্জুন'-এর অভিনয় বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে যুগান্তকারী ঘটনা। 'কর্ণার্জুন' অভিনয় প্রসঙ্গে তখন শিশির পত্রিকা লিখেছিল :

> 'স্টার থিয়েটার যে নতুনত্ব দেখাইতেছেন, ভরসা করি তাহা চিরদিনই দেখাইতে পারিবেন। ... এ দেশের চিরাচরিত মলিন, নিষ্প্রাণ ভাবধারাকে বিদায় দিয়া যাঁহারা নতুনত্বের সূচনা করিয়াছেন তাহাদের আমরা সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।'

এতদিনকার বাংলা থিয়েটারের বহু ব্যবহৃত সিনসিনারি, পোশাক-পরিচ্ছদ, মঞ্চসজ্জা পাল্টে দিয়ে চকচকে নতুন সব কিছু তৈরি করা হল। অজন্তা গুহার চিত্রের আঙ্গিকে বেশভূষা ও অলঙ্কার তৈরি করা হয়েছিল। অভিনয়ে, সাজসজ্জা, চাকচিক্যে, মঞ্চস্থাপত্য ও মঞ্চকৌশলে এবং তরুণ তাজা সব নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমন্বয়ে আর্ট থিয়েটার প্রথম থেকেই দর্শক আকর্ষণে এবং সুষ্ঠু মঞ্চায়নে সাফল্যলাভ করে। এইখান থেকেই পরবর্তীকালের অনেক খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটে। অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নিভাননী, নীহারবালা, কৃষ্ণভামিনী। স্বয়ং অপরেশচন্দ্র তো ছিলেনই।

আর্ট থিয়েটার চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ও সাফল্য লাভ করে। ঠিক একই সময়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী সাধারণ রঙ্গালয়ে এসে পাকাপাকিভাবে অভিনয় শুরু করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই সময়েই আর্ট থিয়েটারের সগৌরব অস্তিত্ব ঘোষণা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তারপর থেকে আর্ট থিয়েটার টানা দশ বছর

ধরে স্টার থিয়েটারের মঞ্চে অভিনয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছিল।

১৯২৩ : কর্ণার্জুন (অপরেশচন্দ্র, ৩০ জুন), মুক্তির ডাক (মন্মথ রায়, একাঙ্ক, ২৫ ডিসেম্বর), রাজা ও রানী (রবীন্দ্রনাথ, ২৯ অগাস্ট)।

১৯২৪ : ইরানের রানী (অস্কার ওয়াইল্ডের 'দা ডাচেস অফ পাডুয়া' অবলম্বনে, অপরেশচন্দ্র, ১ জানুয়ারি)।

১৯২৫ : গোলকোণ্ডা (ক্ষীরোদপ্রসাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি), চিরকুমার সভা (রবীন্দ্রনাথ, ১৮ জুলাই), রূপকুমারী (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩ ডিসেম্বর) গৃহপ্রবেশ (রবীন্দ্রনাথ, ৫ ডিসেম্বর), বন্দিনী (অপরেশচন্দ্র, ২৫ ডিসেম্বর)।

১৯২৬ : বশীকরণ (রবীন্দ্রনাথ, ১০ জানুয়ারি), বিদায় অভিশাপ (রবীন্দ্রনাথ, ১৬ এপ্রিল), শোধবোধ (রবীন্দ্রনাথ, ২৩ জুলাই), দ্বন্দ্বেমাতনম (অমৃতলাল বসু, ১০ নভেম্বর), শ্রীকৃষ্ণ (অপরেশচন্দ্র, ১৫ মে), লাখ টাকা (সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭ জুলাই), চণ্ডীদাস (অপরেশচন্দ্র, ২৫ ডিসেম্বর)।

১৯২৭ : চিত্রাঙ্গদা (রবীন্দ্রনাথ, ১০ মে), পরিত্রাণ (রবীন্দ্রনাথ, ১০ সেপ্টেম্বর), মগের মুলুক (অপরেশচন্দ্র, ৩ ডিসেম্বর), পুষ্পাদিত্য (অপরেশচন্দ্র, ২৫ ডিসেম্বর)।

১৯২৮ : 'রমা' / পল্লীসমাজ (শরৎচন্দ্র / হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ৪ অগাস্ট), ফুল্লরা (অপরেশচন্দ্র, ২১ অক্টোবর) , দেবাসুর (মন্মথ রায়, ২৮ এপ্রিল), শাখের করাত (ভূপেন্দ্রনাথ, ২৫ ডিসেম্বর)।

১৯২৯ : শ্রীবৎস (মন্মথ রায়, ৮ জুন), চিরকুমার সভা (রবীন্দ্রনাথ, ২৯ জুলাই), [অহীন্দ্র চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে একরাত্রি শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'চন্দ্রের' ভূমিকায় অভিনয় করেন। অগাস্ট মাসে প্রবোধচন্দ্র গুহ আর্ট থিয়েটার ছাড়লেন। মন্ত্রশক্তি (অনুরূপা দেবী/অপরেশচন্দ্র, ২৩ নভেম্বর)।

১৯৩০ : চিরকুমার সভা (রবীন্দ্রনাথ, ২৮ মে। চন্দ্র — শিশিরকুমার); শকুন্তলা (৩০ অক্টোবর)।

১৯৩১ : মুক্তি (অপরেশচন্দ্র, ১ জানুয়ারি); স্বয়ংবরা (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৭ জুন), শ্রীগৌরাঙ্গ (অপরেশচন্দ্র, ১৯ সেপ্টেম্বর)।

১৯৩২ : পোষ্যপুত্র (অনুরূপা দেবী/অপরেশচন্দ্র, ১২ মার্চ), বিদ্রোহিনী (অপরেশচন্দ্র,৫ নভেম্বর); বড়বৌ (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ২৪ ডিসেম্বর), মানময়ী গার্লস স্কুল (রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, ২৬ ডিসেম্বর)।

১৯৩৩ : বৈকুণ্ঠের খাতা (রবীন্দ্রনাথ, ১৭ জুন), [প্রথমে 'কেদার'-এর চরিত্রে অভিনয় করতেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ২ জুলাই থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'কেদার' চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন] মন্দির প্রবেশ (জলধর চট্টোপাধ্যায়, ২৭ মে)।

এরপরে দেনার দায়ে আর্ট থিয়েটারের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে এখানকার বিখ্যাত অভিনেতা দানীবাবুর মৃত্যুতে (১৯৩৩) আর্ট থিয়েটারের মনোবল ভেঙে যায়। তারপরের বছরেই অপরেশচন্দ্রের মৃত্যু হয় (১৫ মে, ১৯৩৪) । তার সঙ্গে সঙ্গেই স্টার থিয়েটারে আর্ট থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস শেষ হয়।

অপরেশচন্দ্রের উদ্যমে, প্রবোধচন্দ্র গুহের পরামর্শে এবং তারাসুন্দরীর আনুকূল্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে যে থিয়েটার খোলা হয়েছিল, দশ বছর ধারাবাহিক নাট্যাভিনয়ের পর তা উঠে যায়। অপরেশচন্দ্রের একুশটি নাটক ছাড়া এখানে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল প্রভৃতির পুরনো বেশ কিছু নাটকের অভিনয় হয়েছিল। বেশ কিছু নতুন নাটকের অভিনয়ও এঁরা করেন। শরৎচন্দ্রের, অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপও এখানে অভিনীত হয়। এখানে পরপর রবীন্দ্রনাথের ন'টি নাটক ও উপন্যাস-ছোটগল্পের নাট্যরূপ অভিনীত হয়। উদ্বোধনের দু'মাসের মধ্যেই তাঁরা 'রাজা ও রানী' অভিনয় করেন। অভিনয় করেছিলেন : অহীন্দ্র চৌধুরী — কুমার সেন। তিনকড়ি চক্রবর্তী — বিক্রম। নরেশ মিত্র — শঙ্কর। অপরেশচন্দ্র — দেবদত্ত। কৃষ্ণভামিনী — সুমিত্রা। নীহারবালা — ইলা।

প্রস্তাবমতো রবীন্দ্রনাথ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-র নাট্যরূপ 'চিরকুমার সভা' শিশির ভাদুড়ীকে না দিয়ে আর্ট থিয়েটারকে অভিনয়ের জন্য দেন। এই অভিনয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের যে কটি নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে সাফল্য লাভ করেছে, 'চিরকুমার সভা' তাদের অন্যতম। অহীন্দ্র চৌধুরী (চন্দ্রবাবু), তিনকড়ি চক্রবর্তী (অক্ষয়), দুর্গাদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্ণ), অপরেশচন্দ্র (রসিক), নীহারবালা (নীরবালা) কমেডি নাটকের অভিনয়ে এবং নাচেগানে নাটকটিকে জমিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, দৃশ্যপট তৈরিতে সাহায্য করেন এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর গান শিখিয়ে দেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ', 'বশীকরণ', 'বিদায় অভিশাপ', 'শোধবোধ' (কর্মফল গল্পের কবিকৃত নাট্যরূপ), 'পরিত্রাণ' (বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের কবিকৃত নাট্যরূপ), 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আর্ট থিয়েটার উদ্যোগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটককে সাধারণ রঙ্গালয়ে নিয়ে আসে। এই পর্যায়ে আর্ট থিয়েটারই সর্বাধিক রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের আয়োজন করে। তারা রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সাহায্য, উপদেশ ও সহযোগিতা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও অপরেশচন্দ্রের পরিচালনার আন্তরিকতা এবং সে যুগের সব ক্ষমতাশালী অভিনেতা-অভিনেত্রীর দক্ষতায় রবীন্দ্রনাটকগুলি আর্ট থিয়েটারে সাফল্যলাভ করেছিল। এই একই সময়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর থিয়েটারে রবীন্দ্রনাটকের যা অভিনয় করেছেন, আর্ট থিয়েটার তার চেয়ে অনেক বেশি করেছে এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে অভিনয়ের চেষ্টা করেছে। সব নাটক সমান সাফল্য না পেলেও, তারা অভিনয় চালিয়ে গেছে। তখনকার পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের প্রশংসাই করা হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সমর্থন, প্রশংসা ও আশীর্বাদ এবং আনুকূল্য তারা লাভ করেছিল। বহু নাটকের অভিনয় রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে ও স্বজন-বান্ধবসহ দেখতে গিয়েছিলেন। একমাত্র শিশিরকুমার ছাড়া আর কেউ রবীন্দ্রনাথের এত আনুকূল্য পাননি।

রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের কালে অনেক সময়েই তারা প্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শিশিরকুমারকে ডেকে এনে হাজির করিয়েছে। শিশিরকুমারের উপস্থিতি ও অভিনয়ে আর্ট থিয়েটারের মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঝিমিয়ে পড়া বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়কে আর্ট থিয়েটার চাঙ্গা করে তুলেছিল। নাটক নির্বাচন, অসামান্য সব অভিনেতা-অভিনেত্রীর তরতাজা সমাবেশ, অপরেশচন্দ্রের নিষ্ঠা এবং প্রয়োগ-কৌশলের গুণে শিশির ভাদুড়ীর সমকালে আর্ট থিয়েটার জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল। আর্ট থিয়েটারের সাফল্যের ইতিহাস টানা দশ বছর অব্যাহত ছিল। অপরেশচন্দ্রের ২১টি, রবীন্দ্রনাথের ৯টি এবং অন্যান্য নাট্যকারের আরও ২২টি, মোট প্রায় ৫২টি নাটক আর্ট থিয়েটার মঞ্চস্থ করে। এইভাবে হতোদ্যম স্টার থিয়েটারের ইতিহাসকে দশ বছর সচল রেখে আর্ট থিয়েটার বিদায় নেয়।

আর্ট থিয়েটারের সমকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যপ্রযোজনাগুলি বেশি স্বীকৃতি এবং প্রচার পায় — বিশেষ করে বিদগ্ধ ও শিক্ষিত মহলে। আর্ট থিয়েটার অন্যদিকে সাধারণ দর্শকের সমাদর লাভ করেছিল অনেক বেশি। বহু সময়ে বিদগ্ধ দর্শকদেরও তারা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। স্টার থিয়েটারের বাড়িতে আর্ট থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের কাল বাংলা থিয়েটারের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

স্টার থিয়েটারে আর্ট থিয়েটার সম্পর্কে তাই বলা যেতে পারে :

এক. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা মৃতপ্রায় থিয়েটারকে নতুনভাবে চাঙ্গা করে তুলেছিল আর্ট থিয়েটার।

দুই. একাদিক্রমে দশ বছর ধরে পঞ্চাশাধিক নানা ভাব ও রসের নাটক অভিনয় করে দর্শকের মনকে আবার থিয়েটার-অভিমুখী করে তুলেছিল।

তিন. সমসময়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী বাংলা থিয়েটারে যে প্রাণবন্যা এনেছিলেন, সেখানে বিদগ্ধ রুচির মানুষের সাযুজ্য পেয়েছিলেন। আর্ট থিয়েটার একই সময়ে সাধারণ দর্শক ও বিদগ্ধ দর্শক — উভয়েরই মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

চার. তরতাজা সব নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে আর্ট থিয়েটার নাট্যাভিনয়ে তারুণ্যের প্রাণ এনেছিল। এরাই পরবর্তী যুগে স্বনামখ্যাত হয়েছিলেন।

পাঁচ. গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ধারাকে আর্ট থিয়েটার এগিয়ে নিয়েছিল। অন্যদিকে শিশিরকুমার নতুন যুগের

অভিনয়ধারা প্রবর্তন করেছিলেন।

ছয়. স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় আর্ট থিয়েটারে তাঁর 'চিরকুমার সভা' অভিনয়ের সময়ে নিজে এবং তাঁর অনুগামীদের দিয়ে অভিনয়ে সাহায্য করেছিলেন নানাভাবে।

সাত. আর্ট থিয়েটারই সাধারণ রঙ্গালয়ে বেশি রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় করেছিল।

আট. নাট্যকার, অভিনেতা এবং নাট্যপরিচালক হিসাবে বাংলা থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধি এখানেই সম্ভব হয়েছিল।

চতুর্থ পর্ব : (১৯৩৪-৩৭)

নবনাট্য মন্দির

১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি স্টার থিয়েটার মঞ্চে 'আর্ট থিয়েটার' বন্ধ হয়ে গেল। শিশিরকুমার ভাদুড়ী স্টার থিয়েটার গ্রহণ করে সেখানে 'নবনাট্য মন্দির' প্রতিষ্ঠা করলেন, ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে। নবপ্রতিষ্ঠিত 'নবনাট্য মন্দির' অনেক দিন বাদে শিশিরকুমারের নিজস্ব থিয়েটার হল। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত একটানা স্টার থিয়েটারে শিশিরকুমার তাঁর নাট্যদল নিয়ে অভিনয় চালিয়ে যান।

আর্ট থিয়েটারের অভিনয়ের রমরমা স্টার থিয়েটারের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরে শিশিরকুমারের 'নবনাট্য মন্দির' ও তাঁব বিভিন্নমুখী অভিনয়ের কৃতিত্ব ও সৌকর্যে স্টার থিয়েটার-বাড়ির মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯৩৪-এর ১৯ জানুয়ারি নবনাট্য মন্দিরের প্রথম অভিনয় শুরু হল স্টার থিয়েটারে। নাটক : যদুনাথ খাস্তগীরের লেখা 'অভিমানিনী'। নতুন উদ্যমে শিশিরকুমার আবার নিজের প্রযোজনায় নিজের নাট্যাভিনয় শুরু করলেন। পরপর অভিনয় করলেন : অভিমানিনী (যদুনাথ খাস্তগীর, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৪), ফুলের আয়না (নরেন্দ্র দেব, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪), বিরাজ বৌ (শরৎচন্দ্রের ওই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ, ২৮ জুলাই, ১৯৩৪), মায়া (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), 'সরমা' (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), 'প্রতাপাদিত্য' (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, নভেম্বর, ১৯৩৪), 'দশের দাবী' (শচীন সেনগুপ্ত, ২৪ নভেম্বর, ১৯৩৪), 'বিজয়া' (শরৎচন্দ্রের দত্তা উপন্যাসের নাট্যরূপ, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৪), 'রীতিমত নাটক' (জলধর চট্টোপাধ্যায়, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৫), শ্যামা (সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৫), 'অচলা' (শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসের নাট্যরূপ, ২২ অক্টোবর, ১৯৩৬), 'যোগাযোগ' (রবীন্দ্রনাথের ওই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৬)।

১৯৩৭ সালের জুন মাসে স্টার থিয়েটারের মালিকপক্ষের সঙ্গে মামলায় হেরে গিয়ে শিশিরকুমার ওখান থেকে উচ্ছেদ হন। নবনাট্য মন্দির বন্ধ হয়ে যায় (জুন, ১৯৩৭)।

এখানে তিনি মূলত রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেন। হাতের কাছে ভালো নাট্যকার বা নাটক না থাকাতে তাঁকে এইভাবে নাট্যাভিনয় কবে যেতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দর্শকদের দেখিয়ে, কাহিনী ও চরিত্রের নতুন সম্ভার তাঁদের কাছে হাজির করেন।

স্টার থিয়েটারে নবনাট্য মন্দিরের পক্ষে শিশিরকুমার নতুন ও পুরনো নাটক মিলিয়ে কুড়িটি নাটকের অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়ের গুণে, নাট্যপ্রযোজনার উন্নতমানে এবং পরিচালনার আধুনিক মনোভঙ্গিতে বিদগ্ধ ও রুচিশীল দর্শকেরা মুগ্ধ হলেন। বাংলা নাটকের একঘেয়ে প্যাঁচ-পয়জার এবং নাট্য উপস্থাপনার ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির ধারায় শিশিরকুমার নবযুগের সূচনা করলেন। স্টার থিয়েটারে এই প্রায় চার বছরের প্রয়াস স্টার থিয়েটারের ধারাবাহিক ইতিহাসকে যেমন সচল রেখেছিল, তেমনি নাট্যাভিনয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতেও নতুন প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি করেছিল।

পঞ্চম পর্ব : (১৯৩৮-১৯৫৩)

স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মামলায় হেরে শিশিরকুমার ভাদুড়ী স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিলেন (জুন, ১৯৩৭)।

এরপর মামলা-মোকদ্দমার নানা ঝামেলায় স্টার প্রায় বন্ধই থাকে। ১৯৩৭ সালের ৪ অক্টোবর যোগেশ চৌধুরী স্টার থিয়েটার ভাড়া নিলেন। তাঁর নাট্যদলের নাম 'নাটমহল'। এই নাটমহল সম্প্রদায়ের হয়ে যোগেশ চৌধুরী তাঁর নিজের লেখা নাটক 'গৌরাঙ্গসুন্দর' (৪ অক্টোবর) অভিনয় করলেন। তারপর বিমল পাল নামে একজন কিছুদিনের জন্য স্টার থিয়েটারের 'লেসী' হন। তিনি তৈরি করলেন 'স্টেজ অ্যান্ড স্ক্রিন সিন্ডিকেট'। স্টার মঞ্চে এই সম্প্রদায় অভিনয় করেছিল রমেশ গোস্বামীর 'বিদ্যাপতি' (১৭ নভেম্বর), অয়স্কান্ত বক্সীর 'অভিসারিকা' (২৫ ডিসেম্বর), ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'অপরাজিতা' (৩০ ডিসেম্বর)। ১৯৩৭ এইভাবে শেষ হল।

১৯৩৮-এর মার্চ মাস পর্যন্ত 'স্টেজ অ্যান্ড স্ক্রিন সিন্ডিকেট' বিমল পালের কর্তৃত্বে স্টার থিয়েটারে অভিনয় চালিয়ে যায়। এই বছরে নতুন নাটকের মধ্যে শচীন সেনগুপ্তের কালের দাবি (১২ মার্চ) উল্লেখযোগ্য।

এবারে বিমল পাল স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। তখন মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রকুমার মিত্রের পুত্র সলিলকুমার মিত্র স্টার থিয়েটারের নতুন 'লেসী' হয়ে এলেন। নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে যোগ দিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। ১৯৩৮ সালের ২৯ মার্চ থেকে স্টার থিয়েটারের আবার নতুন পর্ব শুরু হল।

এই সময় থেকে স্টার থিয়েটারে শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। মহেন্দ্র গুপ্তের নিয়ন্ত্রণাধীনে খুবই সুষ্ঠুভাবে এই নতুন অভিনয়সূচি পালিত হতে থাকে। প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন : মহেন্দ্র গুপ্ত স্বয়ং, বিপিন গুপ্ত, ভূপেন চক্রবর্তী, শেফালিকা, পূর্ণিমা প্রমুখ।

মিনার্ভা থিয়েটার থেকে সলিলকুমার মিত্র স্টার থিয়েটারে এসে প্রথমে মিনার্ভায় অভিনীত নাটকগুলিই চালাবার চেষ্টা করেন। তাঁর সম্পর্কিত ভ্রাতা কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রথম দিকে দায়িত্ব নিয়ে মিনার্ভার চলতি নাটক, যেমন 'ধর্ম্মদ্বন্দ্ব', 'গয়াতীর্থ', শিবার্জুন', স্টারে অভিনয় করান। কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় এবার স্টারে নামল নতুন নাটক 'চক্রধারী' (৩ জুন, ১৯৩৮)। নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত। পরে পরেই সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'বাংলার বোমা' (৩০ সেপ্টেম্বর) , মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাসুদেব'।

১৯৩৮ সালের ২০ অগাস্ট স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নেন অমিয়কুমার দে, ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকায়। জমির মালিক নতুন হলেও স্টার থিয়েটার পরিচালনার পুরো দায়িত্বে রইলেন সলিলকুমার মিত্র। তাঁরই সুষ্ঠু ও নিপুণ কর্তৃত্বাধীনে স্টার থিয়েটার ১৯৩৮-এর ২৯ মার্চ থেকে ১৯৭১-এর ৩০ মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর একটানা নাট্যাভিনয় চালিয়ে গেছে।

এবারে নাট্যপরিচালনার দায়িত্বে এলেন মহেন্দ্র গুপ্ত, অক্টোবর, ১৯৪০। তারপর থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মহেন্দ্র গুপ্ত একটানা স্টার থিয়েটারের নাট্যপরিচালনা করেছেন, প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং প্রয়োজনে অনেক নাটক রচনা করেছেন। তাই নাট্যাভিনয়ের দিক থেকে এই পর্বকে (১৯৩৮-৫৩) স্টার থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্তের পর্ব বলা যেতে পারে।

মহেন্দ্র গুপ্তের জাতীয় ভাবাত্মক নাটকগুলি এখানে জনসমাদর লাভ করে। 'নন্দকুমার', 'টিপু সুলতান', 'রণজিৎ সিংহ', 'শতবর্ষ আগে' প্রভৃতি নাটক খুবই খ্যাতিলাভ করে। 'নন্দকুমার' তো একটানা দু'শ রজনী অভিনয় হয়েছিল। এখান থেকেই মহেন্দ্র গুপ্ত নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

মনে রাখতে হবে, এই পর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) শুরু হয়। যুদ্ধের ভয় ও জাপানি বোমার আতঙ্কে তখন কলকাতাবাসী আতঙ্কিত। শহর কলকাতায় ব্ল্যাক- আউট। সারা দেশে খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। তার সঙ্গে চোরাচালানি, কালোবাজারি, মজুতদারি। দেশজুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম। সে এক বিপর্যয়কর অবস্থা। বিশ্বযুদ্ধ মিটলেই ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী নিষ্ঠুর দাঙ্গা, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা এবং বঙ্গবিভাগের ক্ষত ও জ্বালা। কাতারে কাতারে উদ্বাস্তুর আগমন। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এই ভয়ঙ্কর ও বিভীষিকাপূর্ণ সময়ে কলকাতার বুকে রঙ্গালয়গুলিও মহাসমারোহে নাট্যাভিনয় চালাতে পারেনি। অন্য থিয়েটারগুলির মতো স্টার থিয়েটারও মাঝে মাঝেই নির্জীব হয়ে পড়ছিল। তার মধ্যেও মহেন্দ্র গুপ্তের জাতীয় ভাবাবেগের নাটক রচনা ও অভিনয় এবং

সাফল্যলাভ অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। ঐতিহাসিক নাটকের উপস্থাপনা ও তার অভিনয়ের কৃতিত্বে তিনি এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন।

১৯৩৯ সালে অভিনীত হল ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গা শ্রীহরি' (১৮ মার্চ), মহেন্দ্র গুপ্তের 'সোনার বাংলা' (২৭ মে), ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'জাহ্নবী' (২ সেপ্টেম্বর), সুধীন্দ্রনাথ রাহার জননী জন্মভূমি (২৪ নভেম্বর)।

১৯৪০-এ মহেন্দ্র গুপ্তের তিনটি নাটক — 'সতী তুলসী' (১৬ মার্চ), 'উত্তরা' (১৮ মে), 'পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ' অভিনীত হল। তারপরে সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'রণদাপ্রসাদ' (২৮ সেপ্টেম্বর)। এই পর্যন্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ স্টার থিয়েটারের নাটকগুলি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। যদিও মহেন্দ্র গুপ্তই মূল দায়িত্ব পালন করতেন। অক্টোবর, ১৯৪০ থেকে মহেন্দ্র গুপ্ত পুরোপুরি নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নামালেন 'গঙ্গাবতরণ' (২৬ অক্টোবর) এবং 'উষাহরণ', দুটিই তাঁর লিখিত এবং পরিচালিত।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে মহেন্দ্র গুপ্তের 'কমলেকামিনী' (৪ এপ্রিল), ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'বৃত্রসংহার' (১০ জুলাই), অমল চট্টোপাধ্যায়ের 'মদনমোহন' (১৮ সেপ্টেম্বর) মঞ্চস্থ হল।

১৯৪২-এ অভিনীত হল মহেন্দ্র গুপ্তের 'রানী ভবানী' (২৪ জানুয়ারি) ও 'অলকানন্দা' (১৮ এপ্রিল)। অশ্বিনীকুমার ঘোষের 'পুরীর মন্দির' (১৮ জুলাই) এবং মহেন্দ্র গুপ্তের 'মহালক্ষ্মী' (৯ অক্টোবর)।

১৯৪৩-এ মহেন্দ্র গুপ্তের 'রানী দুর্গাবতী' (৯ জানুয়ারি), মহারাজা নন্দকুমার (৪ জুন) সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হল। এগুলি ছাড়া বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'কৃষ্ণার্জুন' (১১ ফেব্রুয়ারি), রবি পাত্রের 'সুকন্যা' (২২ এপ্রিল), বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরানী'র নাট্যরূপ (মহেন্দ্র গুপ্ত, ২৯ সেপ্টেম্বর), 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ (মহেন্দ্র গুপ্ত, ২২ ডিসেম্বর) অভিনীত হল।

১৯৪৪-এর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল 'টিপু সুলতান' (মহেন্দ্র গুপ্ত, ১৯ মে)। পুরনো নাটক 'কেদার রায়' কিংবা 'অযোধ্যার বেগম' (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) অভিনীত হয়েছিল।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট' (৫ মে), হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পলাশী' (১১ নভেম্বর)। তারপরে অভিনীত হল যুগান্তকারী নাটক 'শতবর্ষ আগে' (২১ ডিসেম্বর)। এই নাটকের অভিনয় সে যুগে খুবই সাড়া ফেলেছিল। ব্রিটিশ সরকার নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

১৯৪৬ সালে আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'মনীশের বৌ' (৩০ এপ্রিল), মহেন্দ্র গুপ্তের 'হায়দার আলি' (১৫ অগাস্ট) ও 'রায়গড়' (১৪ সেপ্টেম্বর) অভিনয় হয়।

১৯৪৭-এ মহেন্দ্র গুপ্তের 'স্বর্গ হতে বড়' (১৫ ফেব্রুয়ারি) অভিনয় করা হল। এই নাটক সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য খবর হল, এই নাটকেই সর্বপ্রথম মহেন্দ্র গুপ্ত অভিনেতা হিসাবে মঞ্চে নামেন। ভূমিকা ছিল 'অমরেশ' চরিত্র। এরপর অভিনীত হয় 'শনিবার বাইশে' (দিলীপ দাশগুপ্ত, ৭ মে), 'পার্থসারথী' (উৎপল সেন), 'শ্রীদুর্গা' (মহেন্দ্র গুপ্ত, ১২ অক্টোবর)। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' (নাট্যরূপ : মহেন্দ্র গুপ্ত, ২০ ডিসেম্বর)।

১৯৪৮ সালে তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'কালিন্দী'র নাট্যরূপ (মহেন্দ্র গুপ্ত) অভিনীত হয় (২৫ জুন)। এর আগে তারাশঙ্করের নিজেরই দেওয়া 'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপ নাট্যনিকেতনে (১২ জুলাই, ১৯৪১) অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু সে নাটক বেশিদিন চলেনি। মহেন্দ্র গুপ্তের নাট্যরূপটি স্টার থিয়েটারে বহু রাত্রি অভিনীত হয়ে খ্যাতিলাভ করেছিল। এছাড়া অন্য অভিনয়ের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'গোলকোণ্ডা' (২৩ ডিসেম্বর) পুরনো নাটক হিসাবে অভিনীত হয়েছিল।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'দিল্লী চলো' (২৪ ফেব্রুয়ারি), মহেন্দ্র গুপ্তের 'বিজয়নগর' (২৩ জুলাই) ও 'সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত' (২৩ ডিসেম্বর) অভিনীত হয়েছিল। এই বছরে রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাসের নাট্যরূপ (মহেন্দ্র গুপ্ত) ৭ মে মঞ্চস্থ হয়। রবীন্দ্রনাথের এই একটি নাটক/নাট্যরূপ এই পর্বে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল।

১৯৫০-এ মহেন্দ্র গুপ্তেরই দুটি নাটক 'উর্বশী' (৯ ফেব্রুয়ারি) এবং পৃথ্বীরাজ (২০ ডিসেম্বর) অভিনীত হয়।

১৯৫১ সালে 'মেঘমালা' (সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, ২ মে), 'শকুন্তলা' (মহেন্দ্র গুপ্ত, ১২ জুলাই) অভিনীত হওয়ার পর তারাশঙ্করের নাটক 'বালাজী রাও' (৬ অক্টোবর) মহেন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনা ও পরিচালনায় অভিনীত হল।

১৯৫২ সালের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল রমেশচন্দ্র দত্তের রাজপুত জীবনসন্ধ্যা উপন্যাস অবলম্বনে মহেন্দ্র গুপ্তের নাট্যরূপ 'সূর্যমহল'। তা ১৯ মে অভিনীত হল।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের অভিনয়ের তালিকায় রয়েছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কলঙ্কবতী' (৬ মার্চ), মহেন্দ্র গুপ্তের 'রাজনর্তকী' (২৩ মে)। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে 'পদ্মিনী' (নাট্যরূপ মহেন্দ্র গুপ্ত) ২ এপ্রিল অভিনয় করা হল।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দেই মহেন্দ্র গুপ্তের যুগ শেষ হল। এই বছরের শেষের দিকে দেখা গেল, স্টার থিয়েটারে পরপর বেশ কয়েকটি নাটকে তেমন দর্শক হচ্ছে না, কর্তৃপক্ষের লোকসান যাচ্ছে। মনে করা হল, মহেন্দ্র গুপ্ত আর আগের মতো মনঃসংযোগ বা নিষ্ঠাসহকারে থিয়েটারের কার্যাবলী পালন করতে পারছেন না। তাই থিয়েটারের মালিক সলিলকুমার মিত্র মহেন্দ্র গুপ্তকে ছেড়ে দিয়ে নিজের হাতেই সব দায়িত্ব তুলে নিলেন। মহেন্দ্র গুপ্ত বিদায় নিলেন।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করের উপন্যাসের নাট্যরূপ/নাটক ছাড়া বাদবাকি প্রায় সব নাটকই মহেন্দ্র গুপ্তের। বাদবাকি কিছু অন্য নাট্যকারের। এই পর্বের বড় ঘটনা ভারতের স্বাধীনতালাভ। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অভিশাপ পশ্চিমবঙ্গকে ভোগ করতে হয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬) এবং পরে পরেই দেশভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা — পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যয়কে বাড়িয়ে তুলেছে। দলে দলে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুর ভিড়ে কলকাতা জনাকীর্ণ — পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বিপর্যস্ত।

এইসব প্রাণান্তকর দেশীয় পরিস্থিতিতে আমোদ-প্রমোদের রঙ্গালয়গুলি হয়ে পড়ল প্রাণহীন। সাধারণ রঙ্গালয়গুলি কোনওরকমে অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে — মালিকেরা দর্শকাভাবে দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। তবুও কোনওক্রমে রঙ্গালয়গুলি অভিনয়ধারা চালিয়ে যাচ্ছিল। নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত জানাচ্ছেন .

> 'স্বাধীনতালাভের পর যে দুর্যোগের ঝড় সাধারণ রঙ্গালয়গুলির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে — আমি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সন্ধ্যায় প্রতিটি রঙ্গালয়ে আলো জ্বলত বটে, কিন্তু দর্শক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং রঙ্গালয়গুলির অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও দৃশ্যপটগুলির ছিল জরাজীর্ণ অবস্থা। সুলিখিত নাটক মঞ্চস্থ করেও এই সময় দর্শকদের মন জয় করা যায়নি।'

এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করছেন বুদ্ধদেব বসু :

> 'যত চেষ্টাই করা যাক থিয়েটারকে আর বাঁচানো যাবে না, সে মরতে বসেছে। কোনও থিয়েটারের মধ্যে ঢুকলে তার ধূলিমলিন জীর্ণ আসবাব, পানের পিকমাখা মেঝে ও দেওয়াল, রঙ্গমঞ্চে লক্ষপতির ড্রইংরুমে দু'খানা ভাঙা চেয়ার — প্রতিটি ছোট ছোট জিনিস হা হা করে বলে — নেই, নেই, কিছু আর নেই। রঙ্গালয়ের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, আমাদের থিয়েটারের প্রাণবন্ত কিছু আর নেই, যাঁরা থিয়েটার চালান তাঁরা নিজেরাই নিরুৎসাহ।'

তাছাড়া এই সময়ে (১৯৩১ থেকে) নবনির্মিত চলচ্চিত্রে কথা বলা শুরু হয়েছে। এতদিন থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখানো হত। তাতে থাকত শুধু চলমান চিত্র, কথা ছিল না। এই নতুন কথা বলা চলচ্চিত্র এদেশেও তৈরি হয়ে সিনেমা হলে দেখানো শুরু হয়েছে। এই চলচ্চিত্র থিয়েটারকে ক্রমশই কোণঠাসা করে দিয়েছিল।

অন্যদিকে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রায়শই আসছিল ফিল্ম থেকে, থিয়েটার থেকে চলে যাচ্ছিল ফিল্মে। কেউ দু-চার দিন স্টেজে দেখা দিয়েই তারকা হওয়ার মতলবে চলচ্চিত্র জগতে ছুটেছেন। বুদ্ধদেব বসু এঁদের 'তারকা' না বলে 'তাড়কা' বলেছেন। কারণ, 'ফিল্ম আজ রাক্ষসীর মতো সমস্ত বাংলাদেশকে গিলে খাচ্ছে।'

টাকাওয়ালারাও থিয়েটারে টাকা না ঢেলে নতুন এই প্রমোদ মাধ্যম চলচ্চিত্রে অর্থ লগ্নি করতে লেগেছে। সব দিক

দিয়েই তখন বাংলা থিয়েটারের নাভিশ্বাস। মহেন্দ্র গুপ্ত সাধারণ রঙ্গালয়ের এই অভিশপ্ত বিপর্যস্ত অবস্থানেই স্টার থিয়েটারে নিয়মিত নাটক রচনা, নাট্য পরিচালনা এবং নিজে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে থিয়েটারকে প্রাণবন্ত করে রেখেছিলেন।

এই পরিস্থিতি স্মরণে রাখলে এই সময়কার স্টার থিয়েটার এবং মহেন্দ্র গুপ্তের কৃতিত্বকে কোনও অংশেই খাটো করে দেখা যায় না। তবে একথা ঠিক যে, মন্বন্তর ও যুদ্ধের পটভূমিকায় বাঙালির জনমানসের কোনও প্রতিক্রিয়ার নাট্যরূপ মহেন্দ্র গুপ্ত দেখাতে পারেননি। কিংবা স্বাধীনতা এবং দেশভাগের প্রতিক্রিয়ার কোনও ছবি তিনি আঁকতে পারেননি। তাছাড়া শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর আগেই বাংলা রঙ্গালয়ে যে নতুন নাট্যাভিনয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছিলেন, মহেন্দ্র গুপ্ত তার যথাযোগ্য উত্তরসূরি হয়ে উঠতে পারেননি। নাট্য ভাবনায় ও মঞ্চায়নে তিনি শিশিরকুমারের পূর্ববর্তী ধারারই অনুবর্তন করে গেছেন।

আর একটি কথা। ১৯৪৩ থেকে মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে এ দেশে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাদের নাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা এবং গণমানসে উদ্দীপনা সৃষ্টির যে নবতম প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তার কোনও প্রভাবই স্টার থিয়েটারে সমকালে পড়েনি। মন্বন্তরের বুকে বসে যখন গণনাট্য সংঘ বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' অভিনয় করে বাংলা নাটক ও তার প্রয়োগ দিয়ে সমকালের সমাজদ্বন্দ্বের প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে, স্টার থিয়েটার তখনও সেই ঐতিহাসিক রোমান্সের উদ্দীপনায় দেশপ্রেমের ভাবাবেগের তারল্য উদ্‌গীরণ করে চলেছে। মহেন্দ্র গুপ্তের ও তাঁর সময়কার স্টার থিয়েটারের এই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতাও অবশ্যস্বীকার্য। একথা ঠিক, সেই সময়ের কোনও সাধারণ রঙ্গালয়ই সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেনি।

ষষ্ঠ পর্ব : (১৯৫৩-১৯৭১)

১৯৫৩ সালে মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার ছেড়ে দিলেন। পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে স্বত্বাধিকারী সলিলকুমার মিত্র থিয়েটার বাড়ির সংস্কারের কাজে হাত দিলেন। প্রায় ৬০ হাজার টাকা খরচ করে রঙ্গালয় সংস্কার ও সাজানো হল। মঞ্চেরও আমূল সংস্কার করা হল। সাজসজ্জা অলঙ্করণ নতুনভাবে করা হল। সামনের মন্দিরের চূড়ার মতো অংশটি অক্ষুণ্ণ রেখে নাট্যশালার বাকি অংশ পুনর্নির্মাণ করা হল। সমগ্র রঙ্গালয় হল শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। সেই প্রথম কলকাতার কোনও পেশাদারি রঙ্গালয় 'এয়ারকন্ডিশনড্' করা হয় [১৯৫৬-তে 'পরিণীতা' নাটক অভিনয়ের সময়ে]। তখন থেকে স্টার থিয়েটার বাংলার তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যশালারূপে পরিগণিত হল।

সলিলকুমার মিত্র এতদিনকার পুরনো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছেড়ে দিয়ে চলচ্চিত্র ও মঞ্চ জগতের সেরা ও জনপ্রিয় শিল্পীদের স্টার থিয়েটারে নিয়ে এলেন। চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয়তম নায়ক উত্তমকুমারকে আনা হল। আরও আনলেন জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, শ্যাম লাহা, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, রবি রায়, সরযূবালা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, রমা দেবী, শেফালি দেবী প্রমুখ শিল্পীকে।

নাট্যপরিচালক নিযুক্ত হলেন যুগ্মভাবে শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র। নাট্যকার হয়ে এলেন পরবর্তী যুগের খ্যাতিমান নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। শিল্পনির্দেশ ও মঞ্চ ব্যবস্থায় রইলেন সতু সেন। স্টার থিয়েটারে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ (Revolving Stage) তৈরি করা হল। সেট-সেটিংস-সিনসিনাবরি সব আনকোরা নতুনভাবে তৈরি হল। দর্শকাসনগুলিও আরামপ্রদ করে গড়ে তোলা হল। শিল্পী ও কলাকুশলীদের গ্রিনরুমগুলিও পছন্দসইভাবে তৈরি হল।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর স্টার থিয়েটারের অভিনয় শুরু হল। 'শ্যামলী' নাটক দিয়ে স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হল। নিরুপমা দেবীর ওই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। নির্দেশনায় রইলেন শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র। সহকারী পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন দেবনারায়ণ। শিল্পনির্দেশক ও আলোকসম্পাতে সতু সেন।

'শ্যামলী' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা পেশাদারি রঙ্গালয়ে যুগান্তর ঘটে গেল। একাদিক্রমে ২৬ মাস ধরে

৪৮৪ রাত্রি একটানা অভিনীত হয়ে সর্বকালীন অভিনয়ের এবং জনপ্রিয়তার রেকর্ড সৃষ্টি করল। প্রথম পর্যায়ে শেষ অভিনয় হল ১৯৫৫ সালের ১৩ নভেম্বর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বাংলা ব্যবসায়িক ও পেশাদারি মঞ্চে যে একঘেয়েমি এবং রক্তাল্পতা দেখা দিয়েছিল, 'শ্যামলী' সেখানে নতুন প্রাণাবেগ এনেছিল। পেশাদারি থিয়েটার নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। তদানীন্তন বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তম সুদর্শন অভিনেতা উত্তমকুমার এবং খ্যাতময়ী অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করানো হল। উত্তমকুমারের দর্শক আকর্ষণের ক্ষমতা এবং শ্যামলী বোবা-চরিত্রে সাবিত্রীর অভিনয়কুশলতা বাংলা পেশাদার মঞ্চে নতুন প্রাণসঞ্চার করল। একটি বোবা মেয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনার মধ্য দিয়ে 'সেন্টিমেন্ট'-এর উত্তুঙ্গ স্তরে নাট্যবিষয় ও ভাবনাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভাবাবেগ-আপ্লুত দর্শক 'শ্যামলী'কে সাদরে গ্রহণ করেছিল সেদিন। উত্তম-সাবিত্রীর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন সরযূবালা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার প্রমুখ সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। তাছাড়া ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, শ্যামল লাহা, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী, শেফালি দত্ত প্রমুখ শিল্পীও নানা চরিত্রাঙ্কনে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

'শ্যামলী' এত জনপ্রিয় হল যে, স্টার থিয়েটার তাদের সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন নাটক অভিনয়ের প্রথা তুলে দিলেন। এর আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে সপ্তাহে বুধ ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এবং শনি ও রবিবারে ম্যাটিনি ও সন্ধ্যায় অভিনীত হত। শনি ও রবিবারে মূল নাটক অভিনয় করা হত এবং মধ্য-সাপ্তাহিকে অন্য নাটক অভিনয়ের প্রথা চলে আসছিল। 'শ্যামলী' নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে এই নিয়ম পাল্টে স্টার থিয়েটারে বৃহস্পতি, শনি ও রবিবারে একই নাটকের অভিনয় চলতে থাকে। পরবর্তীকালে সব সাধারণ রঙ্গালয়ই এই প্রথা মেনে তাদের অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে।

স্টারের তখন মূল নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। তিনি 'শ্যামলী'র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পরপর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দিলেন এবং সেগুলির অভিনয়ে স্টার থিয়েটার দিনে দিনে খ্যাতির শিখরে উঠে গেল।

অভিনীত হল 'পরিণীতা' (১৫.১২.৫৫)। শরৎচন্দ্রের ওই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ (দেবনারায়ণ গুপ্ত) 'পরিণীতা'র পরিচালনায় রইলেন শিশির মল্লিক। এই নাটকের অভিনয়ে আর উত্তমকুমার ছিলেন না, তিনি 'শ্যামলী' অভিনয় চলাকালীনই স্টার থিয়েটাব ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেখানে এলেন চলচ্চিত্রের আর এক খ্যাতিমান অভিনেতা অসিতবরণ। সঙ্গে গায়ক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'পরিণীতা' চলল টানা ১৩৫ রাত্রি (১৫.৭.৫৬)। তারপরে প্রায়ে সাড়ে ছ'মাস স্টার থিয়েটার বন্ধ রেখে সলিলকুমার মিত্র আবার নতুন করে থিয়েটার-বাড়ির সংস্কারে হাত দিলেন। ভাস্কর সুধাংশু চৌধুরীর পরিকল্পনায় ভেতরের সব সাজানো গোছানো হল। এবারে চালু করা হল শীতাতপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। স্টার থিয়েটার বাঙালির গৌরবের বস্তুতে পরিণত হল।

১৯৫৭ সালের ৭ জানুয়ারি আবার স্টার চালু হল নব সাজে সেজে। নামানো হল 'শ্রীকান্ত'। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব অবলম্বনে নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ এবং পরিচালনায় শিশির মল্লিক। নাটকের জন্য গান লিখলেন শৈলেন রায়, তাতে সুর দিলেন দুর্গা সেন। সমগ্র মঞ্চপরিকল্পনায় মণীন্দ্র দাস।

নিয়মিত শিল্পী ছাড়াও নতুন আনা হয়েছে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক নির্মলকুমারকে, সঙ্গে শিপ্রা মিত্র এবং সুখেন দাস। 'শ্রীকান্ত'ও চলল একটানা তিনশ রাত্রির বেশি, ১৯৫৮ সালের ২ মে পর্যন্ত। অভিনয়ে ছিলেন : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় — অভয়া। জহর গঙ্গোপাধ্যায় — অভয়ার স্বামী। নির্মলকুমার — শ্রীকান্ত। শিপ্রা মিত্র — রাজলক্ষ্মী। সুখেন দাস — ইন্দ্রনাথ। অনুপকুমার — নতুনদা। খ্যাতিমান শিল্পীদের অভিনয়ের গুণে, শরৎচন্দ্রের কাহিনীর আকর্ষণে, দেবনারায়ণের নাট্যরূপের কৃতিত্বে এবং দৃশ্যসজ্জা, দৃশ্যপরিবর্তন ও আলোকসম্পাতের নৈপুণ্যে 'শ্রীকান্ত' জনপ্রিয় হয়ে গেল।

'শ্রীকান্ত'-র সাফল্যে নামানো হল ওই শ্রীকান্ত উপন্যাস থেকেই 'রাজলক্ষ্মী' (২.৬.৫৮)। শ্রীকান্ত উপন্যাসের তৃতীয়

ও চতুর্থ পর্ব অবলম্বনে এই অংশেরও নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। পরিচালনা : শিশির মল্লিক। মঞ্চ ও আলোর দায়িত্ব এবং গীত রচনা করলেন মণীন্দ্র দাস ও শৈলেন রায়। সুরকার হিসাবে যোগ দিলেন তখনকার জনপ্রিয় গায়ক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। স্টারের নিয়মিত শিল্পীরাই অভিনয় করলেন। এই নাটকটিও চলল টাকা ১৩৪ রাত্রি, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ পর্যন্ত।

এবারে নতুন নাটকের নানা প্রস্তুতির জন্য দেরি না করে আগের অভিনীত 'শ্যামলী' দ্বিতীয় পর্যায়ে নামানো হল (২৫.১২.৫৮) এবং ৩৮ রাত্রি অভিনয় শেষে (১৫.২.৫৯) বন্ধ করে দিয়ে নতুন নাটক অভিনয় শুরু হল, 'ডাকবাংলো' মনোজ বসুর 'বৃষ্টি বৃষ্টি' উপন্যাসের নাট্যরূপ (দেবনারায়ণ) এই 'ডাকবাংলো' নাটক। স্টার থিয়েটারে অভিনীত হল ১৯৫৯ সালেব ১২ মার্চ। শুধু নাট্যকার নন, এই নাটক থেকে দেবনারায়ণ গুপ্ত স্টার থিয়েটারের নাট্যপরিচালকও হলেন। 'ডাকবাংলো' দিয়ে তাঁর শুরু। মঞ্চসজ্জা ও আলো : অনিল বসু। নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসাবে যোগ দিলেন মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত বর্ষীয়ান নট ছবি বিশ্বাস এবং চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান নায়িকা সন্ধ্যা রায়। আগের শিল্পীরাও রইলেন। অনেকদিন বাদে আবার পেশাদারি মঞ্চে এসে ছবি বিশ্বাস 'বীরেশ্বর'-এর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করলেন। টানা দু'শ রাত্রির বেশি চলল 'ডাকবাংলো'। 'দেশ' পত্রিকার সমালোচনা [২৮ মার্চ, ১৯৫৯ সংখ্যা] :

> 'দীর্ঘকাল বাদে ছবি বিশ্বাসেব অনবদ্য মঞ্চাভিনয়ের স্বাক্ষর বহন করছে এই নাটক। 'বীরেশ্বর'-এর মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আশা-অভীপ্সা এবং সর্বোপরি তাঁর আত্মভোলা সরলপ্রকৃতি তিনি নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সঙ্গে রূপায়িত করছেন। তাঁর অভিনয় মঞ্চে কয়েকটি গভীর নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করে সহজেই। ...
>
> দৃশ্যসজ্জার দিক দিয়ে নাটকটি অকৃপণ প্রশংসার দাবি রাখে। মঞ্চে বহিপ্রকৃতির রূপ দেখাবার কৌশল এক কথায় চমৎকাব। বীরেশ্বর-এর স্বপ্নে রামনিধি ও কালীশ্বরের আগমনের দৃশ্যটি খুবই সুন্দর। নাটকটি মঞ্চসজ্জা, আঙ্গিক-সুষমা ও আলোকসম্পাত বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।'

১৯৬০-এর ১৯ মার্চ নতুন নাটকের অভিনয় শুরু হল 'পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'। এটি দেবনারায়ণ গুপ্তের মৌলিক নাটক। বাংলা মঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ সব সময়েই আদৃত হন। তাঁর জীবনীকে নিয়ে এই নাটক কিন্তু বেশিদিন দর্শক আকর্ষণ করতে পারল না। দেবনারায়ণ গুপ্তের কুশলী পরিচালনায় এবং শিল্পীদের অভিনয়ের গুণেও (গিরিশ চরিত্রে ছবি বিশ্বাস) মোটে ৭৬ রাত্রি অভিনয়ের পর নাটকটি বন্ধ করে দিতে হল। নতুন নাটকের তখনও পুরো প্রস্তুতি হয়নি। তাই এই অবসবে দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার নামানো হল 'ডাকবাংলো' (২১.৭.৬০)। ১১ রাত্রি চলে বন্ধ হয়ে গেল (৩১.৭.৬০) । নামানো হল নতুন নাটক 'শ্রেয়সী'।

১৯৬০-এর ১১ অগাস্ট 'শ্রেয়সী' নাটকের প্রথম অভিনয় করা হল। সুবোধ ঘোষের ওই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে পরিচালনা করলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। নায়কের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য স্টার থিয়েটার নিয়ে এল চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতিমান অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীকে। অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তীও প্রথম পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করতে এলেন। সঙ্গে রইলেন কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস প্রমুখ দিকপাল অভিনেতৃবৃন্দ। আগের শিল্পীবা তো ছিলেনই। 'শ্রেয়সী' জনসমাদার লাভ কবল। চলল টানা ১৯৬২-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, ৩৭৩ রাত্রি।

এরপরেই মঞ্চস্থ হল 'শেষাগ্নি' (৮ মার্চ, ১৯৬২)। উপন্যাস শক্তিপদ রাজগুরুর। নাট্যরূপ ও পরিচালনা দেবনারায়ণ গুপ্ত। এই নাটকটি চলেছিল ২২০ রাত্রি, দু'দফায়। শেষ অভিনয় হয় ১৯৬৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি।

মাঝে চীন-ভারত সংঘর্ষ শুরু হলে মন্মথ রায়ের এই উপলক্ষে লেখা দেশাত্মবোধক নাটক 'স্বর্ণকীট', সঙ্গে তাঁরই লেখা 'কারাগার' স্টার থিয়েটার কয়েক রাত্রি অভিনয় করেছিল।

'তাপসী' নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩। নীহাররঞ্জন গুপ্তের ওই নামের উপন্যাস থেকে নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। পরিচালনাও করলেন তিনি। সংগীত পরিচালনার জন্য আনা হল অনাদি দস্তিদারকে। চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতিমান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এই নাটকে নায়ক দীপকের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। মঞ্চে তাঁর নতুন মাত্রার অভিনয় দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করল। এই নাটকে তিনখানি রবীন্দ্রসংগীত

ব্যবহার করা হয় এবং আবহে রবীন্দ্রসংগীতের সুর ব্যবহার সংগীত-পরিচালক অনাদি দস্তিদারের কৃতিত্বের পরিচায়ক। 'তাপসী' একটানা ১৯৬৫ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪৬৭ রাত্রি চলেছিল। সৌমিত্র ছাড়া এই নাটকে প্রথম অভিনয় করলেন চিত্রজগতের অভিনেত্রী মঞ্জু দে, তিনিও প্রথম মঞ্চাবতরণ করলেন। অন্যরা হলেন : বাসবী নন্দী, অপর্ণা দেবী, গীতা দে, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, নবকুমার, সুখেন দাস, প্রেমাংশু বসু প্রমুখ।

বিমল মিত্রের 'একক দশক শতক' উপন্যাস সেই সময় বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। স্টার থিয়েটার এবার এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ (দেবনারায়ণ গুপ্ত) ওই একই নামে অভিনয় করল। প্রথম অভিনয় : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫। পরিচালনা — দেবনারায়ণ। সংগীত — অনাদি দস্তিদার। মঞ্চ ও আলো — অনিল বসু। গীত রচনা — পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্য-পরিচালনা — নীলিমা দাস। নাটকটি চলেছিল ২৬৪ রাত্রি। শেষ অভিনয় ১৭ এপ্রিল, ১৯৬৬।

'দাবী' অভিনীত হল ২৮ এপ্রিল, ১৯৬৬। এটি দেবনারায়ণ গুপ্তের মৌলিক নাটক। পরিচালনাও তাঁরই। স্বল্পবিত্ত বাঙালি ঘরের স্বাভাবিক চিত্র তিনি এই নাটকে পরিচ্ছন্ন ও পরিমিতি দিয়ে রচনা করেছেন। একেবারে বাঙালির ঘরের এই নাটক দর্শকরা সাদরে গ্রহণ করল।সংগীতে কালীপদ সেন এলেন, গীত রচনায় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্চ ও আলো অনিল বসু। চলচ্চিত্রের অভিনেতা সতীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রথম পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ে এলেন, সঙ্গে অভিনেত্রী সুব্রতা সেন (পরে চট্টোপাধ্যায়)। স্টারের অন্যান্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা তো রইলেনই।'দাবী' নাটক জনপ্রিয়তায় এত দিনকার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে একটানা ৫৮০ রাত্রি চলল। বন্ধ হল ১৩ অক্টোবর ১৯৬৮।

এরপরে 'শর্মিলা'। এটিও দেবনারায়ণের রচনা। পরিচালনাও তাঁরই। অভিনীত হল ১৯৬৮ সালের ২৪ অক্টোবর। এই নাটকে অভিনেতা হিসাবে এলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা তো ছিলেনই। চলল ৫৫১ রাত্রি। শেষ অভিনয় ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।

দেবনারায়ণ গুপ্তের রচনা ও পরিচালনায় এবার মঞ্চস্থ হল 'সীমা'। নাটকটি চলেছিল ২০৩ রাত্রি। অভিনয়ে ছিলেন স্টারের নিয়মিত শিল্পীবৃন্দ। বন্ধ হয় ২ জানুয়ারি, ১৯৭২। 'সীমা' নাটকটি চলার মধ্যেই স্টার থিয়েটারের স্বত্ববদল হয়ে গেল। সলিলকুমলার মিত্র ১৯৩৮ সাল থেকে একনাগাড়ে দক্ষতার সঙ্গে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হিসাবে থিয়েটারটি চালিয়ে আসছিলেন। ১৯৭১-এর ৩১ মার্চ তিনি রয়্যালটির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের সম্পর্ক ছেড়ে দিলেন। ১৯৩৮-এর ২৯ মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত সলিলকুমার স্টার থিয়েটারে ছিলেন।

স্টার থিয়েটারের জমির মালিক কলকাতার প্রাক্তন মেয়র গোবিন্দচন্দ্র দে-র বৌদি রেণুবালা দে (অমিয়কুমার দে-র স্ত্রী)। তাঁর কাছ থেকে রঞ্জিত পিকচার্সের মালিক রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া স্টার থিয়েটারের সম্পত্তি ও নামটুকু কিনে নিলেন, ৩১ মার্চ, ১৯৭১। সলিলকুমার মিত্রের বিদায়ের পর স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হলেন রঞ্জিতমল [১ এপ্রিল, ১৯৭১]। রঞ্জিত পিকচার্সের তরফে রঞ্জিতমল স্টারের পূর্ণ দেখাশোনার দায়িত্ব নিলেন। দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যকার ও পরিচালক হিসাবে রইলেন। চালু নাটক 'সীমা' যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত 'সীমা' নাটকটি চলার পরে (২০৩ রাত্রি) বন্ধ হয়ে যায়।

'সীমা' নাটক চলার মাঝেই ঘটে যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এই নিয়ে সারা দেশ তখন উত্তাল। এই বিষয় নিয়ে দেবনাবায়ণ লিখলেন 'জয় বাংলা'। প্রথম অভিনীত হল ৮ মে, ১৯৭১, 'সীমা'র অভিনয় বন্ধ রেখে। 'জয় বাংলা' বেশ কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর আবার 'সীমা' চালু হয়।

রঞ্জিতমলের পুরোপুরি মালিকানায় এবার মঞ্চস্থ হল 'মঞ্জরী'। আশাপূর্ণা দেবীর ওই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ। পরিচালনাও তাঁরই। নিয়মিত শিল্পীরা ছিলেন। নতুন এলেন অভিনেতা সবিতাব্রত দত্ত। চলল ২৬৭ রাত্রি (১৮.২.৭৩ পর্যন্ত)।

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয়ের শুভ সূচনা হয়েছিল। তারই শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্টার থিয়েটার মঞ্চস্থ করল 'বিদ্রোহী নায়ক' (১৮.৩.১৯৭৩)। একশ বছর আগেকার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের নাট্যকার ও পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাসের জীবনী নিয়ে এই নাটক লিখলেন

দেবনারায়ণ। উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটক 'সুরেন্দ্র- বিনোদিনী' ও 'শরৎ-সরোজিনী' সে যুগে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিরোধিতার নাটক ছিল। পরে তাঁর 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নিয়ে অনেক গোলমাল হয়। শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ দাসের জেল হয়। পরে ছাড়া পান। এরপরেই ব্রিটিশ সরকার নাট্যাভিনয়ের ওপর কালাকানুন জারি করে, নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) । স্টারে 'বিদ্রোহী নায়ক' চলেছিল ১০৪ রাত্রি। বন্ধ হল ১৯৭৩-এর ৩০ অগাস্ট।

তারপরেই শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনপদবধূ' উপন্যাসের নাট্যরূপ ওই একই নামে অভিনীত হল, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩। পরিচালনা — দেবনারায়ণ। সংগীত পরিচালনা — তিমিরবরণ। নাটকটি ১৭৭ রাতের বেশি চলেনি। শেষ অভিনয় : ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৪।

১৯৭৩-এর ২৫ ডিসেম্বর মন্মথ রায়ের একাঙ্কিকা বলে প্রচারিত 'মুক্তির ডাক' অভিনীত হল, নাটকটির পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে। এইখানে এসেই স্টার থিয়েটাবের একটি গৌরবময় পর্বের সমাপ্তি ঘটল। ১৯৭৪-এর প্রথম দিকেই দেবনারায়ণ গুপ্তের সঙ্গে স্টার থিয়েটারের সম্পর্ক শেষ হল। পুরাতন শিল্পী ও কলাকুশলী গোষ্ঠীকেও বিদায় দেওয়া হল।

দেবনারায়ণ গুপ্ত স্টারে থাকাকালীন ছোট বড় মিলিয়ে নাট্যরূপ এবং মৌলিক মোট কুড়িটা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। তাব সবগুলিই জনসমাদরলাভ করেছিল। নাট্য সমালোচকদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছিল। ঝকমকে রঙ্গমঞ্চ, সুদৃশ্য ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, আলোর বাহার, নামকরা সব অভিনেতা-অভিনেত্রী, আবেগসর্বস্ব পারিবাবিক কাহিনী, প্রেম-ভালোবাসার মধুব ও বিরহের অনুভব এবং পরিচালনার নিষ্ঠা — স্টার থিয়েটারের এই পর্বের নাটকগুলিকে জনসমাদরে ভরিয়ে দিল। প্রতিটি নাটকই বহু রাত্রি অভিনীত হয়েছিল। প্রচলিত জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে দেবনারায়ণ প্রতিষ্ঠা পান। পরে মৌলিক কয়েকটি নাটকও লেখেন। সাদামাটা পারিবারিক কাহিনী বাঙালি জীবনের আবেগ-অনুভূতির ওপর নির্ভর করে এই সব নাটক সেদিন দর্শক আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল।

এদিকে স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের মধ্যে যে টালমাটাল অবস্থা তার কোনও প্রভাব কিন্তু এইসব নাটকে ছিল না। চীন-ভারত যুদ্ধ, খাদ্য আন্দোলন, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়া, নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাস এবং সত্তরের আগে-পরে রাজনৈতিক বিভীষিকার অন্ধকারময় দিন-রাত্রি — এগুলিব, এই যুগসংকটের কোনও প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি এই সময়কার স্টার থিয়েটারের নাটকে দেখা যায় না। 'জয় বাংলা' বা 'স্বর্ণকীট' নামিয়ে তারা দায় সেরেছিল, যুগভাবনার দ্বন্দ্বময় উপস্থাপনা থেকে বহু দূরে স্টারের নাট্যাভিনয় সরে ছিল।

তবে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও সুস্থ সংস্কৃতির নাট্যাভিনয় করে স্টার বাঙালি দর্শকের সাধুবাদ কুড়িয়েছিল। সেই সময়ে পাশাপাশি অনেক পেশাদার থিয়েটার নগ্ন নাচগান এবং ক্যাবারে-নৃত্য ইত্যাদি আমদানি করে বাংলা মঞ্চকে কলুষিত করেছিল। স্টার থিয়েটার কখনই সে প্রলোভনের হাতছানিতে ভোলেনি। থিয়েটারের ইতিহাসে এটাও উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব পরবর্তী মরা রঙ্গালয়ে প্রাণের বাণ ডাকিয়েছিল স্টার। এবং তাতেই উজ্জীবিত হয়ে আবাব অন্য সাধারণ রঙ্গালয়গুলিও নতুন করে ফিরে দাঁড়িয়ে নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস তৈরি করেছিল।

সপ্তম পর্ব : (১৯৭১-১৯৯১)

১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল থেকে রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পর্ব শুরু হয়েছে বলে ধরা যায়। তবে রঞ্জিতমল দায়িত্ব নিয়ে আগের ধারার কোনওরকম পরিবর্তন প্রথমেই করেননি। পুরনো নিয়মেই সব চলেছে। নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত, কলাকুশলী-শিল্পী সব আগের। এবং আগের মতোই দেবনারায়ণ নাটক ও নাট্যরূপের অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৯৭৪-এ স্টারের সঙ্গে দেবনারায়ণের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তখন থেকেই পুরোপুরিভাবে স্টারের আর এক পর্ব শুরু হল। রঞ্জিতমল নিজেই সব দায়িত্ব নিয়ে ভাড়া-করা লোকজন দিয়ে থিয়েটারের কাজ চালাতে লাগলেন। এক

একজন নাট্যকার, আবার নতুন পরিচালক, শিল্পী-দলের পরিবর্তন — এইভাবে বেশ কয়েকটি নাটক রঞ্জিতমলের কর্তৃত্বাধীনে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হল। বলা যায়, তখন থেকেই স্টারের গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান হল।

সত্তরের দশকের রাজনৈতিক ডামাডোল, পটপরিবর্তন এবং আতঙ্ক ও সন্ত্রাস জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সব রঙ্গালয়ের অভিনয়ই তখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্টার থিয়েটারও তা থেকে রেহাই পায়নি। তবে জীবন-সমস্যার কোনও গভীর ব্যাপক নাট্যরূপায়ণ স্টার করতে পারেনি। বরং দেবনারায়ণের প্রচলিত সাদামাটা সামাজিক ও পারিবারিক কাহিনীর নাটকই স্টারে অভিনীত হতে থাকল।

১৯৭৪ সালের ৩১ মে অভিনীত হল 'পরিচয়'। কুণাল মুখোপাধ্যায়ের নাটক। পরিচালনায় বঙ্কিম ঘোষ। নায়িকা হয়ে এলেন চলচ্চিত্রের শমিতা বিশ্বাস। এই নাটকটি চলল ৩০৭ রাত, বন্ধ হয়ে গেল ১৯৭৫-এর ২২ জুন।

২৮ জুন নামানো হল নতুন নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। নাট্যরূপ দিলেন কুণাল মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের নাট্যরূপ আগে স্টার সমেত বাংলা অন্যান্য রঙ্গালয়েও বহুবার অভিনীত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে আনা হল স্টারের পূর্বযুগের অভিনেতা ও নাট্যকার-পরিচালক মহেন্দ্র গুপ্তকে। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় অভিনয়ও করলেন। পরিচালক হিসাবে নাম বিজ্ঞাপিত হল বঞ্জিতমল কাংকারিয়ার। বোঝাই যায়, টাকা দিয়ে দিয়ে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, নাম দিচ্ছেন নিজের। ৫৪৫ রাত্রি অভিনীত হল 'কৃষ্ণকান্তের উইল'।

১৯৭৬-এর ১৮ সেপ্টেম্বর, শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষের বছরে অভিনয় করা হল 'চন্দ্রনাথ'। শরৎচন্দ্রের ওই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। কিছুদিন 'চন্দ্রনাথ' চলার পর নতুন নাটক অভিনীত হল 'সম্রাট'। নাট্যকার অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নান্দীকার' গ্রুপ থিয়েটারের একনিষ্ঠ অভিনেতা ও কর্মী অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় পেশাদারি থিয়েটারের জন্য নাটক লিখে দিলেন। প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে বইলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। অভিনয়ও করলেন প্রধান ভূমিকায়। কিন্তু পরিচালক হিসাবে নাম রইল রঞ্জিতমলের। এই নাটক চলল অনেক দিন, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৮-এ বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত ৪৩৭ রাত্রি।

১৯৭৮-এর ১৪ ডিসেম্বর নতুন নাটক 'সংগ্রাম'। নাট্যকার তপেন্দু গাঙ্গুলি। কিন্তু অপ্রস্তুত এই নাটক বেশিদিন চলল না। মোটে ২৮ রাত্রি। তাই উপায়ান্তর না দেখে রঞ্জিতমল পুরনো নাটক 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আবার নামালেন। থিয়েটারের মুখরক্ষা করে তা চলল ৭৭ রাত।

এবারে, ১৯৭৮-এর ৩০ এপ্রিল থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত স্টার থিয়েটার বন্ধ রাখা হয়। তারপরে অভিনীত হল 'সমাধান' (৫ জুলাই, ১৯৭৯)। 'সমাধান' নাটক বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের সর্বকালের অভিনয়ের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে চলল টানা এক হাজার চব্বিশ রাত্রি। ১৯৭৯ সালের ৫ জুলাই থেকে শুরু করে ১৯৮৬-র ১৩ মার্চ পর্যন্ত সাত বছর ধরে নাটকটি একাদিক্রমে দর্শক পরিপূর্ণ অবস্থায় অভিনীত হয়ে গেছে। 'সমাধান' নাটকটি চলচ্চিত্রকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দাদু'-র মঞ্চরূপ (সন্তোষ সিংহ)। সন্তোষ সিংহের পরিচালনায় এবং মহেন্দ্র গুপ্তের উপদেশনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। পারিবারিক আবেগধর্মী এই নাটক সেদিন বাঙালি দর্শককে খুশি করেছিল। মহেন্দ্র গুপ্তের অসামান্য অভিনয় উল্লেখযোগ্য। নাটকটি চলার মাঝখানেই ১১ নভেম্বর, ১৯৮৪ মহেন্দ্র গুপ্ত মারা যায়। 'সমাধান' নাটকেই তাঁর শেষ অভিনয়।

'সমাধান' নাটক যখন রমরম করে স্টারে চলছে বৃহস্পতি, শনি ও রবি (ম্যাটিনি ও সন্ধ্যা), তখন আবার পূর্বের নিয়মে মধ্য-সাপ্তাহিক অভিনয় শুরু করে স্টার থিয়েটার। মধ্য-সাপ্তাহিক হিসাবে নামানো হল 'পাশের বাড়ি'। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র হিসাবে এর আগেই 'পাশের বাড়ি' সিনেমাহলগুলিতে খুবই চলেছিল। অরুণ চৌধুরীর এই চলচ্চিত্রকাহিনীর নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করা হল স্টারে (১৪.৪.১৯৮৪)। 'সমাধান' নাটকের ফাঁকে ফাঁকে মধ্য-সাপ্তাহিক নাটক হিসাবে 'পাশের বাড়ি' জনপ্রিয় হয়ে উঠল। চলল টানা ৭০৫ রাত।

এবারে শুরু হল অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শাপমোচন'। প্রথম অভিনয় হল ১৯৮৫-র ২৭ জানুয়ারি। তেমন ভালো চলল না। মাত্র ২৬১ রাত।

আবার একটি চলচ্চিত্রের কাহিনী নিয়ে স্টার থিয়েটার নাটক তৈরি করল। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস 'বালুচরী' অবলম্বনে আগেই চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল। তারই মঞ্চরূপ দিলেন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। নায়িকা করে আনা হল চলচ্চিত্রের খ্যাতিময়ী অভিনেত্রী সুপ্রিয়া চৌধুরীকে। ৩৮৮ রাত চলার পর 'বালুচরী'র অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল (২২.১১.১৯৮৭)। 'বালুচরী'র সঙ্গে আবার একটি মধ্য-সাপ্তাহিক নাটক নামানো হল 'খেলনা' (৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮৬) । 'বালুচরী'র ফাঁকে ফাঁকে এটি চলেছিল ৭২ রাত্রি।

তারপরে 'ঘরে ঘরে'। প্রথম অভিনয় : ১৫ এপ্রিল, ১৯৮৭। ভালো চলল না। মোটে ১০৭ রজনী।

স্টার থিয়েটার 'লক আউট' ঘোষণা করা হল। আগে থেকেই স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্মী ও কলাকুশলীদের নানা ব্যাপারে মতান্তর চলছিল। কর্মী বিক্ষোভও চলছিল মাঝে মাঝে। রঞ্জিতমল স্টার থিয়েটারে 'লক-আউট' ঘোষণা করলেন ১৯৮৭ সালের ১ ডিসেম্বর। এক বছর বন্ধ থাকার পর ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৮ স্টার থিয়েটার আবার খোলে। বাংলা পেশাদার রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এর আগে কখনও এইভাবে কোনও থিয়েটারে 'লক-আউট' ঘোষণা করা হয়নি। গৃহসংস্কার বা মালিকানার হাতবদল অথবা মামলা-মোকদ্দমা কিংবা আদালতের রায়ে কখনও কখনও কোনও রঙ্গালয় কিছুদিন বন্ধ থেকেছিল কিংবা একেবারে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু স্টার থিয়েটারের মতো এইভাবে কারখানাসদৃশ লক- আউট, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অনেক টালবাহানার পর কর্মীদের সঙ্গে সমঝোতায় এসে রঞ্জিতমল স্টার থিয়েটার খুললেন। গড়িমসি করে নাটকও প্রযোজনা করলেন। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টগরী' (১৯৮৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি)। এ নাটক একেবারেই হতাশ করল তাঁকে সব দিক দিয়ে। টেনেটুনে ৪৩ রাত্রি চালানোর পর লোকসান দিয়ে নাটক বন্ধ করে দিলেন। আগে থেকেই তাঁর লোকসান চলছিল। লক-আউট ঘোষণা তারই ইঙ্গিত। সর্বশেষে রঞ্জিতমল স্টার থিয়েটারের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলেন। ১৯৮৯ সালের ৩০ এপ্রিল এরপর রঞ্জিতমল স্টার থিয়েটার ভাড়া দিয়ে দিলেন অনুপ গুপ্ত ও স্বপন সেনগুপ্তকে।

অনুপ গুপ্ত ও স্বপন সেনগুপ্তের অন্য পেশা ছিল। তাঁরা থিয়েটারের ব্যবসায় এসে উঠেপড়ে লাগলেন। একে-তাকে জোগাড় করে প্রযোজনা করলেন 'ঘরজামাই' নামে এক মজার নাটক। একশ রাত্রি টানা চলল। স্টার যেন আবার জেগে উঠল। কিন্তু ১৯৭ রজনী অভিনয়ের পর (১০ মার্চ, ১৯৯০) তাঁরা উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন, 'ঘরজামাই' বন্ধ হয়ে গেল।

রঞ্জিতমল তাঁর স্টার থিয়েটার ভাড়া দিয়েছিলেন। সেখানে অনুপ গুপ্ত ও স্বপন সেনগুপ্ত নতুন করে নাটক করতে না পেরে স্টার থিয়েটার ভাড়া দিলেন প্রখ্যাত নট এবং চলচ্চিত্রখ্যাত সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি তাঁর নিজস্ব থিয়েটার দল নিয়ে স্টারে এসে অভিনয় করলেন তাঁর 'নহবত' নাটক, ১৮ মার্চ, ১৯৯০। রচনা ও পরিচালনা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রধান ভূমিকাতেও অভিনয় করলেন। সিরিও-কমিক এই নাটক একশ রজনী অতিক্রম করল। রঞ্জিতমল তখন আবার উৎসাহিত হয়ে নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রযোজনা করলেন 'স্বামীরা আসামী'। প্রথম অভিনয় হল ২৭ এপ্রিল, ১৯৯০। কিন্তু এই নাটকটি একেবারেই দর্শক আকর্ষণে সমর্থন হল না। ৪৩ রাত্রি মোটে অভিনয় হয়েছিল।

আবার অনুপ গুপ্ত এবং স্বপন সেনগুপ্ত উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁরা মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতকীর্তি ও জনপ্রিয় সুদর্শন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে এলেন। অভিনীত হল 'ঘটক বিদায়'। নাটক রচনা, নাট্যপরিচালনা এবং সংগীতকার : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের নামকরা সব অভিনেতা-অভিনেত্রী এই নাটকে অংশগ্রহণ করলেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তো ছিলেনই, অন্যরা হলেন মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী), রবি ঘোষ, শ্রীলা মজুমদার, তরুণকুমার প্রমুখ।

মজাদার এই নাটক জমে গেল রাতারাতি। সৌমিত্র, রবি ঘোষ, তরুণকুমার প্রমুখের অসামান্য অভিনয় এই নাটকের সাফল্যের বড় কারণ। সৌমিত্রের নাট্য- পরিচালনার কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে 'ঘটক বিদায়' নাটক স্টার থিয়েটারে আবার প্রাণ ফিরিয়ে আনল। চলেছিল টানা ৩১৬ রাত্রি। কিন্তু ৩১৭তম অভিনয়ের আগেই, ১৯৯১-এর ১২ অক্টোবর রাত ১-১০ মিনিটে আগুন লেগে স্টার থিয়েটার পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। [ইংরেজি মতে, 13th October

at 1-10 A.M.] একশ বছরের ঐতিহ্যশালী স্টার থিয়েটার শেষ হয়ে গেল।

১০০ বছরের অধিককাল ধরে একটি রঙ্গামঞ্চের নানা উত্থান-পতন, ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে একাদিক্রমে অভিনয় চালিয়ে যাওয়া, পৃথিবীর রঙ্গামঞ্চের ইতিহাসেই খুব কম দেখা যায়। এ দেশে 'স্টার'ই একমাত্র মঞ্চ যা শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্য নিয়ে অভিনয় চালিয়ে গেছে। আগুন লাগার ফলে বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যেই স্টার থিয়েটার তার গৌরবের নবঅধ্যায় শুরু করবে এমন ভরসা দেখি না। এখন স্টার শুধুই ইতিহাস।

এক. ১০০ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে কোনও থিয়েটারের অভিনয় চালিয়ে যাওয়াই যে কোনও দেশে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

দুই. নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও স্টার থিয়েটারে কখনও অভিনয় বন্ধ হয়নি। সাময়িকভাবে হলেও, তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

তিন. একই অঞ্চলে, একই সঙ্গে তিন-চারটি রঙ্গামঞ্চ পাশাপাশি চালু থাকলে এবং সেগুলি সবই বাণিজ্যিক থিয়েটার হলে, স্বাভাবিকভাবেই বিষম প্রতিযোগিতায় সুস্থতা থাকে না, অনেক সময়েই রুচি-বিকৃতি দেখা দেয়। প্রতিযোগিতার ভালো দিকের বাইরে এ এক অসুস্থ সম্ভাবনা। স্টার থিয়েটার কিন্তু সব সময়েই নাটকের কাহিনী নির্বাচনে এবং উপস্থাপনে সুস্থ রুচি বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। কুৎসিত, নিম্নরুচি কিংবা হাল্কা ভাঁড়ামো দিয়ে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা স্টার থিয়েটার কখনও করেনি। এমনকি, বিংশ শতকের ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিক থেকে সত্তর-আশির দশকে অন্য মঞ্চগুলি যখন 'ক্যাবারে গার্ল'দের দিয়ে কুৎসিত নৃত্য, কিংবা নায়িকার 'বস্ত্রবিপ্লব' ঘটিয়ে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা করছে, তখনও স্টার কিন্তু নির্মল ও সুস্থ মানসিকতার প্রসঙ্গ থেকে সরে যায়নি।

চার. এই রঙ্গামঞ্চে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারবৃন্দ (গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, রাজকৃষ্ণ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবনারায়ণ গুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ) যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি এই স্টারের জনাই লেখেন। এখানে তার অনেকগুলি অভিনীত হয়ে যেমন দর্শকমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেছে, তেমনই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়া এখানে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নিরুপমা দেবী, তারাশঙ্কর, বিমল মিত্র, মনোজ বসু, আশাপূর্ণ দেবী প্রমুখ খ্যাতকীর্তি উপন্যাস রচয়িতাদের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপও প্রায়শই অভিনীত হয়েছে।

পাঁচ. সে যুগ এবং এ-যুগের সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ এখানে যুক্ত থেকে তাঁদের অভিনয়ের পারদর্শিতা দেখিয়ে বাংলা মঞ্চাভিনয়ের মান উন্নতও করেছেন। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানীবাবু, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মহেন্দ্র গুপ্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, নির্মলকুমার, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস প্রমুখ দিকপাল অভিনেতা এবং তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, তিনকড়ি, প্রমদাবালা, নিভাননী দেবী, প্রভা দেবী, সরযূবালা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেত্রী এখানে নানা সময়ে যুক্ত থেকে অভিনয় করে গেছেন। এছাড়া দীর্ঘ একশ বছরে আরও কত দীপ্ত নট-নটী ছিলেন, তার তালিকা শেষ করা যাবে না।

ছয়. এই রঙ্গামঞ্চ যেমন সুদৃশ্যভাবে তৈরি হয়েছিল, তেমনই দর্শকদের সুবিধের কথাও সমসময়ে ভাবা হয়েছিল। মহিলা দর্শকদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে এখানকার পরিবেশ কখনও সমসময়ের অন্য রঙ্গালয়গুলির মতো কলুষিত হয়নি।

সাত. বাংলা মঞ্চের মধ্যে এখানেই প্রথম শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ-আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে দর্শকদের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যপ্রযোজনায় আলোকসম্পাতের যুগান্তকারী পরিবর্তন হতে থাকে। স্টারের দেখাদেখি অন্য রঙ্গালয়গুলিও বিদ্যুৎ-আলোর সাহায্য নিতে থাকে। এর

আগে কোথাও কোথাও 'ডায়নামো' (এখনকার ভাষায় 'জেনারেটর') বসিয়ে সাময়িকভাবে চমক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়।

আট. বিশ শতকের গোড়ার দিকে অনেক রঙ্গমঞ্চই তাদের দুরবস্থা কাটিয়ে উঠবার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতায় সঙ্গে সঙ্গে দর্শক আকর্ষণের সব সস্তা ও নাট্যবহির্ভূত কৌশল অবলম্বন করত। স্টার সব সময়েই রুচিমাফিক কাজ করার চেষ্টা করেছে। ফলে অন্য রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায়ই দেখা যেত। কিন্তু স্টার দর্শকদের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখত। দর্শকরা বেহিসেবি হওয়ার সুযোগ পেত না। নিবুদ্বিগ্নভাবে নাট্যাভিনয় করা সম্ভব হত।

নয়. দীর্ঘ একশ বছর ধরে নানা ভাব ও নানা বিষয়ের এবং তাৎপর্যময় ঘটনার নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে। নাটকের শ্লীল-অশ্লীল প্রসঙ্গে সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

দশ. তবে একথাও ঠিক, বিশ শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে বাংলা নাটকের ধারায়, তার অভিনয়ে এবং বিষয়বস্তুতে আমূল পরিবর্তন এনেছিল গণনাট্যধারা। সেই ধারাকে নানমুখীন উৎকর্ষে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল গ্রুপ থিয়েটারগুলির অভিনয় প্রচেষ্টা। বিষয়ের ওই নতুনত্ব এবং প্রযোজনা ও উপস্থাপনার এই পরিবর্তনের নবধারাকে স্টার থিয়েটার গ্রহণ করতে পারেনি। যদিও গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটারের অনেক খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীকে প্রয়োজনে স্টার থিয়েটারে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু বাণিজ্যিক থিয়েটারের প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ থিয়েটারি ঘেরাটোপ থেকে স্টার থিয়েটার নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারেনি। বাংলা নাটকের বিষয় ও উপস্থাপনা যখন বাণিজ্যিক থিয়েটারের পরিমণ্ডলের বাইরে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে, স্টার থিয়েটার তখনও বিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশকের ঐতিহ্যের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে।

এগারো. দেশের স্বাধীনতার পর নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যখন নতুন করে দেশ গড়ে তোলার ভাবনা শুরু হয়েছে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ভাবনার প্রসার মানুষের মনে বিস্তারিত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে স্টার প্রযোজনা করল 'শ্যামলী' (১৯৫৩)। 'শ্যামলী'র অসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্য মঞ্চগুলিও অভিনয় করল 'এরাও মানু', 'উল্কা', 'সেতু'। লক্ষ্য করতে হবে, এইসব নাটকের বিষয় কিন্তু 'অসম্পূর্ণাঙ্গ' মানুষেব কথা। 'সেতু'তে বন্ধ্যা নারীর বেদনা, উল্কাতে বীভৎস দর্শন পুরুষের আত্মজ্বালা, 'এরাও মানুষ'-এ বিকৃত শরীরেব ভিখিরিদের বেদনা। 'শ্যামলী'তে ছিল বোবা-কালা মেয়ের মনোবেদনা। কিন্তু এইসব অসম্পূর্ণাঙ্গ মানুষও যে সমাজের একজন, তারা তাদের সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সে সংগ্রামেব কথা নাটকগুলিতে নেই। বরং তাদের প্রতিবন্ধকতাকে অবলম্বন করে দর্শকের 'সেন্টিমেন্ট' তৈরি করে কারুণ্যের বেদনা প্রকাশ করেছে। নাটকগুলির এখানেই সীমাবদ্ধতা।

ঠিক একই সময়ে পেশাদারি থিয়েটার ভাড়া করে উৎপল দত্ত তাঁর 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' নিয়ে (১৯৫৯-৬৯) 'অঙ্গাব', 'কল্লোল', 'তিতাস একটি নদীব নাম' প্রভৃতি নাটকের প্লাবন বইয়ে দিলেন। গোটা 'সম্পূর্ণাঙ্গ' মানুষের সন্ধান চলেছে সেখানে, যে মানুষেরা সমবেত প্রয়াসে সমাজবদলের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে দর্শকের মনে। বাংলা নাটকের ও প্রযোজনার যে ধারাবদল হয়ে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী 'মিনার্ভা'তে, স্টার থিয়েটার তা ভ্রূক্ষেপ করেনি। তারা তাদের ব্যবসায়িক পেশাদারি থিয়েটারের গতানুগতিক ভাবধারায় মশগুল থেকেছে।

স্টার থিয়েটার ভস্মীভূত হওয়ার সময়ে (১৯৯১) বাংলা অন্য সাধাবণ রঙ্গালয়গুলিও আর চলছিল না। বিশ্বরূপা, রঙমহল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মিনার্ভার অবস্থাও তাই। প্রতাপ মেমোরিয়াল বন্ধ, সুজাতা সদন দ্বাররুদ্ধ। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ তালাবদ্ধ। অন্য ছোটখাটোগুলোও বন্ধই বলা যায়। অর্থাৎ একবিংশ শতকে পড়ার শেষ দশকে পেশাদারি সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের ধারা বন্ধই হয়ে যাচ্ছে বলা যায়। এখানে সেখানে দু-একটি বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষণিকপ্রয়াস দিয়ে ইতিহাসের ধারা অব্যাহত রাখা যায় না।

দেবনারায়ণ গুপ্ত স্টার থিয়েটার তথা বাণিজ্যিক পেশাদারি থিয়েটারের সঙ্গে কাটিয়েছেন দীর্ঘ ত্রিশ বছরেরও বেশি। ৮২ বছর বয়সী দেবদারায়ণ গুপ্ত চোখের সামনে স্টার থিয়েটাব পুড়ে গেলে আর্তনাদ করে বলেছিলেন : 'ওপারে যাবার বেলায় দেখে যাচ্ছি এপারে আমার কারখানা পুড়ে ছাই হল। ... রঙ্গালয়টি আবার গড়ে উঠবে কি না জানি না। যদিও বা গড়ে ওঠে, আমার জীবদ্দশায় আমি তা দেখতে পাব না। —'

শেষে, 'বহুরূপী' নাট্যদলের নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা বর্ষীয়ান শ্রদ্ধেয় কুমার রায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য : 'স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর সাধারণ রঙ্গালয়ের কাজ নিঃশেষপ্রায়। স্টার পুড়ে যাওয়াটা যেন তারই প্রতীক।'

কোনও সাধারণ রঙ্গালয়ই আবার নতুন উদ্যমে চালু হওয়ার কোনও উদ্যোগই তো আর চোখে পড়ছে না।

লেখার দিন পর্যন্ত (৩১-৭-২০০১) ভস্মীভূত থিয়েটার বাড়িটির নবনির্মাণের কোনও খবর নেই। আলাপ আলোচনা, সভা এবং বক্তৃতা ছাড়া আর কোনও উদ্যোগ এখনও দেখা যায়নি।

সংযোজন ১

আনন্দবাজার পত্রিকা
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০১
স্টার থিয়েটার কালই হাতে নিচ্ছে পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পরে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণ করছে কলকাতা পুরসভা। শুক্রবাব মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কাল, রবিবার সকালে তিনি শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে মিছিল করে গিয়ে স্টার থিয়েটারে অধিগ্রহণের নোটিস আটকে দিয়ে আসবেন। সুব্রতবাবু বলেন, 'স্টার দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। রাজ্য সরকারও এটিকে চালু করার কোনও ব্যবস্থা করেনি। স্টারের মালিক এবং ব্যাঙ্কারদের সঙ্গেও কথা বলে লাভ হয়নি। তাই পুবসভা থিয়েটারটি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

সুব্রতবাবু জানান, অধিগ্রহণের পরে দু'বছরের মধ্যে তাঁরা স্টার গড়ে তুলবেন। এই কাজে ব্যয় হবে আট কোটি টাকার কিছু বেশি। বেসরকারি স্পনসর জোগাড় করেও ওই অর্থ বা তার বড় একটা অংশ তোলা যায় কি না তা দেখবে পুরসভা। সেই ক্ষেত্রে পরিভাষায় বি ও টি (বিল্ট, অপারেট অ্যান্ড ট্রান্সফার) পদ্ধতিতে থিয়েটারটি গড়া হবে। মেয়রের কথায়, 'আমি স্টার থিয়েটারের মালিক গোবিন্দ দে-র পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেছি। তাঁরা কোনও আপত্তি জানাননি। রাজ্য সরকারও এই ঐতিহ্যবাহী থিয়েটারের পুনর্গঠনে এগিয়ে আসেনি। বাধ্য হয়েই আমরা এটি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

সংযোজন ২

আনন্দবাজার পত্রিকা
১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০১
আজ স্টারের জন্য পদযাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : পদযাত্রা কলকাতায় নতুন কিছু নয়। কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি থিয়েটারকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য পদযাত্রা কলকাতা আগে দেখেনি। সেই দিক থেকে এই পদযাত্রা অভূতপূর্ব। শতাব্দীপ্রাচীন স্টার থিয়েটার

পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে আজ, রবিবার, একটি পদযাত্রা হচ্ছে। কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং শহরের বহু বিশিষ্ট নাগরিক ওই পদযাত্রায় যোগ দেবেন। এবং আজই স্টার থিয়েটারে অধিগ্রহণের নোটিস লাগিয়ে দেবে কলকাতা পুরসভা। ১৯৯১ সালের ১২ অক্টোবর বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় স্টার থিয়েটার। ৯২০ আসনবিশিষ্ট ঐতিহ্যপূর্ণ ওই থিয়েটার পুনর্নির্মাণের জন্য গোড়ার দিকে হলের মালিক রেণুবালা দে এবং রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া রাজ্যের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। আইনি জটিলতার জন্য সরকার কিছু করেনি।

কলকাতা পুরসভায় তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, পুর আইন অনুসারে পুর কর্তৃপক্ষ স্টার থিয়েটার ও সংলগ্ন জমি অধিগ্রহণ করে নিতে পারে।

সংযোজন ৩

আনন্দবাজার পত্রিকা

৭ মার্চ, ২০০১

আইনি জটিলতা, পুরসভার অর্থসঙ্কট সত্ত্বেও স্টার হাতে নিতে চান মেয়র

পার্থসারথী সেনগুপ্ত

কলকাতা পুরসভার আর্থিক হাল কেমন? একটা ছোট্ট উদাহরণই যথেষ্ট — পুরকর্মীদের মাইনে দিতেই মাসে প্রায় ৩২ কোটি টাকা লাগে, সেই টাকার অর্ধেক জোগাতে হয় রাজ্য সরকারকে। এই অবস্থায় প্রায় ন'কোটি টাকা খরচ করে স্টার থিয়েটার হাতে নিতে চলেছে পুরসভা।

ভোট বড় বালাই। তাই সাত তাড়াতাড়ি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে স্টার থিয়েটারের নতুন ভবনের শিলান্যাস করানোর দিনক্ষণও ঠিক করে ফেলেছেন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়। ওই অনুষ্ঠান হবে আজ, বুধবার। কিন্তু স্টার থিয়েটারের মালিকানা নিয়ে আইনি জটিলতা রয়েছে অনেক। চলছে মামলাও। সেগুলির মীমাংসা না করেই পুরসভা দৌড় শুরু করেছে।

স্টার থিয়েটার পুড়ে যায় ১৯৯১ সালে। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত লিজ নিয়ে ওই হল চালাতেন রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া। তিনি গত ৩১ জানুয়ারি মেয়রকে চিঠি [illegible] অনুরোধ জানান, তাঁকে ফের স্টার থিয়েটারের লিজ দিলে তিনি সেটি পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেবেন। কাঙ্কারি[illegible]কে মনে করিয়ে দিয়েছেন, অন্তত চারটি গোষ্ঠী স্টার থিয়েটারের মালিকানার প্রশ্নে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন,

● স্টার থিয়েটারের জমির মালিক হলেন প্রাক্তন মেয়র প্রয়াত গোবিন্দচন্দ্র দে-র বৌদি রেণুবালা দে। তিনি গোবিন্দবাবুর দাদা প্রয়াত অমিয়কুমার দে-র স্ত্রী।

● ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত স্টাব থিয়েটারের লিজ ছিল রঞ্জিত পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের। ওই সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া। ওই লিজ শেষ হওয়ার পরে তিনি গোবিন্দবাবুকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন লিজ পুনর্নবীকবণের। সেই আবেদনেরও মীমাংসা হয়নি। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়।

● কাঙ্কারিয়া মেয়রকে তাঁর চিঠিতে জানিয়েছেন, স্টার থিয়েটার বন্ধক রয়েছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাছে। এই ব্যাপারেও মামলা চলছে। বিষয়টি ব্যাঙ্ক রিকভারি ট্রাইবুনালে গিয়েছে।

● নট্ট কোম্পানির মাখনলাল নট্ট স্টার থিয়েটার কেনাব জন্য গোবিন্দচন্দ্র দে-কে বেশ কিছু টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে মাখনবাবুর বক্তব্য, গোবিন্দবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে স্টার থিয়েটারের দাম ধরা হয়েছিল প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। তিনি ১২ লক্ষাধিক টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। কিন্তু স্টার পুড়ে যাওয়ায় বিষয়টি ঝুলে আছে।

স্টার থিয়েটারের মালিকানা নিয়ে এই বিতর্কও নস্যাৎ করে দিয়েছেন সুব্রতবাবু। তাঁর হাতেও অস্ত্র একটিই। তা হল, পুর আইনের ৪২৫(এন) ধারা। সুব্রতবাবু জানান, আইনের ওই ধারা অনুযায়ী যদি পুর কমিশনার খবর পান

যে, কোনও ঐতিহ্যবাহী ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো হচ্ছে না, তখন তিনি মালিকের সঙ্গে কথা বলে ভবনটির পরিচালনার দায়িত্ব পুরসভার হাতে তুলে নিতে পারেন। পাঁচ বছরের জন্য এই ব্যবস্থাই চালু থাকবে। পরে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ১৮৯৪ অনুযায়ী ফের পাঁচ বছরের জন্য পুর-কর্তৃপক্ষ পরিচালনার দায়িত্ব বজায় রাখতে পারেন। এই ব্যাপারে দে পরিবারের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে।

দে পরিবারের সঞ্জয় দে অবশ্য এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, বিষয়টি বিচারাধীন।

স্টার হাতে নেওয়ার পথে আরও একটি বাধা সেখানকার দোকানঘরগুলি। সুব্রতবাবু অবশ্য বলেছেন, প্রথমে দোকানের মালিকদের বুঝিয়ে সুজিয়ে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে। কিন্তু কেউ যদি অনড় থাকেন যে, তিনি স্টারের জমির দখল ছাড়বেন না, তাঁকে জোর করেই তুলে দেবে পুরসভা। সুব্রতবাবু বলেন, 'যদি কেউ সরতে না-চায়, তা হলে মালা আছে আর মালার বুলডোজারও আছে।' মালা হলেন মেয়র-পারিষদ (জঞ্জাল অপসারণ) মালা রায়।

অর্থাৎ যে-করেই হোক, মেয়র স্টার হাতে নেবেনই। হাতে নিয়ে ওই চালাবেন কীভাবে, তারও কোনও স্পষ্ট রূপরেখা এখনও স্থির হয়নি। মেয়র স্টার পুনর্গঠনের একটি রুপোলি পরিকল্পনা শোনাচ্ছেন : মাটির তলায় হবে পার্কিং লট। তার উপরে রঙ্গমঞ্চ। দোতলায় শপিং কমপ্লেক্সে ব্যবসায়ীদের জায়গা বেচে টাকা উঠবে। বেসরকারি সংস্থা সাহায্য করলে আপত্তি নেই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছেও সাহায্য চাইবে পুরসভা। প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালিয়ে আগামী দু'বছরের মধ্যেই প্রেক্ষাগৃহে নাটক মঞ্চস্থ করার কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করছেন সুব্রতবাবু। প্রেক্ষাগৃহের মূল আদলটি যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা চালানো হবে। এই ব্যাপারে প্রখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়ার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন পুরকর্তারা।

হবে তো বটেই, কিন্তু করবে কে? সেটাই স্পষ্ট নয়, অথচ শিলান্যাসের আয়োজন সারা। আইনি জটিলতাকে হাল্কা করে দেখছেন না অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নীতিগতভাবে স্টার অধিগ্রহণের পক্ষপাতী। সরকারি বা বেসরকারি কোনও উদ্যোগেই আপত্তি নেই তাঁর। তাঁর মতে, প্রেক্ষাগৃহটি বাঁচিয়ে তোলা দরকার। কিন্তু মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কত দূর কী হবে, এই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন।

'শ্যামলী' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল স্টার থিয়েটারে। রেকর্ড সৃষ্টিকারী সেই নাটকে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। সাবিত্রীদেবী স্টার অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তে খুশি।

মজার ব্যাপার, সব ব্যাপারে বিরোধিতা করলেও সুব্রতবাবুর উদ্যোগে সমর্থন জানিয়েছেন পুরসভার বিরোধী নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়েও তাঁর দুটি প্রশ্ন : এক) ঐতিহ্যবাহী ভবন অধিগ্রহণ করলেও মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। নইলে আইনি সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারে সুব্রতবাবু কী করছেন? দুই) ঐতিহ্যবাহী ভবনে শপিং কমপ্লেক্স বানানো কি সম্ভব? কান্তিবাবুর মত সম্ভব নয়। প্রস্তাবিত শপিং কমপ্লেক্স ঘিরেই সন্দেহ তাঁর মনে। তাঁর মতে, বিষয়টি যথেষ্ট গোলমেলে।

<u>সংযোজন ৪</u>

আনন্দবাজার পত্রিকা

৮ মার্চ, ২০০১

ঋণ-জটের মধ্যেই স্টারের নতুন ভবনের শিলান্যাস

স্টাফ রিপোর্টার : বুধবার সাড়ম্বরে স্টার থিয়েটারের নতুন ভবনের শিলান্যাস হলেও বন্ধকি এই সম্পত্তি নিয়ে কলকাতা পুরসভার সঙ্গে ব্যাঙ্কের সমস্যার জোট খোলেনি। ইলাহাবাদ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি পুরসভাকে থিয়েটারের জমির মালিকের

বকেয়া প্রায় ছ'কোটি টাকার ঋণ সুদ-সহ মিটিয়ে দিতে অনুরোধ করেছে। পুর কমিশনার দেবাশিস সোমকে লেখা একটি চিঠিতে ব্যাঙ্কের আইনজীবী মানবরঞ্জন সর্বাধিকারী জানিয়েছেন, বকেয়া টাকা না মিটিয়ে পুরসভার স্টার হাতে নেওয়া পুরোপুরি বেআইনি কাজ। কড়ায়-গণ্ডায় ঋণের টাকা না মেটানো পর্যন্ত স্টারের জমি, বাড়ি, যন্ত্রপাতি ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক থাকবে। এই চিঠির কোনও উত্তর মেলেনি বলে ব্যাঙ্কের আইনজীবী জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, এ দিন পুর কমিশনার বলেন, ব্যাঙ্কের চিফ জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। ঋণের ব্যাপারটি কোনও সমস্যা নয়। শিলান্যাসের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা আগেই অবশ্য মানবরঞ্জনবাবু জানিয়েছেন, ব্যাঙ্কের কর্তাদরে সঙ্গে পুর কমিশনারের কথা হয়েছি কি না, তা তাঁর জানা নেই। ব্যাঙ্কের কর্তাদের নির্দেশ অনুসারেই ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি পুর কমিশনারকে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও লিখিত উত্তর পাননি। তাই ব্যাঙ্কের তরফে আইনমাফিক যা করার, তা তিনি করবেন।

ওই আইনজীবীর বক্তব্য, 'দুটি রাস্তা খোলা আছে। হয় পুরসভা নিজেরাই ব্যাঙ্কের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিক অথবা যারা স্টার বন্ধক রেখে কোটি কোটি টাকা ধার নিয়েছিল, তাদের বুঝিয়ে বলুক টাকা ফেরত দিতে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তদারকিতে ঋণগ্রহীদাদের সঙ্গে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে ইলাহাবাদ ব্যাঙ্কের একটি সমঝোতাও হয়েছিল। কিন্তু টাকা শোধ হওয়ার আগেই পুর-কর্তৃপক্ষ বন্ধকি সম্পত্তি হাতে নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের টাকাই গচ্ছিত থাকে ব্যাঙ্কে। এই টাকার সুরক্ষার দায়িত্বও ব্যাঙ্কের। এই টাকাব অজুহাত দিয়ে ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওযা অনুচিত। বিশেষত কলকাতা পুরসভাও যখন একটি সবকারি সংস্থা, তার এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

স্টার পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে যে আইনগত ও আর্থিক নানা সমস্যা রয়েছে, শিলান্যাসের অনুষ্ঠানেও তা স্বীকার করেছেন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়। স্বীকার কবেছেন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনিই শিলান্যাস করেন। দুজনেই অবশ্য বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন,
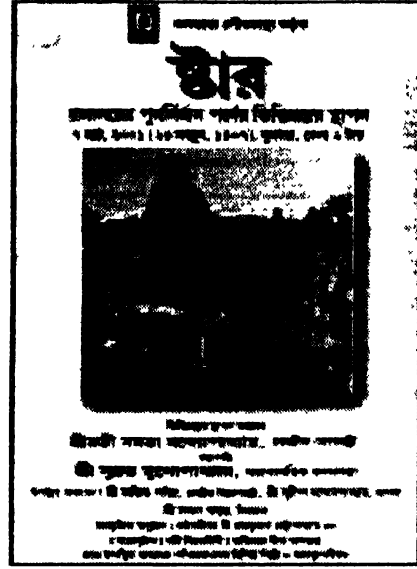
স্টার থিয়েটার পুনর্নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের (৭ মার্চ, ২০০১) বিজ্ঞাপন

নির্বাচনের ঠিক আগে ভোটের রাজনীতির কোনও অঙ্ক মাথায় রেখে স্টার থিয়েটার খোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হননি তাঁরা। একদা সি পি এমের রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার স্লোগানের আদলে মমতাও বলেছেন, 'প্রয়োজনে নিজেদের রক্ত বেচে স্টার থিয়েটার গড়ে তুলব।'

একটু তির্যকভাবেই সুব্রতবাবু বলেন, 'আমি কি নির্বোধ যে, বেআইনি কাজ করব! আইন অনুসারেই পুরসভা স্টার থিয়েটার নিয়েছে। আইনি প্রশ্ন উঠলে আদালতের কথা মতো চলব। অনেকেই এখন বিচার করতে শুরু করেছেন, স্টার থিয়েটার নিয়ে আমরা ঠিক করেছি কি না। মানছি, অর্থের অভাব আছে। কিন্তু টাকার সংস্থান কীভাবে হবে, তা এখনই খুলে বলব না। বললেই অনেকে তা বন্ধ করতে এগিয়ে আসবেন।'

মমতাও জানিয়েছেন, মেয়র টাকার ব্যবস্থা করেছেন। এখনই বিস্তারিতভাবে কিছু বলা হচ্ছে না। ভালো কাজ 'চুপচাপ' করাই উচিত। কারণ, ভালো কাজ ভন্ডুল করার অনেক লোক আছে। একটি বিশেষ তহবিল

গঠন করে পুরসভা যে স্টার থিয়েটার পুনর্নির্মাণে সাধারণ মানুষের আর্থিক সাহায্যও নেবে, সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন মমতা। এ দিন আরতি বারিক নামে এক মহিলা তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় থেকে সাত হাজার টাকা স্টার পুনর্নির্মাণে মমতার হাতে তুলে দেন। রেলমন্ত্রী নিজেও তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের অবশিষ্ট ২৫ হাজার টাকা স্টারের পুনর্নির্মাণে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
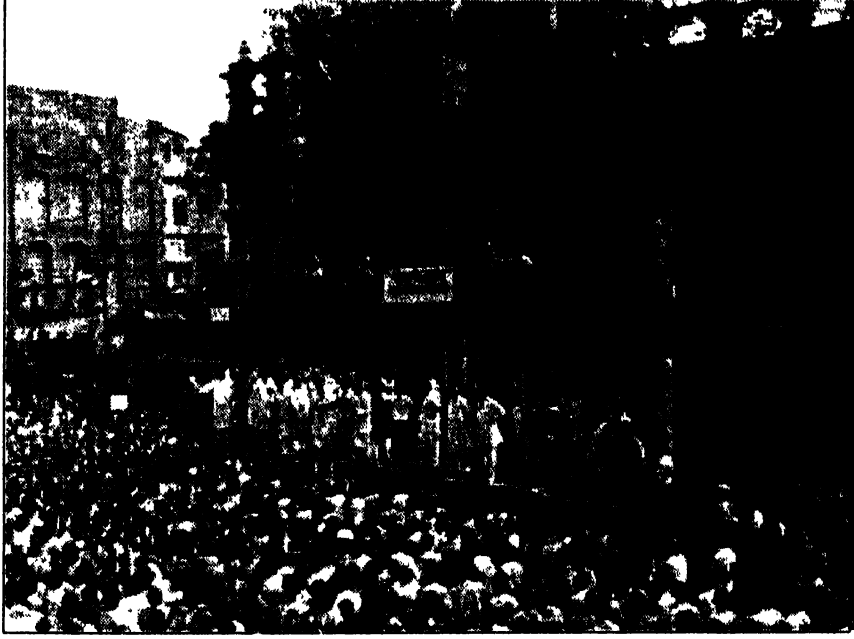
'পুড়ে যাওয়া স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণ উপলক্ষে বাম ও তৃণমূল নেতাদের উপস্থিতিতে সমাবেশ।' ছবি ও ক্যাপশন আনন্দবাজার পত্রিকার।

অগ্নিদগ্ধ স্টার থিয়েটার বিপুল অর্থব্যয়ে মেরামত ও নতুন করে সাজিয়ে, বাইরের কাঠামো একই রেখে, উদ্বোধন করা হয় ২০০৪ সালের ১৩ অক্টোবর। সেই সঙ্গে নির্মিত হয় সিনেমা হল। স্টার রঙ্গমঞ্চে অদ্যাবধি কোনও পেশাদারি নাট্য প্রযোজনা হয়নি। দু-একটি অ-পেশাদারি নাট্যদল নাটক মঞ্চস্থ করেছে, কিন্তু অতি সামান্য। স্টার আর নাট্যকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি।

কালের সাক্ষী
মিনার্ভা থিয়েটার
দেবাশিস রায়চৌধুরী
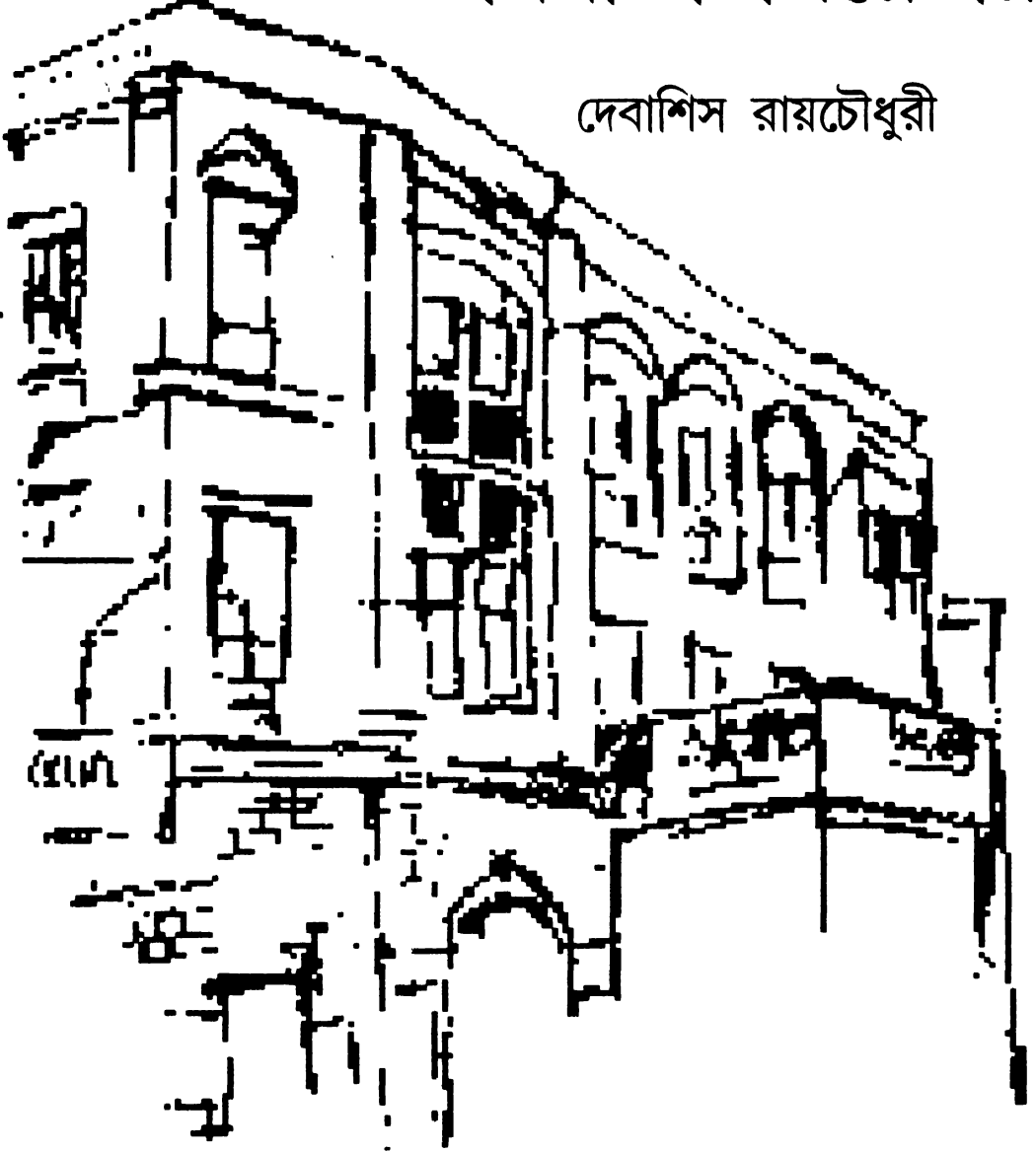
মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'কল্লোল'

'সেদিন সন্ধ্যার পর হইতেই বৃষ্টি হইতেছিল। যখন তিনি থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন, তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। অতি অল্প দর্শকই তখন উপস্থিত, অনুমান পঞ্চাশ টাকার অধিক টিকিট বিক্রয় হয় নাই। মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'এই দুর্যোগেও এত অল্প বিক্রয়ে, নিষ্ফল অভিনয়ে, আপনার ঠাণ্ডা লাগাইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিবার প্রয়োজন নাই।' কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 'করুণাময়' অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত সেই দারুণ দুর্যোগেও ক্রমশ দর্শক সমাগমে প্রায় চারিশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইল। তখন গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 'এই ভীষণ দুর্যোগে মুষলধারায় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা আমার অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিব না, ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহার আর উপায় কি? হায়, তখন কে জানিত যে রঙ্গালয়ে সেই কাল তাঁহার শেষ রজনী।'

গিরিশচন্দ্র · অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপন মজুমদার সম্পাদিত, ১৯২৭

রঙ্গালয়টির নাম মিনার্ভা থিয়েটার, আর দিনটি ছিল ১৯১১ সালের ১৫ জুলাই। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'বলিদান' নাটকে 'করুণাময়'-এর ভূমিকায় শেষবারের মতো অভিনয় করেন। নিজেরই তৈরি নাট্যশালায় শেষবারের মতো অভিনয় সবার জীবনে সচরাচর ঘটে না, যা কি না ঘটেছিল 'Father of the Native Stage' গিরিশচন্দ্রের জীবনে। যিনি একদা একের পর যে থিয়েটার গড়েছেন তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন অভিনেতৃ তৈরি করে বাংলা থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

বাংলা দেশের নাট্য-ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে মিনার্ভা থিয়েটার অন্যতম। এই মিনার্ভা দেখেছে এবং অসংখ্য নাট্যপ্রেমীকে দেখিয়েছে বহু বিখ্যাত নাটকে বিশিষ্ট অভিনেতৃর রসোত্তীর্ণ অভিনয়। লোকপরম্পরায় সেই গৌরবময় অতীতের স্মৃতি আজ বিস্মৃতির পথে। মিনার্ভা থিয়েটারের জন্মের তারিখটির দিকে যদি আমরা ফিরে তাকাই তাহলে দেখব এর বয়স এখন প্রায় একশ' আটাশ বছরের কাছাকাছি।

২০০০ সালের নভেম্বর মাসে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'মিনার্ভা থিয়েটার হাতে নিচ্ছে রাজ্য' শীর্ষক সংবাদে

আমরা জেনেছি — ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যমঞ্চ মিনার্ভা থিয়েটার অধিগ্রহণ করছে রাজ্য সরকার। মিনার্ভার বর্তমান মালিকদের কাছ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় হলটি কিনে নিয়ে সেটি গ্রুপ থিয়েটারের স্থায়ী মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরনো দিনের বহু অভিনেতার স্মৃতি-বিজড়িত এই থিয়েটার বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধ থাকার পর মিনার্ভার কর্মীদের নিজেদের উদ্যোগে এই থিয়েটার চালানোর চেষ্টা হলেও তা খুব ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে হয় না। যদিও এখন বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার নিয়মিত অভিনয় হচ্ছে। মিনার্ভা থিয়েটারের বর্তমান ম্যানেজার ক্ষিতিশ সরকার জানালেন, তাঁরা এই থিয়েটারটির সংরক্ষণে অনেক চেষ্টা করেছেন, এমসময় বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী মিনার্ভার নবরূপায়ণে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। পরে রাজ্য সরকার নবরূপায়ণের পরিকল্পনায় অগ্রসর হওয়ায় বর্তমান কর্মীরা স্বস্তিবোধ করছেন। বর্তমানে কর্মীর সংখ্যা ছাব্বিশ। তবে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ হলেন বিরাশি বছরের সুধীর রায়, যিনি উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনার সময় থেকে যুক্ত।

উৎপল দত্তের প্রসঙ্গ আসতেই মনে পড়ল ১৯৫৯ সালের কথা। কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে ১৯৫৯ সালের ২৬ জুন প্রকাশিত হয় একটি সংবাদ : '২৭শে জুন : মিনার্ভা থিয়েটারের দারোদ্ঘাটন — এ সপ্তাহে শহরের নাট্যালোকের বড় খবরটি হল মিনার্ভা থিয়েটারের দারোদ্ঘাটন। আগামীকাল (শনিবার) ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হবে। অনেকদিন পরে আবার বিডন স্ট্রীটের ঐ ঐতিহ্যপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ সরব হয়ে উঠবে, মঞ্চের পাদপ্রদীপ হবে প্রোজ্জ্বল। বর্তমান নাট্যআন্দোলনের আসরে যে দল নিজেদের আসন বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপই এবার মিনার্ভার পুরোন গৌরব ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হয়েছেন।'

সে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটার চলে না ... চলতে পারে না, এইরকম একটা মতবাদ যেমন নাট্যব্রতীদের তেমনই নাট্যরসিকদের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। তাই তখন মিনার্ভা থিয়েটারের প্রসঙ্গ উঠলেই অনেকেই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে বলতেন — ও' থিয়েটার চলবে না ... চলতে পারে না। যে থিয়েটারের অতীত এত গৌরবময়, যে থিয়েটারকে কেন্দ্র করেই ইতিহাস রচিত হতে পারে, সেই থিয়েটাব সম্পর্কে এরকম অদ্ভুত উক্তি কেন উচ্চারণ করতেন সে সময়ের মানুষ, তার কোনও সদুত্তর কিন্তু সে সময়ে ছিল না। বা বলা যেতে পারে, কেউ হয়তো চক্ষুলজ্জাবশত সত্য গোপন করে যেতেন। কেউ বা অনভিজ্ঞতাবশত অবৈজ্ঞানিক অভিমত ব্যক্ত করতেন।

তবে বাঙালির ইতিহাসে দলাদলি যেমন বাংলার সব ক্ষেত্রে সব কাজে বাংলার বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছে, বাংলা থিয়েটারও তার শুরুর দিন থেকে এর ব্যতিক্রম হয়নি এবং আজও সেই বৈশিষ্ট্য অপ্রতিহতভাবেই তার প্রভাব অটুট রেখেছে।

১৮৭২ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছর বাংলা দেশের থিয়েটার যাঁদের নিয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁরাই একের পর এক নানা রঙ্গামঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এক ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনাল দল ভেঙেই স্টার, এমারেল্ড, সিটি ও মিনার্ভা জন্ম নিয়েছিল। বিশিষ্ট মঞ্চরূপকার ধর্মদাস সুর তাঁর আত্মজীবনীতে (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত নাট্য-মন্দির পত্রিকায় প্রকাশিত) লিখেছেন, 'আমার চেষ্টায় ও ভুবন মোহন নিয়োগীর পয়সায় বিডন স্ট্রীটে মহেন্দ্রনাথ দাসের জমি ভাড়া লইয়া (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) এক কাঠের ঘর নির্মাণ করি, উহার নাম দেওয়া হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।'

এ তো গেল ১৮৭৩ সালের কথা। গিরিশচন্দ্র অবশ্য গোড়াতে ছিলেন না, পরে গ্রেট ন্যাশনালে যোগ দেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ঠিকানা ছিল ৬ নম্বর বিডন স্ট্রিট। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম দিকের কয়েকটি নাটকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪)'মৃণালিনী' (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' (৩ অক্টোবর, ১৮৭৪) উল্লেখ করার মতো। ৬ নম্বর বিডন স্ট্রিটে যে জমির ওপর ভুবন মোহন নিয়োগী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খুলেছিলেন, সেই জমি সিমলার মহেন্দ্রনাথ দাসের কাছ থেকে লিজ নিয়ে সেখানেই মিনার্ভা থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এ সময়ে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গো স্টার থিয়েটারের কর্তাব্যক্তিদের যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল তার শর্ত ছিল এইরকম : স্টার গিরিশচন্দ্রকে আজীবন মাসে একশ' টাকা পেনশন দেবে, কিন্তু তিনি পাবলিক বা

প্রাইভেট থিয়েটারে যোগ দিতে বা তাদের কোনওরকম সাহায্য করতে পারবেন না। উভয়পক্ষের মধ্যে যিনি বা যাঁরা এই শর্ত ভঙ্গ করবেন, তাঁকে বা তাঁদের পাঁচ হাজার টাকা ড্যামারেজ দিতে হবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পক্ষে মাসে একশ' টাকা নিয়ে বাড়ি বসে থাকা অসহ্য হয়ে উঠল, স্টারের ব্যবহারেও তিনি মর্মাহত হলেন। এদিকে স্টারের অন্যতম অভিনেতা নীলমাধব চক্রবর্তী স্টারের বেশ কয়েকজন অভিনেতৃকে নিয়ে সিটি থিয়েটার নামে বীণা রঙ্গমঞ্চে ১৮৯১ সালের ১৬ মে থেকে ১৮৯২ সালের ৮ মে পর্যন্ত অভিনয় করেন। কিন্তু ছোট বাড়িতে হরেকরকম অসুবিধা দেখা দেওয়ায় তাঁরা একটা নতুন থিয়েটার বাড়ি তৈরির জন্য একজন ধনী ব্যক্তির খোঁজে ছিলেন। কারণ সে সময়ে ধনী ব্যক্তিরাই থিয়েটার গড়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। এমনই একজন হলেন নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। বাঙালির প্রথম শখের নাট্যশালার সৃষ্টিকর্তা পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র, তিনিই হলেন মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী। আর গিরিশচন্দ্র নগেন্দ্রবাবুর মধ্যস্থতায় স্টার থিয়েটারের কবল থেকে মুক্ত হলেন। যদিও সিটি থিয়েটারের অভিনেতৃদের দিয়েই মিনার্ভার সূত্রপাত, কিন্তু থিয়েটারের লভ্যাংশ নিয়ে নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গো নীলমাধববাবুর মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি কয়েকজনকে নিয়ে মিনার্ভার বাড়ি তৈরি শেষ হওয়ার আগেই মিনার্ভা ত্যাগ করেন। শেষে মিনার্ভা যখন খোলা হল, সিটির অনেককে তখন আর সে দলে দেখা গেল না। তাই বেশিরবাগ নতুন অভিনেতৃ, যেমন চুণীলাল দেব, নিখিলকৃষ্ণ দেব, বিনোদবিহারী ঘোষ, কুমুদনাথ সরকার, নীলমণি ঘোষ, তিনকড়ি দাসী প্রমুখকে নিয়ে মিনার্ভার দল গড়া হল। সিটি থিয়েটারের দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ), অঘোরনাথ পাঠক, এমারেল্ড থিয়েটারের পন্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য এলেন। ধর্মদাস সুর স্টেজ ম্যানেজার এবং দেবকণ্ঠ বাগচী অপেরা-মাস্টার হলেন। এর মাঝে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এমারেল্ড থিয়েটার ছেড়ে অন্যতম অভিনয়-শিক্ষক হয়ে মিনার্ভায় যোগ দেন।

বেশ কয়েকমাস রিহার্সাল দিয়ে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় প্রথম নাটক শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' অভিনয় ও পরিচালনা করলেন। 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রথম অভিনয় হল ১৮৯৩ সালের ২৮ জানুয়ারি। সেকালের বিশিষ্ট মঞ্চসজ্জাকার উইলার্ড সাহেব ও রূপসজ্জাকার পিম্ সাহেব এই প্রযোজনার সঙ্গো যুক্ত হলেন। 'ম্যাকবেথ'-এর অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কেননা, এই নাটককে অবলম্বন করে গিরিশচন্দ্র এদেশে অভিনয়ের ধারার বদল করলেন। দানীবাবু ম্যালকম, কুমুদ সরকার ব্যাঙ্কো, অঘোর পাঠক ম্যাকডাফ, প্রমদাসুন্দরী লেডি ম্যাকডাফ, তিনকড়ি দাসী লেডি ম্যাকবেথ এবং অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী অভিনয় করলেন ১ম ডাকিনী, বৃদ্ধ, ১ম হত্যাকারী ও ডাক্তার চরিত্রে। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় তিনকড়ি দাসীর অভিনয়ও সেদিন শিক্ষিত দর্শকদের বিস্মিত করেছিল। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইন্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার সম্পাদক এন. ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অভিনয়ের এবং নাটকের অনুবাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫, এই তিন বছরে যে তেরোটি নাটক অভিনীত হল তার বেশিরভাগ রচনাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের। এখানে একে একে 'মুকুল মুকুরা' (১১ মার্চ, ১৮৯৩), 'আবু হোসেন' (২৫ মার্চ, ১৮৯৩), 'নল-দময়ন্তী' ও 'আলাদিন' (৩০ জুন, ১৮৯৫), 'করমেতৈবাঈ' (৬ জুলাই, ১৮৯৫), 'প্রফুল্ল' (১৩ জুলাই, ১৮৯৫), 'পলাশীর যুদ্ধ' (১০ অগাস্ট, ১৮৯৫), 'জনা' (১২ জানুয়াবি, ১৮৯৬), 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬) ইত্যাদি নাটকের অভিনয় হয়।

তাঁর 'আবু হোসেন' নাটক সম্পর্কে একসময় স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'গিরিশবাবুর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।' অথচ মিনার্ভা থিয়েটার 'আবু হোসেন' অভিনয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করেছিল। আবু হোসেনের ভূমিকায় অভিনয় করেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন : 'প্রথম রাত্রে যখন অর্দ্ধেন্দুশেখর এই 'আবু'র ভূমিকা লইয়া মঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন এবং কৌতুক অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দর্শকগণকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিলেন তখন গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছিল, 'অর্দ্ধেন্দু, তোমার জুড়ি নাই, তোমার তুলনা কেবল তুমিই' (অর্দ্ধেন্দুশেখর পুস্তিকা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ)।' তবে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় এ নাটকের বিরূপ সমালোচনাও হয়েছিল।

মিনার্ভায় যেদিন 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় শুরু হল, সেইদিন থেকে প্রতিযোগিতায় স্টারও 'প্রফুল্ল' নাটকের

পুনরভিনয় আবম্ভ করল। মিনার্ভায় 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এই প্রথম, আর স্টারে যোগেশের ভূমিকায় তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য অমৃতলাল মিত্র। প্রথম রাতে দু'থিয়েটারেই জনসমুদ্র, আর পরের রাতে স্টারের দর্শক মিনার্ভায় ও মিনার্ভার দর্শক স্টারে আসে। এর আগে স্টারে 'প্রফুল্ল' অভিনয় হয়েছিল এবং গিরিশচন্দ্র সেখানে অমৃতলাল মিত্রকে যোগেশের অভিনয় দেখিয়েছিলেন, অমৃতলাল এই চরিত্রের অভিনয়ে প্রভূত খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু পুরনোকে কেমন করে নতুন ছাঁচে গড়তে হয় গিরিশচন্দ্র যোগেশের ভূমিকায় তা দেখালেন। নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'অমৃতলালের অভিনয়ে বুঝা যাইত যে 'যোগেশ' তাহার এই শোচনীয় অবস্থা মর্মে অনুভব করিয়া অভিনয় করিতেছে। গিরিশচন্দ্রের 'যোগেশ' দেখিয়া মনে হইত, কল্পনাতীত অবস্থান্তরের মধ্যে উপর্যুপরি আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রহারে হতচেতন হইয়া অবসাদে মোহে সব ডুবাইয়া দিয়াছে। অনুভব করিবার শক্তি বা হৃদয় তাহার নাই। এই যে অসহায়, এই যে আত্মবিস্মৃত, এই যে শোকাহত 'যোগেশ', গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে আমরা এই 'যোগেশ'কেই দেখিতাম। সে 'যোগেশে'র অন্তরের রুদ্ধবেগ উথলিয়া উঠিত 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' এই কথায়।' (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।)

ফলত প্রতিযোগিতায় মিনার্ভাই জয়মাল্য ছিনিয়ে নিল। শুধু তাই নয়, তিন বছরেই শহরের শ্রেষ্ঠ থিয়েটার হয়ে উঠল মিনার্ভা। মিনার্ভা থিয়েটারের সে সময়ে বিস্তর আয়। তাই আয় যত বাড়ছিল নগেন্দ্রবাবুর বাবুয়ানাও তত বাড়ছিল, ফলে তিনি বিপুল ঋণের জালে জড়িয়ে পড়লেন। দেনার দায়ে আগেই তিনি মিনার্ভা থিয়েটার প্রমথনাথ দাসের কাছে বন্ধক রেখেছিলেন, পরে বন্ধকী আট আনা অংশ বেচে দিয়েছিলেন। এইসব কারণে গিরিশচন্দ্র বেশ কয়েকদিন ধরে বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন, এরপর ১৮৯৬ সালের ২২ মার্চ 'ফণীর মণি ও পাঁচ কনে' নাটক অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা ছেড়ে দিলেন। ওই একই বছরে স্টার থিয়েটারে তিনি ড্রামাটিক ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র চলে যাওয়ার পব থেকেই মিনার্ভার চরম সংকট দেখা দেয়। শুধুমাত্র নিজের কর্তৃত্বে মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালনা অসম্ভব বুঝে নীলমাধব চক্রবর্তী ও তাঁর সিটি থিয়েটারকে মিনার্ভায় নিয়ে আসেন নগেনবাবু। তাঁরা ১৯৯৬ সালের ১১ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন মিনার্ভা মঞ্চে অভিনয় করেন। এরপর মিনার্ভা সাড়ে তিনমাসকাল বন্ধ থাকে। এই সময়েই নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় অপসারিত হন এবং গিরিশচন্দ্রের পিসতুতো ভাই দেবেন্দ্রনাথ বসু অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হন।

ওই একই বছরের ৩ অক্টোবর পুনর্গঠিত মিনার্ভার পুনরুদ্বোধন হয়। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, তিনকড়ি দাসী প্রমুখ এই সময়ে মিনার্ভাব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদিনের দা স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল :

GRAND RE-OPENING NIGHT
Actor's Benefit Night!!!
THE MINERVA THEATRE
SATURDAY, THE 3RD OCT,
AT 9 P.M. I. FANIR MANI — FANIR MANI
II. PANCH KONAY. NEXT DAY, SUNDAY,
AT 7 P.M.
JANA! JANA!! JANA!!! Sm. Tincouri Dasi
D.N. Basu, Asstt. Manager.

মিনার্ভা থিয়েটারের টিকিটের হার কেমন ছিল তার সঠিক তথ্য কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি, তবে অন্যান্য থিয়েটারের টিকিটের মূল্য অনুযায়ী টিকিটেব হার কী ছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। ১৮৮৮ সালের ২৩ মে 'ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত স্টারে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'নসীরাম' নাটকের উদ্বোধন-রাত্রির বিজ্ঞাপন লক্ষ করা যাক।

OUR HUMBLE DEBUT!
AT THE NEW BUILDING
STAR THEATRE
CORNWALLIS STREET
1888
OPENING NIGHTS :
FRIDAY, THE 25TH, & SATURDAY
THE 26TH MAY at 9 p.m.
AND
SUNDAY, THE 27TH AT CANDLE LIGHT
NEW DRAMA
NASHIRAM
PRICES OF ADMISSION
Royal Box 9 (to seat 5)....Rs. 100/-
Box (to seat 4)....Rs. 14
Box (to seat 2)....Rs. 8
Dress Circle .... Rs. 4
Orchestra Stall .... Rs. 3
Stall .... Rs. 2
Pit - Re. 1
Gallery .... Rs. 8
Zenana Box 9 (to seat 4)....Rs. 10
Zenana .... Rs. 2
Tramcars will run after the close of the performances from the theatre to the Bow-Bazar Crossing
Fare - Six pice
Tickets can be secured at once from the
Box Office
AMRITALAL BOSE, Manager

পাঁচজনের জন্য নির্দিষ্ট রয়্যাল বক্সের টিকিট একশ টাকা পর্যন্ত যেমন ছিল, তেমনই জেনানা অর্থাৎ মহিলাদের জন্য ন্যূনতম দু'টাকার টিকিটও ছিল। গ্যালারির সিটের মূল্য ছিল আট টাকা, আবার পিটের টিকিট ছিল এক টাকা। অভিনয় শেষে যাত্রীদের সুবিধার্থে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যানবাহন, যেমন আমরা এই বিজ্ঞাপনে দেখতে পাচ্ছি, ট্রামেরও ব্যবস্থা ছিল। যথাসম্ভব শীঘ্র টিকিট সংগ্রহ করতেও বলা হত। আবার কোনও কোনও বিজ্ঞাপনে কোনও ফ্রি পাস বা কমপ্লিমেন্টারি দেওয়া হবে না, এমন কথাও বলা থাকত।

১৮৯৮ সালের ৩১ মার্চ নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ দাসের দেনার দায়ে মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ি হাইকোর্টে নিলাম হয়। খুলনার উকিল বেণীমাধব রায় ও অতুলচন্দ্র রায়, দু'জনে বাড়িটি কিনে নেন। এইভাবেই

থিয়েটারের স্বত্বাধিকার ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ঘটে। আর মাঝে মাঝেই মিনার্ভা বন্ধ হতে থাকে। ১৮৯৯ সালে হরিলাল মল্লিক মিনার্ভা ভাড়া নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ১১ মার্চ 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় শুরু করেন। এবারেও গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় বেশিদিন থাকলেন না। ১৮৯৯ সালের ২৬ মার্চ 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' ও 'আলাদীন' অভিনীত হওয়ার পর গিরিশচন্দ্র আবার মিনার্ভা ছেড়ে দিলেন। এবার শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার বেশি দাম দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার কিনে নিলেন। সুতরাং পরিচালন-ব্যবস্থায় অদল-বদল হল — নরেন্দ্রনাথ সরকার হলেন ডিরেক্টর, আর ম্যানেজার দুর্গাদাস দে। গিরিশচন্দ্র মাঝে কিছুদিন ক্লাসিকে থাকার পর নরেন্দ্রনাথের ডাকে মিনার্ভায় যোগ দিলেও আবার মনোমালিন্য, ফলে গিরিশচন্দ্র ছেড়ে দিলেন মিনার্ভা। শুধু এখানে ক্ষান্ত হল না মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালন-ব্যবস্থা। ১৯০৩ সালের ৭ নভেম্বর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মিনার্ভা থিয়েটার মেরামত করে, গ্যাসের বদলে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'রঘুবীর' নাটকের অভিনয় শুরু করলেন। রঘুবীরের ভূমিকায় অভিনয় করেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে যে 'CANDLE LIGHT' কথাটি ব্যবহার করা হত, তা কিন্তু সময় বোঝাতেই হত, কারণ অভিনয় মোমবাতির আলোয় নয়, গ্যাসের আলোয় হত। ইলেকট্রিক আলোর ব্যবহার শুরু হলেও প্রয়োজনে গ্যাস বা কেরোসিন জাতীয় আলোর ব্যবহারও থেকে গিয়েছিল। মিনার্ভা থিয়েটারের পজেসন বা দখলদারি নিয়ে আবার একটা হাঙ্গামা হল। অমরেন্দ্রনাথ তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের খবর পেয়ে পুলিসের সাহায্যে মিনার্ভার 'পজেসন' নিয়ে সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্লাসিকে নিয়ে গেলেন। পরে পুলিসি তদন্তে অমরেন্দ্রনাথেরই জয় হয়। কিন্তু মিনার্ভা নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ তাল সামলাতে পারলেন না, তাঁর লোকসান হল, সেইসঙ্গে বাড়িভাড়াও বাকি পড়তে লাগল। তবে অমরেন্দ্রনাথের সময়ে মিনার্ভা তার দলবল নিয়ে বিদেশেও অভিনয় করতে গিয়েছিল। এমনকি অমরেন্দ্রনাথের আমলে রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের কেদারনাথ চৌধুরীকৃত নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকটি 'প্রতাপাদিত্য' নামে অভিনয়ের সময়ে গিরিশচন্দ্রও মিনার্ভার ম্যানেজার ছিলেন। 'প্রতাপাদিত্য' নাটকটি অভিনীত হয় ১৯০৪-এর ১০ জানুয়ারি।

থিয়েটার পরিচালনার আর্থিক অসঙ্গতির জন্য অমরেন্দ্রনাথ প্রায়ই সেই সময়ের ধনী কনট্রাক্টর মনোমোহন পাঁড়ের কাছে ঋণ নিতেন। ক্রমে সে ঋণের পরিমাণও বাড়তে লাগল। এইরকম বিপন্ন অবস্থায় ১৯০৪ সালের ২৭ জুলাই মিনার্ভার বাকি দু'বছরের লিজ অমরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া করে মনোমোহন পাঁড়েকে হস্তান্তর করলেন। তিনি অভিনেতা চুণীলাল দেবকে মিনার্ভা সাবলিজ দিলেন মাসিক সাতশ' পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায়। চুণীবাবু অধ্যক্ষ ও পরিচালক হয়ে মিনার্ভার অভিনেতৃদের সঙ্গে শেয়ারের ব্যবস্থা করে থিয়েটার পরিচালনা করতে লাগলেন।

থিয়েটারে দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সময় থেকে উপহার দেওয়ার রীতি ছিল। এবার মিনার্ভাও তাদের প্রযোজনায় দর্শকদের আকৃষ্ট করার তাগিদে বই উপহার দিতে শুরু করল। মিনার্ভার এই বই উপহার থিয়েটারে সর্বপ্রথম, কেননা চুণীলাল দেবের বন্ধু 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলেন। অতুলকৃষ্ণের মিত্রের গ্রন্থাবলি উপহার হিসেবে দেওয়া হত।

পাঠকের মনে হতে পারে, মিনার্ভা থিয়েটারের ইতিহাস কেবল দলাদলি আর দলভাঙার ইতিহাস। আবার এটাও লক্ষ করতে হবে যে, কোনও থিয়েটারের স্থায়িত্ব নিয়ে যখন গেল গেল রব উঠছে তখন কোনও না কোনও ব্যক্তিত্ব এসে থিয়েটারের উদ্ধারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, তাই হয়তো এখনও আমরা থিয়েটারকে নিয়ে চলতে পারছি। ফিরে আসা যাক মিনার্ভার কথায়। এই নবগঠিত মিনার্ভা দলও ভেঙে গেল, চুণীলাল দেব চলে গেলেন। ফলে আবারও গিরিশচন্দ্র। সেই সময়ে এই একটি মানুষকে ঘিরে থিয়েটারের পালাবদল যেমন চলছিল তেমনই নতুন নতুন থিয়েটারেরও জন্ম হচ্ছিল। কিন্তু এবার গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' ১৯০৫ সালের ৮ এপ্রিল অভিনীত হওয়ার পর তা মিনার্ভায় থিয়েটারের মর্যাদাকে বিশেষভাবে বাড়িয়ে দিল। এই প্রযোজনার সময় থেকে উপহার দেওয়া প্রথা উঠে গেল। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ভারতীয় রঙ্গামঞ্চ গ্রন্থে লিখেছেন : 'বলিদানে'র প্রথম রাত্রির বিক্রয় ২৮৬। ক্রমে ষষ্ঠ

রাত্রিতে ৫৪৪ পর্যন্ত হয়। তারপরে ক্রমে বাদুড় ঝুলিত।'

ইতিমধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক তখন অভিনীত হতে শুরু করেছে। স্টার তখন দ্বিজেন্দ্রলালের ইতিহাসমূলক নাটক 'রাণাপ্রতাপ' অভিনয় করছে। স্টারের বিশিষ্ট অভিনেতৃ তালিকায় তখন অমৃতলাল মিত্র ও অমৃতলাল বসু রয়েছেন। এখানে বলা প্রয়োজন, স্টার থিয়েটারের বরাবরই একটা আলাদা ঐতিহ্য ছিল, পড়তি সময়েও কখনও এরা সারা রাত্তির অভিনয় করেনি বা উপহার দিয়ে থিয়েটারের ঐতিহ্যকে নষ্ট করেনি। তা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গো সম্পর্ক ভালো রইল না। অগত্যা দ্বিজেন্দ্রলাল স্টারের সঙ্গো প্রতিযোগিতায় মিনার্ভায় 'রাণাপ্রতাপ' নাটকের অভিনয়ের নিমিত্ত মিনার্ভার সঙ্গো সম্পর্ক গড়লেন।

'রিহার্স্যাল আরম্ভ হইল। তখনকার সে রিহার্স্যাল — সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সম্মুখের চেয়ারে গিরিশচন্দ্র, — পুরুষ সিংহ, পার্শ্বে দ্বিজেন্দ্রলাল, শান্ত-সৌম্য-সুন্দর; তাঁহার সঙ্গে তাঁহারই দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু; একপার্শ্বে একটা কাঠগড়ার মত উঁচু স্ট্যান্ড, তাহাতে ভর দিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর দাঁড়াইয়া; জমজমাট আসর — দক্ষিণে বামে আমরা অভিনেতারা সুবোধ ছাত্রের মত বসিয়া — কিছু দূরে সম্মুখের ফরাসে অভিনেত্রীদল। সূচীপতনেরও শব্দ হয়, স্থান এমনই নিস্তব্ধ। গিরিশচন্দ্র রিহার্স্যালে বসিলে রিহার্স্যালের আসর এমনি জমিয়া উঠিত। গিরিশচন্দ্র যে রিহার্স্যালের আসরে, সেখানে তদানীন্তন কত মহা মহা রথী, কত সাহিত্যিক, কত নাট্যকার এবং কত সমালোচককে কতদিন এমনি বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। হায়! বাঙ্গলা থিয়েটার সে গৌরবের আসর আর কখনও দেখিবে কি না কে জানে।' (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৩৪০ বঙ্গাব্দ)

তবে এমন গৌরবের আসর বাংলা থিয়েটার নিশ্চয়ই দেখেছিল, কারণ যুগে যুগে প্রখ্যাত অভিনেতৃবর্গের পার্ষদ তালিকা তার সাক্ষ্য বহন করছে।

১৯০৬ সালে মিনার্ভা থিয়েটারকে বৈদ্যুতিক পাখা দিয়ে সাজানো হল। এ প্রসঙ্গো ২৮ এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ জানালেন : 'For the Convenience of the audience in this sultry weather the entire pavilion has been fitted up with Electric Fans at an enormous cost.' (বঙ্গা রঙ্গামঞ্চ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর . শঙ্কর ভট্টাচার্য। ১৩৯৮)

এই বছরের ৯ জুন রাত্রে মিনার্ভায় 'সিরাজদ্দৌলা'র আটাশতম অভিনয়ে বালগঙ্গাধর তিলক, খাপার্দে, ড. মুঞ্জে এবং অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাজিরার সংবাদ মিনার্ভা থিয়েটার বেঙ্গালি কাগজে (৯ জুন, ১৯০৬) জানালেন :

The Minerva Theatre
6, Beadon Street, Calcutta
Saturday the 9th June at 9 P.M. sharp
The Twenty-Eighth performance of
G. C. Ghosh's Historical Drama
SERAJUDDOWLA
Karim—Girish Chandra Ghosh
Next-day, Sunday, at Candle-light
I. Bankim Chandra's grand master-piece
DURGESH NANDINI
OR
The Chieftain's Daughter
II. ALIBABA
III. THE MINERVA BIOSCOPE

All new pictures throughout

A. S. Mustafi, **G. C. Ghosh**

Master **Manager**

"In honour of the venerable Moharastra Patriots Sirjut Balgangadhar Tilak of Poona, Sri Krishna Kaparde of Amraoti, Dr. Munje of Nagpore and other distinguished and renowned visitors who have kindly consented to grace our pavilion with their presence."

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এল ঐতিহাসিক নাটকের যুগ। কেননা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে দেশাত্মবোধক, ঐতিহাসিক নাটক তখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস প্রথম দিকে তেমন চলেনি, কিন্তু এই সময় সেগুলি হইহই করে পূর্ণমঞ্চস্থ হতে লাগল। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নতুন নতুন ঐতিহাসিক ও দেশাত্মবোধক নাটক লিখতে লাগলেন। অবশ্য ঐতিহাসিক নাটকে প্রকৃত যুগান্তর নিয়ে এসেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর 'দুর্গাদাস' নাটক (৮ ডিসেম্বর, ১৯০৯) দানীবাবুর অভিনয়গুণে মিনার্ভা থিয়েটারে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক 'সাজাহান' প্রথম অভিনীত হয় ১৯০৯-এর ২১ অগাস্ট। এই দেশাত্মবোধক নাটকের যুগ চলে ১৯১২ পর্যন্ত, কারণ গিরিশচন্দ্র ১৯১২ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯১৩-তে মারা যান। এঁদের মৃত্যুর পর তেমন চমকপ্রদ দেশাত্মবোধক নাটক আর পাওয়া যায়নি।

১৯০৮ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে মিনার্ভায় যে সমস্ত নাটকের অভিনয় হয়েছে তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' (১৪ মার্চ, ১৯০৮), 'সোরাব রোস্তম' (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮), গিরিশচন্দ্রের 'শাস্তি কি শান্তি' (৭ নভেম্বর) , দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' (২৬ ডিসেম্বর, ১৯০৮), 'সাজাহান' (২১ অগাস্ট, ১৯০৯), গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য' (১৫ জানুয়ারি, ১৯১০), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রশেখর' (১৫ মে, ১৯১০), ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাংলার মসনদ' (২ জুলাই, ১৯১০), গিরিশচন্দ্রের 'রাজা অশোক' (৩ ডিসেম্বর, ১৯১০), ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলিন' (৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১১), Richard Brinsley Sheridan-এর 'The School for Scandal' অবলম্বনে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'রকমফের' (১৭ জুন, ১৯১১), দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' (২২ জুলাই, ১৯১১), গিরিশচন্দ্রের 'তপোবল' (১৮ নভেম্বর, ১৯১১) ও 'গৃহলক্ষ্মী' (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯১২) খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকটির চারটি অঙ্ক লিখতে পেরেছিলেন, পঞ্চম অঙ্কটি দেবেন্দ্রনাথ বসু গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর লেখেন। তার প্রথম অভিনয়ের রাতে গিরিশচন্দ্রের নামই বিজ্ঞাপিত হয়। এরপর ১৯১৩ সালের ২০ মে মিনার্ভা থিয়েটারের 'ড্রামাটিক ডিরেক্টর' হন অমৃতলাল বসু। এর মাঝে মনোমোহন পাঁড়ে ১৯০৫-এ মিনার্ভা থিয়েটার ষাট হাজার টাকায় কিনে নিয়েছিলেন এবং পাশে একটি হোটেল তৈরি করে তাঁরই পরিচিত মহেন্দ্রকুমার মিত্রকে ওয়ার্কিং পার্টনার করে নেন। এরপর ১৯১১ সালে তিনি থিয়েটাবের এক-তৃতীয়াংশ মহেন্দ্রকুমার মিত্রকে বিক্রি করে দেন। পরে মনোমোহনবাবুর কাছে মহেন্দ্র মিত্র থিয়েটারটি দশ বছরের লিজ নিলেন। ফলে সে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা গিরিশচন্দ্র এসে সামাল দিয়েছিলেন, কিন্তু তা বেশি দিনের জন্য নয়। এদিকে ১৯১২ সালের ১৮ মে মহেন্দ্রকুমার মিত্রের উত্তরাধিকারীদের আপত্তি সত্ত্বেও মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা থিয়েটারের দখল নেন এবং নিজেকে প্রোপ্রাইটর বলে বিজ্ঞাপিত করেন। তখন মহেন্দ্রকুমার মিত্রের তরফে আদালতে মামলা করা হয়, আর এই মামলায় সম্ভাব্য হার আঁচ করতে পেরে মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা থিয়েটারকে তাঁর কোহিনূর থিয়েটারের (মনোমোহনবাবু ১৯১২ সালের ২৭ জুলাই কোহিনূর থিয়েটার এক লক্ষ এগারো হাজার টাকায় কিনেছিলেন) বাড়িতে নিয়ে যান। ফলে মিনার্ভার শিল্পীরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন, কেবল অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। তখন তাঁকে নিয়ে মহেন্দ্রকুমারের অনুজ উপেন্দ্রকুমার ও মনোমোহন পাঁড়ের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়ে যায়। নিরুপায় অমরেন্দ্রনাথ স্টারের সঙ্গে নতুন চুক্তি করেন। নতুন মিনার্ভার ম্যানেজার হন দানীবাবু। মিনার্ভা থিয়েটারের নাম ব্যবহার করায়

মনোমোহনবাবুর বিরুদ্ধে মামলা করেন উপেন্দ্রকুমার। মামলায় জয়লাভ করে উপেন্দ্রকুমার পুরনো রঙ্গমঞ্চে (৬ নম্বর বিডন স্ট্রিট) মিনার্ভা থিয়েটারকে সরিয়ে আনলেন, আর এবার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন ম্যানেজার।

ওদিকে মনোমোহন হেরে গিয়ে তাঁর থিয়েটারের নাম রাখলেন মনোমোহন থিয়েটার। কোহনুর রঙ্গমঞ্চে এই মনোমোহন থিয়েটার ১৯১৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে দানীবাবুকে ম্যানেজার করে তার কাজ শুরু করে। কিন্তু অভিনেত্রী তারাসুন্দরী ও অভিনেতা প্রিয়নাথ ঘোষ, যাঁরা মনোমোহনের পক্ষে ছিলেন, মিনার্ভায় ফিরে আসেন। মিনার্ভার প্রোপ্রাইটর হিসেবে উপেন্দ্রকুমার মিত্রের নাম বিজ্ঞাপিত হয়। মাঝে অভিনেত্রী নরীসুন্দরী স্টার ছেড়ে মিনার্ভায় কিছুদিন অভিনয় করে আবার স্টারে ফিরে যান। ১৯১৫ সালের ২ অক্টোবর দ্বিজেন্দ্রলালের 'সিংহল বিজয়' নাটক দিয়ে মিনার্ভার নতুন করে অভিনয় শুরু হল। অপরেশচন্দ্র সিংহবাহুর ভূমিকায় অভিনয় করলেন। এই সময়ে বিভিন্ন রাজবাড়ি থেকে অভিনয়ের আমন্ত্রণ আসায় মাঝে মাঝে মিনার্ভা থিয়েটার বন্ধ থাকত। যেমন, ১৯১৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ মিনার্ভা বন্ধ ছিল, কারণ ওই সময়ে দিনাজপুর রাজবাড়িতে বায়না ছিল। কখনও কখনও নাটকের বদলে বিভিন্ন জনপ্রিয় নাটকের দ্বৈত ও সমবেত সংগীত পরিবেশনেরও আয়োজন করেছে মিনার্ভা থিয়েটার। সময়ে সময়ে যে সমস্ত গুণীজন মিনার্ভা থিয়েটার গড়ার কাজে যুক্ত ছিলেন তাঁদের এবং অন্য অভিনেতৃদের Benifit Night-এর আয়োজন করে মিনার্ভা থিয়েটার। যেমন : '১১ অগাস্ট 'রাণাপ্রতাপ' ও 'ভগীরথ' (পঞ্চদশ অভিনয়)। এইদিন কবি রজনীকান্ত সেনের Benefit Night ছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন :

Benefit Night!
Benefit Night!
MINERVA THEATRE
6, Beadon Street
Thursday, the 11th August at 8-20 p. m.
Special performance in aid of the well known Poet Babu Rajani Kant Sen, now lying seriously ill at the Medical College Hospital
Mr. D. L. Roy's National Drama
RANAPRATAP
Protap Singha—Surendra Nath Ghosh
Meherunnisa—Sm. Sushilabala
To be followed by
VAGIRATH
Laugh and humour from start to finish. Babu Girish Chunder Ghose will read a short paper on the sick poet before the commencement of the performance
G. C. Ghose, Manager.'

[বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান ১৯১০-১৯১৯: শঙ্কর ভট্টাচার্য। ১৯৯৬]

১৯১৯ সালের ৫ জুলাই বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের নাটক 'মিশরকুমারী'র অভিনয় শুরু হয়। বিভিন্ন চরিত্রে, যেমন

আবন — কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, রামেসিস — হাঁদুবাবু, নাহেরিন — সুশীলাসুন্দরী, সামন্দেশ — প্রিয়নাথ ঘোষ প্রমুখ অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের প্রচুর অর্থ উপার্জিত হয়। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিনার্ভার কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন :

৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
২১ জুলাই, ১৯১৯, কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'মিশরকুমারী' এবং 'কিন্নরী' দুটি নাট্যাভিনয় দেখে আমি বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। যাঁরা 'মিশরকুমারী' দেখবেন তাঁদের স্বীকার করতেই হবে যে মিনার্ভায় নাট্যশিল্পকে স্থান দেবার বিশেষ চেষ্টা চলছে। দেশ কাল পাত্র বিশেষে যথোপযোগী দৃশ্যপট ও সাজগোজ এবং সরঞ্জাম যথাসম্ভব ঠিক রেখে দর্শকের চোখে নিপুণভাবে ধরা বাংলা থিয়েটার মিনার্ভাতেই প্রথম দেখছি। অভিনয় কালে পাত্রপাত্রীগণের চারিদিকটা ফাঁকি এবং ফাঁক না রেখে যথোপযোগী আসবাবপত্র শোভা সৌন্দর্যে মনোরম করে তোলা 'মিশরকুমারী'তেই প্রথম দেখলাম। এজন্য আপনাদের রঙ্গপীঠের অধ্যক্ষ ও শিল্পীগণকে প্রশংসা না করে থাকতে পারলেম না।

ত্বদীয়
শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান ১৯১০-১৯১৯: শঙ্কর ভট্টাচার্য। ১৯৯৬]

মিনার্ভা থিয়েটারের নূতন ষ্টেজের
ড্রপসিনের বিজ্ঞাপনের জন্য
এখন হইতে স্পেস্ কন্ট্রাক্ট করা হইতেছে।
নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্যাদির জন্য
আবেদন করুন ;
বিলম্বে ভাল স্থান পাইবেন না।
শিশির পাবলিশিং হাউস—
বিজ্ঞাপন বিভাগ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

শিশির, ১৯ বৈশাখ, ১৩৩২

১৯২২ সালে বাংলার নাট্যআন্দোলনের নতুন যুগে মিনার্ভায় যোগ দিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র। এই বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি মিনার্ভা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক মঞ্চস্থ হল। নরেশচন্দ্র মিত্র চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এন্টিগোনাস, হাঁদুবাবু চন্দ্রগুপ্ত, আর মুরার চরিত্রে অভিনয় করেন সুশীলাসুন্দরী। উপেন্দ্রকুমার মিত্রের প্রযোজনায় মিনার্ভা আবার যেন ঝলসে উঠল।

এরপর 'সাজাহান' অভিনীত হল। নাট্যানুরাগী জনসাধারণ নরেশ মিত্রের মধ্য দিয়ে সাজাহানের নতুন রূপে বিস্মিত হলেন। ঔরঙ্গজেব চরিত্রে রাধিকানন্দও কম কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন না। ১৯২২-এর জুন মাসে নাটককার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা'য় রাধিকানন্দ প্যালারাম আর নরেশচন্দ্র মি. জেকব চরিত্রে অভিনয় করলেন। কথায়-চলনে-পোশাকে অর্ধেন্দুশেখরের পর খাঁটি সাহেবের ছাপ আঁকলেন নরেশ মিত্র। তদানীন্তন সরকার ২৯ জুলাই নাটকটি বাজেয়াপ্ত করে। আরও কয়েকটি নাটক অভিনীত হওয়ার পর ১৯২২ সালের ১৮ অক্টোবর মিনার্ভা থিয়েটার আগুনে পুড়ে যায়। উপেন্দ্রকুমার মিত্র বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। তবু তিনি মিনার্ভার দল ভেঙে দেননি। কী কারণে মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে গিয়েছিল তার কিন্তু কোনও সঠিক তথ্য কোথাও পাওয়া যায়নি। তবু অনুমান, ইলেকট্রিক আলোর ব্যবহার সত্ত্বেও গ্যাসের আলোর ব্যবহারও যে ছিল না তা বলা যাবে না। অসাবধানতাবশত আগুন লেগে থাকতেই পারে। মিনার্ভা থিয়েটার নতুনভাবে গড়ে ওঠা পর্যন্ত উপেন মিত্র মফস্বলে অভিনয় দেখিয়ে দল বাঁচিয়ে রাখেন। মাঝে মাছে আলফ্রেড থিয়েটার ভাড়া নিয়েও অভিনয় করেন। এই সময়ের একটি নাটকের কথা উল্লেখ করতেই হয়। তা হল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাহিনী 'ডালিম'-এর নাট্যরূপ, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের দেওয়া। তখন বিজ্ঞাপন ছিল এইরকম :

স্বপ্নাতীত সংবাদ! কল্পনাতীত আয়োজন!
মিনার্ভায় — চিত্তরঞ্জনের 'ডালিম' আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে।
যাহা কেহ কখনও কল্পনাও করিতে পারেন নাই; —
মিনার্ভার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ তাহাই সম্ভব হইল।
— চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য সাধনার ফল — "ডালিম"!

কথা সাহত্যে চিত্তরঞ্জনের একমাত্র দান — করুণরসসিঞ্চিত মর্মস্পর্শী কাহিনী 'ডালিম' সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত কর্তৃক অপূর্ব নৈপুণ্যসহকারে নাটকাকারে গ্রথিত —তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ — চিত্তরঞ্জনের সেই "ডালিম"। —

যাই হোক, ১৯২৫-এর অগাস্টে ৬ বিডন স্ট্রিটে নতুনভাবে তৈরি মিনার্ভা থিয়েটারের নতুন জীবন শুরু হল, তাই আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে মিনার্ভা থিয়েটারের শেষ সপ্তাহ এবং নবনির্মিত নাট্যভবনে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে শ্রেষ্ঠ নাটকাবলির পুনঃপ্রদর্শনের আয়োজন করে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। তখন মিনার্ভা থিয়েটারের নতুন ভবনের সংবাদ জানিয়ে বিভিন্নরকমের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন :

দেশবাসীর শুভকামনার ফলে
অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ
মিনার্ভা থিয়েটার
নবনির্ম্মিত হর্ম্ম্যে — নবদৃশ্যপটাদি
সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চে
শীঘ্রই আপনাদের পদধূলি দান প্রার্থনা করিবে

সে সময়ে থিয়েটারে ড্রপসিনে যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রথা চালু ছিল, মিনার্ভা থিয়েটার এ প্রসঙ্গেও পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল (বাঁ পাশের ছবি)।

আবার দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের নতুন ভবনের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কর্তৃপক্ষ পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। যেমন —

"হে দুর্দ্দিনের বন্ধুবর্গ। দুর্দ্দিনে আপনাদের মনের মত আদরযত্ন করিবার সুবিধা ও সুযোগ পাই নাই, আজ সুদিন আসিয়াছে, এসময়ে দয়া করিয়া নব রঙ্গালয়ে আসিয়া আমাদের আদর যত্ন গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন।"

আবার —

"মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্রাম গৃহ নির্মিত হইয়াছে। যাহাতে শিশুদের নিরাপদে গদিমোড়া খাটে শোয়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে মহিলারা অভিনয় দেখিতে পারেন তাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।"

১৯৩০ সালে অহীন্দ্র চৌধুরী চলে আসেন মিনার্ভা থিয়েটারে। মিনার্ভায় তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে 'মিশরকুমারী' নাটকে (এপ্রিল, ১৯৩০) আবন, 'বেহুলা' নাটকে (৩০ অগাস্ট, ১৯৩০) চন্দ্রধর, শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' নাটকে (৯ অক্টোবর, ১৯৩১) কৈলাসখুড়ো, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য'-তে (২ অগাস্ট, ১৯৩২) ভবানন্দ, 'দেবযানী' (১০ ডিসেম্বর, ১৯৩২) নাটকে শুক্রাচার্য।

এরপর তিনি অবশ্য শুধু মিনার্ভায় নয়, অন্যান্য মঞ্চ যেমন স্টার, রঙমহল, নাট্যনিকেতন, মিনার্ভা এবং ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের সঙ্গে ফার্স্ট এম্পায়ার মঞ্চে অনেক নাটকে অভিনয় করেন। এই সময়েই অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে আসে শকট-মঞ্চ ও ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। প্রথমটি হয় প্রবোধচন্দ্র গুহের নতুন থিয়েটার নাট্যনিকেতনে (পরে শ্রীরঙ্গম এবং এখন বিশ্বরূপা)। ১৯৩৯ সালে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রবর্তন হয় নাট্যনিকেতনে। শকট-মঞ্চ হল রেলের মতো লাইনে ঠেলে ঠেলে দৃশ্য সরানো। আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চে চাকার সাহায্যে ঘুরিয়ে দৃশ্য পাল্টানোর সুযোগ ঘটে গেল। তবে মিনার্ভায় ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু পর্দায় আঁকা দৃশ্যগুলি ওপরে গোটানো থাকত এবং ধীরে ধীরে তা নেমে আসত, বলা হত রোল সিন। শকট-মঞ্চ সব থিয়েটারেই চালু ছিল।

১৯৫০ সালে অহীন্দ্র চৌধুরী পুনরায় মিনার্ভায় ফিরে এসে শচীন সেনগুপ্তের নাট্যরূপ 'দেবদাস' (১৬ জুন, ১৯৫০) নাটকে বসন্ত চরিত্রে অভিনয় করেন। এই মিনার্ভাতেই শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর কালজয়ী অভিনয় সিরাজের সহচর ভাঁড় গোলাম হোসেনের চরিত্রে অভাবিত রসারোপ করে। চরিত্রটি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন : 'নিজের বিচার নিজে করা যায় না। তবে আমার আনন্দ এই যে আমি সেদিন অজস্র দর্শকের অভিনন্দন পেয়েছিলাম। আমার শিল্পীমন শুধু সেইটুকুই তো চায়।' (নিজেরে হারায়ে খুঁজি : অহীন্দ্র চৌধুরী। দ্বিতীয় পর্ব। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ)

১৯৪০ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে 'মিশরকুমারী' নাটকে সম্মিলিত অভিনয়ের পর বাংলা থিয়েটারে আবার ঐতিহাসিক ঘটনা শিশির-অহীন্দ্র সম্মেলন। অভিনীত হল বেশ কয়েকখানি পুরাতন নাটক।

১৯৫৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনেতৃ সঙ্ঘ আয়োজিত দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে সাজাহানের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে জীবনের শেষ অভিনয় করলেন। এই অভিনয়ে নটসূর্য ছবি বিশ্বাস 'ঔরঙ্গজীব' চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৪৪ সালের ১১ মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' নাটকে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় শুরু। পরে ১৯৪৫-এ তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' নাটকে নুটুবিহারী চরিত্রে অভিনয় করেন। এই একই চরিত্রে নাট্যভারতীর হয়ে ১৯৪২ সালে অভিনয় করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৯ জানুয়ারি ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটারে মন্মথ রায়ের 'জীবনটাই নাটক' মঞ্চস্থ হয়। এরপর ছবি বিশ্বাস আর স্থায়ীভাবে কোনও থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবে ছবি বিশ্বাস যে যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন সেইসব চরিত্রে তাঁর সমসাময়িক কালের অন্য কোনও অভিনেতার পক্ষে অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি।

মিনার্ভা থিয়েটার প্রসঙ্গে এই সময়ে আরও একজন বিশিষ্ট নাটককার ও পরিচালকের কথা স্মরণ করতেই হবে, তিনি হলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। ১৯৩৭-এর ১৮ জুন তাঁর নাটক 'গয়াতীর্থ' অভিনীত হল। এই নাটকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয়

করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সুর দিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। 'গয়াতীর্থ'র মঞ্চসাফল্য দিল্লি প্রবাসী মহেন্দ্র গুপ্তকে কলকাতায় নিয়ে এল। ১৯৩৮ সালের ৩ জুন স্টারে অভিনীত হল তাঁর নাটক 'চক্রধারী', আর ১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর মিনার্ভায় তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'অভিযান'। মুখ্য ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী। এর ঠিক দশ বছর পরে 'অভিযান' যখন 'বিজয়নগর' নামে মঞ্চস্থ হল তখন একই ভূমিকায় অভিনয় করেন মহেন্দ্র গুপ্ত। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে তাঁর নাটক 'দেবী দুর্গা'র গান রচনা ও সুরারোপ করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, এবং গান গেয়েছিলেন বিখ্যাত গায়িকা রাধারাণী দেবী।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চের এক হতমান সময়ে এসেছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তাঁরই প্রয়োগ-নৈপুণ্যে, সাংগঠনিক পারদর্শিতায়, দক্ষ অভিনয়ে শেষবারের মতো তীব্র তেজে জ্বলে উঠেছিল পাদপ্রদীপের আলো। হতমান সময় এই কারণেই যে মহাযুদ্ধশেষে রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা তখন থিয়েটার সুষ্ঠুভাবে চালানোর পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হয়ে উঠেছিল, সেই সঙ্গে সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় থিয়েটারও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তবে ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'এরাও মানুষ' নাটকটি দু'শ রাত্রির অভিনয় অতিক্রম করেছিল। তারপর ১৯৫৬ ও ৫৭ সালে একে একে দেখা গেছে 'মধ্যবিত্ত' (সন্তোষ সেন রচিত), কিছুদিনের জন্য 'জীবনরঙ্গ' (শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনীত), 'প্রত্যাবর্তন' (প্রশান্ত চৌধুরীর রচনা), 'কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণ' (কেদারলাল রায় রচিত), 'ড. শঙ্কর' (জলধর চ্যাটার্জী) ইত্যাদি। তবু যেন মিনার্ভার দৈন্যদশা কিছুতেই কাটছিল না। মাঝে মাঝেই মিনার্ভা থিয়েটার বন্ধ হয়ে যেত।

এমন যখন অবস্থা, তখন, অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে এলেন উৎপল দত্ত ও তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপ (এল টি জি)। 'দেশ' পত্রিকায় (মার্চ, ১৯৯০) প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত বলেছিলেন, 'দশ বছর বন্ধ ছিল। শম্ভু মিত্র মাঝখানে 'রক্তকরবী' অভিনয়ের চেষ্টা করেছিলেন।' ঠিকই, পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে একবার বহুরূপী বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার 'ছেঁড়াতার' ও 'রক্তকরবী'র নিয়মিত অভিনয় মাত্র দু'মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছিল। পেশাদার মঞ্চের রীতি অনুসারে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার প্রচারও হয়েছিল। কিন্তু সফল হল না বলে পেশাদার মঞ্চের রুচিবদলের আশা তাঁরা ত্যাগ করলেন।' (উত্তর স্বাধীনতা : পেশাদার মঞ্চের পরার্ধ। প্রভাতকুমার দাস। নাট্যচিন্তা, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৬-১২, এপ্রিল-অক্টোবর ১৯৯৯) সুতরাং দশ বছর মিনার্ভা থিয়েটার বন্ধ ছিল না। তবে যেমনভাবে চলছিল তাতে 'মিনার্ভা থিয়েটার বন্ধ ছিল দশ বছর' কথাটি ভুল নয়।

লিটল থিয়েটার গ্রুপের পরিচালনাধীনে মিনার্ভা থিয়েটারের পুনরভ্যুদয় হল ২৭ জুন, ১৯৫৯। নাটক উৎপল দত্ত রচিত 'ছায়ানট'। এরপর ১ জুলাই এক সাংবাদিক বৈঠকে উৎপল দত্ত মিনার্ভার পরিচালনা প্রসঙ্গে যে ঘোষণাটি করেন সেটিই বিশেষ অভিনব এবং চিত্তাকর্ষক। তিনি জানালেন : 'মিনার্ভা শিল্পী নিয়োগ করবেন না, শিল্পীরাই মিনার্ভার মালিক হবেন। লভ্যাংশ শিল্পী সমবায়ের প্রাপ্য। এমনকি প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক কর্মী, আলোক শিল্পী, বুকিং ক্লার্কও এই সমবায়ের অন্তর্গত এবং সম-অংশীদার। ভিন্ন মালিকের লাভের প্রশ্ন না থাকাতে কোন নাটকের ভাগ্য শুধু টিকিট বিক্রির ওপরেই নির্ভর করবে না। তাছাড়া এর ফলে নাট্যাভিনয়ে অনেক নতুন চিন্তাধারার সুযোগ আনবে। দেশের এবং বিদেশের অমর নাট্যসম্ভার এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে।' (যুগান্তর, ৩ জুলাই, ১৯৫৯)

ওই সাংবাদিক বৈঠকে মিনার্ভার নতুন নামকরণের প্রস্তাবও ওঠে, 'শিশির নাট্যমন্দির'। এ প্রসঙ্গে ৫ জুলাই ১৯৫৯, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে আমরা জানতে পারি : 'মিনার্ভা থিয়েটারের নূতন নাম হইবে : 'শিশির নাট্য-মন্দির'। গত শুক্রবার লিটল থিয়েটার দলের পক্ষ হইতে মিনার্ভার নব-উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করা হয়। লিটল থিয়েটার দলের মুখপাত্র সভায় বলেন যে লিজ গ্রহণের পর এই নাম পরিবর্তনে আইনের দিক হইতে বাধা উপস্থিত হইবে কি না তাহা এখনও তাহাদের অজ্ঞাত। আইনের বাধা না থাকিলে অচিরেই এই রঙ্গালয় নাট্যাচার্যের নামের সহিত যুক্ত হইবার সম্মান লাভ করিবে।'

'নাট্য মন্দির' নামটি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর একান্ত প্রিয় ছিল। এই কথা ভেবেই হয়তো মিনার্ভাকে নতুন প্রাণে

সঞ্জীবিত করার প্রয়াসে লিটল থিয়েটার গ্রুপ 'শিশির নাট্য-মন্দির' নামকরণে উদ্যোগ নিয়েছিল। সেদিনের সভায় পৌরহিত্য করেন ড. কালিদাস নাগ, সভায় বক্তৃতা করেন অহীন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু এল টি জি-র সেদিনের উদ্যোগ সফল হয়নি, থিয়েটারটি মিনার্ভা থিয়েটার নামেই আমাদের কাছে পরিচিত রইল। এছাড়াও সেদিনের সভায় প্রতিষ্ঠানের একখানি মুখপত্র প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁরা আশা প্রকাশ করেছিলেন।

শুরুতে প্রতি শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিনে 'ছায়ানট' এবং প্রতি বৃহস্পতিবার শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' (বাংলায়) অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকেই উৎপল দত্ত অনুভব করছিলেন নিজস্ব একটি থিয়েটার হলের, না হলে সত্যিকারের ভালো নাটক প্রযোজনা করা সম্ভব নয়। তখন বিশ্বরূপা আয়োজিত নাট্যোৎসবে মালিক রাসবিহারী সরকার উৎপল দত্তকে এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তা নিয়ে কথাবার্তাও চলছিল। কিন্তু উৎপল দত্তের বন্ধু নাটককার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় মিনার্ভার লেসি হওয়ার প্রস্তাবটি আনেন। তখন মিনার্ভার মালিক ছিলেন কস্তুরচাঁদ জৈন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেষ্ট কুণ্ডু। এই কেষ্ট কুণ্ডু ও উৎপল দত্ত হলেন যৌথ লেসি। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে (পূর্বোক্ত) উৎপল দত্ত বলেছেন : 'বৃহস্পতিবার আমরা 'ওথেলো' করতাম এবং অবাক হয়ে দেখতাম শেক্সপীয়রেই বেশী লোক হচ্ছে 'ছায়ানটে'র চেয়ে। অবশ্য শেষ শো'-র দিন 'ছায়ানট' হাউসফুল হয়েছিল। কিন্তু তারপর আমরা মারাত্মক ভুল করলাম, সেটা হচ্ছে 'নীচের মহল' (১৯৫৯)। 'নীচের মহল' আমরা শুরু করেছি আগেই। বাইরে করতাম, তখন মানুষ খুবই তার ... মানে অভিনন্দন জানাত। কিন্তু একটা পেশাদার নাট্যশালায় চলতে পারে না 'নীচের মহল' এটাই হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা। সাত/আটজন লোক বসে আছেন প্রেক্ষাগৃহে তবু আমরা অভিনয় করে যাচ্ছি এবং বিন্দুমাত্র যাতে শৈথিল্য না আসে সেদিকে কড়া নজর রাখছি। কেন না আমাদের কাছে খালি সিটও অত্যন্ত শ্রদ্ধার জিনিস এবং যে সাতজন কি আটজন বসে আছেন তাঁরা হচ্ছেন পরম পূজনীয়। যাই হোক্, তারপর আমরা শুরু করলাম 'অঙ্গার'। এই যে শিক্ষাটা পেয়েছিলাম জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, এই শিক্ষাটা কাজে লাগালাম। পেশাদার নাট্যশালায় দর্শককে নিয়ে এগোতে হবে তো। দর্শকের মাথার উপর দিয়ে চলে যায় এরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ভুল। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। আগে দর্শককে আনতে হবে, তারপর তাকে শিক্ষিত করতে হবে।'

মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গ্রুপের স্মরণীয় দিনটি হল ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৯। এই দিনই 'অঙ্গার' প্রথম অভিনীত হল, আর এই প্রযোজনার ওপর নির্ভর করেছিল মিনার্ভায় এল টি জি-র টিকে থাকার প্রসঙ্গ। সত্যিই তাই। 'অঙ্গার' পর্যাপ্ত অর্থ এনে দিল, মিনার্ভায়ও এল টি জি টিকে গেল। এল টি জি-র প্রাক-মিনার্ভা পর্বে যেহেতু কোনও বাঁধা মঞ্চ ছিল না, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্টেজে নাটক অভিনয় করতে হত, সেই কারণেই প্রযোজনার একটা ফ্লেকসিবিলিটি ও মবিলিটির কৌশল স্বভাবতই এল টি জি-কে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। এবং আধুনিক থিয়েটারের নানা প্রকার অনুষঙ্গ, সে মঞ্চ পরিকল্পনাতেই হোক বা অভিনয়ের কলাকৌশলেই হোক, নাটককে তার নিজস্ব ব্যাখ্যায় দর্শকের কাছে উপস্থাপন করাটাই ছিল এল টি জি-র মূল লক্ষ্য।

অসিত বসু তাঁর 'উৎপল দত্তের প্রযোজনা' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'আজকাল যাকে অনসম্বল অ্যাকটিং বলা হচ্ছে, বাংলা থিয়েটারে তার চূড়ান্ত রূপ উৎপল দত্তের প্রযোজনাতেই প্রতিফলিত। ধরা যাক্, মিনার্ভ পর্বে 'অঙ্গার' নাটকে খনি দুর্ঘটনার পর রেসকিউর দৃশ্য, কিংবা 'ফেরারী ফৌজ' (২৮ মে, ১৯৬১) নাটকে simultaneous setting-এর সুপ্রযোজিত অভিনয়ের অর্কেস্ট্রা, কিংবা 'কল্লোল' (২৯ মার্চ, ১৯৬৩) নাটকের ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তির দৃশ্যে ক্রাউড সিন, কিংবা 'মানুষের অধিকার'-এর পেইন্টরক স্টেশনে নিগ্রো যুবক হে-উড প্যাটারসনের লিঞ্চিং-এর দৃশ্য, বা 'অজেয় ভিয়েতনাম'-এর (৩১ অগাস্ট, ১৯৬৬) মালটি-মিডিয়া সেটআপের মঞ্চ, বহির্মঞ্চ (পর্দার সম্মুখভাগ) এবং ফিল্ম প্রোজেকশনের সমাহারে বিদ্যুৎগতি প্রযোজনা, অথবা 'তীর' (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৭) নাটকের মহাজন সত্যবান সিং-এর প্রাসাদ লুণ্ঠনের ম্যাগনাম ভিস্যুয়াল — এসবই বাংলা থিয়েটারের প্রযোজক উৎপল দত্তের স্বকীয় প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। মিনার্ভা পর্বে এসে নিজের নাট্যবোধের, নাট্যচেতনার ও নাট্যদর্শনের প্রতিফলনের সঠিক নাটক না পেয়ে

বাধ্য হয়ে প্রযোজক উৎপল দত্ত সৃষ্টি করেন তাঁর আর এক সত্তা নাট্যকার উৎপল দত্তকে, এবং প্রায় সূচনা-পর্ব থেকেই প্রযোজক উৎপল দত্ত তাঁর বলিষ্ঠ হাতে নাট্যকার উৎপল দত্তকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি পার করে ধীরে ধীরে সার্থকতার তুঙ্গে পৌছে দেন।' (নাট্য আকাদেমি পত্রিকা/৪, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪)

১৯৬৩ সালের ১০ মার্চ মিনার্ভায় অভিনীত হল এল টি জি-র নতুন নাটক 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এই নাটকে বিশিষ্ট নাটককার বিজন ভট্টাচার্য অভিনয় করেন। দর্শকের মাঝখান থেকে একটি পথ সোজা মঞ্চ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে এই প্রযোজনায় নতুনত্ব আনলেন উৎপল দত্ত। মিনার্ভার দর্শক হলেন অভিভূত। তিতাস চলেছিল একশ' রজনীর মতো। ১৯৬৩-তে 'ফেরারী ফৌজ' নাটকের জন্য উৎপল দত্ত সংগীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কার পান। এই সময়ে তাঁর পরিচালনায় 'ঘুম ভাঙার গান' ছবির কাজ শুরু হয়। 'কল্লোল' নাটক প্রযোজনার সময় 'দেশহিতৈষী' পত্রিকায় 'সংগ্রামের আর এক দিক' প্রবন্ধের জন্য উৎপল দত্ত গ্রেপ্তার হন। অন্যদিকে কিছু সংবাদপত্র 'কল্লোল' নাটকের বিজ্ঞাপন নেওয়া বন্ধ করে দেয়, শুরু হয় আন্দোলন। এই নাটকের প্রচারসচিব বিশিষ্ট আলোকশিল্পী তাপস সেনের 'কল্লোল চলছে চলবে' স্লোগান তখন লোকের মুখে মুখে। এরপর উৎপল দত্ত মুক্তি পান, মিনার্ভা থিয়েটারে 'কল্লোল'-এর বিজয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। এই নাটক শুধু সুনাম নয়, প্রভূত অর্থ উপার্জনেও সহায়ক হয়েছিল। তারপর ১৯৬৮ সালে দলে অভ্যন্তরীণ গোলমাল দেখা দিল। এই বছরের অগাস্ট মাস নাগাদ মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে এল টি জি মিনার্ভায় বেশি দিন টিকতে পারবে না। ধার দেনা, বদনাম, শত্রুপক্ষের উস্কানিতে ঋণ বেড়ে যেতেই লাগল। উৎপল দত্ত তখন কয়েকজনকে নিয়ে নতুন দল গড়লেন, 'বিবেক যাত্রা সমাজ'।

মিনার্ভায় উৎপল দত্তের পরিচালনায় একদিকে যেমন শেক্সপীয়রের নাটক 'রোমিও জুলিয়েট' (১৯৬০), 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন' (১৯৬৪), 'জুলিয়াস সীজার' (১৯৬৪) এবং ইংরেজিতে 'ওথেলো' (১৯৬৪) অভিনীত হয়েছিল শেক্সপীয়রের চারশতম জন্মবর্ষকে কেন্দ্র করে, তেমনই অন্যদিকে 'প্রফেসর মামলক' (১৮ এপ্রিল, ১৯৬৫), 'যুদ্ধং দেহী' (২৪ নভেম্বর, ১৯৬৮) 'লেনিনের ডাক' (১৬ নভেম্বর, ১৯৬৯) নাটকগুলিও অভিনীত হয়। এরপরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। ১৯৭১ সালে এল টি জি পর্ব শেষ হল, এবং এল পি এল টি বা পিপ্‌লস লিট্‌ল থিয়েটার, যার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালে। উৎপল দত্ত ও শোভা সেন, দু'জনেই তখন ছবির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ফলে মিনার্ভা থেকে পাততাড়ি গোটাতে হল। শোভা সেন লিখেছেন : '১৯৭১ সালের ২৮ জুলাই আমরা মিনার্ভা থিয়েটার পুরোপুরি ছেড়ে চলে এলাম। ছাড়ার আগে বাড়িওয়ালা কস্তুরচাঁদ জৈনকে জানিয়ে এলাম, আমরা আর চালাতে পারছি না, তাই ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওখানকার কর্মীরা থিয়েটার জবরদখল করে বসল। কয়েকজন বিরোধী শিল্পীদের নিয়ে ওরা 'অঙ্গার' মঞ্চস্থ করার তোড়জোড় শুরু করল। মামলা রুজু হয়ে গেল ওদের নামে, সাতজন কর্মী গ্রেপ্তার হল।' (স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লাল দুর্গ। শোভা সেন, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩)

বেশ কিছুদিন পর ১৯৭২ সালে মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদ প্রযোজিত ও অভিনীত '১৭৯৯' নাটক নিয়ে আবার এই থিয়েটারে অভিনয় শুরু হয়। নাটককার ও পরিচালক ছিলেন অসিত বসু। এই নাটকে আবহের দায়িত্বে ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। তবে নাটকটি বেশি দিন চলেনি।

সত্তরের দশকে রাজাবাজারের কাছে প্রতাপ মঞ্চে ভালোবাসার ব্লো-হট নাটক (ইংরেজি অ্যাডাল্ট ছবির বিজ্ঞাপনের অনুসরণে) 'বারবধূ' অভিনয় করে অসীম চক্রবর্তী ও তাঁর দল চতুর্মখ প্রভূত সাফল্যলাভ করেন। আর এরপর থেকেই বাণিজিক চূড়ান্ত সফলতার তাগিদে পেশাদার থিয়েটার হতে থাকে নিম্নগামী। ফলে নিষিদ্ধ জীবনের বিকৃতির ফাঁদে জড়িয়ে আশির দশকও কেটে যায় সর্বগ্রাসী হতাশার মধ্যে — মিনার্ভা থিয়েটারও বাদ যায়নি। মিনার্ভা থিয়েটারে একে একে সমর মুখার্জী পরিচালিত 'প্রজাপতি' (২৫ এপ্রিল, ১৯৭৪), 'ব্যভিচার' (৩০ মে, ১৯৭৬), 'প্রিয়ার খোঁজে' (২ নভেম্বর, ১৯৮০) ইত্যাদি নাটক অভিনীত হয়। এমনকি নব্বইয়ের দশকের শেষে যখন পেশাদার থিয়েটার অস্তিত্বহীন, বলা যায় প্রায়বিলুপ্ত, সেই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে 'এক্সজোন', 'সুহাগ', 'শুধু তোমাকে চাই' নামের নিছক বিকৃতরুচির কিছু নাটকেরও অভিনয় হয়।

আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়ের স্মারক পুস্তিকা 'আরব্ধ' (১৯৮৭) পত্রিকায় প্রকাশিত মঞ্চ পরিক্রমা থেকে আমরা জানতে পারছি, ১৯৮৭ সালে এই থিয়েটারের আসন সংখ্যা ছিল ৬৭৫টি, ১২টি সংরক্ষিত। ৮০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত হলভাড়া, অগ্রিম ২০০ টাকা। একটি ব্ল্যাক কার্টেন ও একটি সাইক্লোরামা। লোডশেডিংয়ে জেনারেটর নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যেদিন প্রথম মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়ে ম্যানেজার ক্ষিতীশ সরকারের সঙ্গে কথা বলি, তখন তিনি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরটি প্রসঙ্গে বলেন : সিঁড়ি ভেঙে গিয়েছে, তাই কাঠের পাটাতন দিয়ে পথ তৈরি করা হয়েছে যা কি না বিপজ্জনক। সুতরাং বুঝতেই পারছেন থিয়েটারটির অবস্থা এখন কী —। তবু তিনি এবং তাঁর মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদের ছাব্বিশজন সহকর্মীকে নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারকে সজীব রাখার প্রয়াসে সচেষ্ট রয়েছেন। ভাবলে অবাক হতে হয়, প্রত্যেক কর্মী অভিনয়ের দিনে কুড়ি টাকা করে পান। যদি কোনও কোনও সপ্তাহে বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার বাদ দিয়ে অন্যদিন অভিনয় থাকে তাহলে হল বাবদ সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে একশ' থেকে একশ' পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত তাঁরা পারিশ্রমিক পান। একসময় যে প্রখ্যাত অভিনেতারা এই থিয়েটারে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন, তার সাক্ষ্য বহনের নিমিত্ত সেইসব অভিনেতার কিছু ছবি বাইরে রয়েছে। কথায় কথায় ক্ষিতীশ সরকার বললেন, সে আমলের অনেক রোল সিন গোটানো অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে, তবে সর্বত্রই একটা ভেঙে-পড়া চেহারা। অথচ ভাবুন, যে মিনার্ভা থিয়েটারকে ঘিরে বিগত শতকে বাংলা নাটকে এক উল্লেখযোগ্য সময় সূচিত হয়েছিল, এই থিয়েটারে প্রযুক্ত এক নতুন রীতি বাংলা নাটকের চলার পথকে নিঃসন্দেহে বিকশিত করেছিল, শুধু তাই নয়, নাট্যশিল্পের ইতিহাসে মিনার্ভা থিয়েটার ছিল এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন — বাংলার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের এক বিচিত্র সাক্ষী ভগ্নপ্রায় ও হতশ্রী সেই মিনার্ভা থিয়েটার এখন সরকারি অনুগ্রহের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

যেসব বই ও পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে

গিরিশচন্দ্র । অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। স্বপন মজুমদার সম্পাদিত, ১৯২৭

অর্ধেন্দুশেখর। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ১৩২৭ বঙ্গাব্দ

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চৈত্র, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

বাংলা নাটক ও নাট্যশালা। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বঙ্গারঙ্গামঞ্চ ও অর্ধেন্দুশেখর। শঙ্কর ভট্টাচার্য। ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান। ১৮৭২-১৯০০। শঙ্কর ভট্টাচার্য। ১৯৮২। ১৯০১-১৯০৯। শঙ্কর ভট্টাচার্য। ১৯৯৪। ১৯১০-১৯১৯। শঙ্কর ভট্টাচার্য। ১৯৯৬। সম্পাদনা : অভিজিৎ ভট্টাচার্য

নিজেরে হারায়ে খুঁজি, দ্বিতীয় পর্ব। অহীন্দ্র চৌধুরী। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লাল দুর্গ। শোভা সেন। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

একশ বছরের নাট্য প্রসঙ্গ। দেবনারায়ণ গুপ্ত। শ্রাবণ, ১৩৮৯।

বাংলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র। অহীন্দ্র চৌধুরী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ১৯৫৭ সালের গিরিশ বক্তৃতামালা

বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা। দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

শিশির। বিভিন্ন সংখ্যা

চিত্রবাণী। শ্রাবণ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

দা স্টেট্‌সম্যান

শারদীয়া দেশ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

রূপমঞ্চ। বিভিন্ন সংখ্যা

দেশ, মার্চ (১৯৯০)

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা/৪। সেপ্টেম্বর ১৯৯৪
আজকাল। ১৭ নভেম্বর, ১৯৮৪
নাট্যচিন্তা। বর্ষ ১৭। সংখ্যা ৬-১২। এপ্রিল-অক্টোবর, ১৯৯৯
যুগান্তর
নাট্য শোধ সংস্থানে সংগৃহীত তথ্যাদি

সংযোজন ১

আনন্দবাজার পত্রিকা

২৬ জানুয়ারি, ২০০১

অধিগৃহীত হচ্ছে মিনার্ভা হল, নতুন সজ্জা শীঘ্রই

অশোক সেনগুপ্ত

প্রায় এক দশকের টালবাহানার পরে মিনার্ভা থিয়েটার হলটিকে অধিগ্রহণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। হলটিকে ঢেলে সাজার কাজ শুরু হবে শীঘ্রই। চলতি বছরের মাঝপর্বে এটির ভিতরে লন্ডনের রয়্যাল অ্যালবার্ট হলের আদল আনা হবে। হলের বাইরের নকশা অবিকৃত রাখা হচ্ছে। হল এবং তার ২১ কাঠা জমির পরিবর্তে মূল দুই মালিককে সরকার জায়গা দিচ্ছে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধারে। সরকারি সূত্রের খবর, ওই জমি বাবদ রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের কাছ থেকে এক কোটির কিছু বেশি টাকা পাবে সি এম ডি এ।

বিডন স্ট্রিটে ১৮৮৭ সালে তৈরি মিনার্ভা হলটি ১৯৪৪ সালে কিনে নেন অমরচন্দ্র বাকলিওয়াল ও আনন্দিলাল বিনায়কের পূর্বপুরুষ। হলের কর্মী সংখ্যা ২৬। অতীতে সুদৃশ্য এই হলে নামী অভিনেতারা নাটক করেছেন, অভিনীত হয়েছে স্মরণীয় বহু নাটক। গত দু'দশক ধরে হলটিতে তেমন আয় হচ্ছে না। কর্মীরাও প্রায় কর্মহীন। মামলা-মকদ্দমার জটিলতায় সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল বহু গুণ। গত প্রায় এক দশক ধরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সুধাংশু শীলের মতো সি পি এমের কয়েকজন নেতা হলটির জটিলতা কাটানোর চেষ্টা করছিলেন। অবশেষে সেই জটিলতা কেটেছে।

অমরচন্দ্রের ছেলে সুজন বাকলিওয়াল জানান, ১৯৬৫ সালে তাঁরা প্রয়াত নাট্যকার উৎপল দত্তকে হলটি লিজ দেন। বছর দুই বাদে উৎপলবাবু মুম্বই চলে যাবেন বলে লিজ ফিরিয়ে দেন। তার পর থেকেই হলের দুরবস্থা চলছে। মূল মালিকেরা এটির দখল পাচ্ছিলেন না। উপযুক্ত জমি পেলে হলটির দখল ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই হলের আইনি মালিকদের।

মিনার্ভা হলের আসন-সংখ্যা ৭৫০। তবে উপরের দুটি গ্যালারি-সহ আসন-সংখ্যা প্রায় এক হাজার। উপযুক্ত সংস্কারের পরে এটি সাজাতে কলকাতা পুরসভার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ একটি পরিকল্পনা রচনা করেছে। খরচ হবে ৫০ লক্ষ টাকার মতো। সি পি এম দলীয় স্তরে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সাংসদ-তহবিল থেকে এই টাকা দেবেন রাজ্যসভায় তাঁদের প্রতিনিধি। উপযুক্ত আয়ের কথা মাথায় রেখে কী ভাবে হলটিকে ব্যবহার করা হবে, সেই ব্যাপারে দলের নেতারা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে কথা বলেছেন। ঠিক হয়েছে, শর্তসাপেক্ষে সপ্তাহান্তে বা ছুটির দিন হল ভাড়া দেওয়া হবে বাণিজ্যিক নাট্য গোষ্ঠীকে। অন্যান্য দিন অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় গ্রুপ থিয়েটারের জন্য বরাদ্দ হবে হল। নাটক না থাকলে যাত্রা মহড়ার জন্য সেটি ভাড়া দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে চিৎপুরের কিছু যাত্রা গোষ্ঠী আগ্রহ দেখিয়েছে।

নানা সংস্কার এবং সজ্জায় সজ্জিত হয়ে 'নতুন' মিনার্ভা থিয়েটারের উদ্বোধন হয় ২০০৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। ওই বছরের ২৫ জুলাই থেকে ৮ অগাস্ট মিনার্ভা নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় মূলত গ্রুপ থিয়েটারগুকিে নিয়ে। কিন্তু কোনও পেশাদারি প্রযোজনা হয়নি। অপেশাদারি মঞ্চায়নও সামান্য। রাজ্য সরকার ঘোষণা করে, এটিকে গবেষণা কেন্দ্র করা হবে। মিনার্ভাও কোনও নাট্যকেন্দ্র হয়ে উঠল না।

নাট্যনিকেতন থেকে বিশ্বরূপা

আশিস গোস্বামী
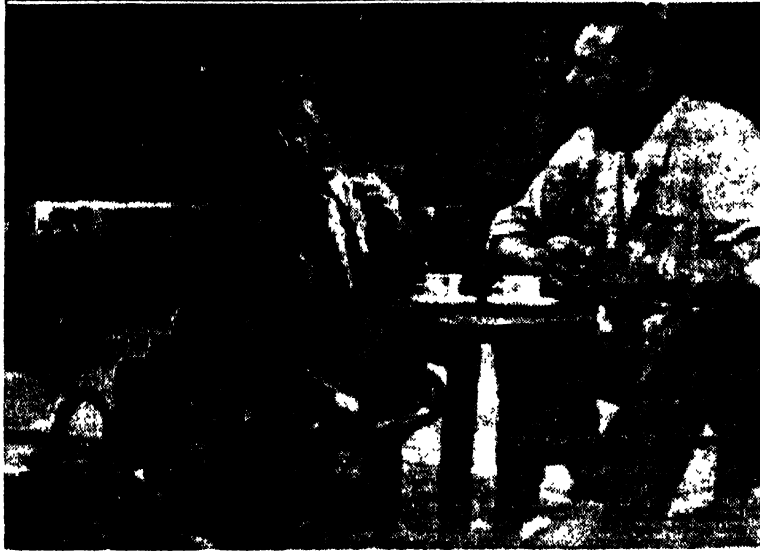
বিশ্বরূপার প্রথম নাটক 'আরোগ্য নিকেতন'-এ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩১ সালের ১৬ মার্চ প্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় নাট্যনিকেতন। ১৯৩১-৪১ পর্যন্ত এই থিয়েটারের কর্ম পরিধি। ১৯৩৬-এ যশোদা ঘোষকে দল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কথিত আছে, এটি নাকি ইসাবি ম্যাচ ফ্যাক্টরি ছিল। কারখানাটি রঙ্গালয়ে রূপান্তরিত হয় প্রবোধচন্দ্রের উৎসাহে। ২৫ অগাস্ট প্রথম মঞ্চস্থ হল 'ধ্রুবতারা' নাটক। তারপর দীর্ঘ দশ বছর ধরে 'ঝড়ের রাতে', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মহাশক্তি', 'পথের দাবী' ইত্যাদি নাটক। ১৯৪১ সালের অক্টোবরে নাট্যনিকেতন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নতুন নামে নতুন অধিনায়কের অধীনে আবারও জ্বলে ওঠে এই রঙ্গমঞ্চের প্রদীপ। নাট্যনিকেতন নাম বদলে হয় শ্রীরঙ্গম; অধিনায়ক শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ১৯৪১ সালের ২৮ নভেম্বর গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক দিয়ে শুরু হয় শ্রীরঙ্গমের জয়যাত্রা। বাংলা থিয়েটারেরও জয়যাত্রা শুরু হল। গিরিশযুগের অবসান হয়েছিল ১৯১২-তে; শিশিরকুমার অভিনয় শুরু করেন ১৯০৮ সালে। থিয়েটারের নতুন অধ্যায়, নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন তিনি। স্থায়ীভাবে নিয়মিত কাজ চলে এই শ্রীরঙ্গম ঘিরে। 'দুঃখীর ইমান', 'বিন্দুর ছেলে', 'বিপ্রদাস', 'পরিচয়', 'সীতা', 'আলমগীর', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি গৌরবোজ্জ্বল প্রযোজনা উপহার দিয়েছে শ্রীরঙ্গম।

১৯৫৬ সালের ২৪ জানুয়ারি শেষ অভিনয় করেন শিশির ভাদুড়ী। ২৮ জানুয়ারি বাড়ির দখল ছেড়ে দিতে হয়। শেষ অভিনয় 'প্রফুল্ল'। সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল অন্য সুরে। আদালত তাঁকে দেউলিয়া ঘোষণা করে শ্রীরঙ্গম দখল নিয়েছিল। জন্ম হয় নতুন থিয়েটার হলের। নাম বিশ্বরূপা। আদালতের মাধ্যমে মঞ্চটি ইজারা নিয়েছিলেন মেসার্স সরকার ব্রাদার্স অ্যান্ড প্রপার্টিস (প্রাইভেট) লিমিটেডের পরিচালকরা। এই পরিচালকদের মধ্যে সরকার পরিবারের কনিষ্ঠজন রাসবিহারী সরকারের উদ্যোগই ছিল বেশি। মূলত তাঁরই উদ্যোগে নতুন করে সেজে উঠল বিশ্বরূপা। এই লিমিটেড কোম্পানির অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে প্রোপ্রাইটারের ব্যবসাও ছিল। ফলে নতুন মঞ্চটির আমূল পরিবর্তনটা সহজ হল। রাসবিহারী সরকার আশৈশব তাঁর বাবা নটবর সরকারের কাছ থেকে থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসার যে পাঠক্রম নিয়েছিলেন তাতে অনেক স্বপ্ন সুপ্ত ছিল। রাসবিহারী তাই নতুন রঙ্গমঞ্চ হাতে পেয়ে সেই স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পেলেন। এক আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন, 'তবে প্রথমেই যে কথাটা বলে নিতে চাই, তা

হচ্ছে মুনাফার লোভে আমরা নাট্যজগতে হস্তক্ষেপ করিনি। তাই বলে এটা নয় যে, লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে বিদায় নেব। তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন তাই ব্যর্থ হবে। থিয়েটার পরিচালনায় যতটুকু ব্যবসায়ীর বিচক্ষণতা থাকা প্রয়োজন, ততটুকু সম্পর্কেই সচেতন থাকব।'

মঞ্চটির নামকরণ বদলের ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। শ্রীরঙ্গম নামটিই রেখে দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন কর্তৃপক্ষ। সম্ভবত নরেশ মিত্রের মাধ্যমে সেই প্রস্তাব শিশিরকুমারের কাছে রাখাও হয়েছিল। শুধু তাই নয়, নতুন কর্মোদ্যোগে শিশিরকুমারকে সসম্মানে আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল। কিন্তু দুটি প্রস্তাবের কোনটিতেই রাজি হননি তিনি। তিনি বলেছিলেন, কারও গোলামি আর করব না। এবং শ্রীরঙ্গম নামটি আমার দেওয়া, ও' নাম আমি কাউকে দেব না। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন কেউ কেউ। নতুন নামকরণ হল 'বিশ্বরূপা'। মঞ্চকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা এবং আলোর সুব্যবস্থার জন্য অপেশাদার নাট্যধারার আলোকশিল্পী তাপস সেনকে আনা হল। তাঁকে অগ্রিম পাঁচশ টাকা এবং মাস মাইনে দেড়শ টাকায় চুক্তিবদ্ধ করা হল। পেশাদার মঞ্চে প্রথম কাজ করতে শুরু করলেন তাপস সেন। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমেই বোঝা যায়, মঞ্চ ও নাটককে অন্যপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাঁরা।

১৯৫৬ সালের ৪ এপ্রিল এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিশ্বরূপা নিয়ে তাঁদের ভাবনার কথা জানানো হয়েছিল।

ক. বিশ্বরূপাকে ভারতের সর্ববৃহৎ আধুনিক নাট্যশালা হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

খ. থিয়েটার দেখতে যাতে শিশুসহ মা-বাবাদের অসুবিধা না হয়, তার জন্য শিশুদের ক্রেশ তৈরি করা হবে, সেখানে ভালোভাবে দেখাশোনার লোক থাকবে এবং শিশুদের খাবারও দেওয়া হবে।

গ. দেড়শ সাইকেল রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

ঘ. মোট আসন সংখ্যা ৯১২। নিচে ৬৬২টি এবং ওপরে ২৫০টি বসার আসন থাকবে।

ঙ. হলের সামনে ফুলের বাগান থাকবে এবং বাগান থেকে ফুল তুলে নাট্যশালার পূর্বজদের উদ্দেশে নিবেদিত বেদিতে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

চ. আসনে বসাবার জন্য মেয়েদের নিযুক্ত করা হবে।

সবগুলি যথাযথ না হলেও কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশেষে ১৯৫৬ সালের ৭ জুন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হল। লেখক কর্তৃক নাট্যরূপায়িত নাটকের পরিচালক ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালক ছিলেন কমল দাশগুপ্ত, নৃত্য-পরিচালনায় অনাদিপ্রসাদ এবং আলোর পরিকল্পনায় তাপস সেন। প্রথম রজনীতে অভিনয় করেছিলেন : জীবনমশাই : নীতীশ মুখোপাধ্যায়, আতর বৌ : শান্তি গুপ্তা, প্রদ্যোত : বসন্ত চৌধুরী, ভূবন রায় : সন্তোষ সিংহ, মতি বৈষ্ণবী : কমলা ঝরিয়া, মঞ্জু : তপতী ঘোষ, দাঁতু ঘোষাল : নবদ্বীপ হালদার, অভয়া : পূর্ণিমা দেবী, কিশোর : বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভ্রা : মেনকা দেবী, সেতাব : জয়নারায়ণ, সুধা : চিত্রা মণ্ডল, ইন্দিরা : মণি শ্রীমানি, চারু ডাক্তার : অজিত গঙ্গোপাধ্যায় এবং কম্পাউন্ডার : কালী ব্যানার্জী।

অসম্পূর্ণ সংস্কারের মধ্যেই নাটক অভিনয় আরম্ভ হয়ে যায়, প্রথম দিন উপস্থিত ছিলেন দানীবাবু, তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। নাটক শুরু হলেও এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয় আরও কিছুদিন বাদে হয়েছিল। ওই বছরের ২২ জুলাই উদ্বোধন স্মারক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উদ্বোধক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন সেই সময়ের বিদ্বৎসমাজের বহুজন। যেমন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকুমার ভদ্র, দেবনারায়ণ গুপ্ত, কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, অমৃতবাজার পত্রিকার এন. কে. জি., যুগান্তর চলচ্চিত্র-সম্পাদক মহেন্দ্র সরকার, কেষ্ট কুণ্ডু, সলিল মিত্র, হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নলীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল বসু, বিজয় মুখোপাধ্যায়, নাট্যসম্রাজ্ঞী নীরদাবালা, দক্ষিণেশ্বর বসু এবং আরও অনেকে।

বিশ্বরূপার প্রাথমিক এই উদ্যোগকে কিন্তু সংবাদমাধ্যম খুব ভালো চোখে দেখেনি। অনেকের মন্তব্যই বেশ ক্রুর। যেমন : 'পূর্বতন শ্রীরঙ্গমের সঙ্গে বর্তমান বিশ্বরূপার আকাশপাতাল তফাৎ আশা করলে হতাশ হতে হবে। অভিনয় ও প্রয়োজনার কথা বাদই দিলাম। পুরাতন শ্রীরঙ্গমের গায়ে চুনকাম করা এবং সিট পাল্টানো ছাড়া তেমন কিছু পরিবর্তন

হয়নি। তবে পুরুষ গেটকিপারের পরিবর্তে মেয়ে গেটকিপারের আমদানি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এই ব্যবসায় বুদ্ধিটুকু ছিল না বলেই কি শ্রীরঙ্গম চলল না? নাট্যশালার চিত্রপ্রদর্শনী বলে বহু বিজ্ঞাপিত জিনিসটিকে চিত্রপ্রদর্শনী না বলাই ভালো। কয়েকজন অভিনেতা ও নাট্যকারের প্রতিকৃতি গাদাগাদি করে টাঙিয়ে দিলেই কি চিত্রপ্রদর্শনী হয়?

'আর একটা কথা, নাট্যশালার নাম বিশ্বরূপা আর নাটকের নাম 'আরোগ্য নিকেতন'। নাট্যশালার এখানে-ওখানে নার্সরূপিণী সেবিকার ছোটাছুটি আর নাটকের মধ্যে ব্রহ্মলোক, প্রেতলোক, মর্ত্যলোক অর্থাৎ বিশ্বরূপের ছড়াছড়ি। আমার যেন মনে হল 'আরোগ্য নিকেতনে এসে বিশ্বরূপা দেখে গেলাম।'

বোঝা যায়, এ সমালোচনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ব্যবসার প্রয়োজনে হলেও কিছু পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। এবং প্রযোজনার ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিককে দিয়ে নাট্যরূপ দেওয়া, অপেশাদার নাট্যধারার কর্মী ও কুশীলবদের নিয়ে আসা, প্রতিভাবান তরুণ অভিনেতাদের সুযোগ দেওয়ার প্রয়াস প্রথম প্রযোজনাতেই লক্ষ্যণীয়। অথচ সংবাদ মাধ্যমে লিখল : 'বিশ্বরূপায় তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনীত হচ্ছে। কিন্তু এটা কি তারাশঙ্করের লেখা 'আরোগ্য নিকেতন'? মূল কাহিনীর সঙ্গে নাট্যরূপের বৈসাদৃশ্য এত অধিক যে, মূল উপন্যাস পড়া দর্শকের পক্ষে নাটকের রস গ্রহণ করা অসম্ভব তো বটেই, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিরক্তিকরও ঠেকে। নাট্যরূপের ভাব, ভাষা, আখ্যানবস্তু, মূল সমস্যা, চরিত্র প্রভৃতি একেবারে আলাদা। ...

'নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও অভিনেতাদের অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটা যখন জমি-জমি করছিল তক্ষুনি পরিচালক খড়্গহস্তে নাটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তৃতীয় অঙ্কে বীরভূমের গ্রাম্য পরিবেশ থেকে চলে যেতে হল ব্রহ্মলোকে। তারপর অকস্মাৎ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব ও মৃত্যুর প্রতিমূর্তিরূপী জয়শ্রী সেনের উদ্দামশ্মশান তাণ্ডব নৃত্য। সঙ্গে কিম্ভূতকিমাকার প্রেতসহচর। নাচিয়েদের লম্ফঝম্ফ এবং চোখ ধাঁধানো লাল-নীল আলোর ছুটোছুটি, সব মিলিয়ে আসল নাটকের বারোটা বাজিয়ে দেয়। কে জানে এরই নাম হয়তো ড্রামাটিক রিলিফ।'

সংবাদ মাধ্যমে যাই বলুক, বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ একের পর এক অনেকরকম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যেমন, নাট্য-সাহিত্য সম্মেলন করা। বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন এর আগেও হয়েছে কিন্তু কোনও মঞ্চ কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা সম্ভবত এই প্রথম। ৩ জুন ১৯৬৬ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল তা তুলে দেওয়া হল : 'বৃহস্পতিবার 'বিশ্বরূপা' প্রাঙ্গণে অষ্টম বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আধফোটা একটি পদ্মের পাপড়ি মেলে ধরে বলেন, এইভাবেই আমি সম্মেলনের উদ্বোধন করছি। সম্মেলনের উদ্যোক্তা বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ। শৈলজানন্দ বলেন, কাব্য-সাহিত্য-সংগীত-নাটক এসবই এক। মনের ভারকে প্রকাশ করার বিভিন্ন পথ। মানুষ মনের আনন্দ প্রকাশের জন্য পাগল। এতে পেট ভরে না ভরে মন। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন, বহু নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবের কেন মিল থাকে না। কিন্তু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার সব সময় সব কিছু মেনে চলতে পারেন না; বোধহয় তা সম্ভবও নয়। আবার অনেকের এ ধারণাও আছে নাট্যকার, কবি বা সাহিত্যিক মাত্রেই বুঝি অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী। না, তা সব সময়েই ঠিক নয়। নাট্যকারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য — ভাবুকতা। তাঁর ভাষা কল্পনার ভাষা, হৃদয়ের ভাষা। একজন কৃতী নাট্যকারের জীবনের চরম ও পরম কামনা সত্যকে উজ্জ্বল করে তোলা। সত্য কতটা মানুষের কাছে আপনার হয়ে উঠল সেটা দেখা দরকার। ...

'প্রধান অতিথি ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, নাটকের ভিতরেই আমাদের জীবনের নানা দিক ফুটে ওঠে। আবার ঘুরিয়ে একথাও বলা যায়, নাটকের ভিতর আমরা জীবনের সত্যকে খুঁজে পাই। নতুন করে জীবনকে দেখতে পাই — দেখে সত্যিই আনন্দ লাভ করি। সভাপতি ড. সুকুমার সেন বলেন, নাট্যসাহিত্যের আরও সম্প্রসারণ হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, এই জন্য আরও অনেককে এগিয়ে আসতে হবে।'

অর্থাৎ বিশ্বরূপার এই ধরনের উদ্যোগ সারস্বত সমাজেব পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। তাতে কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত হয়েছিলেন অবশ্যই। হয়তো সেই উৎসাহের আতিশয্যে তাঁরা বিশ্বরূপা নাট্য মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এই উদ্যোগ কতটা সার্থক হয়ে উঠবে তা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন অনেকেই। কারণ, কলকাতায় তখন

থিয়েটার সেন্টার নামে এমনই একটি শিক্ষালয় চলছিল। এর আগে লিটল থিয়েটার গ্রুপ একটি নাটকের স্কুল খুলে আবার বন্ধ করে দিয়েছিল, শৌভনিক স্কুলের অবস্থাও তথৈবচ। তাছাড়া, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েব নাট্যবিভাগ তখন চলচিল। ফলে রবীন্দ্রভারতী ও থিয়েটার সেন্টার স্কুল চলা সত্ত্বেও নতুন করে আর একটি শিক্ষালয় কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে তা নিয়ে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। এখন থাকলেও সেই সময়ে এই শিক্ষার কোনও ব্যবহারিক মূল্য ছিল না। তাই অনেকেই বলতে দ্বিধা করেননি যে, এ শুধু অর্থের অপচয় মাত্র। এমনকি বিশ্বরূপা তাঁদের শিক্ষার্থীদের নিজস্ব প্রয়োজনায় সুযোগ দেবেন কি না সেটাও সন্দেহজনক। ফলে, এই নাট্য বিদ্যালয় আর এগোতে পারেনি।

একইভাবে ১৯৫৮ সালে শিশুনাট্য শাখাটি গড়ে উঠলেও তা অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। প্রতি শনি-রবি এবং ছুটির দিন সকালে বিশ্বরূপা শিশুনাট্য শাখার মাধ্যমে শিশুদের ভালোলাগার মতো নাচ-গান নাটকের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু অভিভাবকদের সহযোগিতায় শিশুদের সাড়া তেমন না মেলায় বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়।

তবে তাদের সবচেয়ে ফলপ্রসূ প্রকল্প ছিল গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন। ১৯৫৮ সালের ২০ ডিসেম্বর এই প্রকল্পটি চালু হয়। বাংলাদেশের অজস্র সৌখিন দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে স্বনামধন্য হয়েছেন এমন অনেকেরই আবির্ভাব এই প্রতিযোগিতা মঞ্চে। শুধু প্রতিযোগিতা নয়, গিরিশ থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত নাটক অভিনয়েরও এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। একটি স্বতন্ত্র মঞ্চ গড়ার কথাও ছিল সেই পরিকল্পনায়। যতদিন তা না হবে ততদিন বিশ্বরূপাতেই প্রতি সোম, বুধ, শুক্রবার সন্ধে সাড়ে ছ'টায় এবং ছুটির দিন সকাল সাড়ে দশটায় নাটকাভিনয় হবে। ১৯৬০ সালের ৩১ জুলাই সকাল সাড়ে দশটায় এই পরিকল্পনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয় সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন' নাটকটি। এতে অভিনয় করেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখার্জী, সুনীল ব্যানার্জী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অরুণ ব্যানার্জী, জয়শ্রী সেন, গীতা দে। প্রথমে রাধামোহন ভট্টাচার্য এই নাটকে অভিনয় করেন। কিন্তু নাটক জমে উঠছিল না অর্থাৎ টিকিট বিক্রি বাড়ছিল না বলে তাঁর পরিবর্তে মহেন্দ্র গুপ্তকে আনা হয়। ৭৩ রাত্রি অভিনয় হয় নাটকটি। অর্থাৎ এই পবিবর্তনের পরেও নাটকটি জমেনি।

পুরনো নাটকগুলির আধুনিক মঞ্চায়নের প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৬৩ সালের ২৫ জুলাই। প্রতি বৃহস্পতিবার বেলা তিনটেয় ও শুক্রবার সন্ধে সাড়ে ছ'টায় অভিনয় হত। ওই দিন অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। যাত্রার প্রসিদ্ধ অভিনেতা দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত পাঠক যথাক্রমে কর্ণ এবং অর্জুন চরিত্রে অভিনয় করেন। পৌরাণিক এই নাটকটির সম্পাদনা করেছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। নির্দেশক ছিলেন (সেই সময়ে নাট্য শিক্ষক হিসেবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল) সন্তোষ সিংহ ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়, আলো : অমর ঘোষ, মঞ্চ : আর. আর. সিন্দে, নৃত্য পরিচালক : অনাদিপ্রসাদ, পোশাক : সত্যেন রায়চৌধুরী, সহকারী : প্রহ্লাদ পাল। নিয়তির কণ্ঠে গান : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

'রূপমঞ্চ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : 'এঁদের (বিশ্বরূপার) সর্বাধুনিক প্রচেষ্টার মধ্যে সাপ্তাহিক আকর্ষণ হিসেবে অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুন নাটকটিকে নতুন করে উপহার দেওয়া। পৌরাণিক নাটকের অভিনয় আজকাল পেশাদার রঙ্গমঞ্চে হয় না। শৌখিন সম্প্রদায়গুলি মাঝে মাঝে অভিনয় করে থাকেন। কিন্তু সে অভিনয় নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই জনসাধারণ পৌরাণিক নাটকের রসাস্বাদন থেকে বর্তমানে প্রায় বঞ্চিতই ছিলেন বলা চলে। বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ সেই বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দিলেন। ...

'বর্তমান কর্ণার্জুন নাটকের প্রযোজনার দিকটিই হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য — আলোকসম্পাতের অভিনবত্ব — দৃশ্যপটের মনোহারিত্ব, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ নিজেদের চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ... কর্ণার্জুন নাটকের যে বিষয়টি আমাদের দুর্বল বলে মনে হয়েছে — তা হচ্ছে নাটকের সামগ্রিক অভিনয় মান। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে উচ্চাঙ্গের অভিনয় না করলেও যথাযথ অভিনয় করেছেন। অন্তত দু-একজন শিল্পী ছাড়া নিন্দনীয় অভিনয় হয়নি অথচ সামগ্রিক অভিনয় মানে নাটকটির যে রসসৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল তা হতে পারেনি। তাই কর্ণার্জুন নাটকের প্রতিজন শিল্পীকে এ বিষয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ করবো — কাকে কতখানি প্রশংসা বা নিন্দা করা

হল সে বিষয়ে খুশি বা মনঃক্ষুণ্ণ না হয়ে তারা যেন সমবেতভাবে নাটকটির অভিনয় মানের প্রতি সচেতন থেকে বর্তমান নাটকটিকে একটি অপূর্ব শিল্প সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করে নিতে সচেষ্ট থাকেন। শিল্পী নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ যে ভুল করেছিলেন একথা বলব না। তাঁরা যাত্রা, শৌখিন সম্প্রদায় ও অন্যান্য অভিনয় ক্ষেত্র থেকে এক একজনকে বাছাই করেই বর্তমান নাটকের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। কর্তৃপক্ষের এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করব। কিন্তু বিভিন্ন স্থান থেকে শিল্পী নির্বাচনের জন্যই বোধহয় অভিনেতাদের অভিনয় ধারায় পারস্পরিক হৃদ্যতা জমে ওঠেনি।'

এই সমালোচনার মধ্যে একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পেশাদার মঞ্চ, যাত্রা, শৌখিন সম্প্রদায় ও গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী-কলাকুশলীরা বিশ্বরূপায় নানাভাবে জড়িয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ বুঝেছিলেন যে, নতুন যুগে থিয়েটারকে পেশাদার হয়ে চলতে হলে 'নতুন ধরনের' মানুষের সাহচর্য প্রয়োজন। প্রথম থেকেই তাই অন্য থিয়েটারের কৃতীজনের কাছে গিয়েছেন তাঁরা। পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন যাত্রা ও গ্রুপ থিয়েটারের। শৌখিন যাত্রা সম্প্রদায় এবং নাট্য সম্প্রদায়ের মঞ্চায়নের সুযোগ দিয়েছিল বিশ্বরূপা। আবার বহুরূপীর মতো নাট্য সম্প্রদায়কে বিনামূল্যে অভিনয় করার সুযোগও দিয়েছিল বিশ্বরূপা। ১৯৬২ সালের ১৪ ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বহুরূপীর দান' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে লেখা হয়েছিল : 'বহুরূপী সংস্থা ১২ ডিসেম্বর প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য ৩০০০ টাকা রাজ্যপালের হাতে অর্পণ করেছেন। ওই সংস্থা টাকা তোলার জন্য গত ১ ডিসেম্বর 'রক্তকরবী' নাটকের বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বরূপায়। বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ বিনাভাড়ায় ওদের মঞ্চ ব্যবহার করতে দিয়েছিল।' বিশ্বরূপার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানিয়ে শম্ভু মিত্র মহাশয় বলেছিলেন, 'নূতন যুগের সাংস্কৃতিক রূপকে তাঁরা চিনতে পেরেছেন এবং এই বিবর্তনে তাঁরা যথাযোগ্য অংশ নিতে কার্পণ্য করেননি।' (আনন্দবাজার : ১৯ জুলাই ১৯৫৯)। এই মন্তব্য করেছিলেন সম্ভবত বিশ্বরূপার তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা লেখে : 'At the outset Sombhu Mitra, in course of a short speech, observed that there comes inevitably in the cultural History of a nation a period of transition followed by a tial wave of new changes. Biswaroopa, he said, did not shut its door in the face of the tides of renaissance, and thus it could move with and imbibe spirit of the changing times.' (১৯ জুলাই ১৯৫৯)

এরকম আরও একটি অনুষ্ঠানের সংবাদ পাই আমরা। 'The benefit performance of Tulsi Lahiri's Chhera Taar will be held on June 29 at 6.30 p.m. at Biswaroopa by Bohurupi under the auspices at Biswaroopa Nattonayan Parikalpana Committee in honour of its ailing author.'

বিশ্বরূপার দ্বিতীয় প্রযোজনা 'ক্ষুধা'। বিজ্ঞাপনে লেখা হল : জাতির ও জীবনের নাটক 'ক্ষুধা'। ১৯৫৭ সালে প্রথম অভিনীত হয় (বাংলা ৭ বৈশাখ ১৩৬৪)। নাট্যকার: বিধায়ক ভট্টাচার্য, পরিচালনা : নরেশচন্দ্র মিত্র, সহপরিচালক : কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীত : নচিকেতা ঘোষ, আলো : তাপস সেন, দৃশ্য পরিকল্পনা : আর. সিন্দে। অভিনয়ে ছিলেন নরেশ মিত্র, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, কালী ব্যানার্জী, তরুণকুমার, সন্তোষ সিংহ, শান্তি গুপ্তা, তপতী ঘোষ, জয়শ্রী সেন, নবদ্বীপ হালদার, মণি শ্রীমানি, জয়নারায়ণ, আরতি দাস, সুব্রতা সেন, মীরা, মায়া, ঝর্ণা। পরে বসন্ত চৌধুরীর পরিবর্তে আসেন অসিতবরণ। নাটকটি একাদিক্রমে ৫৭৩ রাত্রি অভিনীত হয়েছিল। ইতিপূর্বে মঞ্চ অভিনয়ের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিল 'ক্ষুধা', স্টারে 'শ্যামলী' ৪৮৪ রাত্রি অভিনয় হয়েছিল। রঙমহলে 'উল্কা' ৫০৭ রাত্রি অভিনয় হয়। তাই ১৯৫৯ সালের ৩০ অগাস্ট যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে দিয়ে 'ক্ষুধা'-র শেষ অভিনয় হয় ওইদিন। সংবাদমাধ্যম কিন্তু এত সাফল্য প্রথমেই আঁচ করতে পারেনি। জনপ্রিয়তা পেলেও সংবাদমাধ্যমে ছিল মিশ্র প্রতিক্রিয়া। দুটি সমালোচনা অংশ তুলে ধরা হল।

'আরোগ্য নিকেতনের পর বিশ্বরূপার দ্বিতীয় নাট্যার্ঘ্য বিধায়ক ভট্টাচার্যের ক্ষুধা। নাটকখানি পরিচালনা করেছেন নটশেখর নরেশ মিত্র। ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে যে নাটকের গতি, ক্ষুধা তার ব্যতিক্রম। ... বাংলার সুপরিচিত দারিদ্র্য নিপীড়নের এক ঘরোয়া কাহিনী।

'কাহিনীই এ নাটকের বিশেষত্ব নয়। এ ধরনের মর্মন্তুদ বিষয়বস্তু অনাবিল হাস্যরসের মধ্য দিয়ে বহন করার প্রয়াস প্রশংসনীয়। সংগতির প্রশ্নে মনকে বিমুখ করে না রাখলে নাটকের প্রায় অর্ধেক বিপুল হাস্যরসের খোরাক দেবে। কিন্তু বিধায়কের ক্ষুধার রাজ্য আরও একটু গদ্যময় হলে ভালো হত। যাই হোক, ক্ষুধা নাটকের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য শিল্পীদের অভিনয়। নিখুঁত অভিনয়ের এমন টিমওয়ার্ক সচবাচর দেখা যায় না। ... নিখুঁত অভিনয়ের এক সামগ্রিক প্রাণপ্রাচুর্য স্থানে স্থানে নাটককে কোন সার্থকতার পর্যায়ে তুলে নিয়ে যেতে পারে, শিল্পীরা তার স্বতঃস্ফূর্ত নজির দেখিয়েছেন এই নাটকে। আলোকশিল্পী শ্রী তাপস সেনের কুশলী আলোকসম্পাত ক্ষুধা রূপায়ণের একটি বিশেষ আকর্ষণ।'

অন্য একটি সমালোচনায় লেখা হয়েছিল : 'বিশ্বরূপার নতুন নাটক 'ক্ষুধা' শুধু আক্ষরিক অর্থে নয়, ভাবের দিক দিয়েও নাটকটি নতুন। জমিদার আর তার নায়েব-গোমস্তাসহ সামন্ততন্ত্রী যুগকে অতীতের নিস্তরঙ্গ শান্তির মধ্যে রেখে নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য ও পরিচালক নরেশ মিত্র দর্শকদের সম্মুখে যে যুগ আর যে সমস্যাকে উপস্থিত করেছেন, তা একান্তই আধুনিক। ভঙ্গ বঙ্গদেশের প্রধান সমস্যা ক্ষুধা, তারই তরঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এ নাটকেব মাধ্যমে এসে লেগেছে; অন্তত এই একটি কারণেই নাট্যরসিকেরা ক্ষুধাকে গ্রহণ করবেন। ...

'নাটেকর দুর্বলতা এর গঠনে, নাট্যকার পাত্রপাত্রীর সংলাপের ওপর যতখানি প্রাধান্য দিয়েছেন, তাদের চারিত্রিক বিকাশের দিকে তত মনোযোগ দেননি।'

'ক্ষুধা' নাটকের অন্তিম অভিনয় ঘোষণার বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল : 'দেশ বিদেশের যেসব সম্মানিত নাট্যানুরাগী জনসাধারণের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের 'ক্ষুধা' নাটক অভূতপূর্ব যশ-গৌরব লাভে সমর্থ হয়েছে — তাদের সবাকার উদ্দেশ্যে আমার প্রণাম পৌঁছে দিয়ে আগামী দিনের নতুন নাট্যোপহারের মধ্য দিয়ে নিজেদেরই সৃষ্ট রেকর্ড ভঙ্গ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

এই প্রতিশ্রুতি সত্য হয়েছিল তাদের পরবর্তী প্রযোজনায়। তৃতীয় প্রযোজনা 'সেতু' এক হাজার বিরাশি রাত্রি অভিনয় হয়েছিল। প্রথম অভিনয় ১৯৫৯ সালের ৮ অক্টোবর, আর শেষ অভিনয় হয় ১৯৬৩ সালে। হাজার রজনী অতিক্রম করেছিল ১৯৬৩ সালের ২২ ডিসেম্বর। এই প্রযোজনা নিয়ে শুরু হল বিতর্ক — আঙ্গিক বড়, না বিষয় বড়। মূলত তাপস সেনের আলো নিয়েই বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিতর্ক যাই হোক, তখন মানুষের মুখে মুখে আলোচ্য বিষয় ছিল রেল দুর্ঘটনার সেই দৃশ্য, তাপস সেনের আলোর চমৎকারিত্ব নিয়ে।

কিরণ মৈত্রের একাঙ্ক 'বুদবুদ' অবলম্বনে বিধায়ক ভট্টাচার্য লেখেন 'সেতু' নাটকটি। পরিচালনা : নরেশ মিত্র, আলো : তাপস সেন, মঞ্চ : অমর ঘোষ, রূপসজ্জা : শক্তি সেন। অভিনয়ে : নরেশ মিত্র, অসিতবরণ, তৃপ্তি মিত্র, তরুণ কুমার, সন্তোষ সিংহ, তমাল লাহিড়ী, তারক ঘোষ, মণি শ্রীমানি, মমতাজ আহমেদ খাঁ, জয়শ্রী সেন, আরতি দাস, সুব্রতা সেন প্রমুখ আরও অনেকে।

'যুগান্তর' পত্রিকায় 'সেতু' নাটক নিয়ে লেখা হয় :

'... বিশ্বরূপায় তৃতীয় নাট্যোপহার 'সেতু' দেখার জন্য নাট্যামোদীদের প্রতীক্ষা যাচাই স্বাভাবিক। সে প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে তৃপ্তি মিত্রের বিচিত্র সুন্দর অভিনয়ে। তাপস সেনের আলোকসম্পাতের চমৎকারিত্বে এবং আঙ্গিক সৌষ্ঠব ও প্রদর্শন নৈপুণ্যে 'সেতু' মনোরঞ্জনকারী রূপ নিয়েই দর্শক সমক্ষে উপস্থিত হয়েছে।

'নাটকটিতে বিধায়কের দক্ষতা ও দুর্বলতা জয়েরই লক্ষণ প্রকট। সংলাপ রচনায় (বিশেষত অসীমার ক্ষেত্রে) তিনি যেমন মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টিতে এবং চরিত্র চিত্রণে দুর্বলতার প্রমাণ দিয়েছেন। ... এসব ত্রুটি ছাড়াও নায়িকার চরিত্রটিকে নাট্যকার বড় বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

'সেতু নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নায়িকা অসীমার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয়। ...

'সেতু' নাটকের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ তাপস সেনের অপূর্ব আলোকসম্পাত। আলোছায়ায় মায়াজাল সৃষ্টি করে ভীমবেগে একটি ট্রেনের আগমন বার্তাসূচক যে অভিনব দৃশ্যটি রচনা করেছেন তিনি তা এক অভাবনীয় এফেক্ট সৃষ্টি

করেছে।'

বিশ্বরূপার এই গৌরবময় অধ্যায় কিন্তু দ্বিতীয়বার আর ফিরে আসেনি। আরও অনেক প্রযোজনা জনপ্রিয় হয়েছে, অনেক রাত্রি অভিনীত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নাট্যইতিহাসে সেই জনপ্রিয়তার হিসেব আজ বড়ই ম্রিয়মান। 'সেতু' নাটকের অন্তরালে ছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য, নরেশ মিত্র, তাপস সেন, তৃপ্তি মিত্রের মতো কৃতজনেরা। ধীরে ধীরে আমরা দেখব বিশ্বরূপার কর্ণধার হচ্ছেন পরিচালক, নাট্যরূপকার — এককথায় সর্বাধিনায়ক। নাটকের পৃষ্ঠপোষকতায় নাট্যের যে উন্নতির স্বপ্ন নানাভাবে দেখিয়েছিলেন রাসবিহারী সরকার, সমগ্র কৃতিত্ব দখলের অভিলাষে তা তাঁকে ক্রমশ জলাঞ্জলি দিতে হল। 'সেতুর' আগে এবং পরে তাই ঘোর ব্যবধান। 'সেতু'র পরবর্তী প্রযোজনা 'লগ্ন'। নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্যের, এবং পরিচালনায় ছিলেন স্বয়ং রাসবিহারী সরকার। নাটকটির বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল এইরকম :

ভারতীয় নাট্যশালার ইতিহাসে বিস্ময়কর উদ্ভাবন থিয়েটারস্কোপ সমন্বিত বিশ্বরূপা থিয়েটারের

লগ্ন

প্রবর্ধনা, প্রবর্তনা ও পরিচালনা : রাসবিহারী সরকার

প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৯৬৪ সালের ৭ মে, বৃহস্পতিবার, সন্ধে সাড়ে ছ'টায়। অভিনয়ে ছিলেন জহর গাঙ্গুলি, অসিতবরণ, তরুণকুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, জয়শ্রী সেন, মিতা চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী এবং প্রথম মঞ্চে নামলেন নাট্যকার স্বয়ং বিধায়ক ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে। নৃত্য-পরিচালনায় অনাদিপ্রসাদ এবং আলোকসম্পাতে বংশী সাউ।

মঞ্চনাটকে 'থিয়েটারস্কোপ' কথাটি প্রথম এল সম্ভবত উদয়শঙ্করের শঙ্করস্কোপ কথাটির অনুকরণে। এল এই নবমঞ্চব্যবস্থা। এর বৈশিষ্ট্যগুলিও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে। কারণ 'থিয়েটারস্কোপ' কথাটি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়েছিল এবং আজও সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করেন, বিজ্ঞাপনের চমক ছাড়া এটা আর কিছু নয়। তবুও প্রবর্তনাকারীর দেওয়া বৈশিষ্ট্যগুলি ইতিহাসের স্বার্থেই প্রয়োজনীয়।

- ব্যাকস্টেজ বলে কিছু থাকবে না; অন্তত দর্শক তা দেখতে পাবেন না।
- নাট্যদৃশ্যগুলিকে বিভিন্ন স্তরে সাজিয়ে এক বা একাধিক স্তরে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ নিরন্তর অভিনয় চলবে।
- পরিবেশ অনুযায়ী আবহসংগীত বেজে চলবে।
- শব্দের সাহায্যে চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ।
- স্বগতোক্তিকে নাটকীয় অথচ বাস্তবানুগভাবে প্রকাশ করা।

বলাবাহুল্য, এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্য দিয়ে নবীনত্ব কিছুই অনুভব করা যায় না। অথচ সতু সেনের মতো মানুষ এর সপক্ষে দীর্ঘ মন্তব্য করেছিলেন যা বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দীর্ঘদিন পূর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চে আমি সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তনা করি -- এতদিন ধরে সেই পদ্ধতি নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক মঞ্চকৌশলরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছিল। বিশ্বরূপার নতুন নাটক 'লগ্ন'। নাটকটির পরিচালকরূপেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। 'লগ্ন' নাটকখানির সঙ্গে তিনি নবতম মঞ্চকৌশলের প্রবর্তনা করেছেন যার নামকরণ করেছেন থিয়েটারস্কোপ। থিয়েটারস্কোপ বাংলার নাট্যশালার একটি যুগের অবসান ঘটিয়ে আর একটি নতুন যুগের সূচনা করল। ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চকে পেছনে ফেলে আমরা আর এক ধাপ অগ্রসর হলাম, দীর্ঘদিন নাট্যশালার সেবা করে যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে বলতে পারি, থিয়েটারস্কোপ একদিন সমগ্র নাট্যামোদী দেশবাসীর অন্তর জয় করবে।'

দৈনিক যুগান্তর কাগজে নাটকটির সমালোচনায় লেখা হয়েছিল : 'লগ্ন নাটকে বিধায়ক ভট্টাচার্য বলতে চেয়েছেন — 'একালে কি শুদ্ধ শিল্পচর্চা সম্ভব? যদি কোনও যোগ্য প্রতিভা সেই আইডিয়ায় নিজেকে সঁপে থাকেন তাঁর কি পরিণাম ঘটতে পারে!' নাটকটি শেষ হয়, এ যুগের অসম্ভব সাধনা তথা পিওর আর্টের চেতনা পরিণামে ব্যর্থ হতে বাধ্য। হয়তো

এই বোধ থেকেই চমকপ্রদ আঙ্গিক দিয়ে মন ভোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন রাসবিহারী। তাই জোরালো উপন্যাসের ব্যর্থ প্রযোজনার দুর্বহ ভার বয়ে চলতে হয়েছিল বহুকাল, দুয়েকটি প্রযোজনা সাফল্য পেলেও অধিকাংশই তাই দুর্বল ও ব্যর্থ।'

পরবর্তী প্রযোজনা তারাশঙ্করের উপন্যাস 'রাধা' অবলম্বনে গড়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালের ১৫ এপ্রিল প্রথম অভিনয় হয়। ঘূর্ণায়মান মঞ্চনাট্য ও নেপথ্য সংগীত পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাম থাকলেও রাসবিহারী নিজেকে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন : থিয়েটার, নাটক ও পরিচালনা : রাসবিহারী সরকার। বোধহয় এর অর্থ ঘূর্ণায়মান মঞ্চোপযোগী নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্য লিখলেও তার থিয়েটারস্কোপ চেহারাটি রাসবিহারীর অবদান। এতে সুরারোপ করেছেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। কণ্ঠ সংগীতে ছিলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী মিত্র, দিলীপকুমার রায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। নৃত্যে : অনাদিপ্রসাদ। মঞ্চমায়া : প্রহ্লাদ দাস। আলো : বংশী সাউ। পোশাক : নিরঞ্জন ঘোষ এবং রূপসজ্জায় : শক্তি সেন। অভিনয়ে ছিলেন : মিহির ভট্টাচার্য, রূপক মজুমদার, বিদ্যুৎ গোস্বামী, শঙ্কর ব্যানার্জি, গঙ্গাপদ বসু, তরুণ মিত্র, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, অজয় সিংহ, অরুণ চৌধুরী, শিপ্রা মিত্র, জয়শ্রী সেন প্রমুখ।

এই ধরনের সব কাজেই প্রশংসা করেন এমন সমালোচকেরা যেমন লিখলেন, 'রাধা নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে শ্রীমতী জয়শ্রী সেনের সাত্ত্বিক অভিনয়ের স্পর্শে যে কোনও নাট্যামোদীরাও অভিভূত হবেন। প্রথমেই বলেছি, রাধা থিয়েটারস্কোপ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মঞ্চায়িত। থিয়েটারস্কোপের প্রথম নাটক লগ্ন। দ্বিতীয় নাটকের ক্ষেত্রে থিয়েটারস্কোপের উদ্ভাবক রাসবিহারী সরকার যে উন্নততর প্রয়োগ পদ্ধতির পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে নতুন করে প্রমাণিত হল। চলচ্চিত্রের উন্নততর প্রয়োগ পদ্ধতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবার মতো শক্তি এনে দিল থিয়েটারস্কোপ।' — তেমনই প্রসেনিয়াম পত্রিকা লিখল, 'বিশ্বরূপায় রাধা তারাশঙ্করের কালজয়ী উপন্যাস 'রাধা' অবলম্বনে বলে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। তারাশঙ্করের রাধা পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল রাধা উপন্যাসটি প্রতিক্রিয়াশীল এবং বেশ কিছু অংশে বিরক্তিকর। তবুও কিন্তু সেটি তারাশঙ্করেরই একটি নিকৃষ্ট রচনা। অন্য কারও নয়। কিন্তু বিশ্বরূপায় 'রাধা' দেখে মনে হল নাটকটি রাম-শ্যাম-যদুচরণ নামে কোনও চতুর্থ শ্রেণীর হস্তিমূর্খের রচনা। কোথায় তারাশঙ্করের রাধা।'

এরপরের নাটক বনফুলের 'ত্রিবর্ণ' অবলম্বনে 'জাগো'। এই প্রথম নাট্যকার হিসেবে অবতীর্ণ হলেন রাসবিহারী সরকার। নাটক-প্রয়োগ ও পরিচালনায় তিনিই। বিধায়ক-নরেশ-তাপস-কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা আর নেই বিশ্বরূপার প্রযোজনার সঙ্গে। বিশ্বরূপার গৌরবময় অতীতের কারিগরেরা নেই; তখন সর্বাধিনায়ক একজনই। থিয়েটারস্কোপ পদ্ধতির তৃতীয় প্রযোজনা 'জাগে'। প্রথম অভিনয় ১২ অক্টোবর ১৯৬৬, সন্ধে সাড়ে ছ'টায়। অভিনয়ে জয়শ্রী সেন, সুমিতা সান্যাল, শ্রাবণী বসু, অসিতবরণ, নির্মলকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ গাঙ্গুলি প্রমুখ। নাটকটি কোনওভাবেই সাড়া জাগাতে পারেনি। রাসবিহারী নিজের কৃতিত্বের এই পরিণতি দেখে অন্যপন্থা নিলেন। যদিও তা সাময়িক। কিছুদিনের জন্য থিয়েটার সেন্টারের তরুণ রায়ের ওপর নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। উভয়ের মধ্যে একটা সাময়িক চুক্তি হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের ২০ মে অভিনীত হয় 'রঙ্গিনী'। লেবেদেফের জীবনী অবলম্বনে নাটকটি যৌথভাবে লেখেন ধনঞ্জয় বৈরাগী ও প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। নাটকটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পরবর্তী প্রযোজনা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আগন্তুক' সুপ্রযোজনা হিসেবে সমাদৃত হয়।

এই প্রযোজনা চলাকালীনই সরকার পরিবারে মৃত্যু-ভাঙন-পৃথক হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে এবং ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে বিশ্বরূপার পুরোপুরি স্বত্ব গ্রহণ করেন রাসবিহারী সরকার। এতদিন সরকার পরিবারের যে সামগ্রিক কর্তৃত্ব ছিল তা এবার একজনের ওপর সমর্পিত হল। সেই সঙ্গে থিয়েটার সেন্টার তথা তরুণ রায়ের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তাও সম্ভবত আর অগ্রসর হল না। যথার্থ কারণ না জানা গেলেও তথ্য সেই কথাই বলে। নতুনভাবে কাজ শুরু করলেন তিনি। তাঁর অধিনায়কত্বে প্রযোজিত হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মেঘের ওপর প্রাসাদ' উপন্যাস অবলম্বনে 'ঘর' নাটকটি। প্রথম অভিনয় ৩ মার্চ ১৯৬৯-এ। অভিনয়ে ছিলেন স্বরূপ দত্ত, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, সর্বেন্দ্র,

শ্রীরঙ্গাম ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী

'রিজয়া' নাটকে
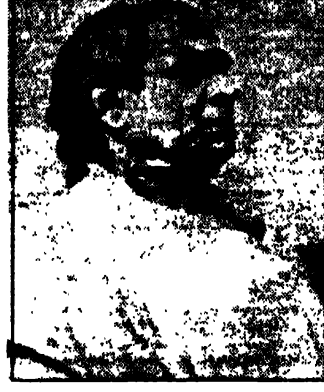
'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে

শেষ প্রযোজনা 'প্রফুল্ল' নাটকে

অনুপকুমার, সমরেশ ব্যানার্জী, নির্মল ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ সেন, তপন গাঙ্গুলি, কালী ব্যানার্জী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, উমানাথ চৌধুরী প্রমুখ। মঞ্চ ও আলোয় অমর ঘোষ, আবহে কমল রায়চৌধুরী। এই প্রযোজনারও সদর্থক দিকটি নির্দেশ করে সমালোচক লিখেছিলেন : বর্তমান দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার চাপে বাঙালি সমাজের যে শোচনীয়তার ছবি দেখে আমরা আঁতকে উঠছি তা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্তি পাওয়ার নির্দেশ দিতে সমাজের কোনও উৎসাহ দেখি না। বরং ভুয়ো সমাজ বিবর্তন ও বিপ্লবের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক নেতা ও তাদের চেলাচামুণ্ডারা দেশ ও জাতির ভাগ্যাকাশকে আরও ধূমায়িত করে তুলেছেন — সমগ্র জাতিকে তুলেছেন বিভ্রান্ত করে। এমন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে বিশ্বরূপা নাট্যশালা 'ঘর'-এর মতো নাটক মঞ্চস্থ করে জাতির সামনে তার সমস্যাকে মূর্ত করে তুলে শোচনীয়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ নির্দেশ দিয়েছে।'

এই প্রশংসা বিষয়গত। তাই নাট্যকারের তুলনায় কাহিনীকার প্রশংসিত, কিন্তু প্রযোজনা লোকপ্রিয়তা পায়নি একেবারেই। এই একই অবস্থা পরবর্তী দুটি প্রযোজনাতেই বর্তমান ছিল। 'বেগম মেরী বিশ্বাস' এবং 'কোথায় পাবো তারে' প্রযোজনা আর্থিক লাভের মুখ দেখেনি (কথিত আছে, আয়কর বিভাগীয় নথিতে তাদের কোনও প্রযোজনাই লাভের মুখ দেখেনি, এমনকি 'সেতু' প্রযোজনাতেই প্রচুর টাকা লোকসান গেছে বলে দেখানো হয়েছিল। তবে এ জাতীয় কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি)। 'কোথায় পাবো তারে' সুপ্রযোজনা হিসেবে প্রশংসা কুড়োলেও লোকপ্রিয়তা পায়নি। কিন্তু তারপরের দুটি প্রযোজনা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। শংকরের 'চৌরঙ্গী' এবং বিমল মিত্রের 'আসামী হাজির', 'চৌরঙ্গী' প্রথম অভিনয় হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এবং টানা প্রায় দু'বছর চলেছিল। শেষ অভিনয় ১ জুলাই ১৯৭৩। জনপ্রিয় হলেও সেতুর তুলনায় এই জনপ্রিয়তা খুবই ম্রিয়মান। এবং এই জনপ্রিয়তার পিছনে ঐতিহ্যবাহী পেশাদার মঞ্চে ক্যাবারে নৃত্যের আমদানি অন্যতম কারণ ছিল। থিয়েটারস্কোপের পর টিকিট বিক্রি বাড়াবার নবীনপন্থা মিস শেফালিদের মঞ্চায়ন। যার ফললাভ অনেক বেশি হয়েছিল চৌরঙ্গীর তুলনায় 'আসামী হাজির'-এ। এই প্রযোজনার বিজ্ঞাপনের ভাষাটি এইরকম ছিল :

চৌরঙ্গীর চেয়েও সাড়া জাগানো, মন মাতানো
বর্তমান বাংলা নাট্যমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার-পরিচালক
দুর্ধর্ষ
রাসবিহারী সরকারের দুর্ধর্ষ প্রচেষ্টা
আসামী হাজির

কাহিনী বিমল মিত্র। অভিনয়ে : বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলি, নির্মল ঘোষ, প্রমোদ গাঙ্গুলি, কণিকা মজুমদার, রুবি দত্ত, সৈকত পাকড়াশি, কিরণকুমার এবং মিস শেফালি। পাহাড়ী সান্যাল কিছুদিন অভিনয় করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আসেন পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়। আর এসেছিলেন দিলীপ রায় এবং আরতি ভট্টাচার্য।

'আসামী হাজির' জনপ্রিয় হয়েছিল। বিমল মিত্রের এই উপন্যাসের জনপ্রিয় মঞ্চায়নই বিশ্বরূপার শেষ জনপ্রিয় প্রযোজনা। এই ঔপন্যাসিকের পর পর প্রযোজনা মঞ্চস্থ হতে শুরু করল। কিন্তু আর টিকিট ঘরের সাফল্য পাওয়া যায়নি। রাসবিহারী সরকার আর কোনও চমকে লোককে আকৃষ্ট করতে পারেননি। কারণ চমক দিয়ে বেশি দিন শিল্পকে আকর্ষক করে তোলা সম্ভব নয়। তাই এরপর 'পরস্ত্রী', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'জনগণমন', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'সব ঠিক হ্যায়' বিশ্বরূপার ঐতিহ্যকে ম্লান করেছে ক্রমাগত। এই প্রযোজনাগুলির মধ্যে অন্য দুই ঔপন্যাসিকের দুটি উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' অবলম্বনে 'দেনা পাওনা' এবং আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা'।

যখন একের পর এক প্রযোজনা অসফল হচ্ছে এবং থিয়েটারের বাইরে অন্য স্রোতে ক্রমাগত টাকার যোগান দিতে হচ্ছে তখন কর্তৃপক্ষ দিশাহারা। কীভাবে আর্থিক সংস্থান করা সম্ভব তারই চেষ্টায় তৎপর রাসবিহারী ঠিক করলেন বিশ্বরূপার ফাঁকা জমিতে ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করে টাকা তুলবেন। প্রোমোটারি ব্যবসায় নামলেন তিনি। বাড়ি বিক্রি বাবদ

অগ্রিম টাকা নিতেও শুরু করলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, যে জমিতে বাড়ি তুলবেন ঠিক করলেন সেই জমি তাঁর নয়; বিশ্বরূপা হলটি তাঁর কিন্তু হল সংলগ্ন জমির মালিক তিনি নন। তাই জমির মালিকপক্ষ মামলা করলেন। ফলে থিয়েটার হলের লোকসান, মামলা এবং অগ্রিম টাকা ফেরত দেওয়ার তাগাদায় একেবারে বিপর্যস্ত রাসবিহারী সরকার। তাঁর গৌরবময় সেই সূচনা, থিয়েটারের সামগ্রিক উন্নতির স্বপ্ন একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। হল টিকিয়ে রাখা, নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাই তখন দায় হয়ে ওঠে।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে শুক্লা সেনগুপ্ত বিশ্বরূপা মঞ্চটি লিজ নেন রাসবিহারী সরকারের কাছ থেকে।

সংযোজন/১

রথীন চক্রবর্তী

শুক্লা সেনগুপ্ত পেশাদারি থিয়েটারে সুস্থরুচির নাটক প্রযোজনায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। 'স্বরলিপি', 'ফেরা', 'স্বীকারোক্তি' ও 'নীলকণ্ঠ' — ব্যবসার থেকেও তাঁর কাছে বড় কথা ছিল সুস্থ রুচির নাটক, ভালো নাটক প্রযোজনা। তাঁর নিজস্ব কোনও থিয়েটার হল ছিল না, তবু সুস্থ নাটক প্রযোজনার জন্য তিনি যথাসাধ্য করেছিলেন। বিজ্ঞাপন, শিল্পী ও কলাকুশলীদের মাইনে, হল ভাড়া — এইসব মিলিয়ে তাঁকে মাসে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকাও খরচ করতে হয়েছে, যার বেশির ভাগটাই বিজ্ঞাপনখাতে। এটা মানতেই হবে যে, শুক্লা সেনগুপ্ত কুরুচিকর সস্তা বিনোদনের পসরা সাজিয়ে দর্শকদের 'পকেট কাটা'র ফিকির না খুঁজে পেশাদারি থিয়েটারে বারবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাই আমরা তাঁর প্রযোজনায় বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে বেশ কিছু ভালো নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

তিনি বলেছিলেন : 'সুস্থ রুচির নাটক দেখতে লোকে কেন পয়সা খরচ করবে না, এইসব চিন্তা মাথায় রেখে একসময় একক প্রযোজনার দায়িত্বও নিয়ে ফেলি। 'স্বরলিপি'-র। তার পরের কথা জানা। জনপ্রিয়তা পেতে স্বরলিপি-র সময় লেগেছে। তাই প্রোডাকশনের বিপুল খরচ মাথায় নিয়ে প্রথম দিকে মার খেলেও আমি হতোদ্যম হইনি। ফেরা-তেও প্রথমে লোক হয়নি, কিন্তু পরে হল। বিপুল জনপ্রিয়তা পেল দুটি নাটকই।' (যুগান্তর। ২৩ জুলাই, ১৯৮৯)

'ঘন্টাফটক', 'ভালো খারাপ মেয়ে'-ও শুক্লা সেনগুপ্তের প্রযোজনা। গ্রুপ থিয়েটারের রমাপ্রসাদ বণিককে নিয়ে গিয়েছিলেন নির্দেশনায়। মনে রাখতে হবে, অনেক রথী-মহারথী যা পারেননি, বাংলা থিয়েটারের নেপথ্যের এই অনন্যা এক গৃহবধূ তা করেছিলেন। বিপুল ঋণভার নিয়ে তিনি আর চলতে পারছিলেন না। পরিস্থিতি তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু সং-প্রচেষ্টার প্রযোজনায় ছেদ টেনে দেয়।

সংযোজন/২

আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৪ নভেম্বর, ২০০১

গভীর রাতে বিশ্বরূপাও পুড়ল, প্রোমোটার গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : স্টার, রঙমহলের পরে পুড়ল বিশ্বরূপা। অন্য দুটির মতো বিশ্বরূপা থিয়েটারেও আগুন লাগল মধ্যরাতে। স্টার এবং রঙমহলে আগুন লাগার কারণ এখনও পরিষ্কার না হলেও বিশ্বরূপার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা করছে। আগুন নেভাতে যাওয়া দমকলকর্মীদের গলিতে লাঠিধারী মস্তানেরা আটকে রেখেছিল বলে অভিযোগ করেছেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী স্বয়ং।

প্রাথমিক তদন্তে রাজ্য সরকার জানতে পেরেছে, বিশ্বরূপা ভেঙে বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হলের ম্যানেজার জগদীশ মাহাত এবং প্রোমোটার রমেশ ভুতরাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রঙমহলের অব্যবহিত পরে এভাবে বিশ্বরূপায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি এব্যাপারে দমকলমন্ত্রী ও পুলিস কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি। তদন্ত অবশ্যই হবে। ফরেন্সিক রিপোর্ট পাওয়ার পরে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।

অন্যদিকে মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিশ্বরূপায় কে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তা আমার জানা। কিন্তু কিছু বলা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত করুন, প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি আমি তাঁকে দেব।' সেই সঙ্গে সুব্রতবাবুর অভিযোগ, 'বেশ কিছুদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যেসব আগুন লাগছে বলে বলা হচ্ছে, আসলে তার সবগুলোতেই আগুন লাগানো হচ্ছে।'

বুধবার রাত ১টা ১০ মিনিট নাগাদ বিশ্বরূপায় আগুন লাগে।....

১৯৯৭ সাল থেকে বন্ধ ওই ঐতিহ্যশালী থিয়েটার হলটি পুনর্গঠনের জন্য পুরসভার কাছে আবেদন করা হয়েছিল। গত চারবছরে হলের চেয়ারসহ বিভিন্ন আসবাব ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। থিয়েটার হলের জমিতে বহুতল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল বলে পুলিস তদন্তে জানতে পেরেছে। ওই জমিটির লিজ দলিলে নাম রয়েছে জয়ন্তী মিশ্র নামে এক মহিলার। জমিটি লালচাঁদ বৈদ ট্রাস্টির কাছ থেকে লিজে নিয়েছিলেন রাসবিহারী সরকার। জয়ন্তী দেবী রাসবিহারীবাবুর মেয়ে। তাঁর অভিযোগ, এই আগুন পরিষ্কার অন্তর্ঘাত। ট্রাস্টির সদস্য যুগলাল সুরানা জানিয়েছেন, 'সম্প্রতি জয়ন্তী দেবী দুই প্রোমোটার রমেশ ভুতরা এবং অশোক আগরওয়ালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাড়ি সংস্কারের চেষ্টা করছিলেন। আমি লিখিতভাবে এই কথা পুলিসকে জানিয়েছি।' ভুতরাকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জয়ন্তী দেবী অন্তর্ঘাতের দায় পুরোপুরি চাপিয়ে দিয়েছেন সুরানার ওপরে। তিনি বলেন, 'এতে সুরানারই একমাত্র লাভ।' মেয়রের সঙ্গেও এদিন দেখা করেন জয়ন্তী মিশ্র। তিনি মেয়রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ছ'শ আসনবিশিষ্ট বিশ্বরূপা ফের গড়ে তোলা হবে। এদিন দুপুরে পুরসভার বিল্ডিং দপ্তর ওই বাড়ি ভাঙার জন্য একটি নোটিস জারি করা হয়েছে।

জয়ন্তী মিশ্র বলেছিলেন বিশ্বরূপা ফের গড়ে তোলা হবে। কলকাতা পুরসভা বলেছিল, বিশ্বরূপা পুনর্গঠনে পূর্ণ সহায়তা করবে তারা। কিন্তু বিশ্বরূপা আর গড়ে ওঠেনি। যারা বিশ্বরূপাকে ধ্বংস করেছিল তাদের কোনও শাস্তি হয়নি। রাজ্য সরকারের পূর্ণ তদন্ত রিপোর্টও প্রকাশ পায়নি। থিয়েটারমহল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, কিন্তু নিঃশব্দে।

রঙমহলের কথা

অরুণিতা রায় চৌধুরী
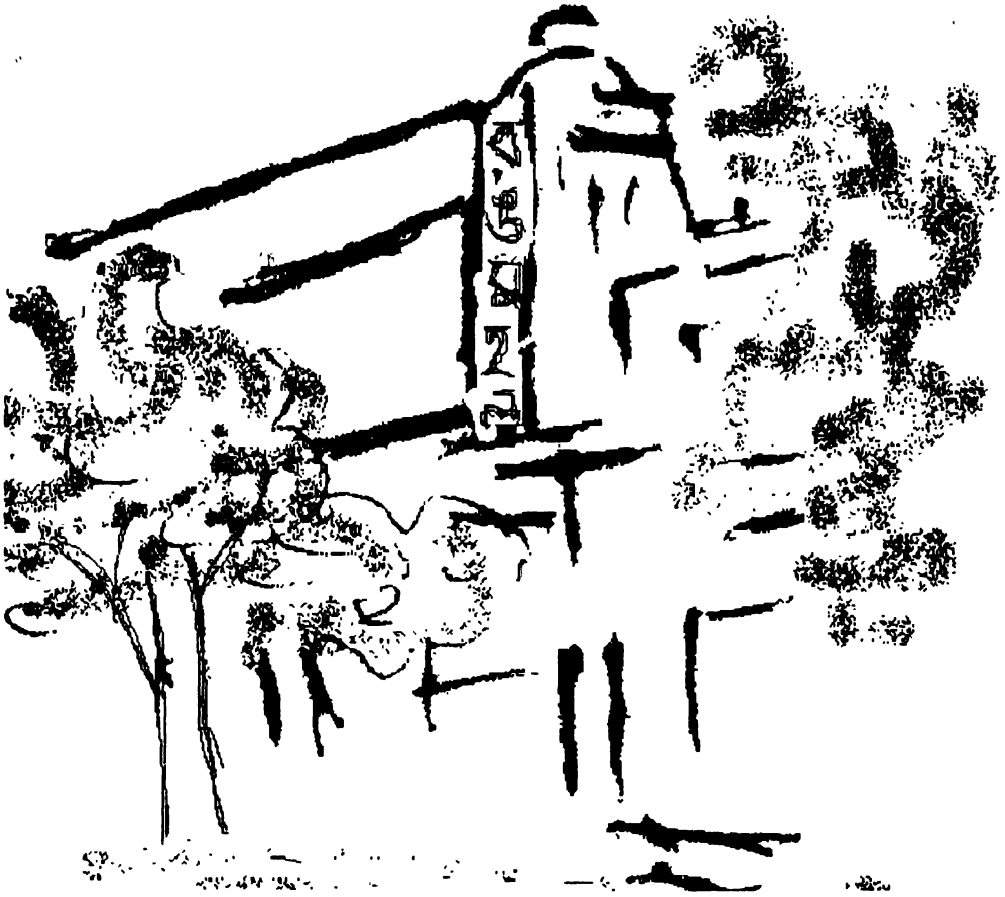
রঙমহলের প্রথম নাটক 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-তে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও প্রভা দেবী

আমার স্মৃতিবিজড়িত বহুদিনের থিয়েটার রঙমহল পুড়ে গেল গত ২৮ অগাস্ট, ২০০১ সালের গভীর রাতে। একটু অবাক হওয়ারই কথা। আমার স্মৃতিবিজড়িত, সেটা আবার কী? না, আমার তেমন কোনও ইতিহাস নেই যে ছেলেবেলায় বাবা-মায়ের হাত ধরে থিয়েটারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। কিন্তু উত্তর কলকাতায় জন্মসূত্রে থিয়েটারের পাড়ার কাছাকাছি বড় হয়ে ওঠায় প্রত্যেকটি থিয়েটার হল কেমন আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। আমার বাবা ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত গায়ক-নায়ক রবীন মজুমদার। না, বাবার তেমন কোনও উৎসাহ ছিল না যে তাঁর ছেলেমেয়েরাও অভিনেতা-অভিনেত্রী হোক, কিন্তু আমাদের বাড়িতে থিয়েটারের একটা আবহাওয়া নিশ্চয়ই ছিল, যেহেতু রবীন মজুমদার নিয়মিত থিয়েটার করতেন। সকাল-বিকেল কত যে গুণীজন মানুষের আনাগোনা ছিল আমাদের বাড়িতে তা আর বলে শেষ করা যায় না। আজ ভাবলে অবাক লাগে, ঘরবাড়ি সবই রয়েছে কেবল সেইসব মানুষই নেই। আর এবার থিয়েটার হলগুলোও একে একে পুড়তে শুরু করেছে। মনে পড়ছে আমাদের মাস্টারমশাই গণেশ মুখোপাধ্যায়ের কথা — রঙমহলের ভস্মের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, 'স্টার যেদিন পুড়ল, আমরা বলেছিলাম বাংলা থিয়েটারের কপাল পুড়ল। কিন্তু হালে স্টার তৈরি করা নিয়ে হইচই শুরু হওয়ায় একটা আশা জেগেছিল, হয়তো সুদিন ফিরবে। রঙমহলের পরে আর সেই আশাও নেই।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ অগাস্ট, ২০০১)

উত্তর কলকাতার থিয়েটারপাড়ায় অনিশ্চয়তার বাতাবরণ বেশ কয়েক বছর ধরেই লক্ষ করা যাচ্ছিল, একের পর এক থিয়েটার হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এই সেদিন পর্যন্তও রঙ্গনা থিয়েটার গণেশ মুখোপাধ্যায় ও হীরক মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় টিমটিম করে চলছিল, কিন্তু তা আজ বন্ধ। কেন এমন হল তার অনুসন্ধানে হয়তো অনেক যুক্তিই অনেকে দেখাবেন, কিন্তু থিয়েটার হলগুলোকে অন্য কাজে ব্যবহার করার প্রবণতা সেই বিধানচন্দ্র রায়ের আমল থেকেই। তখন শিল্পী-কলাকুশলীরা একসঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিলেন বলেই হয়তো থিয়েটার টিকেছিল, কিন্তু আজ আর তা সম্ভব হল না। ৭৬বি, বিধান সরণির যে বাড়িটির নাম রঙমহল থিয়েটার সেই বাড়িটির বাইরে একটি সাইনবোর্ডে কিছু লেখা পড়ে সত্যি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল : বিবাহ, প্রদর্শনী, মহলা, অন্নপ্রাশন ও অন্য যে কোনও অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হয়। যোগাযোগ, ফোন : ৫৫৫-৭১৮৬।

বেশ কিছুদিন আগে দা স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত 'থিয়েটার অব ডিকে' (২১.১২.১৯৯৯) শীর্ষক রিপোর্টে জেনেছিলাম, গত পনেরো বছর ধরে থিয়েটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা অনিল চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে, মঞ্চটি ঠিক আছে কিন্তু বেশির ভাগ বসার আসন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওই একই রিপোর্টে রঙমহল থিয়েটারের মালিক ললিতকুমার কাঙ্কারিয়া বলেছিলেন যে থিয়েটার থেকে কোনও লাভ হচ্ছিল না। কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুৎ এইসব খরচা, তাছাড়া পুরকর্তৃপক্ষ ডেড় লক্ষ টাকার জলকর ধার্য করেছেন যে জল পানের জন্য ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। এদিকে কোনও প্রযোজক থিয়েটার করতেই চাইছেন না। এমতাবস্থায় থিয়েটার বন্ধ করা ছাড়া তাঁর কোনও উপায় নেই। তাই ১৯৯৭ সালে অভিনেত্রী রত্না ঘোষাল ও সুশীল দাসের প্রযোজনায় 'জয় জগন্নাথ' রঙমহল থিয়েটারে অভিনীত শেষ নাটক। এরপর ওই বছরের নভেম্বর মাস থেকে রঙমহল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৯ সাল থেকে নানা সামাজিক শুভ অনুষ্ঠানের আয়োজনে হলটির ভাড়া দেওয়া শুরু হয়।

রঙমহল থিয়েটারের দীর্ঘদিনের সুখদুঃখের সাথী অভিনেতা-পরিচালক জহর রায় তাঁর প্রবন্ধ 'নাট্য ও সাধারণ রঙ্গামঞ্চ'-এ লিখেছিলেন, 'আমাদের পেশাদার রঙ্গামঞ্চে উন্নতমানের নাটকের প্রযোজনার জন্য থিয়েটার মালিক, পরিচালক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার দরকার এবং কমার্শিয়াল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এর সমন্বয় সাধন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমি মনে করি নাট্যসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে পেশাদার ও অপেশাদার শিল্পীদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গো মঞ্চশিল্পীদের সাক্ষাৎকালে আমি এই মতই ব্যক্ত করেছি যে একটা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেলে দেশের এমন কিছু যায় আসে না, কিন্তু সংস্কৃতি মারা গেলে দেশের আর কিছুই থাকে না।' (এপিক থিয়েটার/তারিখ পাওয়া যায়নি)

অথচ ভাবুন, এই রঙমহল থিয়েটার — ১৯৩১ সালে প্রখ্যাত অভিনেতা রবীন্দ্রমোহন রায় এবং গায়ক অভিনেতা কৃষ্ণচন্দ্র দে যৌথ প্রতিষ্ঠানরূপে এই থিয়েটারটিকে গড়েছিলেন। তখন সবে শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর আমেরিকা সফর সেরে ফিরে এসেছেন, ঠিক হল নাটক যোগেশ চৌধুরীর 'বিষ্ণুপ্রিয়া', শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালক। ১৯৩১ সালে ৮ অগাস্ট 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকের উদ্বোধন হল রঙমহল থিয়েটারে। শিশির ভাদুড়ী স্বয়ং নিমাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করলেন, সঙ্গে ছিলেন যোগেশ চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, রবি রায়, কঙ্কাবতী, প্রভাদেবী, সরযূদেবী, রাজলক্ষ্মী প্রমুখ। এই রঙমহল থিয়েটারেই আর একটি মানুষের মঞ্চজীবনের আর এক নতুন অধ্যায় শুরু হল, তিনি হলেন সতু সেন। তিনি এই প্রথম 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে শিল্পনির্দেশক হিসাবে কাজ করলেন। অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সতু সেন প্রসঙ্গো তাঁর 'সতুদা' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'বাংলা রঙ্গমঞ্চে মঞ্চ ও আলোর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন সতু সেন। আমেরিকা থেকে ফেরার পর 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে উনি প্রথম আলো করেন। দর্শক হিসাবে সেই আলো দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। নিমাইয়ের বাড়ির দাওয়া, মা-ছেলের কথা হচ্ছে। সময় তখন ধরা যাক সাড়ে বারোটা, তারপর গভীর রাত্রি, ক্রমশ ভোর হল। এই সম্পূর্ণ পরিবেশটা পেছনে শুধু সাইক্লোরামার সাহায্যে উনি তৈরি করেছিলেন।' (সংসৃতি/সতু সেন বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৯৯৮) সেই প্রথম রজনীর অভিনয়ে মঞ্চে ও নেপথ্যে যে সমস্ত গুণীজনেরা ছিলেন, তাঁরা হলেন প্রয়োগশিল্পী শিশিরকুমার ভাদুড়ী, সুরশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে, মঞ্চশিল্পী সত্যেন্দ্র সেন, ওই সহকারী মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়, হারমোনিয়ামবাদক কালীদাস ভট্টাচার্য, নৃত্যশিক্ষক ব্রজবল্লভ পাল, বংশীবাদক শৈলেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, সংগতি ও খোলবাদক শশাঙ্কশেখর চতুর্বেদী ও অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, বেহালাবাদক ললিতমোহন বসাক, কুমার কনকনারায়ণ ও নরেন্দ্রনাথ দাস, স্মারক মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় ও বিমলচন্দ্র ঘোষ, চিত্রশিল্পী রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মঞ্চসজ্জাকর ভূতনাথ দাস।

এরপর ১৯৩২ সালের ২৫ মার্চ নলিনী চ্যাটার্জির নাটক 'রঙের খেলা', মে মাসে 'শাদী কি শূল' ও ২৫ জুন উৎপল সেনের 'সিন্ধু গৌরব' নাটক অভিনীত হল। 'সিন্ধু গৌরব' নাটকে নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, উৎপল সেন, সরযূবালা, চারুবালা প্রমুখ অভিনয় করেন। এ নাটকেও মঞ্চ জুড়ে সতু সেন সিন্ধুনদের উপকূলে বিশাল নৌকা তৈরি করেছিলেন। আর তেমনই ছিল রাজকীয় মঞ্চসজ্জা। এই সময় রঙমহল থিয়েটারে আর্থিক দুরবস্থা দেখা দেয়, ১৯৩৩

সালে শিশির মল্লিক এবং যামিনী মিত্র রঙমহলের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। এঁদের উদ্যোগ এবং উৎসাহে ১৯৩৩ সালের ১৫ এপ্রিল সতু সেন রঙমহলে প্রথম ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে বাংলা তথা ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে এক ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর আত্মস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন, 'স্থানু মঞ্চের উপর একটি দৃশ্য থেকে অপর একটি দৃশ্যে যেতে হলে মঞ্চসজ্জার পরিবর্তন, বিভিন্ন চরিত্রের আগমন এবং নিষ্ক্রমণে প্রচন্ডভাবে সময়ের অপব্যবহার হত। দ্বিতীয়ত নাটকের গতি ও সচলতাও তাতে বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। উক্ত অসুবিধাগুলি দূর করার প্রয়াসেই আমি ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ নির্মাণে ব্রতী হই।' (সংসৃতি, সতু সেন বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ-২, ১৯৯৮)

পরবর্তীকালে রঙমহল ছাড়াও তিনি ভারতের বিভিন্নস্থানে এই ধরনের মঞ্চ তৈরি করেছেন। সেই সময়ে এই মঞ্চটি তৈরি করতে কত খরচ হয়েছিল, তার একটা হিসাব তিনি দিয়েছেন, তা হল —

ESTIMATE OF A 30'DIA
REVOLVING STAGE

1. Revolving portion of the stage with rims, spokes, ballbearings Central pivot, worns and pinions etc. L.S. Rs. 4600/-

2. Driving Motor (5H.P.) with starter etc. L.S. Rs. 1500/-

3. Wood Work L.S. Rs. 1200/-

4. Masonary Support L.S. Rs. 2500/-

5. Fitting and Erection L.S. Rs. 1500/-

Total Rs. 11,300/-

এছাড়া মঞ্চ তৈরি যিনি করবেন, তাঁর পারিশ্রমিক ২৫০০ টাকা।

১৯৩৩ সালের ১৫ এপ্রিল অনুরূপা দেবী প্রণীত ও যোগেশ চৌধুরীর নাট্যরূপায়িত 'মহানিশা' নাটকটি এই অভিনব মঞ্চে প্রথম অভিনীত হল। মঞ্চকর্মী শিবনারায়ণ ঘোষ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন : 'মহানিশা' নাটকের একটি দৃশ্য মনে পড়ে। জলের ওপর দিয়ে একটা বজরা চলে যাচ্ছে — স্টেজের মধ্যে দশ-বারোটি রোলার এপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলছে, রোলারের গায়ে ছবি আঁকা, দুটো লোক ঐগুলোকে ঘোরাবেন, বজরাটা আস্তে আস্তে চালানো হচ্ছে। উপর থেকে একটা হালকা নীল আলো এসে পড়েছে — দূর থেকে দেখে মনে হতো নদীর ঢেউগুলো সামনের দিকে আছড়ে পড়ছে আর উপর দিয়ে বজরাটা চলে যাচ্ছে — একটা অভিজ্ঞতা।' (সংসৃতি, ওই)

প্রকৃত অর্থে মঞ্চপরিকল্পনায়, মঞ্চস্থাপত্যে ও আধুনিক আলোর ব্যবহারে এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেদিনের কলকাতার মানুষ। আগে মঞ্চে আর্কের স্পটের ব্যবহার ছিল — সে আলো হঠাৎ যেমন মঞ্চে আসত তেমনই হঠাৎ চলে যেত। এই প্রথম সতু সেন ল্যাম্পের স্পট ব্যবহার করলেন। দর্শক সেদিন প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন কেমন আস্তে আস্তে দিনের আলো চলে যাচ্ছে, রাতের আলো আসছে। 'মহানিশা' নাটক থেকে শুরু হল মঞ্চের দ্রুত আধুনিকীকরণ। এই 'মহানিশা' নাটকে অভিনয় করেছিলেন নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, ভূমেন রায়, শান্তি গুপ্তা, পুতুল, চারুবালা দেবী প্রমুখ। শুধু মঞ্চ পরিকল্পনা নয়, নাটক রচনা ও অভিনয়েও বাংলার দর্শক এক অন্য স্বাদ অনুভব করতে শুরু করলেন। রঙমহলে তখন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ। 'মহানিশা' নাটকে যোগেশ চৌধুরী অভূতপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। এবং যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা সে অভিনয় দেখতে পেয়েছেন তাঁরাই জানেন যে নাটক ছাড়িয়ে কোথায় যেত তাঁর অভিনয়। 'মহানিশা' নাটকে তিনি হতেন গ্রামের একজন সুদখোর বদমেজাজি লোক। একদিন সেই খিটখিটে স্বভাবের লোকটি তাঁর পুরনো জমজমাট সংসারের বর্ণনা দেন। শুরুটা করেন যেন খানিকটা ব্যঙ্গো, অলিপ্ত তৃতীয় ব্যক্তির মতো। কিন্তু বলতে বলতে তাঁর গলা বদলে যায়, স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, বিবরণটা ক্রমশ যেন গভীরভাবে ব্যক্তিগত হয়ে উঠল। তখন এই নিঃসঙ্গ বদমেজাজি মানুষটার গোপন ক্ষতের জায়গাটা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে। যোগেশ চৌধুরীর বাচনভঙ্গি ছিল স্বাভাবিক কথা বলারই মতো। এই অভিনয়ে বরং

খিঁচিয়ে ওঠার ভাব ছিল বেশি। সেই কাঠামোর মধ্যেই তিনি অতিকৃতির সাহায্য না নিয়ে এমন একটা সুর আনতেন যে বর্ণনার শেষটুকুতে মনে হত লোকটা যেন আর্তনাদ করে বিলাপ করে উঠল।'

১৯৩৩ সালের ২ ডিসেম্বর রঙমহলে অভিনীত হল মন্মথ রায়ের নাটক 'অশোক'। 'অশোক' নাটকের মঞ্চসজ্জায় সতু সেন অশোকযুগের সার্থক পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। বিশাল বৌদ্ধবিহার, দৃশ্যের পর দৃশ্য অনবদ্য কারুচিত্র পরিকল্পনা আর আলোর গভীর ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ — সেদিনের দর্শকের এ ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এমনকি সংবাদপত্রগুলিতে, যেমন অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রায়ই এরকম মন্তব্য করা হত : Cheer up Rangmahal! You have revived the fallen glory of Bengali Stage. অথবা : ... of all play houses in Calcutta today, Rangmahal is probably doing most to build up a sound tradition for the Bengali Stage on entirely new lines .... 'অশোক' নাটকে অভিনয় করেছিলেন রবি রায়, ভূমেন রায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, নরেশ মিত্র, চারুবালা দেবী।

কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কাহিনী 'স্পর্শের প্রভাব' নাট্যরূপ দিলেন যোগেশ চৌধুরী, নাম হল 'পতিব্রতা'। ১৯৩৪ সালের ৩১ মার্চ রঙমহলে নরেশ মিত্র, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ, শান্তি গুপ্তা, যোগেশ চৌধুরী প্রমুখ অভিনয় করলেন। এ প্রসঙ্গে নরেশ মিত্র সম্পর্কে বলা প্রয়োজন, তাঁর অভিনয়সুলভ চেহারা বা কণ্ঠ কোনওটাই ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি প্রথম সারির অভিনেতারূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। চরিত্রাভিনেতারূপে তাঁর যেমন খ্যাতি ছিল, তেমনই নাট্যশিক্ষকরূপেও তাঁর প্রভূত সুনাম ছিল, বহু নাটকের কৃতী নাট্যনির্দেশকও তিনি। এরপর ওই বছরেরই ২০ সেপ্টেম্বর প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কাহিনী 'পথের শেষে' যোগেশ চৌধুরীকৃত নাট্যরূপ 'বাংলার মেয়ে' অভিনীত হল রঙমহলে। মধ্যত্রিশ দশকের 'মহানিশা' ও 'বাংলার মেয়ে' বাংলা মঞ্চে সব অর্থে সফল নাটক।

যোগেশ চৌধুরীর আর এক স্মরণীয় অভিনয় ছিল এই 'বাংলার মেয়ে' নাটকে। তিনি অভিনয় করতেন একজন সাত্ত্বিক আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের। তিনি মেয়েকে দেখতে এসেছেন। জামাই কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে এসে বলে যে, সে তার স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলেছে। কয়েকদিন পরে আজ ঘরে ফিরে সে আকস্মিক এক রাগে তার স্ত্রীর হাত ধরে টান মারে। স্ত্রী তখন কয়েকদিন অভুক্ত থাকার পর খেতে বসেছে। দুর্বল শরীরে সেই হ্যাঁচকা টান সহ্য করতে পারেনি, মরে গেছে। জামাই কেঁদে বলে, আপনি আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিন, আমি ওকে খুন করেছি। বৃদ্ধ যেন ভালো করে শোনেন না কথাগুলো, তারপর যেন আপন মনে বলেন : কিন্তু আমার তো চোখে জল আসছে না, যাই বৌমাকে গিয়ে বলি, সে কাঁদলে তখন হয়তো আমারও কান্না পাবে। তারপর একটা শ্বাস টেনে বললেন : শিব শম্ভু, শিব শম্ভু —! তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। শম্ভু মিত্র তাঁর 'কিছু স্মরণীয় অভিনয়'-এ লিখেছেন : 'সাজঘরে তিনি তখন কাপড় বদলাচ্ছেন, আমি উত্তেজিত হয়ে সেখানে গিয়ে বললুম — আপনি কী করলেন? কী করে? (অল্প বয়সের অহঙ্কারে বলেছিলুম) যদি কোথাও আপনার গলা কাঁপতো বা ঐ-রকম কিছু হতো, আমি সত্যি বলছি আপনাকে, আমি এখুনি সেটা তুলে ফেলতে পারতুম, কিন্তু আপনি তো গলার আওয়াজ কিছু বদলালেন বলে বুঝতে পারলুম না, অথচ অতো কান্না কী করে প্রকাশ পেলো? আপনি কী করে করলেন ওটা?

'তখনো যোগেশবাবু যেন সজল হয়ে আছেন। একটু হেসে প্রায় আপন মনেই বললেন, — কি জানো, ধ্যান করতে হয়, ধ্যান করলে — মন দিয়ে ধ্যান করলে — তারপর পাওয়া যায়। অথচ এই লোককেই আমি 'রমা'-তে গোবিন্দ গাঙ্গুলির মতো ধূর্ত ও নীচ লোকের অভিনয় করতে দেখেছি। এইরকম ব্যাপ্তি না থাকলে আমাদের দেশের শিল্পীরা উচ্চতম শ্রেণীর বলে গণ্য হতেন না। এই হল আমাদের ঐতিহ্য।' (সম্মার্গ সপর্যা, মাঘ, ১৩৯৬)

রঙমহলে এর মাঝে 'কাজরী' ও ১২ ডিসেম্বর যোগেশ চৌধুরীর নাটক 'রাবণ' অভিনীত হয়। এই নাটকে অন্যান্যদের সঙ্গে জহর গাঙ্গুলি ও ভূমেন রায়ও অভিনয় করেন। এ নাটকে যামিনী রায়ের চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে মঞ্চ পরিচালনা করেন সতু সেন। এরপর ১৯৩৫ সালে যোগেশ চৌধুরীর নাট্যরূপান্তরিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' নাটক অভিনীত হয়। এ নাটকে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 'উপেন'-এর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেন।

সুধীন রাহার 'সর্বহারা' ও যোগেশ চৌধুরীর 'নন্দরাণীর সংসার' ১৯৩৬ সালে অভিনীত হয়। প্রথম রাত্রিতেই রঙমহলে 'নন্দরাণীর সংসার' নাটকে বিপুল দর্শক সমাগম হয়। এই নাটকটির প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে (শ্রীশ্রী রাধাষ্টমী, ১৯৪৩) স্বয়ং নাট্যকার লিখেছিলেন, 'প্রথম অভিনয় রাত্রি হইতে নাট্যামোদী দর্শকদেব উৎসাহ এবং প্রেক্ষাগৃহের জনসমাগম দেখিয়া মনে হয়, নাটকখানি দর্শকসাধারণের ভালো লাগিয়াছে। যাঁহাদের পরিশ্রম ও সহানুভূতিতে অভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছে — রঙমহলের সেই সকল অভিনেতৃগণ, প্রযোজক এবং কর্মীমণ্ডলীকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার সহকর্মী বন্ধু শ্রী সতু সেন, শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শ্রী মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়কে আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাইতেছি — তাঁহারা নাটকের অনেক ক্ষুদ্র ত্রুটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভগবৎ কৃপা না থাকিলে শুধু মানুষের চেষ্টায় কোনও কর্মই সুসিদ্ধ হয় না। রঙমহলের প্রায় মুমূর্ষ অবস্থায়, এই অভিনয় যে এতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহা মনে করি নাই।' বাংলা মঞ্চে যোগেশ চৌধুরীকৃত শেষ উপন্যাসের নাট্যরূপ অনুরূপা দেবীর 'পথের সাথী' ১৯৩৬ সালে রঙমহলে অভিনীত হয়। 'নন্দরাণীর সংসার' নাটকটি অভিনীত হওয়ার পর রঙমহল মাঝের কিছুদিনের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে আবার সচল হয়েছিল। যামিনী মল্লিক ও রঘুনাথ মল্লিক এইসময় রঙমহল চালানোর দায়িত্ব নেন। যোগেশ চৌধুরীর পর আর একজন নাট্যকার এলেন রঙমহলে, তিনি হলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। ১৯৩৭-৩৮-৩৯ সালে একে একে যোগেশ চৌধুরীর 'মাকড়শার জাল' এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' ও 'বিশ বছর আগে' নাটকগুলি অভিনীত হল। এরপর রঙমহলের মালিকানা বদল এবং যোগেশ চৌধুরীর রঙমহল ত্যাগ। 'মাটির ঘর' নাটকে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মাটির ঘরের কর্তা সত্যপ্রসন্নের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তাঁর এক মেয়ে স্বামীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করে। নাটকের শেষে তাঁর আর এক মেয়ে পাগল হয়ে যায়, এমনকি পুত্রপ্রতিম যে জামাই সে-ও মারা যায়। তখন সত্যপ্রসন্ন ওপবের দিকে তাকিয়ে বলে — এক অস্বাভাবিক কণ্ঠে — তুমি স্টুপিড, তুমি আমাকে কাঁদাতে পারবে না। এইরকম সংযত অভিনয়ের জন্য মহর্ষির খ্যাতি ছিল। তিনি কখনও বাড়াবাড়ি করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারতেন না। তাহলে কী প্রকাশ পেত? শম্ভু মিত্র বলেছেন : 'আমরা কাঁদতুম না, কিন্তু আমাদের গলার কাছটায় লাগতো, ঢোক গিলতে কষ্ট হ'তো। কেন? আমি বারেবারেই দেখেছি যে অভিনয়ে যখন মানুষের গভীর আবেগ এইরকম প্রকাশ হয় তখন সেটা নাটকের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেন অন্য আর একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছয়। তাই নাটক মাপবার সরলীকৃত মাপকাটি দিয়ে ভালো অভিনয়কে মাপা যায় না। সেজন্য বিচারের সময়ে সেই সংবেদনশীল মন থাকা চাই যা আধুনিককালের পরিপ্রেক্ষিতে একটা মানুষের সত্য প্রকাশ দেখতে পায়, অনুভব করতে পারে।'[২]

শম্ভু মিত্রও তখন রঙমহলের নিয়মিত অভিনেতা। তিনিই বলেছেন, 'রঙমহলে প্রথম। .... কয়েকটা পুরনো নাটক করলাম, আর তারপরই একটা নতুন নাটক শুরু হল বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়' বলে। তাতেও অভিনয় করলাম। তারপবেই বোধহয় গৌর শী'র লেখা 'ঘূর্ণি' বলে একটা নাটক হয়েছিলো। সেটাতে অভিনয় করলাম। তারপর 'রত্নদীপ' হয়েছিলো, সেটাও বোধহয় বিধায়কেরই করা নাট্যরূপ, সেটাতে অভিনয় করলাম। (শম্ভু মিত্র, সাক্ষাৎকার/সুবীর রায়চৌধুরী, বহুরূপী, ৪৬)

ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উপযোগী নাটক শচীন সেনগুপ্তের 'তটিনীর বিচার' রঙমহলে শুরু হল ১৯৩৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর। শুরু হয়ে গেল নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের জয়যাত্রা। একটা নতুন হাওয়া বাংলা মঞ্চে প্রবাহিত হল। এ নাটকে অপূর্ব শিল্পকীর্তি হয়ে রয়েছে অহীন্দ্র চৌধুরীর ডা. ভোস আর নায়িকা 'তটিনী'-র ভূমিকায় রাণীবালাব অভিনয়। এই নাটকের অভিনয়ের পর রঙমহলের দরজা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। ১৯৩৯ সালের ৫ জুলাই রাণীবালা আবার রঙমহলে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে' নাটকে 'বীণা'-র ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর গৌর শী-র নাটক 'ঘূর্ণী' এবং ১৯৪০ সালের ২৪ ডিসেম্বর কথাশিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'রত্নদীপ' বিধায়ক ভট্টাচার্য কর্তৃক নাট্যরূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হল। অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এঁরা সকলেই তখন রঙমহলে। ১৯৪২ সালে অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রঙমহলের লেসি হন। তাঁর আমলে অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তী, মিহির ভট্টাচার্য, রাণীবালা, সুহাসিনী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী

যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ সালে রঙমহলের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' এবং অয়স্কান্ত বক্সীর নাটক 'ভোলা মাস্টার'। এই সময়েই ভিন্নধর্মী চরিত্র সৃষ্টিতে অহীন্দ্র চৌধুরী তখন খুবই জনপ্রিয়। 'মাইকেল' ও 'ভোলা মাস্টার'-এর নামভূমিকায় তাঁর দুটি চরিত্রই অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। 'মাইকেল' নাটকে 'হেনরিয়েটা'-র ভূমিকায় রাণীবালার অনবদ্য অভিনয় দর্শক কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। নাট্যনিকেতনে 'রিজিয়া' নাটক অভিনীত হওয়ার পর ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে রঙমহলের 'রিজিয়া' নাটকে রিজিয়ার নামভূমিকায় সুশীলাসুন্দরীর বদলে রাণীবালা অভিনয় করেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে অহীন্দ্র চৌধুরী কয়েকটি নতুন চরিত্রে রঙমহলেই অভিনয় করেন। প্রমথ চৌধুরীর 'সানিভিলায়' গৃহস্বামী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিংশ শতাব্দী' নাটকে ড. শাস্ত্রী, আর দেবনারায়ণ গুপ্তের নাট্যরূপ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামের সুমতি' নাটকে। 'রামের সুমতি' নাটকে জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সুহাসিনী দেবী, বেলা দেবী, রমা দেবী প্রমুখ অভিনয় করেন। দেবনারায়ণ গুপ্ত লিখেছেন : '২২ জুন 'রামের সুমতি' পাদপ্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করলো। 'রামের সুমতি'-র মহলায় সন্তোষদা আর সুলালদা (জহর গঙ্গোপাধ্যায়) আপ্রাণ পরিশ্রম করতে লাগলেন। 'রামের সুমতি'-র সাফল্যের মূলে এঁদের কথা আজও আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।'[৩]

১৯৪৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অয়স্কান্ত বক্সীর নাটক 'অধিকার' অভিনীত হয় — সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, সুহাসিনী, পূর্ণিমা অভিনয় করেন। ১৯৪৫ সালে রঙমহলেই বাণীকুমার রচিত 'সন্তান' (বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ') ও দেবনারায়ণ গুপ্তের 'অনুপমার প্রেম' (শরৎচন্দ্র) অভিনীত হয়। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতায় থিয়েটারের খুবই খারাপ অবস্থা। মাঝে মধ্যে পুরনো নাটকের অভিনয় ছাড়া নতুন নাটক নেই বললেই চলে। এরপর ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট শচীন সেনগুপ্তের নতুন নাটক 'বাংলার প্রতাপ' অভিনীত হল। এ নাটকে 'কার্ভালো' চরিত্রটি অহীন্দ্র চৌধুরীর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। তখন তাঁর বাহান্ন বছর বয়স, ওই বয়সে রবি রায়ের মতো সাড়ে ছ'ফুট লম্বা বিশালদেহী মানুষটাকে কাঁধে তুলে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করতেন। ১৯৪৮ সালে রঙমহলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক 'রাণাপ্রতাপ', শচীন সেনগুপ্তের 'আবুল হাসান' এবং ১৯৪৯ সালে শচীন সেনগুপ্তের 'রজনী' (বঙ্কিমচন্দ্র) ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুইপুরুষ' নাটক অভিনীত হল। 'দুইপুরুষ'-এর 'নুটবিহারী' তাঁর সংগ্রামী চেতনার জন্য আমাদের শ্রদ্ধা লাভ করেন। 'দুইপুরুষ' নাটকে রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া অন্য গানগুলি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সজনীকান্ত দাসের রচনা। 'দুইপুরুষ' নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল অমৃতবাজার পত্রিকা। (২৮ জুন, ১৯৪২) 'The play presents itself as a perfect specimen of a heat drama, masterfully woven by a magic hand, neatly executed with finished touches of productional fineness and re-created by a nicely co-ordinated band of artistes.'

রঙমহলে বিভিন্নরকমের নাট্যপ্রযোজনার আয়োজন, শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয় — এসব যেমন আমরা দেখেছি তেমনই এটাও মনে রাখতে হবে যে, রঙমহল থিয়েটার যে সবসময় সুষ্ঠুভাবে চলেছে তা নয়। অনেকবারই মালিকানাবদল হয়েছে, এমনকি মাঝে মাঝে থিয়েটার বন্ধও রাখতে হয়েছে। অভিনেতা শরৎচন্দ্র রঙমহলের লেসিরূপে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিলেও, তাঁর বেহিসাবি অর্থব্যয়ের ফলে, তিনি বিপুল ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়েন। এই সময় অহীন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় ও পরিচালনায় কয়েকটি পুরনো নাটক যেমন 'মেবার পতন', 'রিজিয়া', 'বঙ্গে বর্গী' ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিলেও লেসি শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। পাওনাদাররা কোর্টের আদেশে তাঁকে 'ইনসলভেন্ট' বলে ঘোষণা করেন। শরৎচন্দ্র রঙমহল ছেড়ে দিলে, কিছুকাল সতীনাথ মুখোপাধ্যায় রঙমহল থিয়েটার পরিচালনার ভারগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালের ২ অক্টোবর দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যরূপায়িত শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে গিরিশের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী অসাধারণ অভিনয় করেন। এবং প্রভা দেবী সিদ্ধেশ্বরীর ভূমিকায় তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের বিশেষ স্বাক্ষর রাখেন। 'নিষ্কৃতি' নাটকের অসম্ভব জনপ্রিয়তা রঙমহলকে আর্থিক সাফল্য এনে দেয়। এই সময়ে রঙমহলে শিল্পীদের মধ্যে প্রভা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, রাণীবালা, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'নিষ্কৃতি' চলাকালীন ১৯৫১ সালে মধ্য-সাপ্তাহিক আকর্ষণ হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের বিদ্যাবিনোদের 'চাঁদবিবি' নাটক মঞ্চস্থ হতে শুরু করে। চাঁদবিবির ভূমিকার অভিনয় করেন প্রভা দেবী। ১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীজাবাঈ' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক রঙমহলে মঞ্চস্থ হয়। প্রভা দেবী 'জীজাবাঈ' চরিত্রের রূপ দেন। এবং এই রঙমহলেই তাঁর অভিনয় জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

রঙমহল আবার বেশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ রইল। ১৯৫৪ সালের মে-জুন মাস নাগাদ রঙমহলের দায়িত্ব নিলেন প্রাচী সিনেমার মালিক জীতেন বোস এবং ভিট্‌ল ভাই মানসাটা (জ্যোতি সিনেমার মালিক)। ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে এলেন নলিনী ব্যানার্জী ও হেমন্ত ব্যানার্জী। পরিচালক হলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। নেপাল নাগ প্রোডাকশন একজিকিউটিভ। ঠিক হল নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী' হবে, সলিল সেন নাট্যরূপ দিলেন। নতুন শিল্পী খোঁজা শুরু হল। হেমন্তবাবুদের পড়াশোনা যেমন ছিল, তেমনই প্রোগ্রেসিভ চিন্তা-ভাবনাও তাঁদের ছিল। তখন বহুরূপীর 'রক্তকরবী' প্রযোজনা প্রভূত সাফল্যলাভ করেছে, এই সময় নতুন বিষয়বস্তুর কথা ভেবেই নেপাল নাগের পরামর্শে রঙমহল কর্তৃপক্ষ শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু ও দু-একজনকে রঙমহলের নতুন নাটকে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। নেপাল নাগের মধ্যস্থতায় তাঁরা রাজিও হন, কিন্তু একটি শর্তে যে, তাঁদের নামের পাশে বহুরূপী কথাটি লিখতে হবে। কর্তৃপক্ষ রাজি হন। কিন্তু কয়েকদিন মহলার পর কালীপ্রসাদ ঘোষ আর পরিচালক থাকতে চাইলেন না, তখন শম্ভু মিত্রই দায়িত্ব নেন এবং সবচেয়ে বেশি বেতন তিনি নেবেন, এমনও ঠিক হয়। কিন্তু খবরের কাগজে 'বহুরূপী' নামটা বাদ পড়ায় ড্রেস রিহার্সালের দিন কর্তৃপক্ষকে শম্ভু মিত্র অভিনয়ে অসম্মতির কথা জানিয়ে চিঠি দেন. রঙমহল কর্তৃপক্ষ বেশ বিপাকে পড়েন। গঙ্গাপদ বসু বহুরূপীর সভাপতি, তাই তিনিও অসম্মত হন। পরের দিন নাটক শুরু, সেইমতো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। তখন নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বোস, প্রণতি ঘোষ এঁরা রঙমহলের মান রাখলেন — ১৯৫৪ সালের ৩১ জুলাই 'দূরভাষিণী' নাটকের অভিনয় শুরু হল।"

এরপর অর্দ্ধেন্দু মুখার্জীর পরিচালনায় নীহাররঞ্জন গুপ্তের নাটক 'উল্কা' অভিনীত হল। বিকলাঙ্গ অরুণাংশুর ভূমিকায় নতুন অভিনেতা দীপক মুখার্জী খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। নাটকটি প্রথম পঁচিশ রাত্রিতে তেমন দর্শক সমাগম না হওয়ায় উঠে যাওয়ার দাখিল হয়েছিল, কিন্তু তিরিশ রাত্রি অভিনয়ের পর এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর এত বেড়ে গেল যে 'উল্কা' ছ'শ রাত্রি অভিনীত হয়েছে। রঙমহল কর্তৃপক্ষ প্রচুর আর্থিক সাফল্যলাভ করেছিলেন। ১৯৫৭ সালের ১২ জুন শুরু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'কবি'। পরিচালক হলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এই নাটকের আগে অবশ্য দেবকী বসু পরিচালিত ছবি 'কবি' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। কবির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রবীন মজুমদার। এই নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার সময় শিল্পী নির্বাচনে কোনও অসুবিধেই রইল না। রবীন মজুমদার হলেন নিতাই কবিয়াল, নীতীশ মুখোপাধ্যায় রাজন, রাজনের স্ত্রী রমাদাসী চরিত্রে কেতকী দত্ত, নীলিমা দাস বসন, ঠাকুরঝি হলেন গীতা সিং, নীলিমা দাস চলে যাওয়ার পর প্রণতি ঘোষ বসনের চরিত্রে অভিনয় করতেন। মহাদেব কবিয়াল হরিধন মুখোপাধ্যায়, বিপ্রপদ জহর রায়, মাসী রাজলক্ষ্মী (বড়) প্রমুখ। 'কবি' নাটকের নায়ক নিতাই কবিয়াল জন্মসূত্রে ব্রাত্য, কিন্তু প্রতিভার দীপ্তিতে ও চরিত্রমাধুর্যে সে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। 'কবি' নাটকের 'ও আমার মনের মানুষ গো, তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর' অথবা 'আমি ভালবেসে এই বুঝেছি সুখের সার যে চোখের জলে রে' — এইসব গান তারাশঙ্করের শক্তি ও সামর্থের নিদর্শন।

'কবি' নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৩৬৪ সালের ১৯ আষাঢ়ের যুগান্তর পত্রিকায় তাঁর সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে : 'যে নাটক দেখার পর বাড়ি ফিরেও মনের মধ্যে সুরের রেশ গুঞ্জরিত হতে থাকে, মামুলি বিশ্লেষণে তার প্রশংসা করতে মন চায় না। তারাশঙ্করের 'কবি' নাটকটি আমার কাছে একটি মধুর করুণ কবিতার মতো উপাদেয়। বারবার উপভোগ করেও আশা মেটে না।' পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র জানিয়েছেন : 'রুমানিয়া থেকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল এই নাটকের অভিনয় দেখে তারাশঙ্কর ও 'কবি' নাটকের দলটিকে রুমানিয়া যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং 'কবি' নাটকের সমস্ত গান অনুমতি নিয়ে টেপ রেকর্ডারে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু

আমাদের পক্ষে নানা কারণে তাঁদের ওই আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।'

এটা মানতেই হবে, 'কবি' নাটকটি চলচ্চিত্রে, বেতারে এবং যাত্রায় বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[৫]

২১ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে শুরু হল 'কালপুরুষ' — যার পরিচালক ছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। নাট্যকার ছিলেন সত্যেন সিংহ ও মহেন্দ্র গুপ্ত। ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে রঙমহল প্রযোজিত 'মায়ামৃগ' নাটকের পরিচালক ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। মাঝে আমরা মহেন্দ্র গুপ্তকে পরিচালক হিসাবে পেলাম, এর আগে তিনি স্টারের পরিচালক ছিলেন। 'কালপুরুষ' নাটক এর আগে স্টারেও অভিনীত হয়েছিল। পরে 'উল্কা' নাটকটি যখন আবার অভিনীত হল তখনই মহেন্দ্র গুপ্ত রঙমহলে এসেছিলেন। সে সময় অবশ্য তরুণ রায়ের সঙ্গো রঙমহল কর্তৃপক্ষের কথাবার্তা চলছিল, তার ফাঁকেই 'কালপুরুষ' নাটকটি অভিনীত হয়। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে তরুণ রায় রঙমহলে যোগ দিলেন, পরপর নাটক করলেন 'এক মুঠো আকাশ', 'এক পেয়ালা কফি'। তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায় এলেন, আর এলেন নাট্যকার-অভিনেতা শৈলেন গুহ নিয়োগী। 'এক মুঠো আকাশ' নাটকটি রঙমহলকে আর্থিক সাফল্য এনে দিল। শততম রাত্রি অভিনয়ের উদ্বোধন করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ রায়। এরপর তরুণ রায় ব্রুসেলস্-এর লেখা তাঁরই রূপান্তর 'এক পেয়ালা কফি' নাটক করার প্রস্তাব দিলেন। 'এক পেয়ালা কফি' খুব জমে গেল। বাছা বাছা সব শিল্পী যেমন তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, রবীন মজুমদার, জহর রায়, নীতীশ মুখার্জী, কেতকী দত্ত, শৈলেন গুহ নিয়োগী প্রমুখ। এ নাটকও খুব রমরম করে চলল। প্রখ্যাত স্মারক (প্রম্পটার) মণি চ্যাটার্জীর কথায় : 'এই এক পেয়ালা কফি' নাটকে দীপান্বিতা ও তরুণ রায়কে নিয়ে একটা ঘটনা ঘটল। ১৯৬০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, সেদিন রবিবার, ডাবল শো। ফুল হাউস বিক্রি হয়ে গেছে। সকাল সাড়ে এগারোটায় থিয়েটার সেন্টারের বাড়ি থেকে তরুণ রায় ফোন করে জানালেন যে তাঁরা ওইদিনের অভিনয়ে দু'জনেই আসবেন না। সকলে বললেন, ফুল হাউস, আপনারা কেন আসবেন না। তার উত্তরে তাঁরা জানালেন, তাঁরা নাকি অপমানিত হয়েছেন। পরে জানা গিয়েছিল, তাঁদের মেক-আপের ঘরে নাকি কে কী আপত্তিকর কথা লিখেছিল। রঙমহল কর্তৃপক্ষ খুব বিপদে পড়ে গেলেন। অবশ্য তাঁদের পার্ট খুব একটা বড় ছিল না, ছোট পার্ট ছিল — তাই রক্ষে। যা কিছু করবে মণিবাবু। ডাক পড়ল আমার, কেননা প্রম্পটার হিসাবে তখন আমার একটু নাম হয়েছে, এর মধ্যে আমি অহীন্দ্র চৌধুরী এমনকি শিশির ভাদুড়ীর প্রম্পটার হিসাবে কাজ করেছি। খুব অভিনয় ভালবাসতাম, অহীনবাবুর পরামর্শে আমি প্রম্পটার হই। তখন অনেক ভেবেচিন্তে তরুণ রায়ের বদলে ঠাকুরদাস মিত্র এবং দীপান্বিতা রায়ের বদলে শুক্লা চৌধুরীকে (পরে বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছিলেন) নেওয়া হল। ঠাকুরদাস মিত্র তখন যাত্রা করতেন, সবে তিনি যাত্রা থেকে ফিরেছেন, তাঁকে ধরে আনা হল। আর শুক্লা চৌধুরী তখন রঙমহলে যাতায়াত শুরু করেছেন, ছোট পার্টও করেছেন, এই দু'জনকে নিয়ে রঙমহলে তিনতলার ঘরে দুপুর বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত মহলা চলল, কোনও আর্টিস্ট জানতেন না। আমি খালি সান্ত্বনা দিচ্ছি — কোনও চিন্তা নেই, আমি পিছনে আছি। ওঁরা দু'জনেই খুব সাকসেসফুল অভিনয় করলেন। সেইদিন জীতেনবাবু আমাকে একটা ইনক্রিমেন্ট দিলেন। তবে এ নাটকে জহর রায় এবং রবীন মজুমদার খুব ভালো অভিনয় করতেন। ওই রাত্তিরের পরে অবশ্য দীপক মুখার্জী ও তপতী ঘোষ পাকাপাকিভাবে অভিনয় করতে শুরু করেন।'[৬]

১৯৫৮ সালের ১৪ এপ্রিল 'মায়ামৃগ' নাটক — পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এই নাটকে একটি পার্টির সিনে প্রথম অভিনয় করলেন বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী। এরপর রঙমহলের 'সাহেব বিবি গোলাম' নাটকে বিশ্বজিৎ ভূতনাথের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। পরে চলচ্চিত্রে প্রভূত খ্যাতি এলেও সদালাপী মিষ্টভাষী বিশ্বজিৎ দীর্ঘদিন রঙমহলের কর্মীদের সুখে-দুঃখে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। পাঁচ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই রঙমহল কর্তৃপক্ষ সিনেমা হল করার তাগিদে থিয়েটারটি বন্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সিনেমার জনপ্রিয়তার সঙ্গো পাল্লা দিতে না পারায় কর্তৃপক্ষ থিয়েটার ভাড়া দেওয়ার জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। সেই সময় সমস্ত কর্মী ও শিল্পী, যেমন জহর রায়, সরযূবালা আরও অনেকে, থিয়েটারের সামনে ধরনা দিতে শুরু করেন। তবে মালিকপক্ষের হেমন্ত ব্যানার্জী ও নলিনী ব্যানার্জী হল বন্ধ করার পক্ষে ছিলেন না। ভিট্‌ল ভাই মানসাটা ছিলেন সিনেমা হল তৈরির পক্ষে। তখন মুখ্যমন্ত্রী

বিধানচন্দ্র রায়ের মধ্যস্থতায় কর্তৃপক্ষ থিয়েটারের পরিচালনভার কর্মী ও শিল্পীদের হাতে তুলে দেন। গর্বিত হয় রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী। সেই সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কর্তৃপক্ষের হুমকির প্রতিবাদে সকলে সোচ্চার হয়েছিলেন। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'আমি নিজে যদিও সিনেমার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তবু আমি আসলে বাংলাদেশের একজন সাহিত্যসেবী — আমি চাই না সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলা রঙ্গালয়ের অকালমৃত্যু হোক। আমি জানি, একটি সর্বোৎকৃষ্ট সিনেমা-ছবির আয়ুষ্কালের তুলনায় একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটকের পরমায়ু অনেক বেশি। শুনলাম নাকি রঙমহল রঙ্গামঞ্চটির দিকেও সিনেমা তার হস্ত প্রসারিত করেছে। এর পরিণাম যদি হয় একটি রঙ্গালয়ের অবলুপ্তি তাহলে তা হবে নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। প্রার্থনা করি, বাংলার রঙ্গালয় চিরজীবী হোক।' (যুগান্তর পত্রিকা/১৯৫৮)।

রঙমহলে কয়েক বছর ধরে তখন জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সারা রাত্রি অভিনয়ের আয়োজন হত। যেমন 'মায়ামৃগ', 'জন্মাষ্টমী', 'নন্দোৎসব', 'মিশরকুমারী', 'কবি' — পাঁচটি কি ছ'টি নাটক। অভিনয় করতেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, বিশ্বজিৎ, রাজলক্ষ্মী, কেতকী দত্ত, লীলাবতী ও সবযূদেবী।

১৯৬২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি রঙমহলে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকের অভিনয় শুরু হল। অভিনয় করলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, রবীন মজুমদার প্রমুখ। পদ্মঝি-র ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন।

এই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকের অনেক মজার স্মৃতি আমার রয়েছে। যেমন জহরকাকার অভিনয়। তিনি মতি চাকরের চরিত্রে অভিনয় করতেন। আমার বাবা রবীন মজুমদার করতেন শালাবাবু। একটি দৃশ্যে ছিল — শালাবাবু মতি চাকরকে তাঁর ছাতাটি আনতে বলতেন। প্রতিদিনই জহর রায় কিছু না কিছু মজা করতেন। একদিন দেখলাম প্রচুর আটা মুখে নিয়ে মঞ্চে এলেন, কথা বলছেন আর আটা মুখ থেকে বেরচ্ছে। বললেন, আপনার ডাক শুনে ছুটে আসতে গিয়ে আটার ওপর পড়ে গিয়েছি। একদিন ছাতা, হাতা আরও কত কী নিয়ে মঞ্চে এলেন। বললেন, শালাবাবু আপনি কী চাইছিলেন, আমি বুঝতে না পেরে এতগুলো নিয়ে এসেছি, আপনি বেছে নিন। তখন কত ছোট আমি, আমার এখনও মনে আছে, হল হাসিতে ফেটে পড়ত। ১৯৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি অভিনীত হল সুনীলচন্দ্র সরকারের নাটক 'কথা কও'। এই প্রথম রূপকার নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক, অভিনেতা সবিতাব্রত দত্ত অভিনয় করলেন। সঙ্গে ছিলেন অসিতবরণ, জহর রায়, রবীন মজুমদার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সরযূদেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র প্রমুখ। উপদেষ্টা ছিলেন সলিল সেন। রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালনায় সলিল সেনের নাটক 'স্বীকৃতি' অভিনীত হল ১৯৬৩ সালের ২১ ডিসেম্বর। এই নাটকে নিয়মিত যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁদের সঙ্গে আর একটি নাম সংযোজিত হল। তিনি হলেন প্রখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক শেখর চট্টোপাধ্যায়। এই 'স্বীকৃতি' নাটকের পর রবীন মজুমদার আর রঙমহলে অভিনয় করেননি। এরপর হরিধন মুখোপাধ্যায় ও জহর রায়ের যুগ্ম-পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের হাসির নাটক 'অতএব' অভিনীত হল ১৯৬৬ সালের ৬ অক্টোবর। রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠীর চুক্তি টিকিয়ে রাখার তাগিদে আর একটি কম জনপ্রিয় নাটকের অভিনয় মাঝে মাঝেই করতে হত। তা হল সুনীল চক্রবর্তীর নাটক 'টাকার রং কালো'। ১৯৬৪ সালের ২ অক্টোবর রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালনায় 'নাম বিভ্রাট' এবং সুন্দরম নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী ও সলিল সেনের যুগ্ম-পরিচালনায় পার্থপ্রতিম চৌধুরীর নাটক 'ছায়ানায়িকা' (১৯৬৭ সালের ২ অক্টোবর) অভিনীত হলেও তেমন চলেনি। এই নাটকের আলোকসম্পাতে ছিলেন তাপস সেন। মাঝে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকটি পুনরাভিনীত হত। এরপর সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'নহবত' নাটকের অভিনয় শুরু হয় ১৯৬৮ সালের ৯ মার্চ। 'নহবত' নাটক এত জনপ্রিয় হল যে রঙমহল তার মাঝের আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে আবার প্রাণ ফিরে পেল। এ নাটকে অভিনয় করেন জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সরযূবালা দেবী ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী আরতি ভট্টাচার্য। নাটকটির স্মারক পুস্তিকায় 'রঙমহলের ভাইবোনেরা' দর্শকদের অভিনবভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপিটি এখানে দেওয়া হল।

আজ

রমা ও কল্যাণের মধু-মিলনে

আজ "রঙ্‌মহলের মহলে" সবার নিমন্ত্রণ।

"রঙ্‌মহলের হলে"।

ছোট হ'ল রমা।

"বিবাহ বাসর" "রঙ্‌মহলের"

"রঙ্‌মহল" "ভাই বোনেরা"

জহর রায়ের পবিচালনায় সুনীল চক্রবর্তীর নাটক 'আমি মন্ত্রী হব' এবং মনোজ মিত্রের নাটক 'বাবাবদল' অভিনীত হল ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালে। মাঝে রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী প্রযোজিত প্রবোধবন্ধু অধিকারী ও শৈলেশ গুহ নিয়োগীর নাটক 'সেম সাইড' অভিনীত হয়। তবে এ নাটকগুলি বেশিদিন অভিনীত হয়নি।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী 'উত্তরণ' শুরু হল ১৯৭১ সালের ১ মে। নাট্যরূপ দিলেন বীরু মুখোপাধ্যায়। জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সর্বেন্দ্র, সরযূদেবী, রত্না ঘোষাল প্রমুখ অভিনয় কবেন। এরপব জহর রায়ের পরিচালনায় বেশ কয়েকটি নাটক অভিনীত হল। যেমন ব্যঙ্গ-কৌতুক ও গানে ভরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সুবর্ণগোলক', নাট্যরূপ সন্তোষ সেন। সাধারণ রঙ্গামঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে উদ্বোধন হল ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নৃত্য-গীত রঙ্গারসে ভরা জমজমাট কালজয়ী নাটক 'আলিবাবা' (১৩ মে ১৯৭৩)। এই নাটকে কালী ব্যানার্জী আলিবাবা, নৃত্যশিল্পী প্রভাত ঘোষ আবদাল্লা, মৃণাল মুখোপাধ্যায় কাশিম, শম্ভু ভট্টাচার্য দস্যু-সর্দার, জয়শ্রী সেন মর্জিনা, সাকিনা ছন্দা দেবী ও ফতিমা চরিত্রে অভিনয় করেন সরযূদেবী। তখন রঙমহলে বেশিরভাগ নাটকের শব্দপ্রেক্ষণে প্রভাত হাজরা ও আলোয় অনিল সাহা যুক্ত ছিলেন। নাটক 'অনন্যা'-য় (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩) চণ্ডীদাস বসুর কথা ও সুরে গান গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্ত। এই নাটকে ক্যাবারে নৃত্যের দৃশ্যে মিস্ চন্দ্রকলা ছিলেন। এছাড়া অভিনয়ে ছিলেন জয়শ্রী সেন, বীথি গাঙ্গুলী, অসীমকুমার, জহর রায়, ঠাকুরদাস মিত্র, কামু মুখোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, ধীমান চক্রবর্তী প্রমুখ। 'ভোলা ময়রা' (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৫) নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেন অতীত দিনের প্রখ্যাত গায়ক অভিনেতা তারা ভট্টাচার্য। 'চক্রেশ্বরানন্দ'-এ জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখার্জী, বীথি গাঙগুলী, জোৎস্না বিশ্বাস প্রমুখ অভিনয় করেন। এই নাটকের স্মারক পুস্তিকায় চণ্ডীদাস বসুর কথা ও সুরে ১৪টি গান প্রকাশিত হয়েছিল। তখন পেশাদারি রঙ্গামঞ্চে প্রম্পটের এত প্রযোজন ছিল যে প্রতিটি অভিনয়ের স্মারক পুস্তিকা লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে স্মারকরূপে মণি চ্যাটার্জীর নাম।

আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে জহর রায় পরিচালিত 'নন্দা' অভিনীত হল ১৯৭৬ সালের ২৩ মে। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন প্রভাত হাজরা। ১৯৭৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সমরেশ বসুর কাহিনী 'অপরিচিত' শঙ্কর শিকদার ও সমীর লাহিড়ীকৃত নাট্যরূপে অভিনীত হল। এই নাটকে দিলীপ রায় হলেন সুজিতনাথ মিত্র, জহর রায় হলেন ভুজঙ্গ রায়, সরযূ দেবী কিরণময়ী ও লিলি চক্রবর্তী সুনীতা নাগের চরিত্রে অভিনয় করেন। এই সময়ে রঙমহলের কর্মাধ্যক্ষ হন শক্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজয় ভদ্র। রঙমহলের উন্নতিকল্পে জহর রায় ও সরযূ দেবীর ভূমিকা চিরস্মরণীয়, তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে 'রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী' দীর্ঘদিন রঙমহল থিয়েটারে কাজ করতে পেরেছিলেন।

রঙমহল থিয়েটার শুধু কলকাতায় নয়, শহরের বাইরে এমনকি অন্য রাজ্যেও প্রচুর অভিনয় করেছে। সেই সময় বিভিন্ন প্রযোজনার তালিকা দিয়ে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। যেমন নাটকের স্মারক পুস্তিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন :

রঙমহল থিয়েটার
আমাদের অভিনীত নাটক অনন্যা
টাকার রং কালো, সেমসাইড, ফাঁস
সিরাজদ্দৌলা, সাজাহান,
আমি মন্ত্রী হব,

কলিকাতা ও মফঃস্বলের শো-এর জন্য
রঙমহলে যোগাযোগ করুন

১৯৭৭ সালের ১ অগাস্ট জহর বায়ের মৃত্যুতে রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠীর অস্তিত্বও শেষ হল। রঙমহলে জহর রায় পরিচালিত নাটকগুলির মাঝে ও পরে বেশ কিছু পরিচালক কাজ করেছিলেন। তাঁরা হলেন অনুপকুমার, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, শ্যামল সেন, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর মুখার্জী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। রঙমহলের পরিচালন কর্তৃপক্ষও সময়ে সময়ে বদল হয়েছে। যেমন আশিস ব্যানার্জী, শ্যামল চ্যাটার্জী ও দুর্গাচরণ পাঠক, ডি. পি. প্রোডাকশন্স, মুখার্জী এন্টারপ্রাইজ, ই. এম. বি. ই. ই. এন্টারপ্রাইজ, এল. পি. এন্টারপ্রাইজ, শুভম এন্টারপ্রাইজ (শুক্লা সেনগুপ্ত) প্রভৃতি। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে ১৩ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত থিয়েটার কমিউনের 'দানসাগর' (দুটি অভিনয়), সুন্দরমের 'সাজানো বাগান' (একটি অভিনয়) , থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'নরক গুলজার' (দুটি অভিনয়) আর 'ঘটকালি' নাটকটির চারটি অভিনয় হয়। অনুপকুমারের পরিচালনায় ডি. এল. রায়ের নাটক 'সম্রাজ্ঞী নূরজাহান'-এর নাট্যরূপ দেন শেখর চট্টোপাধ্যায় ও মলিয়েরের নাটক জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের অনুবাদে 'হঠাৎ নবাব' — এই দুটি নাটক অভিনীত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ ও ১৯৮০ সালে, তেমন জনপ্রিয় হয়নি। তবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী ও বীরু মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ 'রাজদ্রোহী' রঙমহলে অনেকদিন অভিনীত হয়েছিল। এই প্রযোজনার সঙ্গে বিশিষ্ট গুণী মানুষ যুক্ত ছিলেন। যেমন ফজল আলির চরিত্রে বিজন ভট্টাচার্য অভিনয় করেন। মুখ্যচরিত্রে ছিলেন দিলীপ রায়, লিলি চক্রবর্তী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর শী, সন্তু মুখোপাধ্যায়, গীতা কর্মকার, কল্যাণী মন্ডল ও আরও অনেকে। আলো তাপস সেন, মঞ্চ সুরেশ দত্ত, সংগীত রচনা ও সুর চণ্ডীদাস বসু, আবহ পার্থপ্রতীম চৌধুরী, নৃত্যপরিকল্পনা শম্ভু ভট্টাচার্য, গ্রন্থনা প্রদীপ ঘোষ ও সহকারী পরিচালক শ্যামল ঘোষ। এই নাটকে সংগীতে অংশ নিয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শক্তি ঠাকুর, মঞ্চাধ্যক্ষ হয়েছিলেন মণি চ্যাটার্জী। 'রাজদ্রোহী' নাটকের পর রঙমহলের কর্মী ও শিল্পীদের মধ্যে গন্ডগোল দেখা দেওয়ায় রঙমহল কয়েক মাস বন্ধ থাকে।

এরপর রবি ঘোষের পরিচালনায় 'ছদ্মবেশী' নাটকে রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, সন্তু মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অলকা গাঙ্গুলী অভিনয় করেন। নাটকটি বেশিদিন চলেনি। এই নাটকের আলোকসম্পাতে ছিলেন কণিষ্ক সেন। এই সময় উত্তর কলকাতার বিভিন্ন থিয়েটারে বেশ কিছু 'এ' চিহ্নিত নাটক অভিনীত হচ্ছিল। এবং মিস ববি, মিস জে — এঁদের নাচও সংযোজিত হচ্ছিল। রঙমহলও বাদ যায়নি। মৃণাল ঘোষের পরিচালনায় 'পিউ কাঁহা' নাটকটি অভিনীত হয় ১৯৭৯ সালের ৩ মে থেকে ১৯৮০ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। এরপর শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'অমরকণ্টক' নাটকের উদ্বোধন হল ১৯৮০ সালের ৪ এপ্রিল। যদিও এই নাটকটির প্রথম ৫০ রজনী অভিনীত হয় নেতাজী ইনস্টিটিউটে। প্রায় ছ'শরও বেশি রাত্রি অভিনীত হয়েছিল এই নাটক। শত রজনীর স্মারক পুস্তিকায় (২৪ জুন, ১৯৮০) শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় 'পরিচালকের বক্তব্য' শিরনামে লিখেছিলেন . 'গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে কিছু লোক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে বিকৃত ক্ষুধার রসদ জুগিয়ে নাটক করে কিছু রোজগার করেছেন ও করছেন। যে কোনও প্রকারে কিছু প্রাপ্তিই তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁদের বক্তব্য দর্শক নিচ্ছে এবং উপভোগও করছে। আমি মনে করি বাংলাদেশের দর্শক সত্যিকারের নাটক ও মনে রাখার মতো অভিনয় দেখতে ভালোবাসেন এবং চান। 'অমরকন্টক' মঞ্চস্থ করে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনে আমাদের বিশ্বাস আবার প্রমাণিত হল।' মুখ্যভূমিকায় অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন : পরিচালক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় সর্বৈধ দক্ষতার সঙ্গো সাফল্যলাভই

করেননি উপরন্তু মঞ্চে এক নতুন নজির উপস্থাপনা করেছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

এরপর সুধাংশু মিত্রের প্রযোজনায় এম্বি'র দ্বিতীয় প্রয়াস হল 'জয় মা কালী বোর্ডিং'। পরিচালনায় ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। আলো : তাপস সেন; মঞ্চ : সুরেশ দত্ত। নাটকটিতে মনু মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, ধীমান চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে অভিনয় করেছিলেন। 'জয় মা কালী বোর্ডিং' ১৯৮২ সালের ১০ অক্টোবর শুরু হয়ে ১৯৮৩ সালের ৩০ জানুয়ারি শেষ হয়। মোট ৭৪টি রজনী অভিনীত হয়। ওই বছরে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল রঙমহল বন্ধ থাকে। পরে সমরেশ বসুর 'বিবর' (নাট্যরূপ সমর মুখার্জী), 'অশ্লীল' (নাট্যরূপ তরুণকুমার) যথাক্রমে সমর মুখার্জী ও কুণাল মুখার্জীর পরিচালনায় অভিনীত হয়। 'বিবর' নাটকে সুব্রতা চ্যাটার্জী, সীমন্তিনী দাস, প্রশান্ত কুমার, মিন্টু চক্রবর্তী, গৌরীশঙ্কর ব্যানার্জী অভিনয় করেন। 'অশ্লীল' নাটক পাঁচশ রজনীর মতো চলেছিল। এই দুটি নাটকই 'A' চিহ্নিত হয়ে বিজ্ঞাপিত হত। ১৯৮৭ সালে রঙমহল থিয়েটার সংস্কারের জন্য বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। ওই বছরই ২৭ জুন সুভাষ বসুর পরিচালনায় 'স্বীকারোক্তি' নাটকটির অভিনয় শুরু হয়। এই সময়ে রঙমহলের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। এই নাটকে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চিরঞ্জিত, ধীমান চক্রবর্তী, সুমন্ত মুখার্জী, জয় সেনগুপ্ত, সংঘমিত্রা ব্যানার্জী, রমা গুহ ও আরও অনেকে অভিনয় করেন। 'স্বীকারোক্তি' দু'শ রজনীর বেশি অভিনীত হয়েছে। ১৯৮৮ সালের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'নীলকণ্ঠ'। নাটক, সংগীত, নির্দেশনা : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আলো : তাপস সেন। মঞ্চ : নির্মল গুহ রায়। প্রযোজনায় ছিলেন শুক্লা সেনগুপ্ত। অভিনয়ে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়,

সংবাদপত্রের সমালোচনা

THE STATESMAN

Friday March 7 1980

Subhendu's latest play, "Amar Kanthak" based on a popular Asutosh Mukhopadhyaya, novel......in terms of production value, acting and dramatic impact, "Amar Kanthak" is certainly a notable event on the contemporary theatre scene.

যুগান্তর

শুক্রবার ১৪ চৈত্র, ১৩৮৬
২৮ মার্চ, ১৯৮০

দারুনই বটে। ঘটনায় ঘটনায় ঠাসা এই নাটকে অভিনয়ের তুলনা নেই। কী সাবিত্রী চ্যাটার্জি (বহিনজি) কী শুভেন্দু চ্যাটার্জি (জনকলাল) কী গীতা দে (রাণী) কী সর্বেন্দ্র (বিনয়)......প্রত্যেকেই প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা মাত করে রেখেছেন দুর্দান্ত অভিনয়ে।......বহুদিন পর একটা নাটক দেখলাম, শুরু থেকে শেষ করতালি মুখরিত। এ কালের সংজ্ঞায় হয়ত আধুনিক নয়, ব্রেখটীয় তো নয়ই, কিন্তু দর্শকদের ভাল লাগছে বলেই তো......তাঁরা দল বেঁধে যাচ্ছেন।... প্রযোজনায় অঙ্গহানি হয়নি, নাটকটি দর্শকদের খুশি করতে পেরেছে যেমন করেছে আমাকে।

অমিতাভ চৌধুরী

আনন্দবাজার পত্রিকা

শুক্রবার ৩০ ফাল্গুন ১৩৮৬
১৪ মার্চ ১৯৮০

নাট্য সমালোচনা

অমরকণ্টক

যে-সব কারণে একটি নাটক সুখভোগ্য হয় তার বেশ কিছু অমর কণ্টক-এ বর্তমান। একাধিক ফ্ল্যাশব্যাকে নাটকটির মূল ঘটনা বলা হয়েছে কিন্তু এর গতি, কখনও শিথিল হয়নি। নাটকের পটভূমি লাল হাওয়েলি, রেল স্টেশনে ট্রেন এসে থামা জলন্ত হেড লাইট সমেত জিপ গাড়ি প্রভৃতি মঞ্চে দেখানোর কঠিন কাজটিও অনায়াসে সম্পন্ন। এর জন্য পরিচালক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কৃতিত্ব অংশত ভাগ করে নিতে পারেন প্রধান কলাকুশলীরা যাঁরা আলো (ভানু বিশ্বাস) মঞ্চ (শৈলেন দে) ও ধ্বনির (অমর নন্দী) কাজে নিযুক্ত। নাটকটি দেখার পর যে সুখ মেলে তার জন্য সাধুবাদ পাবেন পরিচালক। নাটক রচনার জন্য (মূল কাহিনী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) কুনাল মুখোপাধ্যায়েরও প্রশংসা প্রাপ্য।

CINE ADVANCE

February 15, 1980

Subhendu Shines In 'Amarkantak'

In AMARKANTAK the celebrated actor Subhendu Chatterjee has turned into a Director and hits the bull's eye. Author Asutosh Mukherjee dramatist Kunal Mukherjee and the director have worked in very close union and the desired result is a super production. The pivot of the story is a clash of ideals—between a tyrannical ruthless aristocrat and his wife and two daughters The conflict centre on the eldest daughter's marriage to a middleclass educated young man in search of a job—who has made a long trip to reach a far away place where circumstances have led him to be an employee of the tyrant aristocrat

দৈনিক বসুমতী

১৩ই মার্চ ১৯৮০

ইতিহাস ছুঁই ছুঁই মননের এই নাটকে আছে সংলাপের বাঁধুনী। অন্য দিকে প্রতিটি চরিত্র চিত্রণে আছে শিল্পীদের একান্ত আন্তরিকতা। তাই নাটকটি এমন ফুটেছে, এমন জমেছে। হাসি-কান্না, রাগ-রঙ্গ, মান অভিমান, বিরোধ প্রতিক্রিয়া আর তার শেষ পরিণতি সমস্ত! নাটকের পরিবেশ ছিল, তা জানা হয়নি। গান আছে প্রয়োজন মতো, পরিমিত। প্রেমের অন্তঃধারাকে তাদের মহিমায় মহীয়সী করে তোলা হয়েছে।

মহানগরীতে চালু নাটকগুলির মধ্যে 'অমর কণ্টক' সুপ্রযোজিত নাটকগুলির অন্যতম।

সায়নী মিত্র, দেবিকা মিত্র প্রমুখ। তিনশ-র বেশি রাত্রি অভিনীত হয়েছিল 'নীলকণ্ঠ'। বিশিষ্ট সমালোচক দুলেন্দ্র ভৌমিক 'সার্থকতার স্মারক নীলকণ্ঠ' শিরোনামে লিখেছিলেন : 'কলকাতার পেশাদার মঞ্চের ক্ষেত্রে একদা 'কল্লোল' যেমন বিষয়ে এবং আঙ্গিকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল, ঠিক তেমনই কিছুকাল আগে বাংলা পেশাদার মঞ্চ যখন সাফল্যের হাতিয়ার হিসাবে কিছু শস্তা উপাদান নিয়ে মত্ত তখন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নামজীবন' ছিল পেশাদার মঞ্চের নতুন করে উত্তরণের সার্থক ইঙ্গিত। 'ফেরা'-র পর 'নীলকণ্ঠ' নিঃসন্দেহে সেই সার্থকতার আরেকটি স্মারক চিহ্ন।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ নভেম্বর, ১৯৮৮)।

এটা ঠিক, এই সময়ে পেশাদারি থিয়েটারের কুরুচিকর প্রয়োজনার পাশাপাশি মূলত দু'জন প্রযোজক, গণেশ মুখোপাধ্যায় (রঙ্গনা) ও শুক্লা সেনগুপ্ত, সৎ নাটক, সামাজিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন নাটক রুচিসম্মতভাবে পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯৮৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সুভাষ বসুর পরিচালনায় 'পরমা' নাটকটি অভিনীত হয়। মুখ্যভূমিকায় অভিনয় করেন বসন্ত চৌধুরী, পাপিয়া অধিকারী। অঞ্জনা এন্টারপ্রাইজের প্রযোজনায় রঙমহলে নতুন নাটক 'জীবনসঙ্গিনী'-র অভিনয় শুরু হল ১২ জুলাই ১৯৯০ সালে। 'কালবৈশাখী', 'অমরকন্টক' নাটকের মঞ্চ-সফল পরিচালক শুভেন্দু চ্যাটার্জী পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। 'জীবনসঙ্গিনী' নাটকটি একাধারে সিরিয়াস, অপরদিকে কমেডি। এই পারিবারিক নাটকের 'দাদা' ও 'বৌদি' চরিত্রে অভিনয় করেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে জুটি বেঁধেছিলেন গৌতম দে ও নয়না দাস। এছাড়া জ্ঞানেশ মুখার্জী, চিন্ময় রায়, কল্যাণী মণ্ডল অভিনয় করেন। এই নাটকে দুটি রবীন্দ্রসংগীত ও পপ সংগীত ব্যবহার করা হয়েছে। গানগুলি গেয়েছিলেন অরুন্ধতী হোমচৌধুরী ও গোপা ঘোষ।

চলচ্চিত্রের শিল্পীদের থিয়েটারে যোগ দেওয়ার তালিকায় এবার এলেন প্রসেনজিৎ। রাধাগোবিন্দ এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত ঐকতান প্রযোজিত অসিত বসুর নির্দেশনায় তাবই নাটক 'গৌরব'-এর শুভমুক্তি হল ১৯৯৩ সালে ১৪ এপ্রিল। নাটকটি তেমন সাফল্যলাভ করতে পারল না। ডি. মুখার্জি নিবেদিত ঐকতান প্রযোজিত উৎপল রায়ের নাটক 'মাণিকচাঁদ'-এর অভিনয় শুরু হল ১৯৯৪ সালে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্ঞানেশ মুখার্জীর দক্ষ পরিচালনার গুণে নাটকটি গতি ও সুষমা পেয়েছিল। মানিকচাঁদের ভূমিকায় তাপস পাল ফিল্মি হিরোদের মতো নিজেকে অকারণ দূরত্বে না রেখে মঞ্চের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অসাধারণ অভিনয় কবেন। 'মানিকচাঁদ' নাটকে ট্রাক-ডাইভার দর্শন সিং চরিত্রে দিলীপ রায়, ভাড়াটে সাতকড়ি জ্ঞানেশ মুখার্জী, ফুলবসন লিলি চক্রবর্তী এবং মানিকচাঁদের প্রেমিকা মাধুরীর ভূমিকায় রাজশ্রী অভিনয় করেন। এবপর তাপস পাল ও শ্রীলা মজুমদার 'আলোয় ফেরা' নাটকে অভিনয় করেন। কাহিনী দুলেন্দ্র ভৌমিক, নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দেব সিংহ। শ্যামবাজার বাণিজ্যিক ছকে সাজানো নাটক 'আলোয় ফেরা' গানে, হাসিতে অভিনয়ে জমজমাট হলেও মঞ্চসফল নয়। এরপর আর্থিক প্রতিকূলতার কারণে রঙমহল বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯৭ সালের ৫ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় :

রঙমহল খুলছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা রঙমহল থিয়েটার আবার খুলছে। আগামী রবিবার রথের দিন রঙমহল চালু হবে 'জয় জগন্নাথ' নাটক দিয়ে।

দুলেন্দ্র ভৌমিক রচিত 'জগন্নাথ কাহিনী' বইটি থেকে লেখকই নাট্যরূপ দিয়েছেন। প্রযোজক, ইউনিফোকাসের পক্ষ থেকে রত্না ঘোষাল। নাট্যনির্দেশনা এবং অভিনয়েও রত্না আছেন। নাটকের মহড়া কিছুটা দেখে মনে হল বাংলা মঞ্চে নতুন ধরনের কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। মঞ্চে সমুদ্র, দেবতাদের আগমন, ঝড় — এইরকম নানা ঘটনা থাকবে। আলোর দায়িত্বে আছেন কণিষ্ক সেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী মণ্ডল, নিমু ভৌমিক, বোধিসত্ত্ব মজুমদার, দেবাশিস রায়চৌধুরী প্রমুখ। 'জয় জগন্নাথ' নাটকটি কয়েকমাস অভিনীত হওয়ার পর ১৯৯৭ সালের নভেম্বর নাগাদ রঙমহল বন্ধ হয়ে যায়। তারপরের ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা — ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রঙমহল থিয়েটারের প্রায় অনেকটাই ভস্মীভূত। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে দেখতে কয়েকদিন জনসমাগম হলেও এখন শ্মশানের নীরবতা! ভেতরে সব শুনশান, কেবল ফটক প্রহরায় গুটি কয়েক পুলিস।

রঙমহল থিয়েটারের বর্তমান মালিক ললিতমোহন কাঙ্কারিয়া ও তাঁর স্ত্রী প্রমীলা কাঙ্কারিয়া। ৩০ অগাস্ট ২০০১ বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিয়েছেন বলে জানা গেছে। অগ্নিদগ্ধ রঙমহল থিয়েটারকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করে অবিলম্বে তা খালি করে থিয়েটারটি মেরামতি শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে পুরসভা। ১৯৯৯ সাল থেকে রঙমহল বিয়ে বাড়ি বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া চলছিল, তার জন্য পুরস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে নিয়মমাফিক কোনও অনুমতি থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নেননি। এদিকে দমকল বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী পাঁচজনের তদন্ত কমিটি গড়ার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অনুমতি দিয়েছেন। এই কমিটিতে আছেন ডিজি. (দমকল) অতিরিক্ত নগরপাল, ডিজি. (বিল্ডিং), চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেক্টর ও উপ-অধিকর্তা (দমকল) বরেন সেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কমিটিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

তিনতলা বাড়িটি বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই ভেতরে একতলা ও দোতলা জুড়ে প্রেক্ষাগৃহ অংশটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সত্তু সেন নির্মিত এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চকে আগুনে গ্রাস করার পর পড়ে রয়েছে শুধু তোবড়ানো, মোচড়ানো ধাতব কঙ্কালটি। বড় ফাটল পেছনের দেওয়ালে। ভস্মীভূত দু'পাশের উইং, সাজঘর, রঙ্গমঞ্চে ইতিহাস-গড়া বহু নাটকের সযত্নে রক্ষিত দৃশ্যপট। একতলা ও দোতলার ব্যালকনি থেকে ঝোলানো সার বাঁধা পুরনো দিনের পাখাগুলোর অধিকাংশেরই ব্লেড আগুনের তাপে গলে বেঁকে গিয়েছে। পুড়ে গেছে ব্যালকনির রেলিং। পোড়া গন্ধ আর ছাইয়ের মাঝে শুধু বাঁদিকের দেওয়ালে আধপোড়া ক্যানভাস থেকে বেরিয়ে আছে এক নর্তকীর হাস্যমুখ।'

রঙ্গামঞ্চ আমাদের জাতীয় সম্পদ। পৃথিবীর সব জাতির জাতীয় জীবনে রঙ্গামঞ্চের প্রয়োজনীয়তা যে অপরিহার্য সে কথা আজ সর্ববাদীসম্মত। এই রঙ্গামঞ্চকে অবলম্বন করেই দেশে শক্তিমান নট, নাট্যকার ও নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব হয়। সুবৃহৎ এই উপমহাদেশের পদপ্রান্তে আমাদের দেশ কিঞ্চিৎ গৌরবের অধিকারী ছিল, কিন্তু আজ?

সূত্র

প্রথমেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি স্মারক মণি চট্টোপাধ্যায়কে, তাঁর সহযোগিতা ছাড়া এ রচনা সম্ভব হত না। অসুস্থ শরীরে এই নব্বই বছর বয়সেও এতটুকু বিরক্ত না হয়ে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এত মানুষের কথা, এত অভিজ্ঞতা তাঁর সংগ্রহে, তা নিয়ে আরও অনেক রচনাই তৈরি হতে পারে। তিনি সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে থাকুন, এই কামনাই করি।

১. কিছু স্মরণীয় অভিনয়, শম্ভু মিত্র, প্রসঙ্গ : নাট্য, ডিসেম্বর, ১৯৭১।
২. ওই।
৩. বাংলার নটনটী, ২য় খণ্ড, দেবনারায়ণ গুপ্ত, অগাস্ট, ১৯৯০।
৪. সাক্ষাৎকার, নেপাল নাগ, নাট্যশোধ সংস্থান
৫. নন্দন পত্রিকা, জুলাই, ১৯৯৮।
৬. সাক্ষাৎকার, মণি চট্টোপাধ্যায়।
৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ অগাস্ট ২০০১।

সংযোজন ১

বর্তমান। ২৯ অগাস্ট, ২০০১

শেষরাতে আগুন, ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত রঙমহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : মঙ্গলবার মাঝ রাতে উত্তর কলকাতার রঙমহল প্রেক্ষাগৃহে বিধ্বংসী আগুন লাগে। আগুনে প্রেক্ষাগৃহটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশপাশের বস্তিও। চারপাশে প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ২০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত আগুন পুরোপুরি আয়ত্তে

আসেনি। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে প্রেক্ষাগৃহে কোনও শো হচ্ছে না।

দমকল ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত একটার পর রঙমহলে আগুন জ্বলে ওঠে। সেখান থেকে লাগোয়া বস্তিতে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বস্তির মানুষজন তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। অনেকে রাত ১২টার সময় টিভিতে কেবলে সিনেমা দেখে ঘুমোতে গিয়েছিলেন।

রাত তিনটে নাগাদ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গিয়েছে, গোটা এলাকার মানুষ ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন। আতঙ্কে ছুটোছুটি করছেন বস্তিবাসীরা। বড় ধরনের সর্বনাশের আশঙ্কায় কান্নাকাটি করছেন কেউ কেউ। অনেকে আবার দমকলকর্মীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাঁদের অভিযোগ, দমকলকর্মীরা দেরি করে ঘটনাস্থলে এসেছেন।

জলের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে আগুন নেভানোর কাজ। ঘিঞ্জি এলাকায় গাড়ি পৌঁছতে পারছে না। ফলে সমস্যা আরও ভয়াবহ আকার নিয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের লাগোয়া কয়েকটি বাড়ি থেকে গল গল করে বেরচ্ছে ধোঁয়া। জল নিয়ে আসা হচ্ছে হেদুয়া থেকে। স্থানীয় বাসিন্দারা এও বলেছেন, দমকলকর্মীরা কেবল রঙমহলের আগুন নেভাতে ব্যস্ত। তাঁদের ঘরদোর নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই।

আশপাশের বাড়ি কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা ভোররাত অবধি পরিষ্কার নয়। কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। কেউ গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা যায়নি। আশপাশের মানুষ আর্থিক দিক থেকে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তা এখনও কারও জানা নেই। আতঙ্কিত মানুষ এখনও জানেন না তাঁদের কার কী ক্ষতি হয়েছে। আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত তা জানা যাবে না। অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত হিসাব জানতে বুধবার সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। দমকল সূত্রেও একই কথা বলা হয়েছে।

অনেকে এই আগুনের পেছনে নাশকতার সম্ভাবনা আঁচ করছেন। প্রোমোটারদের ষড়যন্ত্রের কথাও বলছেন। এক দশকের বেশি আগে এমন এক রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল ঐতিহ্যশালী স্টার থিয়েটার। এখনও অনেকের মনে সেই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

সংযোজন ২

আনন্দবাজার পত্রিকা। ৩১ অগাস্ট, ২০০১

রঙমহলের নতুন বাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার : রঙমহলের পুরনো বাড়িটি ভেঙে ফেলে সেখানে নতুন বাড়ি তৈরির জন্য বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভা নির্দেশ জারি করেছে। এই মর্মে পুর আইনের ৪১১/১/২ ধারায় নোটিশ জারি করা হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রথমে ওই প্রেক্ষাগৃহের বিপজ্জনক অংশগুলি ভেঙে ফেলা হবে। তার পরে পুড়ে যাওয়া বাড়িটি পুরোপুরি ভেঙে ফেলতে হবে। মেয়র পারিষদ (ভবন) স্বপন সমাদ্দার বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, গত '৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত রঙমহল প্রেক্ষাগৃহের বৈধ লাইসেন্স থাকলেও এই বছর থেকে তাদের কোনও রকম পুর-লাইসেন্স ছিল না। '৯৭ সালে ওই প্রেক্ষাগৃহটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তারপর থেকেই ওই বাড়িটিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হয়ে আসছিল। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বছর কয়েক ধরে রঙমহলের নামই হয়ে গিয়েছিল 'বিয়েবাড়ি'।

এ দিকে, রঙমহল অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে নেমে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করল। বুধবার রাতে রঙমহলের ম্যানেজার অনিল চক্রবর্তী, সহকারি ম্যানেজার দুখিয়ারাম দে এবং ওই প্রেক্ষাগৃহের কেয়ার টেকার রাম নারায়ণ গুপ্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ডি সি (উত্তর) কুন্দনলাল টামটা জানিয়েছেন, দমকলের অভিযোগের ভিত্তিতে, এই তিনজনকে তাঁরা গ্রেফতার করেছেন।

এখনও রঙমহল 'বিয়েবাড়ি' হয়েই আছে। শাড়ি-কাপড়ের মেলা বসে প্রায়ই। অন্য সময়ে নানা সময়ে বিবিধ ঠেক। রঙমহলকে বাঁচানোর দায় এবং কর্তব্য কেউই বোধ করেনি। রঙমহল বিলুপ্ত।

রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চ

গণেশ মুখোপাধ্যায়
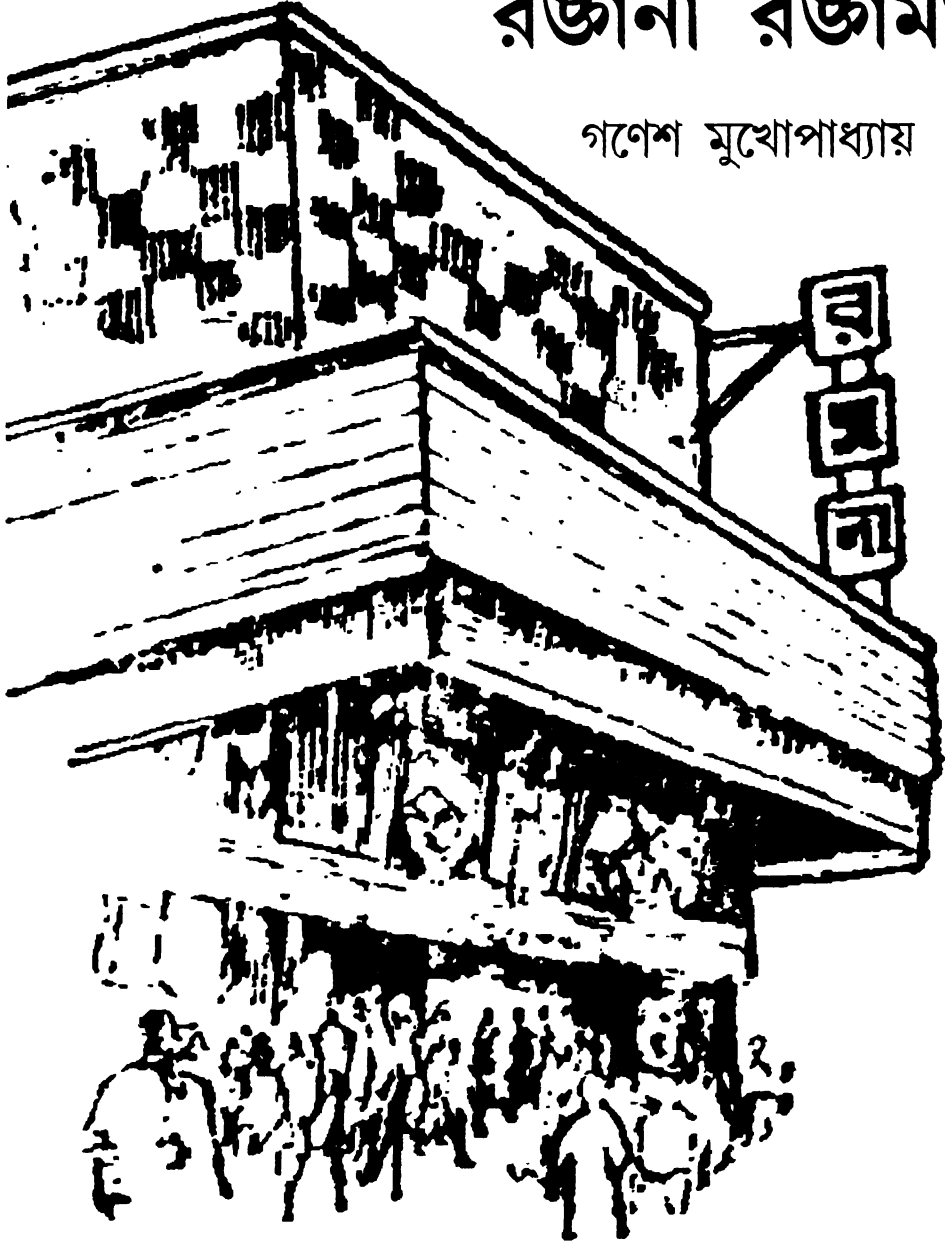
রঙ্গনার প্রথম প্রযোজনা 'নট-নটী'-তে মলিনা দেবী

১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর, বাংলা ১৩৭৭-এর দুর্গা পঞ্চমীর দিন রঙ্গনার যাত্রা শুরু হয়েছিল। বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল তারও দু'বছর আগে। নাটক-পাগল মানুষ বন্ধুবর পরিতোষ দাস (রঙ্গনার জন্মলগ্ন থেকে আমৃত্যু কর্মী) খবর নিয়ে এলেন, বিশ্বরূপার রাস্তায় দীনদাসের ঠাকুর বাড়ির সামনে থিয়েটার হল তৈরি করার মতো একটা জায়গা আছে। তখন আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক বিভাগে অধ্যাপনা করছি, আর শ্রীমঞ্চে নাটক করছি। একটা মঞ্চের কথা অনেকদিন থেকে মাথায় ঘুরছিল। অপেশাদার নাট্যদলগুলির তখন মঞ্চের খুব অভাব। তবু দক্ষিণ কলকাতায় থিয়েটার সেন্টার হয়েছে। মুক্ত অঙ্গন তৈরি হয়েছে। এই দু'টি মঞ্চে গ্রুপ থিয়েটারের নাটক করার কিছুটা সুবিধা হয়েছে। উত্তর কলকাতায় অমন একটা মঞ্চ তৈরির চেষ্টা চলছিল বহুদিন থেকেই। তাই খবরটা পেয়েই লক্ষ্মী পুজোর দিন বিকেল বেলায় চলে গেলাম জায়গাটার খোঁজে। কিন্তু কোথায় কী? বিশ্বরূপা, পূর্ণশ্রীর পর থেকে গোটা রাস্তাটায় গরু-মোষের খাটাল, তেলকল, লোহা-লক্করের কারখানা, আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের মুখে দু-একখানা ঢোল-তবলার দোকান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রায় সন্ধে নাগাদ দীনদাসের ঠাকুর বাড়ির অপর দিকে একটা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে বিশাল একখানা কাঠের গেট দেখতে পাওয়া গেল। বেশ খানিকক্ষণ কড়া নাড়ার পর গেট খুলে বেরলেন একজন ছোটখাটো বয়স্ক মানুষ। হাতে কেরোসিনের লম্ফ। আবছা আলো-অন্ধকারে দেখা গেল দরজার সামনেই ভাঙা টিনের চালার নিচে জনা চার-পাঁচ মানুষের গাঁজার আড্ডা বসেছে। কোনও কথা বলার আগেই আড্ডার লোকেরা মারমুখী। বুঝলাম তাদের মৌতাতে ব্যাঘাত ঘটেছে। তবু দু-এক কথা বলার চেষ্টা করলাম। তারা কিছুই বলল না। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। ওরই মধ্যে যেটুকু দেখলাম তাতে মনে হল ভেতরে বেশ লম্বা-চওড়া কয়েকখানা শেড আছে। মেশিনপত্তর-ইট-কাঠ আছে। তবে জায়গাটা ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। বেশ বুঝলাম, এই সেই থিয়েটার করার মতো জায়গা, যার কথা পরিতোষবাবু বলেছেন।

এরপর থেকে চার-পাঁচদিন ও' তল্লাটে ঘুরলাম। খবর পেলাম, ষোল বছর আগে ওখানে একটা অয়েল মিল ছিল। কিন্তু কার জায়গা, কে তার মালিক, তার কোনও হদিশ করতেই পারলাম না। আবার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে জায়গাটা দেখারও কোনও সুযোগ পেলাম না। অথচ নিজের চোখে একবার ভালোভাবে দেখতে না পেলে ঠিক আন্দাজ

করতে পারছি না এখানে আদৌ কোনও থিয়েটার হল তৈরি করা সম্ভব হবে কি না। দিন পাঁচেক পরে পাড়ার ঢোল-তবলার দোকানের এক বৃদ্ধ ওই জায়গার পাশেই লেদের কারখানায় খোঁজ করতে বললেন। সেই ঢোল-তবলার দোকান আজও আছে, আর পাশের কারখানাও রয়েছে। বৃদ্ধ ঠিকই বলেছিলেন। ওইখান থেকেই খোঁজ পাওয়া গেল বন্ধ অয়েল মিল এবং জায়গার মালিক হচ্ছেন সিমলের বাসিন্দা দুই ভাই শ্রী গোপেন্দ্রকৃষ্ণ শীল এবং শ্রী রাধাবল্লভ শীল। ওখান থেকে কিন্তু বাড়ির ঠিকানা জানতে পারা গেল না। তবে জায়গাটা জানা গেল। সেইদিনই খুঁজে বের করে ফেললাম ওঁদের বাড়ি। দেখা হল ছোটবাবু রাধাবল্লভ শীলের সঙ্গে। আলাপ-পরিচয়ের পর ভয়ে ভয়ে উদ্দেশ্যটা জানালাম। ছোটবাবু বেশ বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। আমার উদ্দেশ্য জেনে হ্যাঁ-না কিছু না বলে শুধু বললেন, আমি বড়বাবু অর্থাৎ শ্রী গোপেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের সঙ্গে কথা বলে দেখি, আপনি কাল সকালে আসুন। পরের দিন সকালে গিয়ে হাজির হলাম। দুই ভাইয়ের সঙ্গেই দেখা হল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা কবলেন বড়বাবু। ওইরকম পরিবেশে থিয়েটার চলার ব্যাপারে সন্দেহও প্রকাশ করলেন। কথাবার্তায় বুঝলাম ভদ্রলোক বেশ দৃঢ়চেতা এবং স্পষ্ট-বক্তা। জায়গাটা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবু বললেন, এক্ষুণি চলুন। আমি তো অবাক! ভাবতেই পারিনি এত তাড়াতাড়ি এইরকম প্রস্তাব আসবে।

যাই হোক, বড়বাবু সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে এসে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি বিশাল বিশাল তিনটি টিনের শেড। তার পাশে খান-চারেক টিনের চালের ঘর। শেডগুলোর নিচে সারবন্দী তেলকলের ভাঙাচোরা মেশিনপত্র। প্রচুর ইট-কাঠ-টিন-লোহা পড়ে আছে। ফাঁকা জায়গাও আছে বিশ খানিকটা, কিন্তু ঝোপ-জঙ্গালে ভরা। ওরই মধ্যে ঘুরে যেটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল, অন্তত তিনখানা মুক্ত অঙ্গান তৈরি হতে পারে এত জায়গা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও হল, অতখানি জায়গা নিয়ে কী করব! আর ওই বিশাল জায়গা নেওয়ার মতো পয়সাই বা কোথায়? তবু বড়বাবুকে বললাম, ঠিক আছে, আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁদের দেখাই, তারপর বাকি কথা হবে। উনি তখনই গাঁজার অড্ডাধারী সেই ছোটখাটো মানুষটিকে বলে দিলেন, ইনি যখনই আসবেন তখনই যেন এঁকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়।

বাড়িতে চলে এলাম। মাথায় আশা-নিরাশার অসংখ্য চিন্তা। ব্যাপারটা প্রথম প্রকাশ করলাম আমার দাদা কার্তিক মুখোপাধ্যায়, সেজভাই প্রভাত মুখোপাধ্যায়, আর বন্ধু গোলক পালের কাছে। গোলক পালদের বিশাল যৌথ বনেদি পরিবার। গোলক পালের ছোটভাই সুরতন পাল এবং ভগ্নিপতি পার্বতী পাল বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট সংলগ্ন প্রিন্সেপ স্ট্রিটে সাইকেলের কারবার করেছিলেন। এঁদের বড় ভাই জীবন পাল, গোলক পাল, ধীরেন পাল, মেজভাইয়ের ছেলে শম্ভু পাল, সকলেই সাইকেলের ব্যবসার অংশীদার। আমিও তখন বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে পাইকারি সাইকেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেই সূত্রে এঁদের সঙ্গে আলাপ, ঘনিষ্ঠতা। এবং ওঁরা আমাদের বাড়ির একাংশ ভাড়া নিয়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন।

রবীন্দ্রভারতীতে পড়ানোর সময় থিয়েটার, সিনেমা, দূরদর্শন প্রভৃতির জন্য মেকআপ সামগ্রীর রিসার্চ করি আচার্য অহীন্দ্র চৌধুরী ও শৈলেন গাঙ্গুলির অধীনে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে প্রথম উচ্চমানের মেকআপ সামগ্রী প্রস্তুতের ব্যবসা করি আমরা দুটি পরিবার, মুখার্জী ও পালেরা মিলে। আমার পিতৃদেব নাট্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সময় থেকেই আমাদের পরিবারে নাট্যচর্চার একটা বাতাবরণ প্রস্তুত হয়েছিল। আর গোলক পালেরা এবং এঁদের এক ভগ্নিপতি সন্তোষ পাল নাট্যামোদী মানুষ ছিলেন। ওঁরা খুব উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তখন গোলকবাবু আর সন্তোষবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আবার জায়গাটা দেখে এলাম। উভয় পরিবার থেকেই যথেষ্ট উৎসাহ পাওয়া গেল। মেকআপ সামগ্রীর ব্যবসাতে আমাদের তখন বেশ কিছু টাকা জমেছিল। তবে একটা থিয়েটার-বাড়ির জন্য সে টাকা যে কিছুই নয় তখন তা বুঝিনি। কিন্তু জল্পনা-কল্পনার পর সবাই মিলে ঠিক হল, জমিটা যদি পাওয়া যায় তাহলে মুক্ত অঙ্গানের মতো একটা ছোটখাটো থিয়েটার তৈরি করা যেতে পারে।

আমার বাবা কালীতনয় মুখোপাধ্যায়কে শুধু আমাদের পাইকপাড়ায় নয়, কাশীপুর-সিঁথি-বীরপাড়া এমনকি টালা

অঞ্চল পর্যন্ত 'তনুবাবু' নামে একডাকে সকলেই চিনত। তিনি ছিলেন সমাজসেবী এবং শিল্পানুরাগী ব্যক্তি। আগেই বলেছি, যাত্রা-থিয়েটারে বাবার ছিল প্রচন্ড উৎসাহ, তাঁরই অনুরাগী আমাদের আত্মীয় বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় এবং ফেলু মুখোপাধ্যায়, এই দুই ভাই উদগ্র নাট্যোৎসাহী এবং পেশায় স্থপতি ছিলেন। বিদ্যুৎদা এবং ফেলুদা জমিটা দেখলেন এবং মাপজোপ করে একটা সাইট-প্ল্যান এঁকে ফেললেন।

প্ল্যানখানা নিয়ে আমি অহীন্দ্র চৌধুরী মশাইয়ের কাছে গেলাম। দুরু-দুরু বুকে ব্যাপারটা তাঁকে শুনিয়ে প্ল্যানখানা দেখালাম। জায়গাটার কাছেই ডালিমতলাতে তিনি বেশ কিছুদিন বসবাস করেছেন। কাজেই আনুপূর্বিক সব কিছু শুনে সাইট-প্ল্যানটা দেখে তিনি জায়গাটা চিনলেন বটে, কিন্তু গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ চুপচাপ চোখ বুজে বসে থেকে বললেন — 'খুব শক্ত ব্যাপার।' আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা, আমিও নির্বাক। খানিক পর বললেন, 'একটা ভালো থিয়েটার-বাড়ি তৈরি করার মতো টাকা পাবে কোথায়?' মেকআপ কোম্পানির জমা টাকার কথা জানালাম। উনিই আমার GANESH নামানুসারে আমাদের মেকআপ সামগ্রীর নাম দিয়েছিলেন — G. ONESE'S MAKE-UP। জমা টাকার অঙ্কটা শুনে একটু হেসে চুপচাপ থেকে বললেন, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি।' আমিও আর কথা না বাড়িয়ে সাইট-প্ল্যানখানা সামনের টেবিলে রেখে চলে এলাম।

পরের দিন বিকেলে গিয়ে দেখি রাস্তার দিকের বারান্দায় চোখ বুজে বসে আছেন, সামনে টিপয়ের ওপর সাইট-প্ল্যানখানা আর কাগজ-পেন্সিল পড়ে রয়েছে। ইশারায় বৌমা অর্থাৎ ওঁর সহধর্মিনী (তিনি আমাকে সন্তানতুল্য স্নেহ করতেন) আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জানালেন গতকাল থেকে প্রায় সারাক্ষণই ওই প্ল্যানখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন আর কাগজে কত কী লেখালিখি আঁকাজোকা করছেন। বুঝলাম ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন।

এরপর প্রায় মাস দেড়েক ধরে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা-উপদেশ-সতর্কবাণী তো চললই, তার সঙ্গে বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানবার জন্য আমাকে পাঠাতে লাগলেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন তৎকালীন স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী সলিল মিত্র, নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত, আর কর্পোরেশন অ্যামিউজমেন্ট অফিসার রঞ্জিত সিনহা। এঁরা সকলেই প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। একদিকে চলছে চৌধুরী মশাইয়ের নির্দেশমতো কাজকর্ম, অপরদিকে জমির মালিক শীলবাবুদের সঙ্গে কথাবার্তা। দেখতে দেখতে কেটে গেল তিনটে মাস। ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারিতে শীলবাবুদের কাছ থেকে জমিটা নেওয়া হল। জমি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে হলেও ঠিকানা কিন্তু তখন ছিল ১৫৩/২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড (পরবর্তীকালে ১৫৩/২ই হয়েছে)। আজ ভাবলে আশ্চর্য লাগে, জায়গাটা তখন শীলবাবুরা প্রায় বিনামূল্যেই দিয়েছিলেন। শুধু জায়গা নয়, ওখানে ওদের তেল-কলের দরুন ইট-কাঠ-লোহা-টিন প্রভৃতি প্রচুর মাল-মশলা মজুত ছিল। সেগুলো সব আমাদের থিয়েটার-বাড়ি তৈরি করার কাজে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন এবং বড় কথা হচ্ছে তার জন্য একটি পয়সাও কোনওদিন দাবি করেননি। 'রঙ্গনা' গড়ে ওঠার পিছনে ওঁদের অবদান অসামান্য।

জমি তো হল। কিন্তু ইতিমধ্যেই চৌধুরী মশাইয়ের 'বড় শক্ত ব্যাপার' কথাটি হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি। কাজেই প্রাথমিক পর্যায়েই দুই পরিবারের দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিলাম। হীরক আমাদের পরিবারের বড় ছেলে। সবে বি-কম পাস করেছে। রক্তে আছে নাট্যপ্রীতির বীজ। স্কুল-কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের নেশা পেয়ে বসেছে। হীরক স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এল পাল পরিবারের ছেলে শম্ভু। শম্ভু তখন ওদের সাইকেলের কারবারে বেরোচ্ছে। এখানকার হিসাবপত্র রাখার জন্য সকাল-সন্ধ্যা সময় দিতে লাগল। আর হাতে-কলমে একটা থিয়েটার-বাড়ি গড়ার কাজে হীরক তখন থেকেই হোলটাইমার হয়ে গেল। দু'পাশে দুই সেনাপতি নিয়ে আমি লড়াইয়ে নেমে পড়লাম। মূল নির্দেশক আচার্য অহীন্দ্র চৌধুরী। সর্বপ্রকার কাজকর্ম অর্থকরী পরামর্শদাতা গোলক পাল, সন্তোষ পাল, আমার দাদা কার্তিক মুখোপাধ্যায়, মামাবাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে আমার ভাই প্রভাত স্বভাবসিদ্ধভাবে নিঃশব্দে গোটা কাজটার মধ্যেই মাথা গলিয়ে দিল।

বিদ্যুৎবাবু কনসালট্যান্ট হিসাবে নিয়ে এলেন এক বিরাট অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কর্পোরেশনের পূর্বতন সিটি আর্কিটেক্ট দীনেশ ঘোষকে। তিনি তখন গ্লোব সিনেমাকে ভেঙেচুরে পুনর্নির্মাণ করছেন। চৌধুরী মশাইয়ের ডিজাইনমতো দীনেশবাবু নকশা আঁকতে লাগলেন। তেলকলের পুরোনো বাড়িটা ভেঙে কর্পোরেশন থেকে প্ল্যান স্যাংশন করিয়ে গোটা ব্যাপারটা গোছাতে সময় লেগে গেল মাস পাঁচেক। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে, রথের দিন, ভিত কাটা হল। সেইদিন থেকে দাঁতে দাঁত দিয়ে শুরু হল এক সৃষ্টির লড়াই।

তিল তিল করে একটা ৮৫০ আসনের (বর্তমান আসন ৯০৫) আদর্শ থিয়েটার গড়ে তুলতে সময় লেগেছিল ১৭ মাস। কত মানুষ যে তখন উৎসাহ দিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন আজ এত বছর পরে সকলের নাম মনে রেখে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্তু পরিতোষবাবু, রঙ্গনা যাঁর প্রাণ ছিল কিংবা তিনিই ছিলেন রঙ্গনার প্রাণ, তাঁর কথা কি ভোলা যাবে? শ্রদ্ধেয় প্রেমাংশুদা, রঞ্জিতবাবু, এঁরা তো গোড়া থেকেই লেগেছিলেন আমাদের সঙ্গে। ইন্দ্রবাহাদুর পাহারাদার আর লক্ষ্মী হেলা সাফসুফ করার কাজে লাগল। দেশাই মিস্ত্রী-মজুর-কেয়ারটেকার, কী না ছিল! এপাড়ার 'টেরর' নন্তি (লক্ষ্মীনারায়ণ দাস) দেখাশোনার কাজে লেগে গেল। মাখন এল যোগাড়ির কাজে। আমাদের বুড়ো রাজমিস্ত্রী ইসমাইল ও তাঁর দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎদা পুরো বিল্ডিংটা গেঁথে দিলেন। দরজা-জানলা থেকে শুরু করে স্টেজ, সেট ইত্যাদি সর্বরকমের কাঠের কাজ স্টার থিয়েটারের বৈজু মিস্ত্রীর ছেলে বিরজু আর তার ভাইপো ঝগড়ু এরাই তৈরি করে দিলে। লোহার স্ট্রাকচার বানালেন দুই কালীবাবু মিলে। ভোলা ভট্টাচার্যরা ইলেকট্রিকের লাইন লাগাল। নিখিল, নিতাই আর জগাবাবুকে (হিমাংশু) নিয়ে লাইটিং এবং সাউন্ড সিস্টেম খাড়া করলেন বাঘাবাবু (অজিত মিত্র)। শিবু (শিবনারায়ণ ঘোষ) স্টেজ কার্টেন, ফ্লাই, ব্যাটন — সব মাপজোপ করে বানিয়ে দিলে। পুরান পালের মামা কোতরংয়ের গোবিন্দবাবুরা তাঁদের ইটভাটা থেকে যাবতীয় ইট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, পয়সা নিয়েছিলেন তিন বছর ধরে। টাকা পয়সার প্রচন্ড অভাব। তবু এক পয়সাও সরকারি সাহায্য চাওয়া হয়নি। পাল এবং মুখুজ্জেদের বহু আত্মীয়-স্বজন যে যেমন পেরেছিলেন টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আমাদের ছোটভাই কেষ্ট, সন্তোষবাবু, আমার মামাবাবু — এঁরা সব প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নিয়ে টাকা এনে দিয়েছিলেন। ইনকাম ট্যাক্সের উকিল বিমল চ্যাটার্জী আমাদের বন্ধু এবং পরামর্শদাতা। তিনি তাঁর বৌদির জমানো টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আরও অনেকেই যাঁর যেমন ক্ষমতা অর্থ এনে দিয়েছিলেন এই থিয়েটারটা গড়ার জন্য। আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে কয়েকটি ঘটনা বিশেষ করে মনে গেঁথে আছে। কাজ প্রায় শেষের দিকে। টাকার তখন খুব অভাব। পাড়ার এক বিধবা —নীরোদিদি — তাঁর মা আমাকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছেন। একদিন নীরোদিদি একটা ময়লা ন্যাকড়ায় বাঁধা হাজার তিনেক টাকা নিয়ে এসে বললেন, আমার এই টাকা ক'টা তুই রেখে দে। এইভাবে কয়েকবারে প্রায় হাজার দশেক টাকা তিনি দিয়েছিলেন। একদিন বাঘাবাবু খবর দিলেন, দুটো ভালো লাউডস্পিকার বক্স পাওয়া যাচ্ছে হাজার পাঁচেক টাকাতে। জিনিস অনুপাতে দামটা সস্তা, কিন্তু হাতে টাকা নেই। বড়বাবু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মশাই আমাদের আলোচনাটা শুনলেন। উনি প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে এসে বেলা দুটো পর্যন্ত কাজকর্মের তদারকি করতেন। পরের দিন আমাকে কিছু না জানিয়েই বাড়ি থেকে টাকা এনে বাঘাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে স্পিকার দুটো কিনে এনে দিলেন। পাখা লাগবে প্রায় পঞ্চাশখানা। কিন্তু পঞ্চাশ টাকা নিয়েও তখন টানাটানি চলছে। বন্ধু লক্ষ্মণ দাশগুপ্ত একটা পাখার এজেন্সি নিয়েছে। সে নিজের থেকেই এসে বললে, আমি পাখা দিচ্ছি, যখন পারবেন দাম দেবেন। সাড়ে তিন বছরে পাখার দাম শোধ হয়েছিল।

আচার্য অহীন্দ্র চৌধুরী থিয়েটারের নাম দিলেন 'রঙ্গনা'। ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দুর্গাপঞ্চমীতে উদ্বোধনের দিনে উপস্থিত ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ড. অজিতকুমার ঘোষ। শ্রীমঞ্চের কয়েকখানা সেটের পর্দা, কাঠের পাটাতন, আর কিছু আলোর সরঞ্জাম দিয়ে রঙ্গনার উদ্বোধন। সে রাত্রে জগন্নাথ-হীরুদের 'বিনি পয়সার ভোজ' আর শ্রীমঞ্চের 'যায়সা কা ত্যায়সা' অভিনীত হয়েছিল। এইভাবে বহু ছাপোষা সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় রঙ্গনা গড়ে উঠেছে, কিন্তু কোনও ধনীর অর্থ কিংবা সরকারি সাহায্য রঙ্গনা স্পর্শ করেনি। বহু অর্থবান প্রযোজক বহুবার রঙ্গনাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছে। গোড়ার দিকে

নিজেদের প্রযোজনা করার সামর্থ ছিল না। কিন্তু গোষ্ঠী থিয়েটারের মানসিকতায় রঙ্গনার জন্ম। তাই অজিতেশবাবু, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রবাবুদের মাধ্যমে তখনকার প্রথম সারির গ্রুপ থিয়েটার নান্দীকার গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুকাল রঙ্গনায় নিয়মিত অভিনয় করার কথা হল। ওঁরাও যোগারযন্ত্র করে হাজার দশেক টাকা অগ্রিম দিয়ে দিলেন। ক্রমশ সেই টাকা শোধ হয়েছে। 'তিন পয়সার পালা দিয়ে' শুরু। তা'র পরের পাঁচ বছরে 'শের আফগান', 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'বীতংস', 'ভালোমানুষ', 'হে সময় উত্তাল সময়' ইত্যাদি নান্দীকারের ভালো ভালো প্রযোজনা রঙ্গনাকে জনপ্রিয় করেছে।

পাঁচ বছর পরে, ১৯৭৬ সালে, রঙ্গনা নিজস্ব প্রযোজনার সামর্থ সঞ্চয় করে মলিনা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, বিমল দেব, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিকা, বাসন্তী, মমতা, হিমানী, গৌতমদের নিয়ে 'নটনটী' প্রযোজনা করেছে। তারপর বনফুলের 'বহ্নি'।

এরপরের ঘটনাটা বড় দুঃখজনক। পাল-মুখার্জীদের মধ্যে মতান্তর। কোর্ট-কাছারি, মামলা-মোকদ্দমা। রিসিভার ব্যারিস্টার গৌর রায়চৌধুরীর সুপরিচালনায় দশ বছর অতিক্রম। সেই সময় নাট্যকার-পরিচালক শ্রদ্ধেয় দেবনারায়ণ গুপ্তের নেতৃত্বে সুপ্রযোজক হরিদাস সান্যালের 'চন্দ্রনাথ', 'জয় মাকালী বোর্ডিং', 'সুন্দরী লো সুন্দরী', 'অঘটন' প্রভৃতি প্রযোজনা রঙ্গনার মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। এরপব অ্যাটর্নি অরুণ রায়, আইনজীবী সোমনাথ রায়, বলাই নন্দী ও আরবিট্রেটার ব্যারিস্টার পি. কে. রায়ের মধ্যস্থতায় মুখার্জী গোষ্ঠীই রঙ্গনার স্বত্ত্বাধিকার ফিরে পায়। সেই থেকে মুখার্জী গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে রঙ্গনার নিজস্ব প্রযোজনার শুরু 'জয়জয়ন্তী' নাটক দিয়ে।

মুক্তি মুখোপাধ্যায়ের সংযোজন

১৯৭৮ সালের প্রথমে যখন আমার ছোট মেয়ে জন্মালো তখন রমাদি (ড. রমা চৌধুরী) বললেন, 'মেয়ের নাম অঙ্গনা রাখো, রঙ্গনা ফিরে পাবে।' রঙ্গনার প্রায় হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাসও অদ্ভুত নাটকীয়। ১৯৭০ সালে উদ্বোধিত রঙ্গনা ভালোই চলছিল মুখার্জী ও পাল পরিবারের যৌথ প্রয়াসে। মুখার্জী পরিবার থেকে গণেশ মুখার্জী ও প্রভাত মুখার্জী (কাকা-শ্বশুর) এবং আমার স্বামী হীরক মুখার্জী এই থিয়েটারের ব্যবসায় সম্পৃক্ত ছিলেন। হীরক ছোটবেলা থেকেই নাটক-পাগল। পড়াব বইয়ের তলা থেকে নাটকের বই বার করে চিরকাল মায়ের কাছে শাসিত হয়েছে। কাকু গণেশ মুখার্জী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যাপক। কাকাবাবু প্রভাত মুখার্জী প্রতিবন্ধী হলেও অশেষ শিল্পবোধের অধিকারী। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই তিনজন রঙ্গনায় নাটকের দিকটাই দেখাশোনা করতেন। পালেরা দেখতেন টাকাপয়সার হিসেবনিকেশ। পালেরা অযথা নাটকের ব্যাপারে মাথা দিতেন না, এঁরাও টাকাপয়সা নিয়ে কোনও ভাবনা করতেন না। হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত। পালেদের তরফ থেকে জানানো হল, আর্থিক ঘাটতি হচ্ছে, নাটক অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তখন 'বহ্নি' নাটক চলছে। বিনা নোটিসে একজন শিল্পী-কলাকুশলীর সংস্থান বন্ধ করাটা অত্যন্ত মর্মঘাতী হল। যেহেতু টাকাপয়সার ব্যাপারটা এপক্ষের সম্পূর্ণ অজানিত তাই বিরাট ভুল বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হল। অতীব আপন পালেদের ওপর কাকু অভিমানে অন্ধ হলেন। আবেগতাড়িত হয়ে তিনি এবং ভাইয়েরা সিদ্ধান্ত নিলেন, হলের সম্পূর্ণ চাবির গোছাটি পাল পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটির হাতে তুলে দিয়ে তাঁরা রঙ্গনার বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। করলেনও তাই। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ওদের খেলাৎবাবু লেনের বাড়িতে গিয়ে চাবির অধিকার ত্যাগ করে এলেন। হীরকের ও আমার মাথায় বজ্রাঘাত। বাস্তববাদী হীরকের তখন রঙ্গনাকে ঘিরেই ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা। বি-কম পাস করার পর অন্য কোনও বৃত্তিতে যেতে না দিয়ে এই ব্যবসার উন্নতিবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে কাকুই হীরককে এখানে লিপ্ত করান। ভালোবাসার জিনিস এবং মনোমতো ব্যবসাটি হওয়ায় হীরকও সমস্ত অন্তর দিয়ে এখানে জড়িয়ে পড়েছিলেন। চাবির গোছা দিয়ে এলেও আইনের চোখে তখনও আমরা অংশীদার। তাই পালেরা অত্যন্ত অল্প টাকার বিনিময়ে গণেশ, প্রভাত ও হীরক মুখার্জীর অংশ কিনে নেওয়ার প্রস্তাব পাঠান।

কাকু ও কাকাবাবু তাতেই রাজি হলেন। পিতৃতুল্য কাকাদের ওপর কথা বলার ধৃষ্টতা হীরকের ছিল না। টাকাপয়সার

লেনদেনের ব্যাপারটা যখন বহু দিনেও সম্পন্ন হল না তখন তিনি গোপনে দ্বারস্থ হলেন আমাদের পরিবারের গুরুদেব শ্রীশ্রীমৌনীবাবাজীর কাছে। সমস্ত ঘটনা শুনে উনি আদেশ দিলেন একদিনও দেরি না করে আইনের সাহায্য নিতে। মামলার দায়িত্ব গুরুদেব ওঁরই আর এক শিষ্য অধুনা প্রয়াত সলিসিটর অরুণ রায়ের হাতে তুলে দেন। গুরুদেবের নির্দেশ অমান্য করার সাহস বাবা-কাকাদের ছিল না। অথচ মামলা যে লড়া হবে তার টাকাও তো নেই। যাই হোক, ক্রমে ক্রমে টাকার যোগাড়ও হল, শুরু হল মামলা। আর্থিক ভাবনায় যাতে হীরককে মাথা দিতে না হয় তাই চাকরির ইন্টারভিউ দিতে শুরু করলাম, শাশুড়ীমায়ের কাছে পাঁচ মাসের ছোট মেয়েকে রেখে। বাগবাজার মালটিপারপাস স্কুলে চাকরি পেলাম। পায়ের তলায় যাহোক একটু মাটি পাওয়া গেল। হাইকোর্টে আইনের অধিকারে হীরকও রঙ্গনায় প্রবেশের অধিকার পেলেন। অনিয়মিত জীবনযাপন, স্নান-খাওয়া অনির্দিষ্ট, রঙ্গনায় অসহনীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-অপমান কোনও কিছুই উনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না — একটিমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছনো ছাড়া। এই সময় হীরকের প্রাণসংশয়ও দেখা দিল। একদিনের ঘটনা। হীরক তখন রঙ্গনায়। হঠাৎ বিজন থিয়েটার থেকে ফোন এল যে ওঁরা দেখতে পাচ্ছেন কয়েকজন মিলে হীরককে ঘেরাও করেছে। সেই সময় বুকে রিভলবারও ধরা হয়েছিল। অবিলম্বে আমরা যেন পুলিস ফোর্স নিয়ে যাই। তবে সেদিন শেষ পর্যন্ত পুলিসের সাহায্যের আর প্রয়োজন হয়নি। হীরকের শান্ত ও নির্বিকার ব্যবহার প্রতিপক্ষকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল।

এদিকে মাননীয় বিচারপতি টি. কে. বাসুর অর্ডারে সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যারিস্টার গৌর রায়চৌধুরী রঙ্গনার স্থায়ী রিসিভার এবং হীরক রঙ্গনার যুগ্ম-পরিচালক নিযুক্ত হলেন। মামলা চলল। এই সময় হীরকের দুই ভাই দীপক এবং অলোক নিজেদের কাজ ছেড়ে হীরককে যথেষ্ট সঙ্গ ও সাহস দিয়েছিলেন, কিন্তু মামলার দীর্ঘসূত্রিতায় একে একে সকলেই হতাশ হয়ে কোর্টে যাওয়া-আসা বন্ধ করেছিলেন। যাঁদের সঙ্গে মামলা তাঁদের মুখোমুখি হওয়ার মতো মনের জোর কাকুর ছিল না, তাই কাকুর ক্ষেত্রে কোর্টে যাওয়ার প্রশ্নই কোনওদিন ওঠেনি। ফলত হীরক বড় একলা হয়ে গেলেন, কিন্তু নিরাশ হলেন না।

দিন গেল — মাস গেল — বছর ঘুরে এল, কিন্তু মামলা কোনও পরিণতিতেই এল না, অথচ বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ হয়েই চলেছে। হীরককে নিরস্ত করার জন্য নিরাশ কাকু আমাদের আত্মীয় অধ্যাপক অজয় মুখার্জীকে বললেন, 'হীরককে থিয়েটারের মালিক হওয়ার স্বপ্ন ত্যাগ করতে বলুন।' কিন্তু কাকে বলছেন? জেদি, অন্তর্মুখী মানুষটি তখন তো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কোর্টের মামলা নিয়ে পড়ে থাকছেন। সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত দুঃসহ প্রতিকূল পরিবেশে রঙ্গনাতে কাজ করছেন। এছাড়া পৃথিবীর অন্য সব দরজা সেদিন বন্ধ ওঁর কাছে। কী করে যে সেই দুর্যোগের বছরগুলো পার করেছি আজ সত্যিই তা ভাবতে পারি না। তবে প্রকৃতির বিধানে যত দুর্যোগ যত ঝঞ্ঝা যত প্রলয়ই আসুক না কেন, কোনও না কোনও সময়ে তার অবসান হবেই। এই দুর্যোগেরও অবসান হল একদিন। ন'বছর পরে মামলাটি একটি সুস্থ পরিণতি পেতে চলল। এই পরিণতির জন্য সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা যাঁর প্রাপ্য তিনি হলেন সলিসিটর অরুণ রায়। আমাদের কাছে তিনি ঈশ্বরতুল্য। ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে পাল পরিবারকে তাঁদের অংশ মুখার্জীদের কাছে বিক্রি করে দিতে হল। রমাদির কথা বা আশীর্বাদ এইভাবে সফল হল।

রঙ্গনা প্রযোজিত নাটক

১. নটনটী

নাটক পরিচালনা : গণেশ মুখোপাধ্যায়। সংগীত : অনিল বাগচী। শিল্প নির্দেশনা : হীরক মুখোপাধ্যায়। প্রথম রজনী : ১০ অক্টোবর, ১৯৭৫। শুক্রবার, সাড়ে ছ'টা। প্রতি শুক্রবার সাড়ে ছ'টা, শনিবার ৩টে, রবি ও ছুটির দিন সকাল ১০টা। ৪৫ রজনী অভিনীত। পরবর্তীকালে বৃহস্পতিবার সাড়ে ছ'টা, শনিবার ৩টে, রবি ও ছুটির দিন ৩টে ও সাড়ে ছ'টা। মোট অভিনয় ৪৫৫ রজনী। অভিনয়ে : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, মলিনা দেবী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

২. বহ্নি

কাহিনী : বনফুল। নাট্যরূপ ও পরিচালনা : গণেশ মুখোপাধ্যায়। সংগীত : অনিল বাগচী। শিল্প ও আলোক : হীরক মুখোপাধ্যায়। প্রথম রজনী : ১ জুলাই, ১৯৭৭। বৃহস্পতিবার, সাড়ে ছ'টা। ৫০ রজনী অভিনীত। অভিনয়ে : সুজিত বসু, অরুণ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, অসিতবরণ, শমিতা বিশ্বাস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

৩. জয়জয়ন্তী

নাটক ও পরিচালনা : গণেশ মুখোপাধ্যায়। সংগীত : কল্যাণ সেন বরাট। মঞ্চ ও আলোক : হীরক মুখোপাধ্যায়। প্রথম রজনী : ১৯ জুন, ১৯৮৮। রবিবার, সাড়ে ছ'টা। ৪০০ রজনী অভিনীত। অভিনয়ে : শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম গাঙ্গুলি, নিমু ভৌমিক, বাসবী নন্দী, গীতা দে, নন্দিনী মালিয়া প্রমুখ।

৪. কি বিভ্রাট

নাটক ও পরিচালনা : গণেশ মুখোপাধ্যায়। সংগীত : কল্যাণ সেন বরাট। মঞ্চ ও আলোক : হীরক মুখোপাধ্যায়। প্রথম রজনী : ১৫ এপ্রিল, ১৯৯০। রবিবার, ৩টে। মোট অভিনয় অনধিক ৮০০ রজনী। অভিনয়ে : অনুপকুমার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম গাঙ্গুলি, নিমু ভৌমিক, গীতা দে, অলকা গাঙ্গুলি, রত্না ঘোষাল প্রমুখ।

৫. মোসাহেব

কাহিনী : প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটক ও পরিচালনা : গণেশ মুখোপাধ্যায়। সংগীত : কল্যাণ সেন বরাট। মঞ্চ ও আলোক : হীরক মুখোপাধ্যায়। প্রথম রজনী : ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৩। বুধবার, ৩টে। মোট অভিনয় ৪৫৭ রজনী। অভিনয়ে : চিন্ময় রায়, জর্জ বেকার, দেবরাজ রায়, নিমু ভৌমিক, গীতা দে, নয়না দাস, পাপিয়া অধিকারী প্রমুখ।

৬. বাদশাহী চাল

নাটক : শৈলেশ গুহ নিয়োগী। সম্পাদনা ও নির্দেশনা: গণেশ মুখোপাধ্যায়। সংগীত : কল্যাণ সেন বরাট। মঞ্চ ও আলোক : হীরক মুখোপাধ্যায়। প্রথম রজনী : ২ জানুয়ারি, ১৯৯৫। রবিবার, ৩টে। অভিনয়ে : নিমু ভৌমিক, চিন্ময় রায়, অরিন্দম গাঙ্গুলি, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নয়না দাস, গীতা দে, শাশ্বতী রায় প্রমুখ।

৭. বিয়ের সানাই

সম্পাদনা ও নির্দেশনা: গণেশ মুখোপাধ্যায়। সংগীত : কল্যাণ সেন বরাট। মঞ্চ ও আলোক : হীরক মুখোপাধ্যায়। প্রথম রজনী : ১৫ অগাস্ট, ১৯৯৬। অভিনয়ে : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, চৈতী ঘোষাল ধীমান চক্রবর্তী, শাশ্বতী রায় প্রমুখ।

৮. পাকেচক্রে

নির্দেশনা : অশোক চ্যাটার্জী। সংগীত : দেবজিত। মঞ্চ ও আলোক : হীরক মুখোপাধ্যায়। প্রথম রজনী : ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮। অভিনয়ে : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।

৯. জোয়ারভাটা

নির্দেশনা: অশোক চট্টোপাধ্যায়। প্রথম রজনী : ১৪ অক্টোবর, ১৯৯৯। অভিনয়ে : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, গীতানাথ।

রঙ্গনার নাট্যপ্রযোজনা বন্ধ হয়ে যায় ২০০৪-০৫ সাল থেকে। বিভিন্ন অফিস ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংগঠন অনুষ্ঠান করে থাকে মাঝেমধ্যে। কিন্তু পেশাদারি সাধারণ রঙ্গালয় হিসেবে রঙ্গনার কোনও অস্তিত্ব নেই।

সারকারিনা প্রসঙ্গ

অমর ঘোষ

'তুষার যুগ আসছে' . সারকারিনার প্রথম নাটকে অমর ঘোষ ও শমিতা বিশ্বাস

চিন্তাভাবনা

১৯৪২ সালে প্রথম কৈশোরে আমার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যচর্চাকেন্দ্রিক সংস্থা 'উদয়াচল'কে পুরোপুরিভাবে নাট্যচর্চাকেন্দ্রিক করে নবরূপায়ণ ঘটানো হল ১৯৫২ সালে। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ অপেশাদারী গোষ্ঠী হয়েও, একই নাটকের নিয়মিত পুনঃপুনঃ অভিনয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে পা বাড়ানো শুরু করেছিলাম আমরা বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণী ও যুবকের দল। এবং সেই প্রথম নিজস্ব পৃথক ঘর ভাড়া নিয়ে মহলাকক্ষ গড়ে তোলা হয়েছিল ৮০এ ভূপেন বোস অ্যাভেনিউয়ের ঠিকানায়। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তখনকার সস্তাগণ্ডার যুগেও নিজস্ব মঞ্চ না থাকলে, নির্দিষ্ট দিনে একই জায়গায় নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে যাওয়া দুরূহই শুধু নয়, বিরাট পুঁজি বিনিয়োগের বিষয়। নির্দিষ্ট দিনটিকে চুক্তির মধ্যে দিয়ে বরাবরের মতো পেতে হলে সেটা তো লাগবেই।

বরাবরই মাথায় ছিল, নতুন কিছু চমকপ্রদ ব্যাপার না ঘটালে, আমাদের মতো অখ্যাতদের দিকে দর্শক সাধারণের দৃষ্টি চট করে টানা যাবে না। নিজে নাটক লিখি, পরিচালনা করি, অভিনয়ে নামি; সেই সঙ্গে আলো, ধ্বনি, দৃশ্য রচনার কাজেও হাত পাকিয়ে ফেলেছিলাম। সুতরাং পরিবেশনে অভিনবত্ব আনার ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার ছিল না। একা একাই ভাবতাম।

সেই সময়ে দুটি পরিবেশনধারা আমায় ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রথমত 'সার্কাসের রিং' — যার মাঝখানে সার্কাস-কর্মীরা নিজেরাই এটা-ওটা-সেটা টেনে এনে সাজিয়ে নিয়ে খেলা দেখায় দর্শকদের সামনে। পরিবেশনের কোনও দিকটাই পিছনের দিক বলে মনে হয় না কারও। দ্বিতীয় ধারাটি হল 'বিড়লা তারামণ্ডলের' গোল ঘরের মধ্যে অনুষ্ঠান পরিবেশন।

নানা ধরনের পরিকল্পনার ছায়াবাজি শুরু হয় মাথার মধ্যে। কিন্তু কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার পথে প্রথম বাধা অর্থসংকুলান — ব্যয়ভার বহন। এতখানি জায়গা স্থায়ীভাবে পাওয়া চারটিখানি কথা নয়।

আমার এই চিন্তাভাবনার পর্বে বার বার গড়ের মাঠের খেলাধূলার তাঁবুগুলি দৃষ্টি টানত। ওরা তো শুনেছি, নামমাত্র

খাজনায় ওই তাঁবু খাটানোর অধিকার পেয়েছে নিজেদের ক্লাবের নামে। আমরা আবেদন করলে কি পেতে পারি না ওই ধরনের তাঁবুর জন্য জায়গা? ওরা খেলাধূলা করার জন্য আলাদা মাঠও পেয়েছে। আমরা তো শুধু তাঁবু খাটানোর জায়গা চাইছি — তার মধ্যেই নাটকের অভিনয় করব, সার্কাসের স্টাইলে।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রভারতীতে [তখন নাম ছিল নৃত্য-নাটক-সংগীত আকাদেমি] মঞ্চবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে কাজে লেগে গেছি। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, গড়ের মাঠে ওই ধরনের তাঁবু গড়ার অনুমতি পেতে হলে তিনটি বিভাগের অনুমোদন দরকার — (ক) ফোর্ট উইলিয়াম, (খ) কলকাতা পুরসভা এবং (গ) লালবাজার। আশায় বুক বেঁধে শুরু করলাম পরিকল্পনা রচনার কাজ। ফোর্ট উইলিয়াম এবং লালবাজারের অনুমোদন পেতে দেরি হল না। আটকে গেল পুরসভার কাছে। আমার আবেদন পুরসভার যে মিটিংয়ে ওঠানো হল আলোচনার জন্য, সেই সভায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে নেওয়া হয়েছিল। উনি মন্তব্য করলেন, যদি আলোচ্য বিষয়টি সফলতা লাভ করে, তবে বহুরূপী, লিটল থিয়েটার গ্রুপ [ওই দুটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল তাঁর নোটে] প্রভৃতি নামী নাট্যসংস্থারাও আবেদন জানাবে। গড়ের মাঠ দ্বিতীয় থিয়েটার পাড়া হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দর্শকের ভিড় টেনে আনবে রাতের দিকে। তখন সেইসব দর্শকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে বহন করবে? ব্যস্, এক মন্তব্যের খোঁচায় নাকচ হয়ে গেল আমার আবেদন। [হয়তো একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস — নটসূর্য তখন আমারই কর্মস্থলে আমারই বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উনি যে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ওই মিটিংয়ে থাকবেন, আমি আগে জানতে পারিনি]

এরপর দ্বিতীয়বার সাধপূরণের সুযোগ এসেছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে। ওঁরা যাত্রাদলগুলির জন্য একটি স্থায়ী রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করেন, যার শীর্ষপদে বৃত হয়েছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায় মহাশয়। সেই সময় আমার পরিচালনায় হিটলার, লেনিন প্রভৃতি পালা যাত্রাজগতের আধুনিকীকরণের পথে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে আমাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল রাতারাতি। আমায় ওই পরিকল্পনা রচনা করার জন্য আহ্বান জানালেন রায়মশাই। বলা হল, ভবানীপুরের একটি পার্ককে কেন্দ্র করে [অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য গাঁজা পার্ক নামে কুখ্যাত ছিল ওই পার্ক] যাত্রার আসর চালানোর উপযোগী একটি স্থায়ী রঙ্গালয়ের নকশা তৈরি করতে।

হলই বা সরকারি সম্পত্তি, তবু তো আমার কল্পনা সাকার হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। প্রয়োজনে আমিও সেটি ব্যবহার করতে পারব। তাছাড়া, আমার কল্পিত 'রঙ্গাশিবির' যাত্রানুষ্ঠানের পক্ষে সব দিক দিয়েই উপযুক্ত হবে।

রাতদিন পরিশ্রম করে একটি বিশাল নকশা [প্রায় ৮ ফুট x ৪ ফুট] তৈরি করে জমা দিলাম মন্মথ রায় মহাশয় মারফত। প্রশংসাও পেলাম সেই নকশার অভিনবত্বে [বলাবাহুল্য, আজকের সারকারিনার নকশা আলোচ্য নকশাটিরই উত্তরসূরী]। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, পরিকল্পনা কার্যকর করার আগেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটল। আমি এবং রায়মশাই বহু চেষ্টা করেও ওই নকশা উদ্ধার করতে পারলাম না।

নকশাটি হারিয়ে যাওয়া বড় কথা ছিল না — নকশার নকল ছিল আমার কাছে; আর ধারণাটা তো সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। শঙ্কা জাগল মনে, ওই নকশা অন্যের হাতে পড়ে রূপায়িত হলে আমার মৌলিকত্ব ও স্বীকৃতি হারিয়ে যাবে।

বস্তুত ওই দুশ্চিন্তাই আমায় আকুল করে তুলেছিল। সিদ্ধান্ত নিলাম, ওই পরিকল্পনার বাস্তবরূপ অন্য কেউ দেওয়ার আগে আমাকেই দিতে হবে। আমি জমি খুঁজতে শুরু করলাম; সেই সঙ্গে নিজের 'সাধ আছে সাধ্য নেই' বুঝেই, সাথী খুঁজতে শুরু করলাম — যিনি বা যাঁরা এ বিষয়ে মূলধন নিয়োগ করতে পারবেন। সৌভাগ্যক্রমে সাথী খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হল না — কিন্তু মনোমতো জমি পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। কেননা, আমার পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য চাই প্রায় বর্গক্ষেত্রের মতো বড় জমি। গতানুগতিক রঙ্গালয়ের প্রয়োজন পড়ে আয়তাকার জমি — যা সহজলভ্য।

বরাবরই নজর ছিল উত্তর কলকাতার দিকেই। শুধু যে নিজের নাট্যসংস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন এই অঞ্চলে কাটিয়েছি, সেই কারণেই নয় — উত্তর কলকাতা এককথায় থিয়েটার মহল হিসাবে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল দীর্ঘদিন ধরে। সুতরাং আমার পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হলে থিয়েটার পাড়াতেই বসতে হবে।

পঁচাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে পেলাম মনের মতো জমির হদিস। গোয়াবাগানে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের এই পাঁচ শরিকের

জমিটি তখন ছিল একটি বিরাট খাটাল। লিজ দলিল তৈরির পর ওই বছরের রথযাত্রার দিন ভিতপুজো করে শুরু হল নির্মাণপর্ব। পরের বছর, অর্থাৎ ৭৬-এর রথযাত্রার দিনটি স্থির হল উদ্বোধনের দিন হিসাবে।

উদ্বোধনে সাড়া ও বিপত্তি

থিয়েটার জগতে শুনতে অদ্ভুত শোনালেও, নতুন নামটি মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল — সারকারিনা। সার্কেল আর এরিনা শব্দ দুটিকে সন্ধিতে যুক্ত করে বানানো নতুন শব্দ। ধ্বনি-সাদৃশ্যের দিক থেকে তদানীন্তনকালে চমক জাগানো 'সারকারামা'র অনুবর্তী। প্রথম নিবেদনের নাটকটিও ছিল ব্যতিক্রমী প্রযোজনা — আমার নির্দেশিত আমারই লেখা 'তুষার যুগ আসছে' — যে নাটকটি রচনাই করা হয়েছিল ওই বিশেষ মঞ্চের উপযোগী করে। থিয়েটার পাড়ায় বিপুল সাড়া জাগিয়ে উদ্বোধনের দু'দিন আগেই হাউস ফুল হয়ে যায় প্রথম রজনীর। কিন্তু বিপত্তি বেধেছিল ঠিক উদ্বোধনের আগের রাতে। বিষয়টি আজও বিরাট প্রশ্নচিহ্ন হয়ে আছে — দুর্ঘটনা, নাকি ষড়যন্ত্র? চরম মহলায় ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যের টেকনিক্যাল রিহার্সালের সময়, পরিকল্পনা বহির্ভূতভাবে মঞ্চ নামিয়ে দেওয়ার ফলে, আমি অভিনয়রত অবস্থায় ভারসাম্য হারিয়ে প্রায় ১৬/১৭ ফুট টাওয়ারের ওপর থেকে নিচের অন্ধকার মেঝেয় আছড়ে পড়ে জখম হই। হাসপাতালে একাধিক অঙ্গে মেজর অপারেশনের পর চিকিৎসকদের মন্তব্যে জানা গিয়েছিল, আমি হয়তো বেঁচে যাব, তবে পঙ্গু হয়ে কাটাতে হবে বাকি জীবন। তাবপরেও এই সিকি শতাব্দী ধরে আমি কী করে নিরবচ্ছিন্নভাবে অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছি, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে, একটি নতুন এবং অভিনব পরিকল্পনা যে ওই বিপত্তির ফলে স্তব্ধ হয়ে যায়নি, এটাই পরম সৌভাগ্যের কথা। ওই পদ্ধতিতে যে কোনও গলদ নেই, এটা ক্রমে লোক বুঝতে পেরেছে।

বিপত্তি অবশ্য শুধু আমার অ্যাক্সিডেন্টেই থেমে থাকেনি। পরে পরেই অংশীদারদের মধ্যে মনোমালিন্যকে কেন্দ্র করে মামলা-মকদ্দমার ঝামেলা থেকে রিসিভার নিয়োগ, দু'জন অংশীদারের সরে যাওয়া প্রভৃতি বিড়ম্বনার ভিতর দিয়ে কয়েকটা বছর কাটানোর মাঝে. সারকারিনায় শুরু হয়ে যায় ভাড়া-নেওয়া দলের প্রযোজনা-পর্ব। সেই পর্বে 'সম্রাট ও সুন্দরী' সহস্র রজনী অতিক্রম করে সারকারিনার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলে। তারপর থেকে গত শতাব্দীর শেষ দশকের শুরু পর্যন্ত সারকারিনাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। যেসব প্রযোজক এসেছেন, তাঁরাই সার্থকভাবে এই নতুন বিশিষ্টতাপূর্ণ মঞ্চায়নের ধারাটিকে খুবই সহজে আত্মস্থ করে, নাটক ধরিয়ে দিতে পেরেছেন এই রঙ্গালয়ে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিকগুলি

সারকারিনা শুধুমাত্র একটি 'এরিনা' নয় — অর্থাৎ যেখানে রঙ্গস্থলকে ঘিরে চারপাশে বসা দর্শকেরা অনুষ্ঠান দেখেন — এর মঞ্চের পাটাতনটি একটি বড়সড়ো শক্তিশালী হাইড্রলিক জ্যাকের ওপর বসানো, যা দৃশ্য বদলের সময় দশ ফুট নিচে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এই দৃশ্য নেমে যাওয়ার পরে পরেই যে অভিনয় থেমে যায়, তা কিন্তু সব ক্ষেত্রে হয় না। সেই সময়ে অভিনয় চলতে পারে পাটাতনটিকে ঘিরে থাকা পাঁচ ফুট প্রশস্ত একটি বৃত্তাকার সিমেন্ট-বাঁধানো অলিন্দে — যেটিকে প্রসেনিয়াম স্টেজের এপ্রনের সঙ্গে তুলনীয় বলে ধরা যেতে পারে।

দৃশ্য অনেক সময় শুরু হয় [অথবা শেষও হতে পারে] দর্শক আসনের মাঝখান দিয়ে নেমে আসা সিঁড়ির ধাপগুলিতে [কতকটা কাবুকি থিয়েটারের হানামিচির স্টাইলে ওইখান দিয়ে শিল্পীরা নেমে আসেন, অথবা উঠে বেরিয়ে যান। এলিভেটরে নেমে যাওয়া দৃশ্যসজ্জা পরিবর্তিত হয়ে আবার উঠে এসে মিলে যায় ওই এপ্রনের সঙ্গে; অভিনয়রত শিল্পীরা তখন চলে আসেন পাটাতনের নতুন পরিমণ্ডলে।]

এই প্রথায় বিশেষভাবে লেখা নাটক এগিয়ে চলে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে — প্রায় চলচ্চিত্রায়িত নাটকের গতিতে। অনেক ক্ষেত্রে পাটাতনটিকে এপ্রনের তুলনায় কিছুটা নীচে বা খানিকটা ওপরে রেখে, দুটি ভিন্ন তলে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সমকালীন ঘটনা একই সঙ্গে দেখানো যায়।

অভিনয়শৈলীতেও কিছুটা বিশিষ্টতা দরকার এই জাতীয় কেন্দ্রায়ত (Theatre-in-the round) অভিনয় ধারায়।

এখানে প্রসেনিয়ামে সুপরিচিত দর্শকমুখী থাকার বাধ্যবাধকতা রাখা হয় না; বরং দর্শকের উপস্থিতি উপেক্ষা করে ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে ঘটতে দেওয়া হয় যার জন্য দরকার সর্বমুখী উপস্থাপনা। তবে পরিবেশন ধারায় পূর্বযুগীয় যাত্রার অনুকরণে স্থান বদল না ঘটিয়ে, যুক্তিপূর্ণ দিকবদলের মধ্যে বেঁধে রাখা হয় কোরিওগ্রাফি।

গোলাকার মঞ্চে এই কোরিওগ্রাফি মনে রাখা প্রথম প্রথম বেশ কষ্টসাধ্য মনে হয়। দিক ভুল হয়ে যায় শিল্পীদের। তাঁদের শেখানো হয়, ব্যবহৃত আসবাবগুলির সঙ্গো অবস্থানগত সম্পর্ক মনে রাখার বিষয়টি। এবং বেশিক্ষণ একমুখী অভিনয় না চালিয়ে, ঘটনার সঙ্গো যুক্তিপূর্ণ সঙ্গাতি রেখে নিজেদের দিকবদল করার ব্যাপারটি বেঁধে দেওয়া হয় মহলার সময়।

বলাবাহুল্য, এরিনা মঞ্চে প্রম্পটারের স্থান নেই। প্রত্যেক শিল্পী পূর্ণভাবে নিজের নিজের ভূমিকা মুখস্থ করে, তবেই এ মঞ্চে অভিনয়ে নামতে পারেন।

এমন অনেক দৃশ্য বা ঘটনা নাটকের প্রয়োজনে আসতে বাধ্য, যেখানে শিল্পী তাঁর দিকবদল করতে পারবেন না (যেমন ধরা যেতে পারে, রোগশয্যায় শায়িত রোগী, আহত বা মুমূর্ষু ব্যক্তি, অথবা অতিবৃদ্ধ চরিত্র ইত্যাদি) — এসব ক্ষেত্রে এই মঞ্চের পাটাতনটি আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করে রিভলবিং স্টেজের মতো। সুপরিকল্পিতভাবে প্রক্ষেপিত আলোর সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় যেন তাঁরা দৃশ্যটির চারপাশে ঘুরে চলেছেন [কতকটা চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় ক্যামেরা ট্রাক করে দৃশ্য গ্রহণের অনুকরণ বলা যেতে পারে]। এই ধরনের প্রয়োগ একমাত্র সারকারিনাতেই দেখানো সম্ভবপর।

বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গো আর একটি দিক হল, পৃথিবীর অন্যান্য নামকরা এরিনা মঞ্চগুলি বেশিরভাগই চতুষ্কোণ [ব্যতিক্রম 'পেন্টহাউস থিয়েটার' — যার দর্শক আসন সংখ্যা ন্যূনাধিক তিনশ মাত্র]। এই ধরনের চতুষ্কোণ এরিনায় একই সারির মধ্যবর্তী আসনে বসা দর্শকবৃন্দ ঘটনাস্থলের কাছে বসার সুযোগ পান; প্রান্তবর্তীরা তুলনামূলকভাবে দূরে বসেন। কিন্তু বৃত্তাকার এরিনায় প্রত্যেক সারির সব দর্শকই সমান সুবিধা ভোগ করেন।

বৃত্তাকারে বসানোর ফলে স্বল্পপরিসর স্থানে বহু দর্শকের সমাবেশ ঘটানো যায়। সারকারিনায় দর্শকাসনের সারি সংখ্যা পূর্ব ও পশ্চিমে আটটি, উত্তরে এগারো এবং দক্ষিণে বারোটি মাত্র। রঙ্গাস্থল গোলাকৃতি হলেও প্রেক্ষাস্থল ডিম্বাকৃতি। সারির সংখ্যাই বলে দিচ্ছে, প্রেক্ষার পশ্চাৎবর্তী প্রাচীর মাত্র কুড়ি থেকে ত্রিশ ফুট দূরে আছে। ফলে শেষতম সারির দর্শকও অভিনয়ের শিল্পীদের প্রসেনিয়ামযুক্ত রঙ্গালয়ের তুলনায় অনেক কাছে থেকে দেখতে পান। অথচ আসন সংখ্যার দিক থেকে সারকারিনা কলকাতার পেশাদারি মঞ্চগুলির মধ্যে বৃহত্তম — যার মোট আসন সংখ্যা ৯৯৮।

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য

নাট্য-উপস্থাপনার প্রযুক্তিগত দিকের তিনটি বিশেষ বিষয় হল তার দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত এবং ধ্বনি প্রক্ষেপণ। এই বিশেষ তিনটি দিকেই সারকারিনার মতো কেন্দ্রায়ত অভিনয় ব্যবস্থা কিছু বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

এই ধরনের মঞ্চে দর্শকের দৃষ্টিরেখায় (sightline) বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনও আসবাব বা দৃশ্যপট ব্যবহার করা হয় না। ফলে, পূর্ণাকৃতি দেয়ালের ব্যবহার এখানে অচল। এমনকি প্রমাণ আকারের ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, গাছপালাও ব্যবহার করা যাবে না। যতটা সম্ভব ইঙ্গিতধর্মী দৃশ্যসজ্জা দিয়ে পটভূমি বোঝাতে হয়। এই দৃশ্যানুষঙ্গাগুলি যেমন পাটাতনের ওপর সাজানো হয়, তেমনই আবার পাটাতনের বাইরেকার এপ্রনেও (সারকারিনায় বলা হয় 'রিং') রাখা যেতে পারে। তবে যে দৃশ্যে ওই ধরনের উভয় স্থানে দৃশ্যানুষঙ্গা ভাগ করে রাখা হয়, সে দৃশ্যকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় দেখানো উচিত নয়।

দৃশ্য পরিবর্তন করা হয় অন্ধকারে, এবং পাটাতন নিচে নামানোর পর। পাটাতন নামানোর জন্য আলোর সংকেত দেওয়া হয় আলোকসম্পাতের কক্ষ থেকে, যেটি দর্শকদের পিছনে বিশেষভাবে তৈরি করা কাচের জানালযুক্ত ঘরে স্থাপিত আছে। আলোকসম্পাদনকারী তাঁর সংকেতলিপি অনুসারে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বোতাম টিপে সিগন্যাল দেন

এলিভেটর চালকের উদ্দেশে — কিন্তু সেই সঙ্গো তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নেন, কোনও শিল্পী পাটাতন এবং রিংয়ের সংযোগ স্থলে আছেন কি না। ওদিকে ওই সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত এলিভেটরের চালক অবশ্যই পাটাতন নামাবেন না।

আলো এই ধরনের এরিনায় প্রসেনিয়ামের তুলনায় উঁচু কোণ থেকে ফেলা হয় — এবং আলোর রশ্মিকে এমনভাবে সংহত রাখা হয়, যেন তা দর্শকের চোখে না পড়ে। উঁচু কোণ থেকে পতিত হওয়ার ফলে, পাটাতনে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি পূর্তির (Filling in) কাজ করে — থুতনির নিম্নাংশ বা চোখের কোণগুলিকে কালচে হতে দেয় না। রিংয়ে অভিনয় চালানোর সময় শিল্পীরা প্রবেশ পথগুলির (vomitaries) সামনে এসে থেমে অভিনয় করার বিষয়ে সচেতন থাকেন। দর্শকদের সামনে তাঁরা সচল থাকেন, বড় একটা দাঁড়ান না — কেননা, ওই সব অঞ্চলে তাঁরা মুখে আলো পাবেন না।

ধ্বনি ক্ষেপণের জন্য সরকারিনায় আছে স্টিরিও সিস্টেম — বিশেষ দিক থেকে প্রয়োজন অনুসারে ধ্বনি ক্ষেপণে বিশেষ ব্যবস্থা। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে মঞ্চের সিলিংয়ে নিচু মুখ করে বসানো স্পিকার থেকেই আবহসংগীত পরিবেশিত হয়। ওই ধ্বনি-তরঙ্গা সরাসরি পাটাতনে আঘাত পেয়ে, সেখান থেকে চারিদিকে দর্শক আসনের ঢাল বরাবর প্রতিফলিত হয় — মনে হয়, ধ্বনির সূত্রটি ওই পাটাতনের মধ্যেই বসানো আছে।

একটি পৃথক ধ্বনিক্ষেপণ ব্যবস্থা আছে সাবকারিনায়, যার মাধ্যমে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাজঘর, আলোকসম্পাত কক্ষ এবং এলিভেটর নিয়ন্ত্রণের জায়গায় বেতারে প্রচারিত শ্রাব্য নাটকের মতো বেজে চলে — এর ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পী এবং কর্মীরা প্রতিটি মুহূর্তে অনুষ্ঠানের সঙ্গো সংযোগ বজায় রাখতে সক্ষম হন।

বলাবাহুল্য, দৃশ্য বদলের সময় পাটাতনের নিম্ন অঞ্চল [Basement] পূর্ণ অন্ধকার রাখা হয়। দৃশ্য পরিবর্তকেরা মহলায় অভ্যস্থ হয়ে নেন এই কাজে। অংশগ্রহণকারীরাও অনুরূপভাবে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন অনালোকিত বা স্বল্পালোকিত নেপথ্যে নিজেদের প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যাপারে।

সাজঘর থেকে দু'দিকে বেরিয়ে শিল্পীরা ওপরের পথে চারটি ভমিটারি এবং দুটি সিঁড়ি পথ ব্যবহার করেন মঞ্চে প্রবেশের জন্য — তেমনই বেসমেন্টেও নেমে যেতে পারেন পাটাতনে চেপে রঙ্গাস্থলে উঠে যাওয়ার জন্য। প্রসেনিয়ামের তুলনায় এই বিষয়টি কিছুটা জটিল — তবে দর্শকদের দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট চমকপ্রদ।

স্মরণীয় কয়েকটি ভিন্ন দলের অভিনয়

আগেই বলেছি, সারকারিনার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিনয়শৈলী অচিরেই আয়ত্ত করে নেন বেশ কয়েকজন প্রয়োগবিদ — যাঁদের নিপুণ হাতে অনেকগুলি ভাড়াটিয়া সংস্থা এই রঙ্গালয়ে সাফল্যের স্মৃতি রেখে গেছেন। তাঁদের প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে 'সম্রাট ও সুন্দরী' [সহস্র রজনী অভিনীত], 'রঙ্গিনী', 'তুঙ্গো বৃহস্পতি', 'সুখী গৃহকোণ', 'কনে বিভ্রাট', 'পান্না হীরে চুণী', 'সাবাস পেটো পাঁচু', 'রক্তাক্ত আদালত', 'সাহেব' প্রভৃতির নাম প্রশংসার সঙ্গো উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব নাটকের পরিচালক সমর মুখার্জী, সুভাষ বসু, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, শোভনলাল মুখার্জী, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখার্জী প্রমুখ যে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গো এই অভিনব মঞ্চব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করে গেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখানে উল্লেখ রাখা যেতে পারে, এই নাটকগুলি চলার যুগে [অর্থাৎ, স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী'র যুগ থেকে সর্বশেষ ১৯৯৪/৯৫ সাল পর্যন্ত] পেশাদারি মঞ্চগুলি ছিল চিত্রতারকানির্ভর। প্রিয় চিত্রতারকাদের নিজের চোখের সামনে জীবন্ত চলাফেরা করতে থাকা অবস্থায় দেখতে পাওয়ার লোভ টেনে আনত গ্রামবাংলার মানুষদের — যাঁরা অগ্রিম টিকিট কেটে ভরিয়ে রাখতেন এই শহরের পেশাদার রঙ্গালয়গুলি। গ্রামাঞ্চলের দর্শক আসার স্রোতে ভাটা পড়ল প্রথমত দিবারাত্রিব্যাপী কেবল্ টিভির রগরগে প্রমোদ অনুষ্ঠান চালু হওয়ায়। মানুষের অবসর বিনোদনের ভিন্নতর এবং উত্তেজক খোরাক জুটে গেল ঘরে ঘরে এই বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, যাত্রা এবং ওয়ান-ওয়াল জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে চিত্রতারকাদের গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ার ফলে — ঘরের পাশে পাঁচ-দশ টাকার টিকিট কেটেই সেই জীবন্ত চিত্রতারকা দেখার ক্ষুধা মিটে গেল গ্রাম-জনতার। চিত্রতারকারাও তাঁদের সম্মোহন হারিয়ে ফেললেন, তাঁদের দেখার জন্য

কেউ আর খরচপত্র করে শহরে ছুটে আসেন না। এর ওপরে আবার, যাত্রায় প্রভূত রোজগারের স্বাদ-পাওয়া তারাকারা নিজেদের মূল্য বাড়িয়ে দিলেন এমন তুঙ্গো, যা যোগাতে হলে, হাউসফুল পেয়েও প্রযোজক ঘরে অর্থ নিয়ে যেতে পারবেন না।

দেখতে দেখতে যেন মড়ক নেমে এল পেশাদার রঙ্গালয়ের জগতে। তারকাখচিত নাটক নামিয়েও কেউ কেউ সর্বস্ব খোয়ালেন, কেউ আত্মহননের পথ বেছে নিলেন। ইতিহাসই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, বিগত কয়েক দশক ধরে বেশিরভাগ পেশাদারি রঙ্গালয়ের মালিকানা এসে গিয়েছিল ব্যবসারদের হাতে — লাভের ঘরে টান পড়তেই তাঁরা সরে পড়লেন একে একে। রঙ্গালয়গুলির দরজা বন্ধ হতে শুরু হল দ্রুতগতিতে। আমাদের মতো গুটিকয় স্বপ্ন-দেখা উন্মাদ, সর্বস্ব পণ করে, আর কতদিন এই রঙ্গালয়ের পুনরুত্থানের আশায় বুক বেঁধে লড়াই চালাতে পারবে, তা ভবিষ্যত বলতে পারে।

সারকারিনার নিজস্ব প্রযোজনার খতিয়ান

সারকারিনা অবশ্য তার নিজস্ব প্রযোজনা শুরু করেছিল পেশাদারী নাট্যজগতের স্বর্ণযুগে — তারকামণ্ডিত কুশীলব তালিকা নিয়ে। 'তুষার যুগ আসছে', 'ছায়ানট', 'হ্যামলেট', 'কাচের পুতুল' প্রভৃতি প্রযোজনাগুলি মূলত ছিল তারকানির্ভর। সবিতাব্রত দত্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, শমিতা বিশ্বাস, সুলতা চৌধুরী, মিন্টু চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, বাসবী নন্দী, নন্দিনী মালিয়া, অনিল চ্যাটার্জী, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, শেখর চ্যাটার্জী প্রমুখ খ্যাতনামাদের সঙ্গে আরও অনেক নামী শিল্পী ওইসব নাটকে মনমাতানো অভিনয় করে প্রযোজনাগুলিকে সাফল্য এনে দিয়েছিলেন।

তবে সারকারিনা ৯৪ সালের পর থেকেই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে নামে। সে পদক্ষেপ, চিত্রতারকা বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুনদের নিয়ে পেশাদারি রঙ্গালয়কে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা। পর পর নামে ব্যঙ্গধর্মী নাটক 'করিতকর্মা', বিজ্ঞানভিত্তিক 'মমি', প্রমোদধর্মী অপরাধ কাহিনী 'হ্যালো চুমকি', রূপকথাভিত্তিক কল্পবিজ্ঞান 'উল্কা', নিছক নিরাবিল হাসির খোরাক 'গুলবাজ', ক্রাইম ড্রামা 'বদলা', সামাজিক গৃহস্থালির গল্প 'গৃহলক্ষ্মী', শেক্সপীয়র অনুপ্রাণিত 'ভুলভুলৈয়া' (Twelfth Night), রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী 'রহস্যপুরী' ও সাম্প্রতিক হাসিকান্নার রোমাঞ্চ নাটক 'হীরাপান্না'।

সারকারিনার উপযোগী করে লেখা আমার এই নাটকগুলির প্রধান সম্বল এর প্রয়োগ নৈপুণ্য। অবশ্যই নতুন মুখের মিছিলে অসংখ্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত ঝিলিক মারছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পেশাদারি মঞ্চের দর্শককে চিত্রতারকাবিহীন প্রযোজনার দিকে টেনে আনতে যথেষ্ট সময় লেগে যাচ্ছে। অন্যদিকে সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন মুখদেরও বেশিদিন ধরে রাখা যাচ্ছে না মঞ্চের গণ্ডীতে। মেগা সিরিয়ালগুলির টোপ সহজেই গিলে তাঁরা সরে যাচ্ছেন উন্নততর ভাগ্যনির্মাণের আশায়। যাঁরা দু'কূল বজায় রাখতে চান, তাঁরাও শুটিংয়ের তাগিদে যখন তখন কামাই করে বিপদে ফেলছেন আমাদের। পেশাদারি রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এই শেষ লড়াইয়ে বলতে গেলে সারকারিনা আজ 'একা কুম্ভ'।

২০০৩-০৪ সাল থেকে সারকারিনার প্রযোজনা ক্ষীয়মান হয়ে পড়ে। তীব্র অর্থকষ্টে ভুগতে থাকে। নিয়মিত অভিনয়ে শৈথিল্য দেখা দেয়। সারকারিনার শেষ প্রযোজনা 'গুলবাগ', ২০০৮ সালের নভেম্বরে। সারকারিনাকে বাঁচানোর জন্য সরকারেব কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ এবং বেশ কিছু নাট্যকর্মী। পরিস্থিতি একই থেকেছে। সারকারিনা বাঁচেনি। প্রোমোটোররা চেষ্টা চালাচ্ছে সারকারিনা দখলের জন্য। অমর ঘোষ মঞ্চ বাঁচানোর লড়াই চালাচ্ছেন।

॥ তৃতীয় পর্ব॥

অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

প্রযোজকরা যখন পরিচালক হলেন

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৯ সালে পানিহাটিতে আমার জন্ম। আমার বাল্যকালের অনেকটা সময় কেটেছিল সিমলায়। বাবা ১৯২৪ সালে কাজ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে বাড়ি কেনেন। ১৯ ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রিট। প্রথমে ক্যালকাটা আকাডেমিতে পড়া শুরু করি, পরে এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই। যতদূর মনে পড়ছে ১৯২৭ সালে। আই. এস. সি.-তে ভর্তি হয়েছিলাম বঙ্গবাসী কলেজে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে ওঠা হয়নি।

তিন বছর স্টেনোগ্রাফি শিখলাম মন দিয়ে, ১৯৩২ সালে ইন্দো-বার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানিতে যোগ দিলাম। ১৯৩৬ সালে হিজ মাস্টার্স ভয়েসে স্টেনো-টাইপিস্ট হিসাবে কাজে যোগ দিই। এই কাজের জায়গায় তখন প্রমোদ সংস্থা বলতে শুধু খেলার ব্যবস্থা ছিল, সাংস্কৃতিক কোনও উদ্যোগ ছিল না। আমারই উদ্যোগে এখানে নাটকের চর্চা শুরু হয়ে গেল। এখনও বেশ মনে আছে, প্রথম নাটক হয়েছিল রঙমহলে প্রতাপাদিত্য। এরপরে ক্রমে ক্রমে কর্ণার্জুন, সিরাজদৌল্লা, চরিত্রহীন, দেবদাস, সব নাম মনে পড়ছে না, সুনামের সঙ্গে প্রচুর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। হিজ মাস্টার্স ভয়েস সূত্রে কে. সি. দে অ্যান্ড সন্সের ম্যানেজার সুবীর গুহের সঙ্গে একদিন আলাপ হল।কথা হল, 'আলেয়া' ছবিতে আমি হব নায়ক। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম, সে ছবিতে আমার আর নায়ক হওয়া হল না। ওই ছবিতে নায়ক হল প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিকে আমাকে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এই অবস্থা দেখে সুবীরবাবু আমাকে পাইওনিয়র রেকর্ড কোম্পানিতে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। আজকের আকাশবাণী কলকাতা তখন ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং, গার্স্টিন প্লেসে অফিস। প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায় তখন ওখানে উঁচু পদে কাজ করেন। বেতারের নাটকে তখন অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করতেন। এইসময় একদিন এইচ এম ভি-তে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রেকর্ড করতে এসেছেন, কোনও এক অভিনেতা না আসায় আমার ডাক পড়ল। তখনকার মতো কাজ হয়ে গেলে বীরেন্দ্রবাবু আমাকে বললেন রেডিওতে অভিনয় করব কি না। তা করলাম। সে তো দেখতে দেখতে প্রায় তিনশ নাটকে অভিনয় করছি। সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় করেছি পরে। আমার জীবনে বেতারে, গ্রামোফোনে অভিনয়ের সুযোগ এসেছে আগে, তারপর চলচ্চিত্রে সবশেষে সাধারণ রঙ্গালয়ে।

১৯৪৬ সালে যোগ দিলাম একেবারে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাছে, তখন আমি চলচ্চিত্রের এক্সক্লুসিভ

আর্টিস্ট, প্রযোজক শিশিরবাবুর ব্যাপার বলেই মেনে নিলেন। শ্রীরঙ্গমে যোগ দিলাম। 'প্রফুল্ল' (সুরেশ), 'চন্দ্রগুপ্ত' (চন্দ্রগুপ্ত), 'সীতা' (শম্বুক), 'রীতিমতো নাটক' (পূর্ববঙ্গজাত এক বাড়িওয়ালা), 'মাইকেল' (রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), 'আলমগীর' (রাজসিংহ), 'সরমা' (বিভীষণ), 'তাই তো' (কর্তা), 'বিপ্রদাস' (বন্দনার বাবা), 'দুঃখীর ইমান' (ধর্মদাস) প্রভৃতি নাটকে নাট্যাচার্যের পরিচালনায় অভিনয় করে খ্যাতি পেলাম। নাট্যাচার্য বলেছিলেন, 'দোষ বলতে একটাও দোষ নেই, অ্যামেচারে যে গুরু পেয়েছ, এমনটা দেখিনি, জার্ক নেই।' আমার প্রথম অভিনয় শিক্ষক কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ওঁর বাড়ি ছিল তমলুকে, উনিই একটি অ্যামেচার ক্লাবে আমাকে নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে নেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ওখানে ছবি বিশ্বাস আসতেন। ছবি বিশ্বাস একদিন বললেন, অনেক তো শিখেছ, এবার পয়সা কড়ি তো দরকার, সংসার চালাতে হবে তো। তখন 'কেদার রায়' চলছে মিনার্ভায়। ছবিদা বললেন, 'ইয়াং রোল তুই, আমি ওল্ড রোল করব। তাই হল, মিনার্ভায় চলল একের পর এক নাটক। 'চাঁদ সওদাগর', 'সাজাহান', 'গৈরিক পতাকা', 'প্রতাপাদিত্য', 'বঙ্গে বর্গী', 'ঝিন্দের বন্দী', 'ঝাঁসির রাণী', 'ভোলা মাস্টার', 'চন্দ্রশেখর', 'কিন্নরী', 'চরিত্রহীন', ইত্যাদি। ফাঁকে ফাঁকে আরও অনেক মঞ্চেই আমাকে যেতে হয়েছিল। রঙমহলে 'মহানিশা', 'বাংলার মেয়ে', 'শ্যামলীর স্বপ্ন', 'উল্কা', 'স্বীকারোক্তি' করেছি, অনেক পরে এখানেই করেছি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'নীলকণ্ঠ'। স্টার রঙ্গমঞ্চে দুটি পর্যায়ে অভিনয় করেছি। প্রথম পর্যায়ে মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় 'পৃথ্বীরাজ', 'টিপু সুলতান', 'বালাজী রাও', 'শকুন্তলা', 'হায়দার আলি', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'দেবলা দেবী'। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি অভিনয় করেছি দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায়। এরপরে স্টারের ভার নিলেন রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া। কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে মনে হল শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, স্টার ত্যাগ করলাম। সঙ্গে অনুপকুমার, সুখেন দাস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন।

হ্যাঁ, আদ্যোপান্ত আমি একজন পেশাদার শিল্পী, চল্লিশ বছরেরও বেশি সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সুখে-দুখে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলাম, তাই শতাব্দীর প্রাচীন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের এই হাল দেখে দুঃখিত বইকি! বহু সময়েই চুপ করে থাকি, তবু মনের মধ্যে বহু উথালপাতাল, বুকের মধ্যে বহু আলোছায়ার খেলা। প্রধানত আমার তো মনে হয় এর জন্য দায়ী টিভির দৌরাত্ম্য। গাড়িভাড়া দিয়ে, টিকিট কেটে, বাইরে টিফিন বা রাতের খাওয়া খেয়ে যে খরচা হয় তা আর বহু মানুষ করতে চাইছেন না। তার থেকে ঘরে বসেই চা-খাবার খেতে খেতেই টিভি-টা দেখা যায়। নাটক দেখার স্বাদ ঘোলে মেটান। একে তো সাধারণ রঙ্গালয়গুলি একের পর এক বন্ধ হচ্ছে, ওদিকে গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনাও সাধারণ রঙ্গালয়ের জায়গা নিতে পারল না। সাধারণ রঙ্গালয়ে আগে যে ধরনের অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন সেই স্থান পূরণ হল না। কোথায় সেই কণ্ঠমাধুর্য। নাটক নেই, নাটকে যে সাহিত্য অংশ, ছন্দ, অলঙ্কার, সংলাপের মাধুর্য, যা মানুষকে আকর্ষণ করত, সব শেষ। তেমন নাট্যকার নেই। যেদিন থেকে প্রযোজকরাই পরিচালক হতে থাকলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের দিন শেষ হতে শুরু করল সেদিন থেকেই। স্টারের সলিলকুমার মিত্রই আমার মতে বাংলা রঙ্গমঞ্চের শেষ প্রযোজক। এরপরে যাঁরা এসেছেন তাঁরা কনট্রাক্টর, ব্যবসায়ী। শিল্পীদের সঙ্গে তাঁরা কুলি-মজুরের মতো ব্যবহার করতে থাকলেন। একে পেশাদারিত্ব বলে না। পেশাদার আবহাওয়াটাই একেবারে চলে গেল। সাধারণ রঙ্গালয় বা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ বলতে যাকে বোঝাতো তা শেষ বলেই মনে হচ্ছে। দু'শ বছরের কিছু বেশি একটা অভিনয়ধারা শেষ। তবু বলব স্টেজ-নাটকের মতো অভিনয় নেই। লাইফ এগেইনস্ট লাইফ। তিনটি জিনিস আমি মেনে চলেছি। যদি মনে হয় এগুলো ভালো তবে কনিষ্ঠরা মেনে নিতে পারে, Discipline, Dedication and Determination। যদি ধরেই নেওয়া যায় সাধারণ রঙ্গালয় শেষ হল, অভিনয় শিল্পটা তো আর শেষ হবে না।

মুখোমুখি : সৌম্যেন্দু ঘোষ

অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

মালিকদের ফাটকা খেলা

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম কথা, প্রফেশনাল যে হয়েছিলাম সেটা কিন্তু শুধুই সিনেমার প্রফেশনাল বলে আমি নিজেকে মনে করি না। কেননা অভিনয়কার্যটা যে কোনও জায়গাতেই অভিনয়, সেটা থিয়েটার, সিনেমায়, এখন পরবর্তীকালে যে টি.ভি. ক্যামেরা এসেছে, এর আলাদা ভাগ করা যায় বলে আমি মনে করি না। এটা হতে পারে যে কেউ তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্রের সীমা টেনে দিতে পারেন — শুধু থিয়েটার নিয়ে কনসেনট্রেট করতে পারেন, কেউ সিনেমায়, শুধু সিনেমায়, কেউ দূরদর্শনে, বা কারোর নিজের ক্ষমতাতেই কেউ চিহ্নিত হয়ে যান। তাঁরা একটা বিশেষ মাধ্যমে ভালো, অন্য মাধ্যমে সেরকম সুবিধের নন, এরকমও হতে পারে। কিন্তু আমি — যাদের ছোটবেলা থেকে ভালো লেগেছে বিশেষ করে বিদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রী, তাদের অনেকেই তো যে কোনও সময়ে যে কোনও মাধ্যমে চলাফেরা করে। আমি অবশ্য শিশিরবাবুকে দেখে নিঃসন্দেহে প্রফেশনাল হওয়ার কথা প্রথম ভেবেছিলাম। তিনি তো থিয়েটারেরই লোক। এতদসত্ত্বেও যখন সত্যজিৎ রায়ের মতো লোক আমাকে সিনেমায় সুযোগ দিলেন বা ডাকলেন তখন আমার কাছে ওটা কোনও বাধাই হয়নি যে আমি থিয়েটারই করব।

আবার, পেশাদার থিয়েটার কেন বেছে নিয়েছিলাম — তার কারণ হল, আমি ছোটবেলা থেকে যাঁদের থিয়েটার দেখব বলে স্থির করেছিলাম বা যাঁদের দেখে শিখেছিলাম বা এই থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তাঁরা সবাই ছিলেন পেশাদার। অপেশাদার কোনও শিল্পীই আমার কাছে প্রেরণার স্থল ছিলেন না। শিশির ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এঁদের তো থিয়েটারে দেখেছি। তারপরে আরও অনেকে, যেমন ছবি বিশ্বাস, এঁরা সবাই পেশাদার শিল্পী হিসাবেই আমাকে আকর্ষণ করতেন। এমনকি আমার পেশাদার থিয়েটারে কাজ শুরু করার আগে, তার মধ্যেই যাঁরা ভালো থিয়েটার করতেন তাঁরাও আকৃষ্ট করেছেন। এরকম বহু লোকই পেশাদার থিয়েটারে ভালো কাজ করেছেন। যেমন উৎপল দত্ত। মিনার্ভা থিয়েটারেই তাঁর সব থেকে ভালো কাজগুলো আমরা দেখেছি। শম্ভু মিত্রও তো পেশাদার থিয়েটার থেকে এসেছিলেন, পরে পেশাদার থিয়েটারে তিনি না থেকে বিকল্পধারার নাট্যানুষ্ঠানে চলে গিয়েছিলেন। একসময় তিনি 'রক্তকরবী' নিয়ে পেশাদার থিয়েটারে করার চেষ্টা করেছিলেন, সেই চেষ্টা মোটেই সফল হয়নি। আসলে আমি নিজেকে প্রথম থেকেই আদ্যোপান্ত পেশাদার হিসাবে তৈরির চেষ্টা করেছি এবং সেইজন্যই পেশাদার থিয়েটার বেছে নিয়েছি। তাছাড়া আমাদের বাংলা থিয়েটারে পেশাদার থিয়েটারের একটা বড় ট্র্যাডিশন রয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে এই

থিয়েটারের ঐতিহ্য আর তেমনভাবে রাখা সম্ভব হয়নি, কেননা ভালো নাটক সেখানে প্রযোজিত হচ্ছিল না — হয়তো এই কারণেও আমি পেশাদার থিয়েটারকে বেছে নিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, তখনও পর্যন্ত গরিষ্ঠ দর্শক পেশাদার থিয়েটারেই নাটক দেখতে আসতেন। বেশি সংখ্যক দর্শককে নিয়ে না এগোলে থিয়েটার কখনও এগোতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। তাই উৎপল দত্ত, অজিতেশরা যেভাবে পেশাদার থিয়েটারে কাজ করেছিলেন, আমি সেরকম কাজের ভাবনা মাথায় নিয়েই পেশাদার থিয়েটারকে বেছে নিয়েছিলাম।

আমি যখন পাকাপাকিভাবে থিয়েটার শুরু করলাম, তখন এই থিয়েটারের চেহারাটা, কী বলব, বেশ খারাপ হয়েছে। তখনও স্টার থিয়েটার আছে বটে, কিন্তু আগের মতো নয়। আমি যখন ১৯৬৩ সালে স্টারে জয়েন করি তখন যেটার জন্য স্টার থিয়েটারের কদর, ততটাই বেশি ছিল। অর্থাৎ, একটা খুব দক্ষ ম্যানেজমেন্ট ছিল। হলের মালিকানা একটা খুব ভালো থিয়েটারপ্রেমী মানুষের হাতে ছিল। আর অনেকদিক থেকেই স্টারের একটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল। অর্থাৎ ভালো প্রফেশনাল কম্পিটেন্স ছিল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে। এবং একটা রুচিরও প্রশ্ন ছিল। সাধারণত খুব উঁচু দরের নাটক সবসময় হত না বটে, কিন্তু আবার ভয়ঙ্কর নিম্নরুচির নাটকও সেখানে কোনওদিন হয়নি। একটা মোটামুটি সুরুচিসম্পন্ন উপন্যাস থেকে নাট্যকৃত কোনও বিষয়বস্তুই সেখানে ছিল উপজীব্য — সলিল মিত্র ছিলেন প্রযোজক। আমি ১৯৬৩ সালে যে স্টারে গিয়েছিলাম, তা কিন্তু মাত্র এক বছরের জন্য। পরে ১৯৭৮ সালে যখন নিজেই থিয়েটার শুরু করলাম, তখন কিন্তু সলিলবাবু স্টার থিয়েটারে নেই। আর আমি যেখানে থিয়েটার শুরু করেছিলাম সেই কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের প্রযোজক ছিলেন হরিদাস সান্যাল মহাশয়, যিনি সত্যিকারের থিয়েটারপ্রেমী ছিলেন। তিনি থিয়েটার ভালোবাসতেন। এবং আমার সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়েছিল যে তিনি থিয়েটারের প্রযোজনার ব্যাপারে কোনওরকম নাক গলাবেন না, আর তাঁর ব্যবসার দিক থেকে তিনি কীভাবে ব্যবসাটা চালাবেন সেখানে আমি কোনও হস্তক্ষেপ করব না। তাই তিনি আমাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। যেমন খুশি কাস্ট করেছি, যেমন খুশি লোক নিয়েছি, যেমন করে খুশি প্রযোজনাটা করতে পেরেছি। তবে থিয়েটার করাটা তো একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ, যে কোনও দেশে যে কোনও সময় যে কোনওভাবেই করুন না কেন, সেই প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা থেকেই অনেক সময় টুকটাক পরিবর্তন করতে হয়। দেখা গেল, এমন একটা জিনিস আমি করতে চাইছি যেটা অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ। সেটা আমাদের থিয়েটার অ্যাফোর্ড করতে পারে না অনেকসময়। তবু বলব 'নামজীবন'-এর অসামান্য সেটের জন্য 'নামজীবন' বিখ্যাত হয়ে আছে। এত কস্টলি একটা সেট তৈরি করতে আমার প্রডিউসার তো কোনও বাধাই দেননি, বরং অবাধে আমাকে সে কাজটা করতে দিয়েছিলেন। এরপরেও আমি যেসব প্রযোজকের সঙ্গে কাজ করেছি তাঁদের সবাই যে আমাকে সুযোগ বা স্বাধীনতা দেননি তা নয়, কিন্তু এটা সত্যি, পরেব দিকে পেশাদার থিয়েটার যখন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছিল তখন প্রযোজকরা ভীষণ অনিশ্চয়তায় ভুগতে শুরু করলেন। অন্ততঃ চাহিদা সম্পর্কে তাঁরা একদমই পরিষ্কার ছিলেন না। ১৯৭৮ সালে 'নামজীবন' পেশাদার থিয়েটারে একটা নতুন হাওয়ার প্রবেশ ঘটিয়েছিল। আর তারপর একটার পর একটা, 'রাজকুমার', 'ফেরা', 'নীলকণ্ঠ' — কত নাটক করেছি। তবে সমগ্র থিয়েটারের পরিবর্তনের জন্য গুটিকতক ভালো প্রযোজনা বা একজন পরিচালকের কাজ যথেষ্ট নয়। সবচেয়ে বড় কথা, তেমন থিয়েটারপ্রেমী প্রযোজক তো আর পাওয়া গেল না। ফলে প্রবাদবাক্যটির মতো হল যে, 'একটি পাখিতেই গ্রীষ্ম সূচিত হয় না।' অথচ যাঁরা ভালো পরিচালক বলে খ্যাত ছিলেন তাঁরা কিন্তু থিয়েটারের দুরবস্থার সময় এগিয়ে আসেননি। যদি সকলে মিলে এগিয়ে আসা যেত তাহলে হয়তো পেশাদার থিয়েটারের সামগ্রিক পরিবর্তন দেখা দিত, আর থিয়েটারটাও বাঁচত।

এই যে পেশাদারি থিয়েটার একেবারে লুপ্ত হল, তার মূলে কী কী আছে তা বলা শক্ত। মানে, একটা কোনও কারণকে বলা যায় না। অনেকগুলো কারণ একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল। তার মধ্যে আমি প্রধান কারণ বলে নির্দিষ্ট করব যে, তিরিশ বছরের ওপর, এবং আরও আগের থেকেই সত্যিকারের ভালো থিয়েটার ওখানে হচ্ছিল না, যে কারণেই আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, ভালো থিয়েটার করার জন্য, একথা আগেই বলেছি। গরিষ্ঠ দেশবাসী থিয়েটার দেখতে আসেন, অথচ সেখানে খারাপ থিয়েটার হয়। তা খারাপ থিয়েটার আর কাঁহাতক লোকের ভালো লাগতে পারে — এটা একটা প্রধান

প্রশ্ন যদি মনে করা হয় যে, ওই থিয়েটারটা শুধুমাত্র খারাপ থিয়েটার করার জায়গা এবং যাঁরা ভালো থিয়েটার করতে পারেন, তাঁদের ভিতরে যদি জাতপাতের মতো একটা পৈতে ধারণের অভিমান থাকে যে তাঁরা পেশাদার থিয়েটারের বাইরের থিয়েটার করে নাম করবেন, তাহলে তাঁদের কাছ থেকেও তো এই থিয়েটার অবহেলিত হয়েছে ও হচ্ছে — এটা একটা কারণ। আবার সেখানে ভালো প্রতিভার প্রবেশ ঘটছে না। অর্থনৈতিক প্রতিকূলতায় থিয়েটারগুলোর সংস্কার হচ্ছিল না, সে কারণে থিয়েটারগুলো জীর্ণদশাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। এরপর, থিয়েটারের নতুন মালিকরা কেউ থিয়েটার করেন না। থিয়েটার করিয়েদের হাতে যদি থিয়েটারের মালিকানা না থাকে, তাহলে যে দশা হয়, এই থিয়েটারগুলোর সেই দশা ঘটতে লাগল। অথচ রঙ্গনা থিয়েটার — যার মালিক নিজে ছিলেন থিয়েটারের মানুষ, নিজেই থিয়েটারের প্রযোজক, তাই অনেকদিন ধরে টিকে ছিল, অন্য সব থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও। কিন্তু সেই গণেশবাবুই, গণেশ মুখোপাধ্যায়, তো এখন অসুস্থ। ফলে রঙ্গনাও বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। এছাড়া মালিকানার চরিত্র পাল্টাল। যাঁরা থিয়েটার ভালোবাসেন তাঁরা থিয়েটারের ব্যবসা করছেন না, তাঁরা থিয়েটারগুলোকে ভাড়া দিচ্ছেন অন্যের হাতে। এতে একটা প্র্যাকটিক্যাল বিপদ হচ্ছে এই যে, মালিক নিজে বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার একটা ভালো নাটক প্রযোজনা করে আর্থিক কিছু ক্ষতি হলেও অন্যদিন ভাড়া দিয়ে সেটা পুষিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু মালিক নিজে যদি থিয়েটার না করে অন্যলোককে ভাড়া দেন — তাঁকে তো ভাড়া দিচ্ছেন শুধু বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার — সে যদি সেখানে মার খায়, তাহলে তার আর ঘুরে দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না। ম্যানেজমেন্টের দিক থেকে অনেক গাফিলতি দেখা দিল। থিয়েটারের সম্বন্ধে যাঁদের এতটুকু ধারণা নেই, তাঁরা যেন এখানে ফাটকা খেলতে এলেন যে দেখাই যাক না কতটা ব্যবসা হয়। তাঁদের থিয়েটারের প্রতি কতটা ভালোবাসা আছে আমি জানি না। তাঁরা সব অ্যাড-হক বেসিসে কাজ শুরু করলেন। কর্মচারী সমস্যা, নিয়োগ সমস্যা, এমনকি শিল্পীদেরও এই অ্যাড-হক বেসিসে — সিনেমার নামকরা শিল্পীকে এমন টাকা দিয়ে আনলেন, যে টাকা দিলে মাসে সব শো হাউসফুল করেও টাকা ওঠে না। এগুলো হল ভুল ম্যানেজমেন্ট।

এইসবের শিকার হল বাংলা থিয়েটার। এবং এটা ফ্যাক্ট, যে সত্যিকারের আজকের দিনের একটা ওয়েল ম্যানেজড মর্ডার্ন বিজনেস হিসেবে থিয়েটারকে কেউ দেখতে চেষ্টা করলেন না।

মুখোমুখি : দেবাশিস রায়চৌধুরী
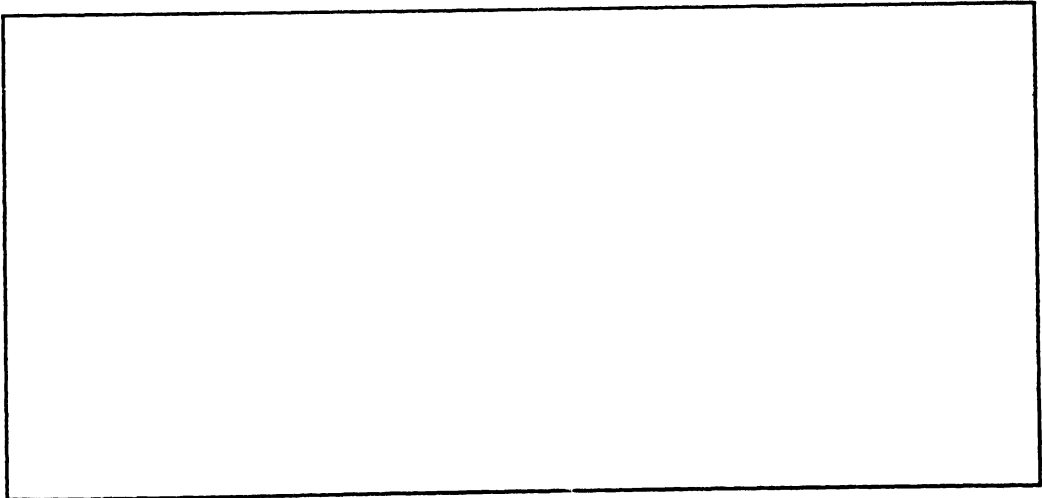
অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

শিক্ষিত প্রযোজক পরিচালক কই!

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

দেশে তখন নবনাট্য আন্দোলনের ঢেউ চলছে। দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা ইত্যাদির একটা প্রত্যক্ষ ছাপ জনজীবনে। নতুন করে সব কিছুর মূল্যায়ন হচ্ছে। এমন একটা মাহেন্দ্রক্ষণেই 'নতুন ইহুদী' নাটকের আবির্ভাব। অত বড় দাঙ্গার পর, হানাহানির পর সর্বস্ব খুইয়ে জীবন হাতে নিয়ে যে মানুষগুলি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বুকে ভাসতে সেদিন বাধ্য হয়েছিল, তাদের একটা ডকুমেন্ট বলা যায় এই নাটককে। নাটকটি যখন প্রথম মঞ্চস্থ হয় তখন থেকেই ভূমিকম্পের মতো একটা ত্রস্ত সাড়া এবং নাড়া পড়ে গিয়েছিল জনমানসে। সেদিক থেকে, অর্থাৎ রিয়ালিস্টিক আউটলুক, বা নাট্যআন্দোলনের দিক থেকে 'নতুন ইহুদী' প্রথিকৃৎ। এই অভিনয় থেকেই আমার, সত্য অর্থে, নাটক ও চলচ্চিত্র জগতে যাত্রা শুরু। এখানে বলে রাখি, 'নতুন ইহুদী' অভিনয় করে আমি কোনওদিন পয়সা পাইনি। পরের দিকে, সেই নাটক যখন কলকাতা মাতিয়ে তুলেছে, দিনের পর দিন হাউসফুল গেছে তখনও আমি একটিও পয়সা পাইনি। তবে এটা মুক্তকণ্ঠে বলব, 'নতুন ইহুদী' আমার ভবিষ্যতের ভিত তৈরি করে দিয়েছিল।

আমি তখন সিনেমায় ব্যস্ত শিল্পী। এইসময় একদিন সেকালের প্রখ্যাত অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য আমাকে ধরলেন দু-তিন নাইট রঙমহলে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকে অভিনয় করার জন্য। সমান্য দু'তিনটে শো, আমি রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু কী হল, নাটক স্টেজে নামতেই রীতিমতো জমে উঠল: আমার 'পদ্মঝি'-র খ্যাতি লোকের মুখে মুখে। সেই সময় বাংলা পেশাদারি মঞ্চে আক্ষরিক অর্থেই খরা চলছিল। ভালো নাটক নেই বলে দর্শক টানতে পারছিল না। সেই অবকাশে অনেক মালিক মঞ্চকে অন্য কাজে ব্যবহার করার কথাও ভাবছিল। রঙমহলেও সেই অবস্থা। হল বন্ধ হলেই সেখানে বহুতল বাড়ি গজিয়ে উঠবে। সেই সময় হল চালু রাখার জন্য বিভিন্ন দলের অভিনয় হচ্ছিল। আমরাও অভিনয় করে কর্মীদের ফান্ডে টাকা দিয়েছিলাম। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' লেগে যেতে আমি কলাকুশলীদের কথা ভেবে অগত্যা থেকেই গেলাম। স্টারে 'শ্যামলী'-ই আমার প্রথম পেশাদার নাটক। আড়াই ঘন্টা একটানা বোবা মেয়ের অভিনয়ের খ্যাতি শুনে লন্ডন স্টেজের নাট্য-বিশারদ স্যার উইলিয়ম ক্যাসেল এবং সিবিল থ্রনডাইক আমার অভিনয় দেখে সে সময়ের বিখ্যাত ছবি 'জনি বেলিন্ডা' (বোবা মেয়ে) ছবির নায়িকার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই 'শ্যামলী'-তে উত্তমদাও দারুণ অভিনয় করত। সত্যি বলতে কি, দু'জনের সম্মিলিত অভিনয়ের ফলেই আমার অভিনয় অমন প্রাণস্পর্শী দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছিল। অথচ মজা এই, ওই নাটকে অভিনয়ের জন্য আমি পারিশ্রমিক পেতাম পাঁচশ টাকা।

এবং অবিশ্বাস্য হলেও, উত্তমদা পেতেন তিনশ টাকা।

এরপর আমি পাবলিক স্টেজে কত নাটক করেছি। সঠিক হিসাব না থাকলেও 'পরিণীতা', 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত', 'অতএব', 'কথা কও', 'ঘর', 'উত্তরণ', 'মল্লিকা', 'পরস্ত্রী', 'অমরকণ্টক', 'কাচের পুতুল', 'সেই রাত', সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'রাজকুমার', 'ইন্দ্রাণী'। কলকাতার প্রায় সব মঞ্চেই অভিনয় করেছি। এই তো সেদিন রঙ্গনায় করেছি 'বাদশাহী চাল' আর 'বিয়ের সানাই'।

বহু নাটক, বহু অভিজ্ঞতা। বাংলা রঙ্গমঞ্চ আমাকে আজও টানে। ভালো নাটকে অভিনয় করতে ইচ্ছে করে আজও। হায়, আর সে সুযোগ কোনওদিনও আসবে কি না তা বলতে পারি না। থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার হিড়িক বা থিয়েটারকে বন্ধ করে তা অন্য কাজে লাগানোর প্রবণতা তো আজ আর নতুন নয়। আমি তো নিজে দেখেছি একসময়, রঙমহলের মালিক হল বন্ধ করে দিতে জহরদা, সরযূদি প্রমুখ শিল্পী হলের কর্মীদের সঙ্গে একত্রে অনশন করেছেন, হলের সামনে ধরনা দিয়েছেন। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন — হল ভাঙা চলবে না। আর অভিনয়ও করতে দিতে হবে। সেদিন শিল্পী, কর্মী, কলাকুশলীরা হল চালিয়েছিলেন। সে সময় যাঁরা থিয়েটার দেখতেই ভালোবাসতেন, তাঁদের সিনেমায় অত আগ্রহ ছিল না। আর বেশিরভাগ দর্শকই ছিলেন মফস্বলের, শুধু কলকাতার লোক দিয়ে থিয়েটার চলে না। মহিলাবা বেশি সংখ্যায় যে নাটক দেখতে আসেন সে নাটকই চলে বেশি — এ তো আমার নিজের অভিজ্ঞতা। এখন পথে-ঘাটে অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক। বাইরে থেকে কলকাতায় এসে নাটক দেখে নিরাপদে ফিরে যাওয়া, তাও আবার রাত্তিরে — অনেকটাই অনিশ্চয়তা। যেটা আগে ছিল, একসঙ্গে তিরিশ-বত্রিশজন, কেউ বাস ভাড়া করে বা ট্রেনে নাটক দেখতে আসতেন। দুপুরে হলের সামনেই ভিড় করে বসে সঙ্গের চিঁড়ে-মুড়ি খেয়ে জমিয়ে নাটক দেখে বাড়ি ফেরা — এ দিন তো শেষ। এখন সে শিক্ষিত প্রযোজক, পরিচালক কই — হরিদাস সান্যাল, শিশির মল্লিক, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সলিল মিত্র প্রমুখ। আজও কি তাঁদের কথা ভুলতে পারব? এখনকার শিল্পীদের শেখার কিছু নেই, এটা মনে করেই তারা আসে। আমাদেব কিন্তু এখনও মনে হয় অনেক শেখার আছে।

ক'দিন ধরে স্টার থিয়েটার নিয়ে খুব মাতামাতি হচ্ছিল। যা হোক মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছিলাম, হয়তো আবার ফিরে আসবে সেই দিন। কিন্তু, হায় রে! এবার রঙমহল থিয়েটারও পুড়ল। ব্যস, হয়ে গেল তো সব।

মুখোমুখি: দেবাশিস রায়চৌধুরী

অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

সবাই শুধু ধান্দা গুছিয়েছে

দিলীপ রায়

আমার মায়ের বাবা অর্থাৎ আমার দাদামশাই যাত্রা করেছেন। এবং দাপুটে অভিনেতা ছিলেন। তা জিন-ঘটিত কারণে আমার আমার অভিনেতা হয়ে ওঠা কি না জানি না, তবে বলা যেতে পারে একজন বা একাধিক মানুষের উৎসাহে, অনুপ্রেরণায় এবং সম্মিলিত ভাবনার ফলে হঠাৎই অভিনেতা হিসাবে আমার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

সালটা ছিল ১৯৫১-৫২। তখন খড়্গপুরে আই আই টি চালু হওয়ার প্রস্তুতিপর্ব চলছে। আমি আই আই টি-তে তখন কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি। আই আই টি-র ডিরেক্টর ছিলেন ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। তখন হিজলিতে বাঙালি বলতে খুবই অল্প কিছু মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ওই জেলের ভেতরের কোয়ার্টার্সে, বাইরে যুদ্ধের সময়ে যেসব মিলিটারি ব্যারাক তৈরি হয়েছিল সেখানে বসবাস করতেন চাকরির সুবাদেই। একদিন সকলে মিলে ঠিক করলেন নাটক করতে হবে। এ ব্যাপারে ড জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ছাড়াও যিনি আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছিলেন তিনি হলেন প্রবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত, রেজিস্টারের পি. এ.। ঠিক হল জুনিয়র গ্রুপ, অর্থাৎ আমাদের দিয়ে নাটক করানো হবে। সেইমতো নাটক বাছা হল, 'মহারাজা নন্দকুমার'। অফিসের পরে এবং শনি রবি আর ছুটির দিনগুলোতে রিহার্সাল হত। নাটক যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় তার জন্য পর্দা তোলা আর ফেলাটা পর্যন্ত রিহার্সালে মহড়া দেওয়া হত। এবং বাঁশির বদলে মুখে ফুঃ ফুঃ আওয়াজ করতেন তিনি, মহড়ায় যাঁর ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর নাম অবনী সাহা। জোর কদমে রিহার্সাল চলত। নন্দকুমার সেজেছিলেন সুনীল মুখার্জি। আমি মির কাশিম। নাটকের দিন কলকাতার বি. ব্রাদার্স থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ গেল। এলাহি ব্যাপার। নাটক শুরু হল। ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, প্রবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং আরও মান্যগণ্য ব্যক্তি ছাড়াও বহু মানুষ নাটক দেখতে এলেন। নাটক বেশ জমে উঠেছে, এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল, বলা যেতে পারে সেটাই আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট।

সিন নম্বরটা মনে নেই, তবে সেই দৃশ্যে, যেখানে মির কাশিমের বেশে আমি বলছি, '... স্বাধীন বাংলার যে পাঞ্জা সে পাঞ্জা নিয়ে আসুন ...', একটা দারুণ নাটকীয় মুহূর্ত সেটা, হঠাৎই ফুর্‌র্‌ করে বাঁশি বেজে উঠল, আর ড্রপ সিন পড়ে গেল। এমন অসতর্ক মুহূর্তে কার্টেন ফেলে দেওয়ার জন্য যখন অবনী সাহাকে চেপে ধরা হল তখন তিনি বললেন, আমার অভিনয় এমনই মোহিত হয়ে তিনি দেখছিলেন যে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখের বাঁশিতে ফুঁ পড়ে যায় এবং তার ফলে এই বিভ্রাট। এদিকে প্যাক্‌ড হাউস। দর্শক গন্ডগোল শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। তাদের দাবি, আবার শুরু হোক সিনটা।

অবনীবাবু তো যার পর নাই লজ্জিত। তখন ড. জ্ঞান ঘোষ এলেন এবং বললেন, 'নাটকটা এত সুন্দর হচ্ছিল অথচ এমন দুর্ঘটনায় সুরটা গেছে কেটে। বরং পরের দিন নাটকটার আর একবার অভিনয় হোক।' খরচ-খরচার দায়ও তিনি নিলেন। পরের দিন নাটকটা হল।

এরপর যেটা হল সেটাই আমার জীবনে একটা বাঁক। ড. জ্ঞান ঘোষ বললেন, 'ওকে এখানে রাখা হয়েছে কেন?' ওনারই পরামর্শে এবং অন্যদের উৎসাহে আমার চাকরি ছেড়ে কলকাতায় আসা এবং সিনেমায় নামা। আমার প্রথম ছবি 'সতী বেহুলা'। সেটা ১৯৫৩ সাল। আমি লখিন্দর। চাঁদ সওদাগর ছবি বিশ্বাস। পদ্মা দেবী সনকা। ছবিটা ছিল ডাবল ভার্সান। বাংলা আর অহমিয়া। অহমিয়ায় লখিন্দর ভূপেন হাজারিকা। নমিতা সিনহা মনসা। যেটা আমার জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তা হল, জীবনের প্রথম ছবিতে নায়িকা হিসাবে বেহুলার ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের সঙ্গে আমি অভিনয় করি। তখনও তিনি 'সুচিত্রা' হয়ে ওঠেননি। তখনও তিনি রমা সেন; দৃশ্যটা ছিল বেহুলার সামনে মৃত লখিন্দর শুয়ে আছে। ওই এক রাত্রির অভিনয়ের পর আর বেহুলা চরিত্রে সুচিত্রা সেন আসেননি। প্রযোজক ভদ্রলোক ছিলেন অবাঙালি। তিনি বললেন, 'ওহ্ লড়কি তো মা বননেওয়ালি হ্যায়' — ব্যস, এই যুক্তিতে সুচিত্রা সেনকে বাদ দিয়ে নতুন নায়িকা আনা হল। পাবলিক প্রসিকিউটর নবনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন, তাঁর মেয়ে মুক্তি গুপ্তকে আনা হল বেহুলার চরিত্রে অভিনয় করানোর জন্য। ছবির ডিরেক্টর ছিলেন সুনীল গাঙ্গুলী। আমাদের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গাঙ্গুলী নন, উনি ছিলেন সেই সময় 'দীপালি' নামে একটি পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। সেই থেকেই আমার পেশাদার অভিনেতার জীবন শুরু।

১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে আমি পেশাদার মঞ্চে যোগ দিই, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে 'এন্টনী কবিয়াল'-এর সাফল্যের পর শুরু হয় 'নটী বিনোদিনী'। আমি গুর্মুখ রাই। বিনোদিনী কেতকী দত্ত। জহর গাঙ্গুলী গিরিশ। রামকৃষ্ণ কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। অনিল বাগচী মিউজিক ডিরেক্টর। 'নটী বিনোদিনী'-তেই আমার প্রথম পেশাদার মঞ্চে আবির্ভাব।

এরপর থেকে প্রায় তিরিশ বছরেরও ওপর আমি সিনেমার পাশাপাশি মঞ্চেও ডিরেক্টর/অ্যাক্টর হিসাবে কাজ করেছি। বহু চরিত্রে অভিনয় করেছি। মঞ্চ ছাড়াও ওয়ান-ওয়াল, এমনকি যাত্রাও করেছি। এই দীর্ঘ সময়কালে আমি বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন প্রযোজনায় নাটক করেছি। এক সময়ে বাংলা পেশাদার মঞ্চের যে রমরমা ছিল সেখান থেকে আজ এই যে একটার পর একটা মঞ্চ বন্ধ হয়ে গেল তার অজস্র কারণ আছে। মঞ্চগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক ছোটখাটো শিল্পী ও কলাকুশলী, যাঁরা শুধুমাত্র থিয়েটার থেকেই রুটি-রুজি আয় করতেন তাঁরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। সিনেমার নামী-দামি শিল্পী যাঁরা শুধু বাড়তি আয়ের জন্য মঞ্চে নাটক করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই অধমও একজন বটে, তাঁরা হয়তো খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, কিন্তু পথে বসলেন না। কিন্তু প্রযোজক তো মঞ্চে তাঁদের সশরীরে হাজির করিয়েই ব্যবসা জমাতেন। লাভ বা কখনও সখনও লোকসান হলেও তবুও মঞ্চগুলোতে নাটক চালু থাকত। আস্তে আস্তে সব বন্ধ হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এমন ঘটল? কী কী কারণে বাংলা পেশাদারি মঞ্চ, যা কি না গিরিশের সময় থেকে শুরু করে শিশিরকুমার-অহীন্দ্র চৌধুরীর যুগ পেরিয়ে একশ বছরেরও বেশি সময় দর্শক মনোরঞ্জন করেছে, তার এমন দশা হল? গত শতকের আশির দশক থেকেই বলা যেতে পারে এই পেশাদার মঞ্চের নাভিশ্বাস ওঠে এবং নব্বইয়ের দশকে এসে তার প্রয়াণ ঘটল। এর একমাত্র কারণ দর্শক। সাধারণ মানুষ যাঁরা মূলত গ্রাম থেকে মফস্বল শহর থেকে এই থিয়েটার দেখতে আসতেন, তাঁরা আস্তে আস্তে এই থিয়েটার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিক্রি-বাটা গেল কমে। প্রযোজকের আর্থিক ক্ষতি হতে লাগল। এই পেশাদার মঞ্চগুলোর নাটক তো আর গ্রুপ থিয়েটারের মতো লোকসানে চলা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নাটক নয়। এগুলোতে প্রযোজকের লাভ-ক্ষতির অঙ্ক জড়িয়ে থাকে। এবং কোনও প্রযোজকই ক্ষতি স্বীকার করে ঘরের টাকা নষ্ট করতে রাজি নয়। সব নাটক যে সব সময় লাভজনক হয় বা হয়েছে তা নয়। তবুও খরচ-খরচা উঠে গেলে এবং সামান্য লাভের মুখ দেখলে নাটক চালিয়ে যাওয়ার মতো সুভদ্র প্রযোজক যে ছিলেন না তা নয়, কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ার মতো আর্থিক বিপর্যয় সহ্য করতে কোন ব্যবসায়ী রাজি থাকেন? ফলে

যা হওয়ার তাই হল। তাহলে কি ব্যবসা মার খেল বলেই পেশাদার মঞ্চের বাতি নিভল? বলা যেতে পারে ব্যাপারটা তাই।

পেশাদার বা প্রফেশনাল থিয়েটারের ব্যবসাটা কীরকম একটু আলোচনা করা যেতে পারে। বাগবাজার অ্যামেচার ক্লাব থেকে, বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের মধুসূদন সান্যালের বাড়ি থেকে গিরিশ-অর্ধেন্দুরা যে থিয়েটার শুরু করে তা চালিয়ে গিয়েছিলেন সে নাটকের অর্থের যোগান এবং থিয়েটারে শিল্পী/কলাকুশলীদের মাইনে, খরচ-খরচা বাদে লাভ-ক্ষতির ইতিহাস আজ অনেকেরই জানা। এমনকি আধুনিক মঞ্চ-প্রয়োগের গুরু শিশিরকুমারের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ম্যাডান সাহেবের কোম্পানি, এ সবও অনেকেরই জানা। পরবর্তীকালে বহুক্ষেত্রে হল-মালিকরাই ছিলেন প্রযোজক। সুতরাং ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে চলছিল একরকম।

একটা সময়, একটা পর্যায় এমন এলো যখন একাধিক প্রযোজকের আবির্ভাব ঘটল যাঁরা কেউ হলের মালিক নন। হল ভাড়া নিয়ে তাঁরা নাট্য-প্রযোজনা করতে এলেন। হল নিতে গেলেই একটা সিকিউরিটি মানি এঁদের কাছে হলের মালিকরা দাবি করলেন। কেননা একটা নাটক যদি না লাগে অর্থাৎ গোড়া থেকেই ক্ষতিতে চলে আসে তখন প্রযোজক যদি নাটক বন্ধ করে বিদায় নেন, সে ক্ষেত্রে হলের মালিকেরই ক্ষতি। হল চালাতে গিয়ে তাঁকেও বেশ কিছু খরচ নিয়মিতভাবে কবতে হয়। ম্যানেজার থেকে সুইপার পর্যন্ত হল-মালিককে মাস-মাইনে দিয়ে পুষতে হয়। এর ওপর আছে নানা ট্যাক্স। স্বাভাবিকভাবেই এই সিকিউরিটি মানি জমা রেখে তিনি নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য বাইরের প্রযোজককে হল ভাড়া দিতে সম্মত হন, এবং সেইমতো কন্ট্রাক্ট হয়। এবং এই সিকিউরিটি মানির অঙ্কটা কোনওক্রমেই লক্ষ টাকার নিচে হয় না। এইবার কোনও নাটক চলল না বলে যদি কন্ট্রাক্ট শেষ হওয়ার আগেই প্রযোজক নাটক বন্ধ করে দেন, সে ক্ষেত্রে ওই সিকিউরিটি মানিটা জলাঞ্জলি যায় বা তার অনেকটাই ক্ষতি স্বীকার করে ছেড়ে দিতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই যে সিকিউরিটি মানি, এটা থিয়েটারের ক্ষেত্রে আন-প্রোডাকটিভ। আইড্‌ল মানি, অথচ আনঅ্যাভয়ডেব্‌ল।

এত সব মেনে নিয়েও যখন কোনও প্রযোজক নাটক প্রযোজনা করতে আসেন তখন থেকেই শুরু হয় তাঁকে শুষে নেওয়ার অদ্ভুত এক কারবার। প্রথমেই বলি, যাঁরা সিনেমা থেকে থিয়েটারে পার্ট করতে যান, তাঁদের মধ্যে এই অধমও একজন, তাঁরা তাঁদের পাওনা-গণ্ডাটা যেভাবে আদায় করেন, বিনিময়ে তেমন দায়টুকু নেন না। শুটিংয়ের অছিলায় অভিনয়ের দিন অনুপস্থিত থেকে বিক্রি-বাটার ক্ষতি করেন। রিহার্সাল থেকে শুরু করে নানা পর্যায়ে নানান বায়না তাঁদের লেগেই থাকে। বিশেষত অভিনেতা বা অভিনেত্রী, যাঁরা সিনেমা থেকে পেশাদার মঞ্চে যোগ দেন স্টার হিসাবে (এই সময়কালে থিয়েটার-স্টার বলে যেহেতু কেউ নেই), তাঁদের ম্যাও সামলাতে বহু প্রযোজককে হিমসিম খেতে হয়। অবশ্য প্রযোজকরা সেসব মেনে নিতেন, আমার ধারণা, যেহেতু তাঁরা তাঁদের হাতের হিসাব-বহির্ভূত বাড়তি টাকা এই থিয়েটারে লাগাতেন বলে। এবং এই কারণেই সম্ভবত অভিনেতা/অভিনেত্রী থেকে সাধারণ কলাকুশলী/শ্রমিক-কর্মচারী সকলেরই ধান্দা থাকত গুছিয়ে কিছু পয়সা কামানো। ফলে মূল কাজটার প্রতি কারও তেমন দায় থাকত না। প্রযোজক মশাইও যত না নাট্যপ্রেমী তার চেয়েও বেশি অন্য কিছু, এবং বাকিরাও প্রায় সব্বাই শুধু ধান্দাটাই বুঝত, কাজটা নয়।

এ তো গেল ভেতরের কথা। তবুও হলগুলিতে যখনই যে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, গ্রাম-মফস্বল থেকে মানুষ কিন্তু নিয়মিত বৃহস্পতি, শনি, রবি এবং ছুটির দিনগুলোতে এসে এখানে ভিড় করেছেন নাটক দেখতে। কিন্তু সত্তরের শেষ বা আশির দশক থেকে, যখন যাত্রার রমরমা চলছে, সেই সময় এক অদ্ভুত নাট্য-প্রযোজনার প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। ওয়ান-ওয়াল। কে যে এমন নামকরণ করেছিল জানি না। তখন যাত্রায় সিনেমা-স্টাররা যেতে শুরু করেছেন। যাঁরা যাত্রা করছেন, করছেন। যাঁরা করছেন না সেই সব সিনেমা-স্টারদের নিয়ে কম হ্যাপায় ওই যাত্রার নায়েকরাই চালু করল ওয়ান-ওয়াল থিয়েটার। কল-শো। যেন তেন একটি প্রযোজনা, মূলত নাটক (যাত্রা নয়) মাঠে-ময়দানে, গ্রামের পটি করার স্পটে, তিনদিক খোলা মঞ্চে অভিনয় করা শুরু হল। সেখানেও কারোর কোনও কমিটমেন্ট নেই। ওয়ান-ওয়ালের প্রযোজক, শিল্পী, কলাকুশলী থেকে স্পট-বয় বা মালবাহী কুলি, সকলেরই ধান্দা যেন তেন প্রকারে পয়সা কামানো। এই যে গ্রামে-গঞ্জে ওয়ান-ওয়াল থিয়েটারের ছড়াছড়ি শুরু হল তাতে হল কী, যে সেনেমা-স্টারদের চাক্ষুস করতে গ্রাম-গঞ্জ

থেকে মানুষ কলকাতায় এসে পেশাদার মঞ্চে ভিড় করত তখন তারা তাঁদের হাতের মাথায়, ঘরের কাছে পেয়ে শহরে আসাটাই ছেড়ে দিতে লাগল।

শিশির-পরবর্তী যুগে, বলা যেতে পারে বিংশ শতকের পঞ্চাশ দশক থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই পেশাদার রঙ্গামঞ্চেই আমরা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্তের মতো শক্তিমান নাট্যকার, পরিচালকদের পেয়েছি। পরবর্তীকালে এঁদের স্থান পূরণ করার মতো প্রতিভা পেশাদার রঙ্গামঞ্চে আর আসেনি। অবশ্য ব্যতিক্রম হিসাবে আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু সৌমিত্র চ্যাটার্জীর নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা উচিত, যিনি পেশাদার রঙ্গামঞ্চে অন্যধারার নাটক করেও দর্শক আকর্ষণ করতে সক্ষম। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে তাঁর ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার আজও হয়নি। তবুও কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে 'নামজীবন'-এর সাফল্যের বেশ কিছুকাল পরেও, বলা যেতে পারে আশির দশকে সৌমিত্র একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন যেগুলো গুণমানে উৎকৃষ্ট তো বটেই এবং একই সঙ্গো দর্শকের প্রশংসাধন্য। তবুও একা কুম্ভ কি কেল্লা রক্ষা করতে পারে? প্রয়োজকের অভাবে সেভাবে সৌমিত্র বেশি কাজও করতে পারলেন না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, এই থিয়েটারে সকলেই শুধু ধান্দা গুছিয়েছে বিনিময়ে একে বাঁচিয়ে রাখতে কোনও দায় স্বীকার করেনি। এমনও দেখা গেছে, খুচরো নেই এই অজুহাতে টিকিট কাউন্টারে যে কর্মচারী টিকিট বেচেন তিনি খরিদ্দার ফিরিয়ে দিয়েছেন। আসলে অন্যত্র চাকরি-বাকরি করে পার্ট-টাইম হিসাবে থিয়েটারের টিকিট কাউন্টারে টিকিট বেচার কাজ করতে যে বা যিনি আসছেন তাঁর কী দায় খরিদ্দার ভেগে গেলে! হলের ভেতর সিট ভাঙা, দেওয়ালে পানের পিক, এ সব দেখভাল করার মাইনে-করা লোক থাকা সত্ত্বেও কিছুই প্রতিকার ছিল না। কাজে অবহেলা, বা আরও স্পষ্ট করে বললে, কাজটার প্রতি কোনও ভালোবাসা বা ভালোলাগা যদি না থাকে তাহলে কী আর হতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রযোজক আসছে মুনাফার লোভে, শিল্পী-কলাকুশলী-কর্মচারীদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রযোজককে শুষে নেওয়া — এই যখন অবস্থা তখন মূল কাজটাই তো গৌণ হয়ে যায়। ফলে যা হওয়ার তাই হল। এই থিয়েটারটা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে গেল।

এই পেশাদার মঞ্চের নাট্য-প্রযোজনাকে এখন বাঁচিয়ে তোলা দুরূহ কাজ। এর জন্য যে সদিচ্ছা, সততা এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তা যে কতজন করতে রাজি হবে তা বলা কঠিন। বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে এখন যে অবস্থা একই সমস্যা পেশাদার থিয়েটারের ক্ষেত্রে। এখন বাংলা সিনেমায় প্রায় সর্বত্রই ভালো গল্প, ভালো চিত্রনাট্য, এমনকি ভালো পরিচালকের যেমন অভাব ঠিক তেমনই এই থিয়েটারেও একই সমস্যা। ভালো নাটক, ভালো পরিচালক এবং ভালো নাটক নাটক প্রয়োজনার সদিচ্ছা-সম্পন্ন প্রযোজকের আকাল চলছে। আমি যেহেতু দুটো ক্ষেত্রেই কাজ করেছি, তাই আমার মনে হয়, এই সমস্যার সমাধানে — এই অসুখের দাওয়াই একটাই। আমরা যারা শিল্পী, যাদের মঞ্চে তুলে যাদের গ্ল্যামার ভাঙিয়ে প্রযোজক এই ব্যবসায় মুনাফা তোলেন, আমরা যদি মনস্থির করি এই ভেবে যে খারাপ নাটক ও খারাপ ছবিতে কাজ করব না, তা সে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও, এর ফলে যে চাপ তৈরি হবে সম্ভবত তাতে কাজ হতে পারে। যে কোনও প্রযোজক টাকার থলি নিয়ে সিনেমা করতে এলেই যদি আমরা প্রশ্ন তুলি, কী ছবি তিনি করতে চান, কাকে তিনি চিত্রনাট্যকার পরিচালক হিসাবে কাজে নিতে চান, তাঁদের যোগ্যতার মান কতখানি — এ সব জেনে-বুঝে তবেই আমরা, শিল্পীরা, সেই ছবিতে কাজ করব, আমি নিশ্চিত এর ফলে বাংলা সিনেমার মান উন্নত হতে বাধ্য। শুধু রোজগারের ধান্দায় নিম্নমানের ছবিতে কাজ করা আমাদের বোধ হয় আর উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, সিনেমার পর্দায় আমাদের চেহারা আর অভিনয়-ক্ষমতার প্রদর্শনটাই প্রযোজকের মূল ব্যবসা। সুতরাং চিত্রটা পাল্টাতে হলে আমরাই সেটা পারি। থিয়েটারের ক্ষেত্রেও এক কথা। দরকার আমাদের, অর্থাৎ শিল্পীদের, সদিচ্ছা। এটার অভাবেই আজ এত সমস্যা। আমরা আমাদের দায় এড়িয়ে যেতে পারি না। প্রথমত, ওই ওয়ান-ওয়াল নামের কুৎসিত থিয়েটার ব্যবসাটা বন্ধ করতে হবে। এই যে কদর্য নাট্যব্যবসা, সেটা আমি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছি। এতে থিয়েটারের ভালো কিছু হয়নি। একই প্রযোজক কখনও কখনও মঞ্চের নাটককে ওয়ান-ওয়ালে রূপান্তরিত করে বাড়তি রোজগারের ব্যবস্থা

করেছে। মানুষ শহরে এসে সেই নাটকের মঞ্চরূপ দেখার অভিজ্ঞতা ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই সব অরাজকতাই পেশাদার মঞ্চের ব্যাপক ক্ষতি করে দিয়েছে।

শুক্লা সেনগুপ্তের মতো একজন প্রযোজককে আমরা আত্মহত্যা করতে দেখেছি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। অনেক ভালো কাজের মধ্যেও উনি ভুল কিছু করেছিলেন। কল-শো'র জন্য শুক্লা ওয়ান-ওয়াল প্রযোজনা করলেন 'ঘণ্টাফটক'। প্রেমাংশু বসু ডিরেক্টর। অপর্ণা সেন আর আমি সে নাটকে ছিলাম। কিন্তু পরে মঞ্চে ওই নাটক করার সময় অপর্ণা সেনের বদলে সুপ্রিয়া দেবীকে নেওয়া হল। মঞ্চ, পোশাক-আশাক ভালো করা হল না। এমনকি রিহার্সালটাও ভালোমতো হল না। এ সবই হল খরচ কমানোর জন্য। মঞ্চে নাটকের মানও গেল নেমে। এবং আমরা এ সব ব্যাপারে শুক্লাকে যতটা পাবলাম শুধুই, যাকে বলে, দুয়ে নিলাম। শুক্লার মৃত্যু খুবই দুর্ভাগ্যজনক। রমাপ্রসাদ বণিককে দিয়ে 'ভালো খারাপ মেয়ে'র মতো চমৎকার একটা প্রযোজনাও তো শুক্লা করেছিল।

স্টার থিয়েটারের রিভাইভ্যালে, দেখলাম, সুব্রত মুখার্জী কলকাতার মেয়র হিসাবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তদানীন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কাগজে-টিভিতে পড়েছি, দেখেছি। আমার মতে, এ সব স্টান্ট। ওখানে কিছু হওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ স্টারের ব্যাপারে আমি এর আগে যত মিটিং হয়েছে প্রায় সব ক'টায় ছিলাম। ওখান এত গন্ডগোল, মানে, জমির মালিক, তারপর লেসি হিসাবে রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া — এদের লায়াবিলিটিজ ছাড়া আরও অনেক সমস্যা আছে যা সহজে মিটবে বলে মনে হয় না। হলে, বামফ্রন্ট সরকার বহু আগেই পদক্ষেপ নিত। স্টার পুড়ে যাওয়ার পরপরই আমরা পেশাদার মঞ্চের বহু শিল্পী গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীদের সাথে যৌথভাবে স্টারের বিভাইভ্যালের ব্যাপাবে বহু মিটিং করেছি। আমাদেব সমর্থনে গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ, অভিনেতৃ সংঘ ছাড়াও আরও বহু সংগঠন, মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন। এ ব্যাপারে আমরা সবকারি স্তরে বা স্টার কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিকবার বসেছি, আলাপ-আলোচনা করেছি। তাতে আমার মনে হয়েছে, যে জট পাকিয়ে আছে তা সহজে খোলা যাবে না।

দেখা যাক কী হয়।

সব শেষে বলি, কোনও কাজই দুরূহ নয়, যদি সে কাজ সম্পাদনের সদিচ্ছা থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই। প্রযোজক, শিল্পী, কলাকুশলী, মায় হল-কর্মচারী, সকলেই যদি মনে করেন যে শুধুমাত্র রোজগারের ধান্দায় নয়, ভালো নাটকের ভালো মঞ্চ-প্রযোজনার স্বার্থে সকলে মিলে প্রকৃত উদ্যোগ নেওয়া যায় তাহলে আবার দিন ফিরবে। মানুষ আবার আসবে।

মুখোমুখি : বিদ্যুৎ নাগ
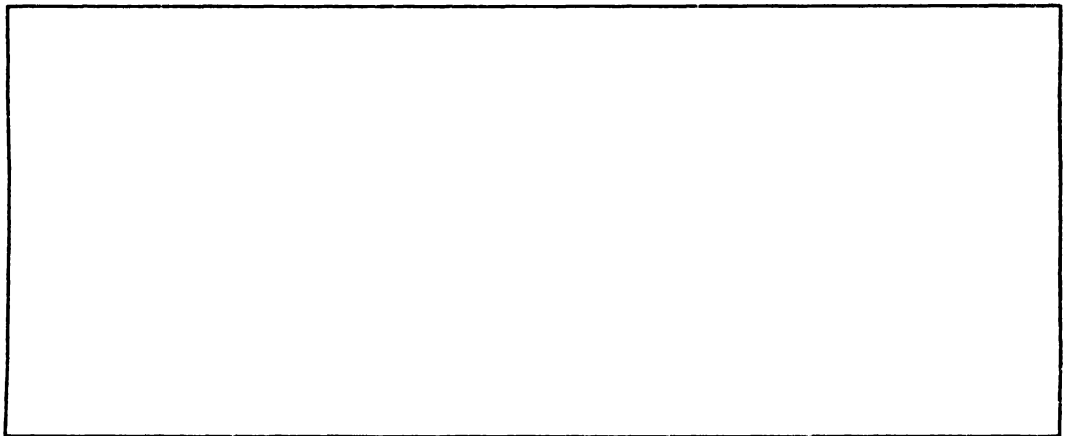
অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

যেদিন থেকে শুরু উলটো স্রোত

গীতা দে

আমার জীবনের সঙ্গে থিয়েটার অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়লেও অনুষঙ্গ হিসাবে আসে থিয়েটার। ছোটবেলার এমন কোনও স্মৃতি নেই যার সঙ্গে থিয়েটারের যোগ নেই। ১৯৩১ সালে জন্ম, সম্ভবত ছ'বছর বয়স থেকেই থিয়েটারের শুরু। সুতরাং নিজের কথা বলতে গেলেই থিয়েটারের কথা বলতে হয়। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে দারিদ্র্যের কারণেই থিয়েটারে এসেছি, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কখন যে এই থিয়েটারকে, এই অভিনয় জগতকে ভালোবেসে ফেলেছি সেকথা আজ আর মনে পড়ে না। এখন একটাই অনুভূতি — আমার জীবন মানেই থিয়েটার, আমার বেঁচে থাকার অর্থই থিয়েটার, আমার সংগ্রাম, আমার প্রেম — সব কিছুই এই থিয়েটার, বা আরও বৃহত্তর অর্থে বলা যায়, এই অভিনয় জীবন।

আমি যে থিয়েটার দেখেছি সে তো থিয়েটারের রমরমা অবস্থা। হ্যাঁ, আমি তখনও থিয়েটারে যোগ দিইনি। খুব ছোটবেলার কথা বলছি। দানীবাবু, গিরিশচন্দ্র, নরেশ মিত্র, নীহারবালা — কী সব অভিনেতা-অভিনেত্রী! গুরু হিসাবে পেয়েছি শিশির ভাদুড়ীকে, পেয়েছি যোগেশ চৌধুরীকে, পরে শিখেছি প্রেমাংশু বসু, দেবনারায়ণ গুপ্তের কাছেও। মহৎ মানুষ সব। এমন সব মানুষের সঙ্গ, এঁদের সাহচর্য পেয়েছিলাম বলেই আজ এখানে পৌঁছতে পেরেছি। আমরা যা দেখেছি সে থিয়েটারের স্বর্ণযুগ।

খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে — নাট্যনিকেতনে নরেশ মিত্র করেছিলেন তারাশঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে 'কালিন্দী' — নামটা নরেশ মিত্রেরই দেওয়া। পরে এই 'কালিন্দী'-ই আবার নতুন করে নাট্যরূপ দিয়ে স্টারে নামিয়েছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। আমি দুটো প্রযোজনাই দেখেছি। আমার অবশ্য প্রথমটাই বেশি ভালো লেগেছিল। সেখানে গিয়ে আমি কাকে দেখলাম? মিউজিক ডিরেক্টর কাজী নজরুল ইসলাম, আর ওঁর সহকারী হিসাবে ছিলেন অনুপকুমারের বাবা। ভাবা যায়? নায়িকা ছিলেন নীহারবালা। যেমন গান করেন, তেমনই অসাধারণ ডান্সার। ওঁর কাছে আমি নাচ শিখেছি।

খুব ছোটবেলায় মনে পড়ে নাট্যনিকেতনের কথা। এটা ছিল এক রাজস্থানী ভদ্রলোকের জমি-বাড়ি। পরবর্তীকালে শিশির ভাদুড়ী এখানেই থাকতেন। সামনে থিয়েটার, পিছন দিকে থাকার ব্যবস্থা। পরে দেনার দায়ে এই থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। এবং প্রবোধ গুহ নামে এক ভদ্রলোক এটা কিনে নেন। যতদূর জানি উনি জাতে মুসলমান ছিলেন। এই সময়

হয়ে গেল ট্যুরিং পার্টি। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে থিয়েটার হত। এই ট্যুরিং পার্টির সঙ্গে অনেক ঘুরেছি। এই সময়ে সিনেমাও করেছি। 'দম্পতি' ছবি — হিরোইনের ছোটবেলার রোল করেছি আমি। এখনকার বাংলাদেশেও গিয়েছি। ঢাকা নয়, নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত। ট্রেনে করে গোয়ালন্দপুর অবধি গিয়ে স্টিমারে যেতে হত নারায়ণগঞ্জ। সেসব আজও মধুর স্মৃতি হয়ে রয়েছে। আমি তখন খুবই ছোট — সকলের স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি। পরিবার থেকে দূরে আছি — এই অনুভব স্পর্শ করতে পারত না।

এসব কথা বলছি আজকের অবস্থার তুলনা হিসাবে। পারস্পরিক ভালোবাসাও তো থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম উপাদন। আজ সেই ভালোবাসা কোথায়? সবাই তো সবার শত্রু। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। সমনে এক, পিছনে এক। থিয়েটারকে আমরা মন্দিরের মতো পবিত্র রাখতে পারিনি, করে তুলেছি কাদা ছোড়াছুড়ির ময়দান — সেই ময়দান ধুলোয় মিশে যাবে — এ তো অনিবার্যই ছিল। হ্যাঁ, তখন লোকসানের কারণে, দেনার দায়ে শিশিরবাবু থিয়েটার বিক্রি করে দিয়েছিলেন — কিন্তু থিয়েটার থেকে পালিয়ে যাননি। অন্যতর লড়াইয়ে নেমেছিলেন। ভালোবাসা ছিল বলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। থিয়েটারে লোকসান হচ্ছে বলে লাভজনক ব্যবসার ধান্দায় নেমে পড়েননি। থিয়েটারে তখন দর্শক সমাগমের কোনও অভাব হত না। সর্বশেষ রো-এর টিকিটের দাম ছিল ১ টাকা। আর হিরোইনের মাইনে ছিল ৩০০ টাকা। তবুও লোকসান হচ্ছিল। কেন লোকসান হচ্ছিল — সেকথা আমার জানা নেই। কিন্তু একটা কথা বুঝেছি, থিয়েটারে একটা ভাঙা-গড়া ছিলই। তাই বলে আজকের মতো এমন বন্ধ্যাদশা সৃষ্টি হয়নি। ভাঙনের পাশাপাশি গড়াটাও ছিল — ভীষণভাবেই ছিল। আব আজ শুধুই ভাঙন। যেমন মনোমোহন থিয়েটার। ওখানেই মিনার্ভা থিয়েটার হয়েছিল। আজকের মিনার্ভা নয়, পুরনো মিনার্ভা, — যেটা পুড়ে গিয়েছিল। উঠে যাওয়ার পরে ওখানেই হয়েছিল স্টার থিয়েটার — এখনকার এই স্টার নয়, বিনোদিনী-গুর্মুখ রায়ের স্টার। সেই সময়ে থিয়েটারে তো তথাকথিত ভদ্রঘরের মেয়েরা আসতেন না। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার করবেন 'শেষরক্ষা' নাটক। সৌমেন ঠাকুর বললেন, রবীন্দ্রনাথের শেষরক্ষায় ছেলে দিয়ে মেয়ের রোল কিছুতেই করা যাবে না। এই সৌমেন ঠাকুরই শিশির ভাদুড়ীকে নিয়ে যান কঙ্কাবতীর কাছে। কঙ্কাবতী আর চন্দ্রাবতী — ওঁদের বাড়ি ওড়িশায়। সম্ভবত এঁরাই থিয়েটারে প্রথম শিক্ষিত মহিলা। এর আগে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই নিষিদ্ধ পল্লীর মহিলা। তথাকথিত ভদ্র পরিবার থেকে কোনও মহিলা থিয়েটারে আসতেন না। থিয়েটারের মহিলারা যেমন সমাজে শ্রদ্ধার আসনে অভিষিক্ত হতেন না তেমনই পুরুষদেরও কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি। গিরিশবাবুকেও অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তবু থিয়েটার ছিল এঁদের ধ্যান-জ্ঞান, এঁদের প্রাণাধিক প্রিয়। তাই কোনও অবস্থাতেই এঁরা থিয়েটার ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারতেন না। শিশিরবাবুর কথা ভাবুন। কলেজের অধ্যাপক। কী প্রয়োজন ছিল তাঁর এই থিয়েটারে আসার? তবু তিনি এসেছিলেন। শিশিরকুমার যখন থিয়েটার করতে আমেরিকা যাচ্ছেন তখন অনেক অভিনেত্রীই যেতে রাজি হননি। গিয়েছিলেন প্রভাদেবী, কঙ্কাবতী দেবী, বিভাবতী দেবী, উষাবতী দেবী — এঁদের প্রত্যেককেই কিন্তু থিয়েটারেরই কোনও না কোনও পুরুষকে বিয়ে করতে হয়েছিল। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিলেন। তা না হলে আমেরিকা সফরের ছাড়পত্র মিলত না। শিশির ভাদুড়ীর ভাই তারাকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল প্রভাদেবীর, শিশিরকুমার বিয়ে করেছিলেন কঙ্কাবতী দেবীকে — এইরকম আর কি। প্রসঙ্গটা এল বিশেষ কারণে। তখনকার দিনে এও কিন্তু কম ত্যাগস্বীকার নয়। থিয়েটারের জন্য, সমাজ-সংসারের কঠোর নীতির বাঁধন ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া — এর মূল্য অসীম! আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা এত বড় ঝুঁকি নেবে কি থিয়েটারের জন্য — সেই হিম্মৎ, সেই বুকের পাটা আছে কারোর?

থিয়েটারটা যেদিন থেকে শুধুই ব্যবসা হয়ে গেল সেদিন থেকেই থিয়েটারের পতন শুরু। অনেকে বলেন, থিয়েটারে সিনেমার তারকারা আসায় থিয়েটারের সর্বনাশ ঘটে যায়। আমি একথা বিশ্বাস করি না। আগেকার দিনের থিয়েটারের বহু শিল্পী ফিল্মেও যুক্ত ছিলেন। বড়ুয়া সাহেবের ছবি হলেই শৈলেন চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী থাকতেন —এরকম অনেকেই ছিলেন। তবে তখন থিয়েটারের শিল্পীরাই ফিল্মে যেতেন। কারণ তখন শিল্প-ভাবনাটাই বড় ছিল। আর পরবর্তীকালে শিল্প-ভাবনা চলে গেল পিছনে, বড় হয়ে উঠল ব্যবসা-ভাবনা। তাই ফিল্মের লোকেরা থিয়েটারে আসতে

শুরু করলেন। গন্ডোগোলের সূত্রপাত এখান থেকে। এঁরা এলেন টাকার লোভে। ফল যা হওয়ার তাই হল। এঁদের লোভের কোপে পড়ে থিয়েটার ডুবল। মুরগিটাকে না বাঁচালে ডিমটা পাওয়া যায় না — এই সহজ হিসেবটাও এরা বুঝতে চাইল না।

পেশাদারি থিয়েটার বন্ধ হয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার থেকে অনেক বেশি সঙ্কটে পড়েছেন থিয়েটারের অন্যান্য কর্মীরা। শিফটার, লাইটম্যান — এঁরা কী মর্মান্তিক অবস্থায় পড়েছেন চিন্তাও করা যায় না। এই প্রসঙ্গে স্টারের সলিল মিত্রের কথা না বললে অপরাধ করা হবে। স্টারে ছিলাম ১৮ বছর। সলিল মিত্র প্রভিডেন্ট ফান্ড দিয়েছিলেন। তখন লেবার মিনিস্টার ছিলেন গোপাল দাস নাগ। তিনি বলেছিলেন, কেন এই প্রভিডেন্ট ফান্ড করতে গেলেন? সলিল মিত্র বলেছিলেন, শিফটার, সুইপার সকলে যেমন পাবেন তেমনই শিল্পীরাও পাবেন এই প্রভিডেন্ট ফান্ড। এইরকম মনের মানুষ আর ক'জন পাওয়া যায়?

এখন যে ছেলেমেয়েরা থিয়েটারে আসছে তাদের শিক্ষা বলে কিছু নেই। ওদেরও দোষ দিই না — আমরা গুরু পেয়েছিলাম — এখন তেমন গুরু কোথায়? তার ওপর পেশাদার মঞ্চে সাহিত্যভিত্তিক নাটকেরও অভাব দেখা দিল। যাও বা নাটক আছে, চরিত্র-বণ্টনে নানারকম দলবাজি, নানা রাজনীতি চলে। তারও ওপর আছে প্রোমোটার চক্র। অধুনা স্টার পুড়ে যাওয়া, রঙমহলে বিয়ে বাড়ি ভাড়া — এসবের পেছনে প্রোমোটারদের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি। সরকার গ্রুপ থিয়েটারের জন্য অনেক কিছু করেছে। কিন্তু পেশাদার থিয়েটারের জন্য কী করেছে? সেদিন টি ভি-তে দেখলাম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলছেন, স্টার নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই। বড় দুঃখ পেলাম। কত মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্ন — আর উনি এরকম একটা কথা বললেন?

পেশাদারি থিয়েটার আমাদের মহান ঐতিহ্য — এর ধ্বংস, এর বিলুপ্তি কিসের ইঙ্গিত বয়ে আনে?

মুখোমুখি : তন্দ্রা চক্রবর্তী
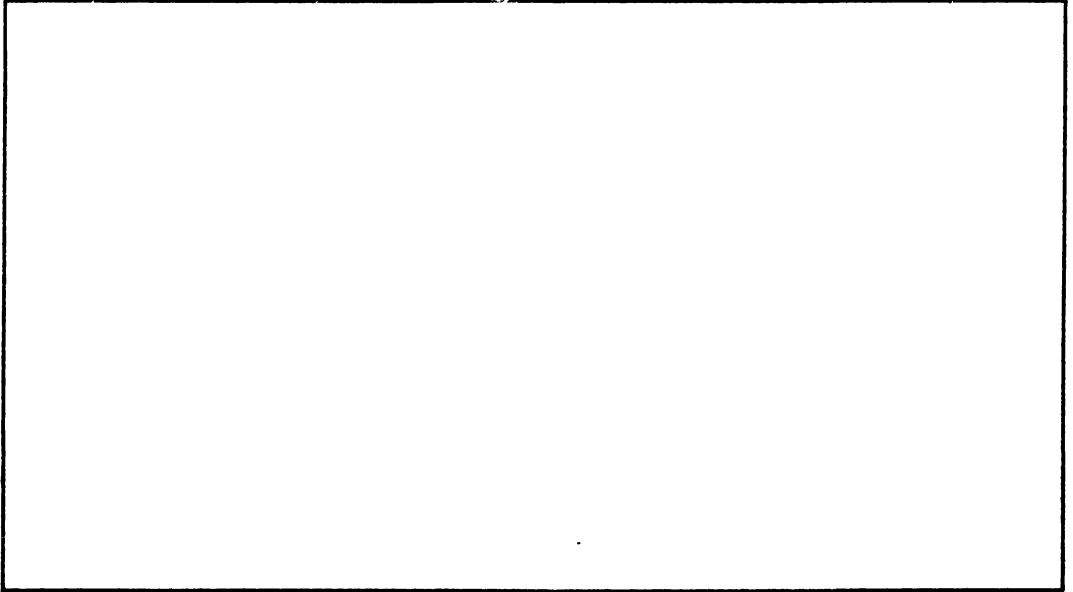
অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

ব্যবসাদাররাই কাণ্ডটা শুরু করল

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

আমি তো চাকরি করতে করতেই থিয়েটার আরম্ভ করেছিলাম, তখন একটা অসুবিধে দেখা দিতে লাগল। তা হল, যখন ফিল্ম বা থিয়েটার করতে যাই, তখন অফিসে খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে, আবার যখন অফিসে যাই তখন ওই থিয়েটার আর ফিল্মের প্রতি মন পড়ে থাকে। কিছুই যেন ভালো লাগে না। তো একদিন আমার স্ত্রীকে বললাম, আমি চাকরিটা ছেড়ে দিতে চাই। বললে, দাও। সেদিন স্ত্রীর কাছ থেকে ওই প্রেরণা যদি আমি না পেতাম তাহলে হয়তো আজকে আমি এখানে আসতে পারতাম না। তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি থিয়েটারে হোলটাইমার হলাম। সে সময়ে বিশ্বরূপা থিয়েটারের মালিক ছিলেন দক্ষিণেশ্বর সরকার। তিনি বললেন, আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে চাইছি। তা হল সোম, বুধ, শুক্রবার এবং রবিবার অর্থাৎ থিয়েটারের দিনগুলো ছাড়া তিনদিন সন্ধেবেলায় আর রবিবার সকালে আমরা একটা অভিনয় করতে চাই। আমি বললাম করুন। ওঁরা তখন আমাকে একটা ফ্যানটাসটিক টাকা অফার করেছিলেন, তখন প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডের অনেকে বিশ্বাস করেননি যে ওঁরা ওই টাকা দেবেন। আমি তখন আমার দলে গিয়ে সব বললাম, আর এও বললাম, যদি তোমরা দায়িত্ব নাও, তাহলে আমি যাব না। সবাই চুপ করে রইল। তাই আর কী করি, বাঁচার তাগিদে পেশাদার থিয়েটারে যোগ দিলাম। বিধায়ক ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'ডাউন ট্রেন' নাটক দিয়ে শুরু হল। খুব তেমন দর্শক সমাগম না হলেও সত্তর-পঁচাত্তর রাত্রি অভিনয় হয়েছিল। একেবারে অর্থের কারণেই আমি পেশাদার থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলাম। কেননা গণনাট্য সংঘেই আমার থিয়েটার শুরু। সে অন্য এক উন্মাদনা ছিল।

আমি যখন ১৯৬১ সালে পেশাদার থিয়েটারে যোগ দিই তখন প্রযোজক ছিলেন দক্ষিণেশ্বর সরকার, তিনি নিশ্চয়ই নাটককে ভালোবাসতেন। ওঁর সঙ্গে নাটক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, হয়তো থিয়োরিটিক্যাল জ্ঞান ততটা নেই কিন্তু কমনসেন্স থেকে যা বলছেন তা ঠিক। এঁরা যদি নাটক না-ই ভালোবাসতেন তাহলে লোহার ব্যবসা ছেড়ে এই থিয়েটারি ব্যবসা করতে আসবেন কেন। তবে এ ব্যবসায় একটা মজা আছে — যখন আসে তখন হাজার হাজার টাকা আসে, আর যখন যায় তখন হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে যায়। যত টাকা বেরিয়ে যেতে থাকে ততই প্রযোজকরা মনে করেন সামনের প্রযোজনাটা নিশ্চয়ই লেগে যাবে। লাগলে তো ভালো, না লাগলেই শেষ। ১৯৭১ সালে আমার বন্ধু তৎকালীন প্রযোজক হরিদাস সান্যাল এবং বীরু মুখোপাধ্যায় দু'জনে আমার কাছে আসেন। এসে বললেন, হল বুক করে এলুম, চলো, নাটক রেডি করো। আমি বললাম, কোথায় হল বুক করে এলেন? — কাশী বিশ্বনাথ। আমি বললাম,

এই রে, ও তো স্যাবি জায়গা, কী নাটক হবে? 'বাঘিনী' করব। আমি বললাম — না, ভালো হবে না। একে স্যাবি জায়গা, তার ওপর মরবিড নাটক। লোকের ভালো লাগবে না ওখানে। ঝকমকে চকমকে কিছু একটা কর, দেখবি লেগে যাবে। তখন আমি বীরুকে বললাম, আমি শুনেছি তুমি জরাসন্ধর 'মল্লিকা'র ফিল্মস্ক্রিপ্ট করেছ। বলল, হ্যাঁ, করেছি। বললাম, ওইটে করো না। এর মধ্যে অবশ্য হরিদাস সাবিত্রীকে হিরোইন হিসাবে ফাইনাল করে এসেছিল, তখন ওরা সাবিত্রীকে গিয়ে 'বাঘিনী'র পরিবর্তে 'মল্লিকা'র কথা বলতে সাবিত্রী তো খুব খুশি। তা 'মল্লিকা' নাটকই প্রযোজিত হল। হরিদাস সান্যাল সত্যিকারের নাট্যপ্রেমী মানুষ ছিল। আজ পর্যন্ত থিয়েটারে এমন প্রযোজক দেখিনি। আমি জানি, ওর কাছে পয়সা নেই, বা কম আছে, কিন্তু কখনও আর্টিস্ট বা টেকনিসিয়ানদের পারিশ্রমিক দেওয়া থেকে একটা দিনও ফেইল করেনি। এটা সাধারণত দেখা যায় না। হয়তো প্রয়োজনে কারোর কাছে সেই সময় ধার করে এনেছিল, আবার সুযোগ মতো তাকে ফেরতও দিয়ে দিয়েছিল। ওরই প্রযোজনায় তখন একটার পর একটা নাটক, যেমন 'মল্লিকা' সুপারহিট, তারপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'না' হিট, বনফুলের 'অঘটন' সুপারহিট। আমি তো প্রায় কলকাতার সবকটা মঞ্চেই কাজ করেছি। 'গৃহপ্রবেশ' বলে একটি নাটক করেছিলাম শ্যামবাজার বাসুদেব মঞ্চে, সেটা তো এখন বাজার হয়ে গেছে। তবে এইসব প্রযোজকদের কোনও নিশ্চয়তা, স্থিরতা কিছুই ছিল না। যেমন আমার বেশ মনে আছে, প্রতাপ মঞ্চে আমি বীরু মুখোপাধ্যায়ের একটা নাটক করেছিলাম 'চারপ্রহর'। প্রযোজক বললেন চালিয়ে যান। যেই লোক বাড়তে আরম্ভ করল অমনি প্রযোজকমশাই বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিলেন। আমি এমনও কাজ করেছি যেখানে তিনজন ছিল প্রযোজক — শ্যামল মৈত্র, অসীম মৈত্র এবং রাম চৌধুরী। নাটক 'শ্রীমান-শ্রীমতী'। তিনজনের মধ্যে অসীম মৈত্র ছিল অগ্রণীর ভূমিকায়, সেই সমস্ত কনডাক্ট করত, সে উল্টোপাল্টা কাজ করতে আরম্ভ করল। এটারও মজা হল, যেদিন থেকে হাউসফুল হতে শুরু করল, তারা বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিল। সে করল কি, সেই টাকা দিয়ে তার পুরনো ধার মেটাতে লাগল। ব্যস, সে গলা টিপে মারল থিয়েটারকে।

একসময় গ্রুপ থিয়েটার যখন পেশাদার থিয়েটারে নাটক প্রযোজনা করতে চাইল তখন তাদের সঙ্গেও কাজ করেছি। যেমন থিয়েটার ইউনিটের প্রযোজনা — 'বিলকিস বেগম'। এই নাটকের একশ রাত্রির অভিনয়ে কমল মিত্রকে নিয়ে গিয়েছিলাম, দেখে বলেছিলেন বিজন থিয়েটারের মতো এই ছোট স্টেজে এত আয়োজন করলি কী করে — আমি তো অভিভূত। আমার মন ভরে গিয়েছিল। সত্যিই তো ওই ছোট স্টেজে — 'বিলকিস বেগম' যে কতদিন চলেছিল তা ভাবা যায় না।

একটা সময় তো এমন হয়েছিল কলকাতার এই পেশাদার থিয়েটারগুলো জুড়ে ছিল হতাশা, দর্শকও তেমন মাত্রায় আসছিল না। সেই সময় সলিল মিত্র (স্টারের প্রযোজক) ঠিক করলেন যে যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। স্টার এয়ারকন্ডিশনড হল, হল-কে ঢেলে সাজানো হল। শুরু হল নাটক 'শ্যামলী'। অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলি, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। এই নাটকের সাফল্যের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। সেই দিন থেকে প্রত্যেকটা স্টেজ সে সময়ে যে নাটক করেছে, তাই রমরম করে চলেছে। মনে রাখতে হবে, সলিল মিত্র কিন্তু একেবারে সুপারস্টারকে পেশাদার থিয়েটারে নিয়ে এসেছিলেন।

এই রমরম করে চলার প্রসঙ্গে আর একটা গল্প মনে পড়ছে — তখন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে 'মল্লিকা' নাটক, রোজ হাউসফুল। একশ রাত্রির পর থেকে পাঁচশ রাত্রি পর্যন্ত একস্ট্রা চেয়ার দিতে হত কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। একদিন সকালে, অভিনয়ের দিন ছিল সেটা, উঠে দেখি প্রচণ্ড সাইক্লোনিক ওয়েদার। আমি হরিদাসকে ফোন করে বললাম — হরিদাস হয়ে গেল, আজ সেল গেল। হরিদাস বলল — কী করা যাবে, একটা দিন যাক। ও' আমাকে তুলে নিয়ে যেত গাড়িতে। তো দু'জনে হলের সামনে গিয়ে একেবারে হতবাক। দুটো শো-এর হাউসফুল বোর্ড টাঙানো। সেদিন রবিবার ছিল — ম্যাটিনি, ইভনিং হাউসফুল। ব্যাপারটা হচ্ছে কি — টিকিট পাওয়া যায় না, যেই ঝড় দেখেছে প্রত্যেকে মনে করেছে আজকে গিয়ে পাব। এই হচ্ছে নাটক যখন লাগে, তখন লাগে।

আশির শেষাশেষি দর্শক কমতে শুরু করল, তখন টেলিভিশন এসে গেছে। এবং আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম।

আগে দর্শকের যে চেহারা দেখতাম, দেখে মনে হত যে অভিজাত পরিবার থেকে সব থিয়েটার দেখতে আসছেন, আশির শেষের দিকে সাধারণ মানুষের ভিড় দেখতে শুরু করলাম। সেই আভিজাত্য যেন হারিয়ে যেতে লাগল। এই সাধারণ মানুষ, এঁরা কিন্তু নাটক ভালোবেসেই দেখতে আসছেন, কিন্তু তাঁরাও বুঝুক আর নাই বুঝুক অনুন্নত মানের প্রযোজনা দেখে দুঃখ পাচ্ছিলেন। পাবেনই তো! নাটকের সেট সেটিং জঘন্য, কোনওরকম জোড়াতাপ্পি দিয়ে করা, পোশাক-পরিচ্ছদ একইরকম। সংগীতের ব্যাপারেও কোনও নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই, সবই পুরনো সংগ্রহ থেকে কী করে খরচ কমিয়ে লাভ করবে বেশি — ব্যবসাদাররা এই কাণ্ডটা শুরু করল। এরপর যে কাণ্ডটা করল সেটা আরও সাংঘাতিক। ভালো নাট্যকারের নাটক সে নেবে না, সে নিজেই নাটক লিখতে শুরু করল, তাও আবার হিন্দি ছবির গপ্পো চুরি করে। 'সাগরবাবুর সংসার' নাটকটা দেখে আমাকে তো কিছু দর্শক বলেই ফেললেন — এ তো হিন্দি সিনেমার গপ্পো চুরি করে। আমি প্রযোজককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি আমাকে আগে বললে না, তাহলে আমি করতাম না। আর একটা যে ঘটনা ঘটল তা হল এখনকার স্টার আর্টিস্টরা গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে অভিনয় করতে শুরু করল। সাতের দশকে, এমনকি আটের দশকেও দেখেছি গ্রাম-গঞ্জের মানুষ সব বাস বোঝাই করে থিয়েটার দেখতে ভিড় করেছেন। যেই এখনকার স্টার আর্টিস্টদের ওয়ান ওয়াল শুরু হয়ে গেল, ব্যস, ওইসব মানুষদের আসা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের পাশেই যখন তাঁরা থিয়েটার দেখতে পাচ্ছেন তখন আর ভাঙাচোরা হলে ছেঁড়া সিটে বসে কেন থিয়েটার দেখবেন। আমি জানি, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে একদিন অভিনয় চলছে, দর্শক আসন থেকে একজন দর্শক হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন — কী হল, না পায়ে ইঁদুর কামড়ে দিয়েছে। এগুলো তো আমাদেরই দোষ। একটা ভালো ওয়েটিং হল নেই। গাড়ি করে যে লোকে যাবে তার পার্কিংয়ের জায়গা নেই। তারপরে ভালো নাটক নেই। অনেকে বলেন, থিয়েটারের ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়ে গেছে, সেটাও অনেকটা সত্যি। বকে গেছে শিফটাররা, সামনে অভিনয় চলছে, পিছনে চিৎকার করে গল্প করছে। বারণ করলে শুনবে না। ইউনিয়নের নামে তারা গুন্ডাবাজি করতে আরম্ভ করল। আজ তারা ভুগছে। এই সমস্ত মিলিয়ে-জুলিয়ে আজ এই অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে বলেছিল, আপনি লিখে জানান, সমস্যাটা কী। আমি লিখে দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু হয়নি। পরে শুনলাম, নাকি বলা হয়েছে — একজনের মালিকানায় ব্যবসাভিত্তিক ব্যাপার, সেখানে আমরা হেল্প করতে যাব কেন? আমি বলেছিলাম, আমি টাকায় হেল্প করতে বলিনি, যদি এমন করা যেত যে অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স রেহাই বা আরও যেসব কর্পোরেশনের নানারকম ট্যাক্স, জলের ট্যাক্স ইত্যাদি যদি মকুব করা যেত তাহলে হয়তো প্রযোজকদের কিছুটা ভার লাঘব হত এবং তাঁদের আর্থিক কষ্টের মুখোমুখি হতে হত না।

আমি মনে করি, আমাদের পূর্বসূরীরা একটা সময় যেমন সাফার করেছেন, তেমনই আমরাও করছি এবার। নিশ্চয়ই আবার দিন আসবে, আবার পেশাদার থিয়েটার দাঁড়াবে, বাংলায় আবার এই পেশাদার থিয়েটারেই নতুন নতুন নাটক প্রযোজিত হবে।

মুখোমুখি : দেবাশিস রায়চৌধুরী
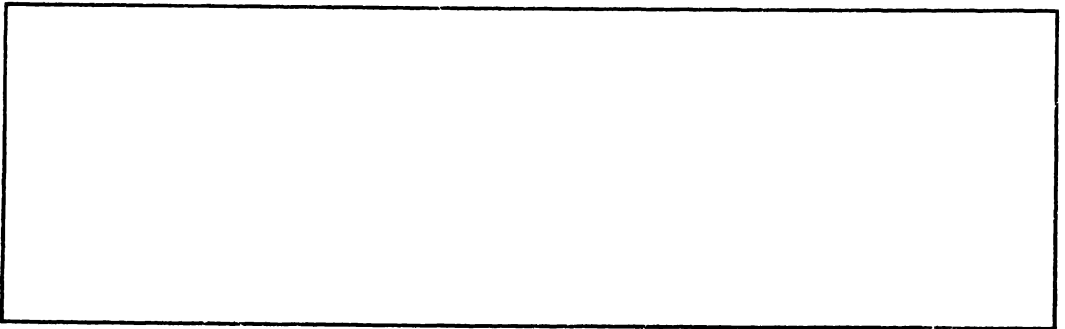
অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

ভালোবাসার অভাবের জন্য

মাধবী চক্রবর্তী

আমার জীবনের প্রথম অভিনয় — মিনার্ভা থিয়েটারে, কম্বিনেশন নাইটে। 'দুই পুরুষ' নাটকে ছোট 'শ্যামা'র ভূমিকায়, আর পরিচালক ছিলেন ছবি বিশ্বাস। সত্যি কথা বলতে কি, ছবি বিশ্বাসের কাছেই আমার হাতেখড়ি। আমি যখন মিনার্ভা থিয়েটারে 'ধাত্রীপান্না' নাটকে ছোট 'কনক' চরিত্রে নিয়মিত অভিনয় শুরু করি তখন আমার চার-পাঁচ বছর বয়স। আমি সকলের সঙ্গেই কাজ করেছি, যেমন নরেশচন্দ্র মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী আরও অনেকে। তখন কিন্তু একটা অদ্ভুত মজা ছিল, পঞ্চাশ নাইটের বেশি কোনও নাটক অভিনীত হত না, বদল করতেই হত। তারপর ওই পঞ্চাশ নাইটের অভিনয়ে যদি কেউ একদিনও অনুপস্থিত না হত, তাহলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হত। আমিও এরকম পুরস্কার পেয়েছি। প্রথম যেটি পাই সেটি একটি অ্যালার্ম ঘড়ি। আমি মিনার্ভা থিয়েটারে টানা দশ বছর কাজ করেছি। এই সময়েই পরিচালক রঞ্জিত রায়ের সঙ্গে যে নাটকটি আমি করি তার নাম 'কেরানীর জীবন', সুপারহিট হয়েছিল। পরের দিকে ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় 'জীবনটাই নাটক', 'ঝিন্দের বন্দি' এমন অনেক নাটক অভিনয় করেছি। এর মাঝে আমার সিনেমায় অভিনয়ও শুরু হয়ে গেছে। মিনার্ভায় নরেশ মিত্রের পরিচালনায় 'আত্মদর্পণ' নাটকে অভিনয় করতে করতেই আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় বাংলা ছবিতে প্রথম অভিনয় শুরু করি।

ফিরে আসি নাটকের কথায়। ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে যখন মিনার্ভায় অভিনয় করছি, তখন কিন্তু থিয়েটারে বেশ খারাপ সময় গেছে। কিন্তু খারাপ সময় হলেও কেন থিয়েটার তখন চলত আর এখনই বা কেন বন্ধ হল তা জানাই তো সব থেকে বড় কথা। থিয়েটারের খারাপ সময়ে দেখেছি ছবি বিশ্বাস সমস্ত শিল্পীদের নিয়ে বাইরে বাইরে শো করতেন। মঞ্চেও যেমন শো হত আবার বাইরেও শো হত। তখন আমরা ছোট, তাই খুব মজা হত। কলকাতার বাইরে ট্রেনে করে গেলাম, একটা বিশাল বাড়ি, সেই বাড়িতে আমরা থাকতাম — একটা পরিবারের মতো। সকলে মেয়ের মতো ভালোবাসত, কাউকে হয়তো মা ডাকলাম, তার কাছে শুলাম। কেউ হয়তো দিদি, সে খাইয়ে দিল। এইরকমভাবে থেকেও কোনও অসুবিধে তো না-ই, বরং একটা আনন্দ পেতাম। আর ছবিবাবু যে ভালোবাসতেন, সে ভালোবাসা তো তুলনাহীন। এটা সত্যি কথা, এঁরা ভালোবাসতে জানতেন এবং স্টেজকেও ভালোবাসতেন। তার ফলে স্টেজের খারাপ সময়ে এঁরা কখনই স্টেজকে ছেড়ে যেতেন না। এমনকি মাইনে পাওয়া না গেলেও এঁরা থিয়েটার ছেড়ে চলে যেতেন না। তখন চেষ্টা করতেন কীভাবে টাকা জোগাড় করা যায়, আর সেই কারণেই তখন বাইরে শো হত। যে টাকাটা রোজগার হত, তা বন্টন করা

হত। কীভাবে হত? না, প্রথমে যারা শিফটার, আলোর লোক; এছাড়া যারা এ কাজে অ্যাপ্রেন্টিস তাদের যতটুকুই মাইনে হোক না কেন তা আগে দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকত তখন সরযূবালা দেবী নিতেন, ছবি বিশ্বাস নিতেন এবং আরও শিল্পী যাঁরা তাঁরা নিতেন। কিন্তু একদম শেষে। এছাড়া প্রযোজকরা কত ভালো ছিলেন। একজনের কথা মনে পড়ছে, তিনি হলেন এন. সি. গুপ্ত, তাঁর কথা খুব মনে আছে। আমার তখন খুবই অভাবের সংসার, সেটা উনি জানতেন। জানতেন বলেই বলতেন, বড় বড় থলি নিয়ে আসবি। ওইসব থলিতে চাল ভবে দিতেন। এত ভালো লাগত যে কী বলব। আমার মাইনে ছিল পঁচিশ টাকা। এরপর খুব দ্রুত প্রমোশন হওয়ায় আমার মাইনে হয়ে হল ডাবল — পঞ্চাশ টাকা।

একটা দৃশ্যের কথা বলি। আমি শিবাজীর ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করছিলাম 'গৈরিক পতাকা' নাটকে। নির্মলেন্দু লাহিড়ী শিবাজী, আর আমি তার ছেলে। এই নাটকে আমার পোশাক বদলানোর ব্যাপার ছিল। যখন পোশাক বদলিয়ে স্টেজে যাব অভিনয় করতে, তখন শুনি সিন হয়ে গেছে। আমি তো হতাশ, মনটা খারাপ হয়ে গেল। সেই সময় সকলে যখন এটা-ওটা বলছেন তখন প্রযোজক এন. সি. গুপ্ত বললেন, না, মাধুকে কিছু বলবে না, ওর মতো সিনসিয়র মেয়ে নেই। দেখ ড্রেসারদের, ওদের নিশ্চয়ই কোনও দোষ আছে। তারপরে ড্রেসার এত কনসাস হলেন যে সবার আগে আমার কাপড়টাই পরাতেন। তখন আমার বয়স কম, আটটা-ন'টা নাগাদ ঘুম আসত। তখন ছবি বিশ্বাস বলতেন, মাধু তোব জন্য একটা সন্দেশ আছে, খেয়ে নে। ওই সন্দেশ খেয়ে ঘুমটা ভাঙত। এগুলো হয়তো খুব ছোট ঘটনা, কিন্তু আমার কাছে বিশাল।

আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। 'তুষারকণা', 'স্নো হোয়াইট'-এর বাংলা। 'তুষারকণা'য় আমি তুষারকণা, আর হৈমবতী করতেন সরযূ দেবী। সম্ভবত যুগান্তর লিখেছিল, আর দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও একটা কাগজে লিখেছিলেন, কুমারী মাধুরীর অভিনয় এত সুন্দর যে নাট্যসম্রাজ্ঞীকেও ম্লান করে দিয়েছে। আচ্ছা, এইটে যদি আজকের দিনে হয় তাহলে কী রিঅ্যাকশন হয়? একেবারে অন্যরকম। কিন্তু সেইসময় — আমি তো জানি না, সরযূবালা দেবী আমাকে বললেন — অ্যাই, আয়, বোস, তুই জানিস তোর সম্বন্ধে কী লিখেছে? আমি বললাম, না। তখন বললেন, দাঁড়া আমি পড়ে শোনাচ্ছি। এবার উনি পড়ে শোনালেন, পড়ে শোনাবার পর বড় বড় দুটো সন্দেশ দিয়ে বললেন, এই নে, খা। এটা তোর প্রাপ্য। এই যে মানুষগুলো, এই যে মানবিকতা, এগুলো হারিয়ে গেল।

এরপর থিয়েটারে এমন সব মানুষ এলেন, ভাবলেন গিমিক দিতে হবে, গিমিক চাই। তাঁরা সব ফিল্মস্টারদের নিয়ে এলেন। আর এই সমস্ত মানুষ তো ফিল্মকেই ভালোবাসেন। তাই যখনই থিয়েটারে খারাপ অবস্থা দেখা দিল, এঁরা বেশি পয়সা রোজগারের তাগিদে যাত্রায় চলে গেলেন। অসুবিধেটা কোথায়, তাঁদের এখানে কোনও মোহ নেই। এঁরা ছবি বিশ্বাসের মতো দুঃসময়ের মোকাবিলা করলেন না। এক্ষেত্রে আমি বলব, এটা প্রযোজকদের একটা ভুল, এই ভুল সিদ্ধান্তে একটার পর একটা ক্ষতি হতে আরম্ভ করল। তারপর যেটা হল, সকলে কমফোর্ট চাইছে। এখন যেমন অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন আগে তো হাউসগুলো এমন ছিল না। শেষের দিকে হাউসগুলোতে ইঁদুর ঘুরে বেড়াত, দর্শকদের কামড়েও দিত। আসল কথা হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্ট। সেখানেও যদি এত কষ্ট, তো লোকে কেন আসবে এই থিয়েটারে। আমার মনে আছে 'না' থিয়েটার করি, হাউসফুল শো, এক্সট্রা চেয়ার পড়ত। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে — সামনে যাঁরা বসে আছেন, জামা-টামা খুলে ফেলেছেন, খালি গায়ে বসে আছেন, এত গরম। কিন্তু নাটক থেকে উঠছেন না। তাঁরা নাটক ভালোবাসেন। যে কারণে নাটকের প্রতি এত দুর্বলতা আমার।

আজ যে এতগুলো থিয়েটার চলে গেল, চলে গেল কিন্তু আমাদের ভালোবাসার অভাবের জন্য। যখন একসময় রঙমহল থিয়েটার তুলে দেওয়ার কথা হয়েছিল, তখন জহর রায়, সরযূবালা দেবী এবং আরও অন্যান্য শিল্পী সবাই মিলে হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছিলেন। তাঁরা হল বন্ধ করতে দেননি। কিন্তু আজ কে করবে, কেউ আছে যে ওখানে বসে অনশন করবে? কাজেই দোষ প্রত্যেক স্তরে। শুধু সরকার করবে বললে হয় না, আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু দোষ আছে, সেইজন্যই শেষ হয়ে গেল।

মুখোমুখি : অরুণিতা রায়চৌধুরী

অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

গ্রামের লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে

তরুণকুমার

এই তো কিছুদিন আগে রঙমহলের সামনে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গো যেন আড্ডা মারছিলাম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়-হয় সময়। হঠাৎ দেখি রঙমহল জুড়ে টুনি লাইট জ্বলে উঠল। মনটা চঞ্চল হয়ে পড়ল। চায়ের দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার, নতুন নাটক নামল নাকি? সে বলে, 'না দাদা, বিয়ে বাড়ি ভাড়া আছে।' বুকে যেন শেল বিঁধল! বিয়ে বাড়ি?

হ্যাঁ, ঠিক, এই অবস্থাটা তো একদিনে হয়নি — ধীরে ধীরে, ক্রমশ নিঃশব্দে এই ভবিতব্যের পথে পা বাড়িয়েছি আমরা। আমরা, মানে পেশাদার থিয়েটারের লোকেরা।

নিজের কথা দিয়েই বলি। অল্প বয়সে পেশাদার থিয়েটারের রমরমা অবস্থা দেখেছি — শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী — কী অসাধারণ অভিনয়! রাতের পর রাত হাউসফুল। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থিয়েটার দেখছে, উপভোগ করছে। কী করে এটা সম্ভব — এই ভাবনা, এই অনুসন্ধান থেকেই আমি অভিনয়ের একেবারে ভেতরে ঢুকে গেছি। এইভাবে অভিনয় শিক্ষার সূত্রপাত। শিখতে হবে, করতে হবে — এইরকম একটা প্যাসন আমার মধ্যে এবং আমার সমকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিল।

১৯৫৭ থেকে ১৯৮০, এই সময়কাল তো পেশাদার থিয়েটারের স্বর্ণযুগ। রমরম করে চলছে পেশাদার থিয়েটার। ঠিক এই সময়ে, পরিস্থিতির চাপে পড়ে স্টার থিয়েটারের সলিল মিত্র রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়ার কাছে স্টার থিয়েটার বেচে দিলেন! পরিস্থিতির চাপ বলতে খানিকটা স্টাফদের ডিমান্ড, খানিকটা আর্টিস্টদের ডিমান্ড —খানিকটা তিতিবিরক্ত হয়েই সলিল মিত্র স্টার বেচে দিলেন। রঞ্জিতমল দায়িত্ব নেওয়ার পর কিছু ভালো নাটক হল। যেমন কৃষ্ণকান্তের উইল, জনপদবধূ —- কিন্তু তেমন টিকল না, দাঁড়াল না। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন দাঁড়াল না। কেন টিকল না। টিকল না, কারণ দর্শকরুচি যে বদলে গেছে পেশাদার থিয়েটার সেটা ঠিক ঠিক ধরতে পারছিল না। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো দর্শকরুচি পাল্টেছে। এদিকে তখন গ্রুপ থিয়েটার দুর্দান্ত সব প্রযোজনা উপহার দিচ্ছে। মানুষ ভিন্ন রুচির নাটকের স্বাদ পাচ্ছে। তখন এই পুরনো থিয়োরি-নির্ভর পেশাদারি থিয়েটার আর তেমন লোক টানতে পারছিল না। এটা ধরুন ৭০-৭২ সালের চেহারা।

এই সময়েই কিন্তু 'বেগম মেরী বিশ্বাস'-এর মতো নাটক হয়ে গেছে, অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছে 'চৌরঙ্গী'।

এবার হল কী, পেশাদার থিয়েটারের জগতে টালিগঞ্জ পাড়া থেকে কিছু উড়ো প্রোডিউসারের আগমন ঘটল। এই উড়ো প্রোডিউসাররা করলেন কী, ফিল্মের কিছু উঠতি চটকদার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে এলেন পেশাদার মঞ্চে। ভাবলেন, এই পথে বিশাল লাভ করবেন। এই সময় থেকে গন্ডোগোলের সূত্রপাত। এইসব অভিনেতা-অভিনেত্রী বিরাট অঙ্কের টাকা দাবি করে বসল। নাটকের নায়কের মাইনে তিরিশ হাজার টাকা। আর তাঁর সঙ্গে যেসব পুরনো অভিনেতা-অভিনেত্রী কাজ করছেন, যাঁরা মূলত থিয়েটারেরই লোক, তাঁদের মাইনে কত? না তিন হাজার। এভাবে কোনও জিনিস টেঁকে? কেন এই ব্যবধান মেনে নেবেন পুরনো লোকেরা। আপনি নায়কের মূল্য বাড়াবেন আর কো-অ্যাক্টরের মূল্য বাড়াবেন না?

এ তো গেল একদিক। অন্যদিকে, ফিল্মের এইসব উঠতি হিরো-হিরোইন নিয়ে যতটা সাফল্য হবে বলে আশা করা গিয়েছিল তা-ও কিন্তু হল না। সাধারণ আর্টিস্টরা থাকতে বিক্রি যেমন হত, এখনও সেইরকমই বিক্রি হতে লাগল। এর ওপর আরও এক সমস্যা ছিল। এইসব উঠতি শিল্পীদের কারও কারও আবার অন্য এক দাবি ছিল। উপরি রোজগার চাই। উপরিটা কী? ধরুন, কোনও দিন যদি হাউসফুল হয় তাহলে মাইনে ছাড়াও ওই শিল্পীদের একটা কমিশন দিতে হবে। এভাবে চলে? একটা থিয়েটার কীভাবে চলে সে সম্বন্ধে এঁদের কোনও ধারণাই নেই। এক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারার কথাটা আসে না। তবু বলছি, বড় বড় বিজনেস-ম্যানুফ্যাকচাররা যখন নানা র-মেটিরিয়াল কিনে, একটা প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে নতুন একটা উৎপাদন সামগ্রী বাজারে ছাড়েন তখন তাঁরা একটা কস্টিং করেন। কত খরচা হল, তার ওপরে কত পার্সেন্ট লাভ রাখতে হবে — ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই থিয়েটারের ব্যবসায়ীরা? তাঁরা ব্যবসা করতেই এলেন, অথচ ব্যবসাব হিসাবটা ঠিকঠাক কষে দেখলেন না। ফলে ব্যবসাটাও হল না, থিয়েটারটাও গেল শেষ হয়ে। শেষ হয়ে তো যাবেই। এত খরচ উঠবে কোথা থেকে? শিল্পীদের পেছনে খরচ, তার ওপর হল মালিকদের তো আগাম টাকা দিয়ে দিতেই হত। উড়ো প্রোডিউসারদের সঙ্গে তাঁদের চুক্তিই ছিল সেইরকম। বিক্রি হোক-না-হোক, নাটক লাগুক না লাগুক শো-প্রতি পাঁচ হাজার টাকা মালিককে গুণে দিতে হবে। বৃহস্পতি- শনি-রবি মিলিয়ে মাসে ১৬টা শো, মানে ৮০ হাজার টাকা নগদ। কাউকে কাউকে মাইনেপত্র দিতে হচ্ছে না, কোনওরকম হ্যাপা পোয়াতে হচ্ছে না। মাস গেলে ৮০ হাজার টাকা পকেটে এসে যাচ্ছে। আর কী চাই? এর ওপরে বাড়ল বিজ্ঞাপনের খরচ। একসময়ে যে বিজ্ঞাপনের মূল্য ছিল ৭০০ টাকা তাব মূল্য দাঁড়াল ৫৫০০ টাকা। প্রোডিউসাররা যায় কোথায়? প্রচার ছাড়া কি কোনও কিছু চলে?

চলল না। যখন চলল না তখন উড়ো প্রোডিউসাররা অন্য ব্যবসায় চলে গেল। এদিকে ততদিনে পারমানেন্ট প্রোডিউসাররা তো ৮০ হাজার টাকা পকেটে পুরতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। মাসান্তে ৮০ হাজার টাকা! অথচ এঁরা হলগুলোর সাধারণ মেরামতির কাজটুকু পর্যন্ত করেননি। হলের সিট ভাঙা, পাখাগুলোর বীভৎস আওয়াজ, টয়লেটে কোনও ভদ্রলোক ঢুকতে পারবেন না। এমনকি গ্রীনরুমটাও জঘন্য হয়ে রয়েছে। এসব সহ্য করে কোন মানুষ আসবেন? এই কি বিনোদনের, মনোরঞ্জনের উপযুক্ত পবিবেশ? ফলে যা হওয়ার তাই হল — ক্রমশ সব বন্ধ হয়ে গেল। প্রোমোটাররা হাত বাড়াল হলগুলোর দিকে। এমনকি থিয়েটার সেন্টারও প্রোমোটারের কবলে চল গেছে, হলটা ভাঙা হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে আমরা খানিকটা অন্যভাবে চেষ্টা করেছিলাম, এখনও করছি। তপন থিয়েটারে 'নহবত' নাটক পেশাদার থিয়েটার জগতে একটা মাইলস্টোন বলা যায়। গ্রুপ থিয়েটারের ঘরনায় আমরা নিজেদের পরিচালনা করেছিলাম বলা যায়। অথবা বলা যায়, একটা গ্রুপকে আমরা প্রফেশনালি চালু করলাম। ব্যাপারটা একটু খুলে বলা যাক। ধরুন, একটি ছেলে আমাদের লাইটে কাজ করছে। সপ্তাহে চারটে শো সে আমাদের জন্য করেছে। সাধারণভাবে বাজারে এই কাজের জন্য হয়তো সে ৫০০ টাকা পায়। আমরা তাকে ৮০০ টাকা দিতাম। তার ওপর কল-শো থাকলে এক্সট্রা টাকা। আর নহবত প্রচুর কল-শো-ও পেয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই মোটামুটি ভালো রোজগার করতে শুরু করল। এবং তারই ফলে কাজের সঙ্গে একটা ভালোবাসা জন্মে গেল, প্রেম জন্মে গেল থিয়েটারের সঙ্গে। গ্রুপ থিয়েটারে শিল্পীদের সঙ্গে যেমন ট্রিটমেন্ট করা হয়, মানে তখনও পর্যন্ত যেরকম করা হত — আমরাও দলের মধ্যে সেইরকমই করতাম। বাইরে নাটক

করতে গেলে দুটো ঘর নেওয়া হত — মেয়েদের জন্য একটা ঘর নেওয়া হত, ছেলেদের জন্য একটা ঘর। সকলে একসঙ্গো, একটা পরিবারের মতো থাকতাম আমরা — এভাবে থিয়েটারের সঙ্গো একটা আলাদা সম্পর্ক তৈরি হয়। শুধুই লেনদেন নয়, এর প্রতি একটা প্রেম, একটা মমত্ববোধ তৈরি হয়। তাই তপন থিয়েটারের 'নহবত' পেশাদারি থিয়েটার জগতের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। শুধু 'নহবত' কেন, তারপরেও করেছি 'নাগপাশ' (৫০০ রজনী), 'কাকের বাসা' (২০০ রজনী) — এরপর তপন থিয়েটারে আর নাটক চালানো গেল না। মূলত বাড়িওয়ালার অত্যাচারে আমাদের তপন থিয়েটার ছাড়তে হয়। অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা — থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবে? এই যন্ত্রণা থেকেই উত্তম মঞ্চের সৃষ্টি। এখানে প্রথমে করলাম 'নহবত' (১০০ রজনী), 'ঝরাপাতা' (১০০ রজনী), 'হীরালাল-পান্নালাল' (১০০ রজনী) এবং এখন চলছে 'মরেও শান্তি নেই'। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নাটকটা 'যদি এমন হত' নামে বিশ্বরূপায় কিছুদিন অভিনীত হয়েছিল। সেটির বহু পরিবর্তন করে আমরা এই নতুন রূপ দিয়েছি এবং এখনও অভিনয় করে চলেছি। না, স্বীকার করতেই হবে, তপন থিয়েটারের সময়কার মতো চলছে না।

চলছে না নানা কারণে। বিদ্যুতের ব্যয়বৃদ্ধি, বিজ্ঞাপনের ব্যয়বৃদ্ধি যেমন অন্যতম কারণ তেমনই যাত্রায় সিনেমার নায়কদের দেখতে পাওয়া, টিভির ব্যাপক প্রসার — ইত্যাদি কারণে গ্রাম-মফস্বল থেকে দর্শক আসা কমে গেছে। একথা স্বীকার করতেই হবে, পেশাদারি থিয়েটারের একটা বড় সংখ্যক দর্শক এঁরা। সিনেমার নায়করা পাড়ায় এসে ম্যারাপ বেঁধে অভিনয় করে যাচ্ছে, বাড়ির দাওয়ায় এসে জল চাইছে — এসব এখন আকছার ঘটছে। তবে আর সময় এবং অর্থ খরচ করে কলকাতায় থিয়েটার দেখতে আসবে কেন মানুষ? ফলে দর্শক কমছে। আর যাত্রার বড় বড় বিজ্ঞাপনের সঙ্গো আমরা কোনওমতেই পাল্লা দিতে পারছি না।

তবে অবস্থা এরকম থাকবে — এমন আমার মনে হয় না। পরিস্থিতি ঘুরে যাবেই। প্রয়োজন এক কালাপাহাড়ের, যে পাল্টা ঘুরে দাঁড়াতে জানে, আর প্রয়োজন রস-ক্ষ্যাপার। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, একটু রস-ক্ষ্যাপা না হলে এ লাইনে টেঁকা যায় না।

বিদ্রোহী মন নিয়ে, নাটক করবই এই উদ্দামতা নিয়ে কেউ যদি এগিয়ে আসে — তবেই পেশাদারি থিয়েটার বাঁচবে।

মুখোমুখি : তন্দ্রা চক্রবর্তী

অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

নাট্যানুরাগী প্রযোজকও ছিল না

এন. বিশ্বনাথন

বাংলা আমার মাতৃভাষা নয়। কলকাতা আমার জন্মস্থানও নয়। তবু আমি বাঙালি। আমার বড় হওয়া, আমার লেখাপড়া সবই এই কলকাতায়। তাই বাঙালি না হয়েও আমি পুরোদস্তুর বাঙালি। আর সেই কারণেই বাঙালির নাট্যরোগ আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে। বছর চোদ্দ বয়স থেকে থিয়েটার করছি। তবে সেগুলো একেবারেই পাড়ার থিয়েটার। এরপর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র হিসাবে ইংরেজি এবং বাংলা দুই ভাষাতেই নাটক করতাম। আমাদের কলেজে ইংরেজি নাটকের পরিচালনায় ছিলেন উৎপল দত্ত এবং বাংলা নাটকের পরিচালনায় ছিলেন তরুণ রায়। সেই সময় 'এক পেয়ালা কফি'-তে প্রথম ভিলেন চরিত্রে অভিনয়। পরে এটা পেশাদারি মঞ্চেও অভিনীত হয়েছিল। ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন 'বিরিঞ্চিবাবা' নাটকে শিষ্যের চরিত্রটা আমি করেছিলাম। এই নাটকগুলি দেখে দেবকীবাবু আমাকে 'রত্নদীপ' ছবিতে অভিনয় করার জন্য ডাকেন। বাংলা, হিন্দি এবং তামিল তিন ভাষাতেই ছবিটি হয়েছিল। তামিল এবং হিন্দিতে আমি অভিনয় করি। নায়িকা ছিলেন মলয়া সরকার। এরপর কয়েক বছর কলকাতার বাইরে থাকার কারণে আমি কোনও নাটক বা ছবিতে অভিনয় করিনি। ১৯৬০ সালে আমি আবার অভিনয় শুরু করি এবং পেশাদারি মঞ্চে। সেটা ছিল 'পথের দাবি' নাটক। এই নাটকে অভিনয় করতেন মহেন্দ্র গুপ্ত, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটা ছিল কম্বিনেশন নাইট। মহাজাতি সদনে অভিনয় হত। মলয়া সরকারও এই নাটকে অভিনয় করতেন। দীর্ঘদিন এ নাটক চলেছিল। এরপর মাসের পর মাস ধরে একটা নাটক চলেছিল — 'থানা থেকে আসছি'। আমি, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃপ্তি মিত্র এই নাটকে অভিনয় করতাম। রামমোহন মঞ্চে এই নাটকটি অভিনীত হত। পরিচালক শ্যামল সেন। খুবই ছোট মঞ্চ, দু'পা ফেললেই মঞ্চের বাইরে চলে যেতাম। তবু দিনের পর দিন সাফল্যের সঙ্গে চলেছিল নাটকটি। পেশাদারি মঞ্চে অভিনয়ের আমার দীর্ঘতম অভিজ্ঞতা এটি। এই নাটকের প্রযোজক নিছক ব্যবসা করতে থিয়েটারে আসেননি। তিনি এসেছিলেন নাটককে ভালোবেসে। তিনি বলেছিলেন, আমি নাটক ভালোবাসি, ভালো ভালো নাটক করতে চাই। যদি শুধু ব্যবসাটাই দেখতেন তাহলে কি রামমোহন মঞ্চে কেউ প্রযোজনা নিয়ে আসে? পরে অবশ্য সুজাতা সদনেও নাটকটি হয়েছিল। ব্যবসা করার জন্য এসব মঞ্চে কেউ অভিনয়ের ব্যবস্থা করে না। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক ক্ষতি হতে থাকে। এরপর যখন রঙমহলে নাটকটি নিয়ে গেলেন তখন অবশ্য কিছু পয়সা তিনি পেয়েছিলেন।

প্রযোজকের প্রসঙ্গ যদি তোলা হয় তাহলে বলব শিশিরবাবুর পরে পেশাদারি মঞ্চে যোগ্য প্রযোজক হিসাবে আমি

হরিদাস সান্যালের নাম করতে চাই। উনি এমন সব নাটক প্রযোজনা করেছেন যেগুলো বক্স-অফিসের দিকে তাকিয়ে করেননি। যার জন্য শেষ জীবনে উনি খুব কষ্টে দিন কাটিয়েছেন। এরপরেও নাটক নিশ্চয়ই চলেছে, কিন্তু হরিদাসবাবুর মতো নাটকের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা নিয়ে কেউ প্রযোজনায় এসেছেন কি না আমার সন্দেহ আছে। তারপরে যাঁরা এসেছেন তাঁরা এসেছেন একেবারেই ব্যবসায়িক মতলবে।

এরকম একটা ধারণা আছে যে পেশাদারি মঞ্চের দর্শক একটু স্থূল বা গোদা-গোদা ধরনের নাটক পছন্দ করেন। এর জলজ্যান্ত উদাহরণ 'সম্রাট ও সুন্দরী'। আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াচ্ছি। নাটকটি করেছিলেন সমর মুখার্জী। আমাকেও ওঁরা ডেকেছিলেন। এরকম কুৎসিত নোংরা নাটক আমি দেখিনি। স্বাভাবিক কারণেই আমি অভিনয় করতে রাজি হইনি। এই প্রসঙ্গে প্রতাপ মঞ্চের 'বারবধূ' নাটকটির কথাও বলা যায়। একেবারেই ব্যবসায়িক নাটক। একটি দৃশ্যে মঞ্চের ওপর ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা ছিল। কাগজে লেখালেখি হওয়ার পরে উপস্থাপনাটা একটু বদলে দেওয়া হয়। 'বারবধূ' অশ্লীল নাটক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। গিরিশ ঘোষের আমল থেকে যদি ধরা হয় তাহলে দেখা যায় এইসব মদ্যপ বেশ্যা এদের নিয়ে নাটক চিরকালই হয়ে এসেছে। কিন্তু তা এরকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নোংরামি করার জন্য নয় — সেগুলি বিষয় হিসাবে এসেছে। পরবর্তীকালে যেসব উলঙ্গনৃত্য বা ক্যাবারে আনা হয়েছে তাও কেবলমাত্র ব্যবসা করার জন্য। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একদিকে এইসব নোংরা অশ্লীল নাটক এবং অন্যদিকে কাহিনীভিত্তিক, জীবনভিত্তিক নাটক — এই দুইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি বেশি চলেছে। যেমন 'ক্ষুধা'। চমৎকার নাটক। দীর্ঘদিন চলেছিল। 'শ্যামলী' রেকর্ড। কিংবা সত্যবাবুদের 'নহবত'। দারুণ চলেছে। যেমন ধরুন 'সুজাতা', কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে চলেছিল। সন্ধ্যা রায় অভিনয় করেছিলেন। এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে।

এতসব উদাহরণের পরেও নির্মম সত্য এটাই যে পেশাদারি থিয়েটার বিলুপ্ত হয়ে গেল। আমার মনে হয় মঞ্চের পুরোপুরি বাণিজ্যিকীকরণ, টিকিটের হারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, টেলিভিশনের দাপট, প্রকৃত শ্রদ্ধাশীল, ধৈর্যশীল নাট্যানুরাগী অর্থবান প্রযোজকের অভাব বাংলা পেশাদারি মঞ্চ ডুবে যাওয়ার কারণ।

সরকারের যেমন সিনেমা শিল্পকে বাঁচানোর দায় আছে, যেমন নন্দন নির্মাণ, সিনেমা প্রযোজনায় অর্থ সাহায্য ইত্যাদি তেমনই পেশাদারি মঞ্চের ক্ষেত্রেও সেই সাহায্য প্রসারিত হওয়া উচিত ছিল। শিল্পের সব ক্ষেত্রে সরকারের দায় দলমত নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তি, গোষ্ঠীর পক্ষে থাকা দরকার।

মুখোমুখি : **অনিল দে**
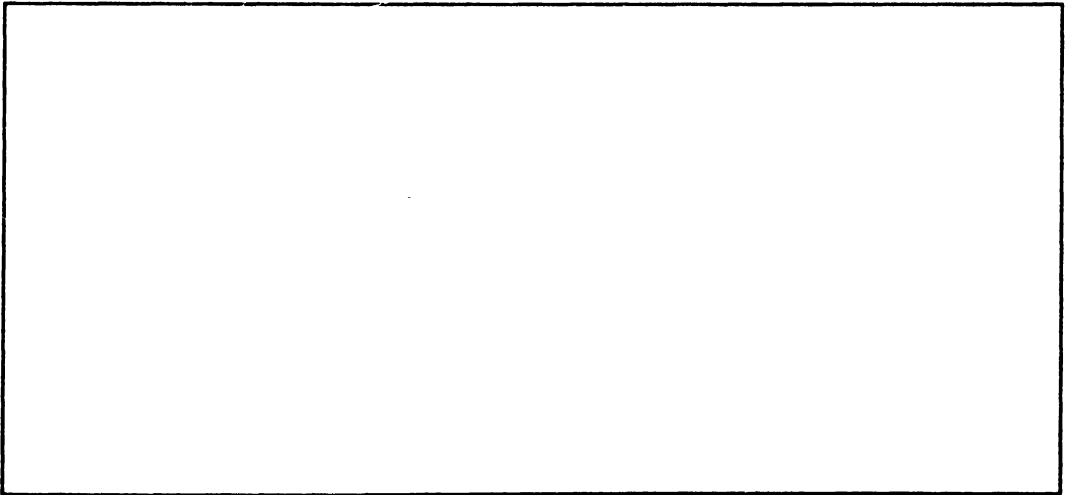
অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

মালিক পক্ষের ব্যভিচার

শক্তি সেন

আমি ১৯৬০ সালে পেশাদারি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হই। শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটার মঞ্চটির নাম ছিল শ্রীরঙ্গম। ষাটের দশকে ওই মঞ্চটি তাঁকে দেনার দায়ে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। রাসবিহারী সরকার ও দক্ষিণেশ্বর সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল। তাঁরাই নাম পাল্টে নাম রেখেছিল 'বিশ্বরূপা' থিয়েটার। সেখানে প্রথম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। শ্রী কালী বন্দ্যোপাধ্যায় শশী কম্পাউন্ডারের ভূমিকা অভিনয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। দু'শ রজনীর পরে 'ক্ষুধা' নাটকটিও দারুণ সুনামের সঙ্গে পাঁচশ রজনী চলেছিল। তারপর কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেতন বাড়ানোর কথায় রাজি না হওয়ায় তিনি থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় তৃপ্তি মিত্রকে বহু হাজার টাকা দিয়ে পুষে রেখেছিলেন। সেই সময় তাপস সেন ও আমি, বিজন ভট্টাচার্য, বসন্ত চৌধুরী, অসিতবরণ, রেবা রায়চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, মমতাজ আমেদ, তপতী ঘোষ, জয়নারায়ণ, নবদ্বীপ হালদার, কিরণবালা দেবী, কমলা ঝরিয়া প্রমুখ আর্টিস্ট বিশ্বরূপায় ৬০-এর দশকে মাস-মাইনেয় কাজ করতাম। আমি 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকে কালী ব্যানার্জীকে শশী কম্পাউন্ডারের মেক-আপ করার জন্য সোনার মেডেল পুরস্কার পেয়েছিলাম। কালীবাবুকে কোনও দর্শক চিনতে পারত না। তাপস সেন 'সেতু' নাটকে চলন্ত রেলগাড়ির দর্শকদের পাশ দিয়ে ধেয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখিয়েছিল। তারপরই ছিল বিরতি। পূর্ণ হল অর্ধেক খালি হয়ে যেত দ্বিতীয়ার্দ্ধে। তাপস সেন একটি মোটর গাড়ি চেয়েছিলেন থিয়েটার কর্তৃপক্ষের কাছে, কিন্তু তারা তা দেয়নি। তাপসও আর ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেনি। সেই সময় একটা ছোট মোটরকারের দাম ছিল দশ হাজার টাকা মাত্র। 'সেতু' নাটকটি হাজার রজনী অতিক্রম করেছিল। বিশ লক্ষের বেশি অর্থ উপার্জন করেছিল। নাট্যকলাশিল্পের অভিনেতা ও কলাকুশলীরা চিরকাল শোষিত হয়েছেন। সরকারি ব্যবস্থা কোনওদিন দৃষ্টিপাত করেনি। এই সম্পর্কে সিনেমা ও থিয়েটারের সাধারণ কলাকুশলীরা চিরকাল শোষিত হয়েছেন। কিন্তু অভিনয়শিল্পের উচ্চস্তরের শিল্পীরা কোনওদিন ফিরেও তাকান না তাঁদের দিকে। ইদানীং কলাকুশলীদের একটা ফেডারেশন তৈরি হয়েছে। সেখানে মাইনের রেট ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু তা কোনও কাজেই লাগে না। সেখানে কম টাকায় যাঁরা কাজ করতে রাজি হন তাঁদের নেওয়া হয়ে থাকে।

ষাটের দশকে থিয়েটারের শৈল্পিক ও বাণিজ্যিক অবস্থা ভালোই ছিল। কিন্তু মালিক পক্ষের ব্যভিচার ও সকলের মাইনের অর্থের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ হওয়ার দরুণ বহু গুণী শিল্পী থিয়েটার ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মালিকপক্ষ নায়িকা ও নায়ক এবং দু-একজন শিল্পীকে থিয়েটারের সমস্ত লাভের অর্থ উজার করে দিয়ে দিত। ফলে, দেনার দায়ে থিয়েটারগুলি ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেছে। এই ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী মালিকপক্ষের নির্বুদ্ধিতা। কারণ, ভালো নাটক ও ভালো বিষয়বস্তু এবং ভালো অভিনয় আর ভালো পরিচালনার অভাবেই নাটক দর্শকের কাছে সমাদর পায়নি।

পেশাদারি থিয়েটার উঠে যাওয়ার ফলে নাট্যসংস্কৃতিতে ধাক্কা লাগার কোনও কারণ ঘটেনি। তার কারণ, পেশাদারি থিয়েটার উঠে যাওয়ার অনেক আগে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তৈরি হয়েছে। গণনাট্যের প্রধান নাটক বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ও তুলসী লাহিড়ীর 'দুখীর ইমান'। এই নাটকগুলি শোষিত মানুষের পক্ষে প্রথম তৈরি হয়েছে। তারপর ঋত্বিক ঘটক 'গ্রুপ থিয়েটার' তৈরি করেছেন। গণনাট্যের নাটকগুলি রাজনীতিনির্ভর হওয়ার দরুণ সাধারণ গরিব, মধ্যবিত্ত, জনমজুর ও কৃষক শ্রেণীর জীবনদর্শন একেবারেই বাদ পড়ে যাচ্ছিল। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ও মধ্যবিত্ত জীবনে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কথা ভেবেই ঋত্বিক ঘটক, 'গ্রুপ থিয়েটার' নাম দিয়ে আলাদা দল তৈরি করেছিলেন। সেই দলের সমস্ত সভ্যই দলের মালিক থাকবে। কেবল কোনও রাজনৈতিক দল সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আজ যে অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার তৈরি হয়েছে এবং যাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁদের দল পরিচালনা করতে পারছে, তার স্রষ্টা হচ্ছেন ঋত্বিককুমার ঘটক। তাই কোনও রাজনৈতিক দল আজ আর এই থিয়েটারের ওপর তাদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতে পারছে না। প্রত্যেক গ্রুপ থিয়েটারই স্বাধীনসত্তায় দল চালানোর ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে। তাছাড়া টিভিতে মানুষ সিনেমা, নাটক, নৃত্যনাট্য ও নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় কতরকম অনুষ্ঠান দেখতে পারছে। কাজেই নাটক দেখার জন্য নাট্যমঞ্চে যাওয়ার তাগিদ দর্শকেরা অনুভব করছে না। গ্রুপ থিয়েটারের চাহিদা কিন্তু আজও মলিন হয়নি। যখনই কোনও ভালো নাটকের প্রশংসা প্রচারিত হয় (whispering campaign), থিয়েটারের দর্শক সবসময় সেই থিয়েটারে দল বেঁধে ছুটতে থাকে।

যাত্রা ও থিয়েটার আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। তাই আজ আর পেশাদারি থিয়েটারমঞ্চ তৈরির কোনও প্রয়োজন হচ্ছে না। সেই সময় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গীতা মুখার্জী ঋত্বিককে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। তাঁদের কথা ভোলার নয়। আমাকে টাকা দেওয়ার কথা এঁরাই ঋত্বিককে বলে, প্রত্যেক শো-তে ৫০ টাকা করে ধার্য করেছিলেন। তখন ওই টাকার অনুদান আমাকে প্রচন্ড দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। একথা আমি কখনও ভুলতে পারব না। গণনাট্যের শুরু থেকে তাপস সেন ও আমি আলো ও মেক-আপের কাজকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে আসার আপ্রাণ পরিশ্রম করে আজ যেখানে নিয়ে এসেছি সেকথা দর্শক সাধারণের জানতে বাকি নেই। যেমন তাপসের 'সেতু' নাটকে চলন্ত রেলগাড়ি। আমার 'নীল আকাশের নিচে' ছবিতে কালী ব্যানার্জীর 'ওয়াংলু' চরিত্রের মেক-আপের কথা।

গণনাট্য সংঘের সমসাময়িক যে কটি বড় থিয়েটারের দল তৈরি হয়েছিল তা হচ্ছে, বহুরূপী, সবিতাব্রত দত্তের পরিচালনায় রূপকার, উৎপল দত্তের পরিচালনায় লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ও তারপরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নান্দীকার। তারপর বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় থিয়েটার ওয়ার্কশপ। শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় বহুরূপী সর্বভারতীয় দল হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিল এবং ম্যাগসাইসাই পুরস্কারে শম্ভু মিত্রকে ভূষিত করা হয়েছিল। যার অর্থমূল্য ১ লক্ষেরও বেশি টাকা। শম্ভু মিত্রের পর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যদলগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। নাট্যশালা তৈরির জন্য অর্থ সংগ্রহের সময় সম্মিলিত থিয়েটার শিল্পীদের নিয়ে কলামন্দির মঞ্চে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেয়া, তৃপ্তি মিত্র ও আরও অনেক বিশিষ্ট শিল্পীর অভিনয়ে ছিলেন। শম্ভু মিত্র চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এই নাটকে। তারপর কিছুকাল পরে, নান্দীকার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন অজিতেশবাবু। নানাধরনের চক্রান্তের ফলে দল ছেড়ে যেতে হয়েছিল, কেয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে। তার কিছুদিন পরে, ঋত্বিক ঘটকের তৈরি গ্রুপ থিয়েটার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। ধীরে ধীরে পেশাদারি থিয়েটারের অবনমন ঘটতে শুরু করল। এই রোগের মূল কারণ হল, অর্থ ও ভালো চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ লাভ করা। এর ফলে দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিতে লাগল। এই ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী মালিক ও পরিচালক।

পেশাদারি থিয়েটার উঠে যাওয়ার ফলে নাট্যসংস্কৃতিতে কোনও ধাক্কা লাগেনি। বরং গ্রুপ থিয়েটার ও নাট্যসংস্কৃতি অনেক লাভবান হয়েছে। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন অনেক প্রসারলাভ করেছে। তার প্রকাশ আজ বহু গ্রুপ থিয়েটার ও তার আন্দোলন। দলের সভ্যদের অর্থ সাহায্য করতে তারা লড়ছে।

পেশাদারি থিয়েটার উঠে যাওয়ার ফলে নাট্য সংস্কৃতির অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে।

পেশাদারি থিয়েটারর উত্থানের কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

মুখোমুখি : সচ্চিদানন্দ চৌধুরী
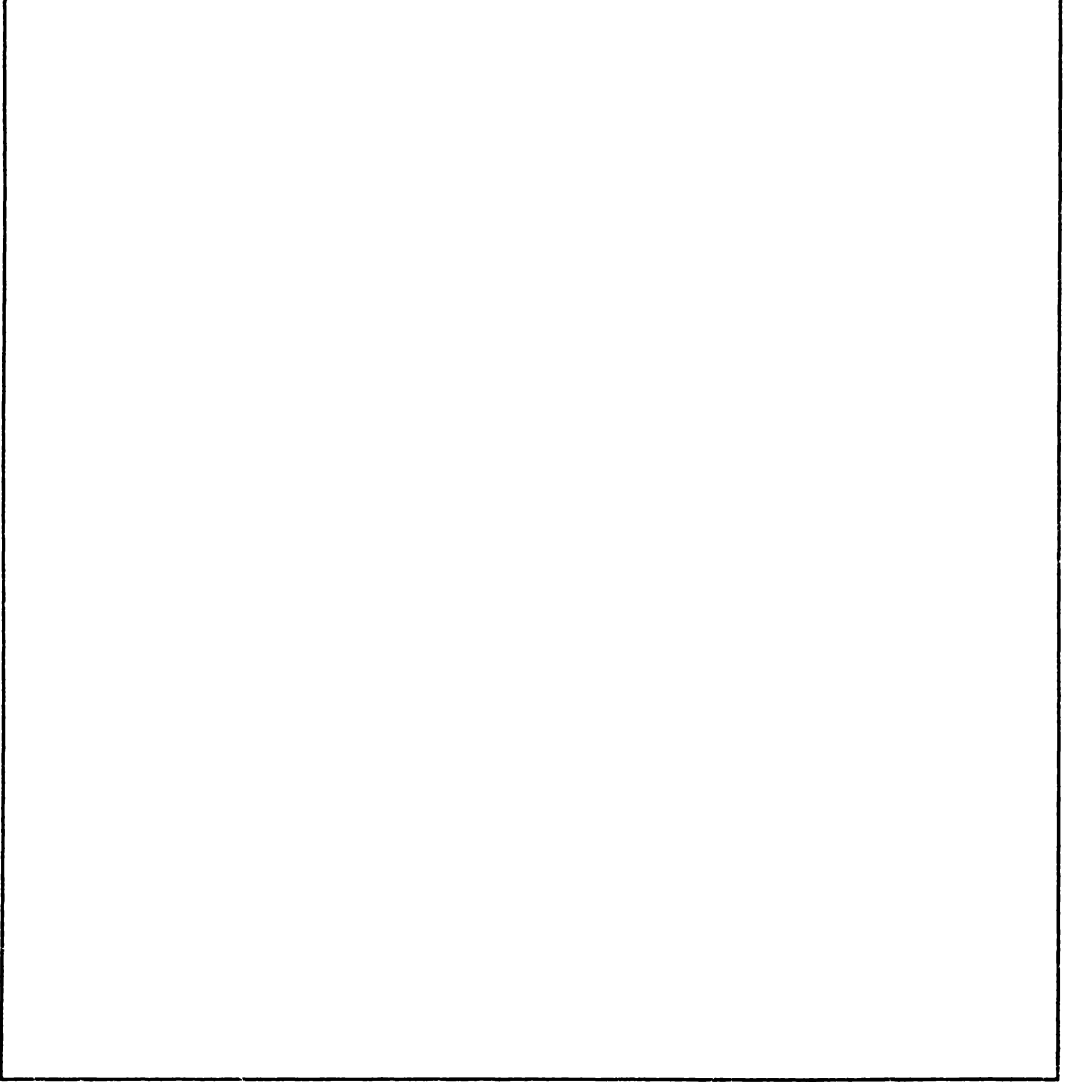
অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে
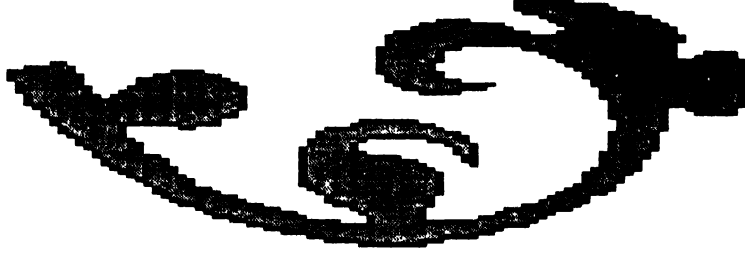
কোনও আন্দোলন ছিল না, তাই

কেতকী দত্ত

থিয়েটার এবং আমি — দুটোকে কখনই আলাদা করতে পারি না। ছোটবেলার স্মৃতি মানেই থিয়েটার, মা মানেই থিয়েটার, বাবার স্মৃতি সে-ও থিয়েটারের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠযুক্ত। সুতরাং আমাদের পরিবারই থিয়েটার-কেন্দ্রিক। আরও সঠিক বলতে গেলে, থিয়েটার-ভিত্তিক। থিয়েটার আমার রক্তে, থিয়েটার আমার চিন্তায়, চেতনায়, সম্ভবত নিদ্রায়ও। তাই থিয়েটারহীন জীবনের কথা চিন্তাও করতে পারি না। বয়স হয়েছে। কখনও-সখনও যে ক্লান্তি আসে না তা নয়। তবু সেই ক্লান্তি দূর করার মহাযৌধও সম্ভবত অভিনয়। সেই আমি এক থিয়েটারের মেয়ে যখন দেখি স্টার ভস্মীভূত, রঙমহল অনুষ্ঠানবাড়ির ভাড়া খাটছে, বিশ্বরূপা পোড়োবাড়িতে রূপান্তরিত, তখন যে কষ্ট অনুভব করি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নিজের বাড়ি, নিজের সংসার ভেঙে গেলে মেয়েরা যেমন বেদনায় মুহ্যমান হয় আজকের থিয়েটারের অবস্থা দেখে আমিও সেইরকমই মর্মাহত হই। বুঝি না, কেন এমন হল, কীসে এর মুক্তি।

মায়ের হাত ধরে সেই কোন ছোটবেলায় মঞ্চে যাওয়া শুরু করেছি। কত অভিনেতা-অভিনেত্রী দেখেছি। শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, গিরিশ ঘোষ— কাকে না দেখেছি? পরবর্তীকালে দেখেছি ছবি বিশ্বাস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, উত্তমকুমার— সিনেমার শিল্পী হয়েও মঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছেন, মঞ্চকে ভালোবেসেছেন। সেই মঞ্চের আজ কী হাল!

আমার মনে হয়, আজ গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে যারা হইহই করছেন তাঁদের এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। এমন দিন সম্ভবত খুব বেশি দূরে নয় যেদিন গ্রুপ থিয়েটারও থাকবে না। আজকের পেশাদার মঞ্চের মতোই মুখ থুবড়ে পড়বে গ্রুপ থিয়েটারও। অত্যন্ত দুঃখের হলেও একথা আমি বলছি থিয়েটারকে ভালোবাসি বলেই। বলছি, যদি আমরা এখনও সতর্ক হতে পারি — এই আশায়। হয়তো এখনও সতর্ক হলে থিয়েটারকে বাঁচানো যাবে। আসলে গ্রুপ থিয়েটার কথাটির সঙ্গে, গ্রুপ থিয়েটার ভাবনার সঙ্গে, পাশাপাশি উচ্চারিত হয় একটি শব্দ, সেটি হল আন্দোলন — এই আন্দোলনই সমস্ত কিছুকে বাঁচিয়ে রাখে। জলে যদি আন্দোলন না থাকে, যদি নদীর ঢেউ আন্দোলিত না হয় তাহলে জল বদ্ধডোবায় পরিণত হয়। শুরু হয় পচন। পচন থেকেই বিনাশ, ক্ষয়। পেশাদারি থিয়েটারের বিলুপ্তির কারণ হিসাবে হাজার একটা যুক্তি সাজাতে পারি। কিন্তু স্বীকার করতে হবে, আমাদের পেশাদারি থিয়েটারে একতা, কোনও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছিল না বলেই আজ এই করুণ অবস্থা। আজ আমরা গেল গেল বলে আর্তনাদ করছি। একদিনে তো যায়নি। যখন ক্ষয় শুরু হয়েছিল আমরা বদ্ধ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনও আন্দোলন শুরু করেছিলাম কি? অথচ শিশির ভাদুড়ীকে আমি দেখেছি,

থিয়েটারে লোকসান হচ্ছে, সেই থিয়েটারকে বাঁচাতে স্থায়ী মঞ্চ ছেড়ে তিনি ট্যুর পার্টি নিয়ে থিয়েটার করে বেড়িয়েছেন। ছবি বিশ্বাসকেও দেখেছি। কিন্তু পরের প্রজন্ম? শুধু নিজেরটা গোছাতে ব্যস্ত। থিয়েটার যায় যাক, আমি টিকলেই হল। তাই হয়েছে। থিয়েটার অবলুপ্ত। আমরা বেঁচে আছি পরগাছার মতো টিভি বা অন্য মিডিয়াকে জড়িয়ে ধরে।

হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি, ষাটের দশকের শেষের দিকে যখন গ্রুপ থিয়েটারের স্বর্ণযুগ তখন পেশাদারি থিয়েটার দর্শকরুচির পরিবর্তনের দিকে কোনও গুরুত্বই দেয়নি। অথচ দর্শক তো ভিন্ন রুচির নাটকের আস্বাদ লাভ করছে। পেশাদারি থিয়েটার সেই সময়টাকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। আপন গন্ধে আপনি মাতোয়ারা হয়ে পেশাদারি থিয়েটারে তখনও বস্তাপচা সেন্টিমেন্টাল কাহিনীর ছড়াছড়ি। ফলে দর্শক কমেছে। ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি মেটাতে হাজির হয়েছেন একদল নতুন প্রোডিউসার। এঁরা ব্যবসা করতেই এসেছিলেন। অন্য পাঁচটা ব্যবসার মতোই এরা লাভ করার দিকে মনোযোগী থেকেছেন। থিয়েটারকেও যে বোঝা দরকার, এ ব্যাপারটা মাথায় রাখেননি। এঁরা এসেই থিয়েটারে ফিল্মের গ্ল্যামারওয়ালা লোকজন আনতে শুরু করলেন। প্রচুর টাকা দিয়ে ফিল্ম-স্টার দেখালেই দর্শক উপচে পড়বে — এই ছিল এঁদের ধারণা। কিন্তু তা হয়নি।

না হওয়ার অনেক কারণ আছে। প্রথমত, চলচ্চিত্রের ওইসব শিল্পী যে পরিমাণ অর্থ মঞ্চ থেকে নিতেন তা মঞ্চের অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই সময়েই পেশাদারি থিয়েটার মহলে আর একটা ব্যাপার চালু হল, সেটা হচ্ছে তিন-দিক খোলা মঞ্চ — না-যাত্রা-না-থিয়েটার গোছের একটা ব্যাপার। এবার এই তিনদিক খোলা মঞ্চে বেশ নামজাদা 'স্টার'-দের দেখা গেল। এঁরা মফস্বলে গ্রামে গিয়ে অভিনয় করতে লাগলেন। একথা তো মানতেই হবে যে, পেশাদারি থিয়েটারের বড় দর্শক আসতেন মূলত মফস্বল শহর এবং গ্রামগঞ্জ থেকে। তিনদিক খোলা মঞ্চে পাড়ার ফুটবল খেলার মাঠে যখন এঁরা স্বপ্নের স্টারদের দেখা পেয়ে গেলেন তখন আর কীসের টানে এঁরা কষ্ট করে কলকাতায় আসবেন? ফলে পেশাদারি থিয়েটারের নাভিশ্বাস। লাভ করতে গিয়ে নতুন প্রোডিউসাররা বেশ লোকসানের মধ্যেই পড়লেন। এখানে উল্লেখ করতে হবে, এই সময় বিজ্ঞাপনের খরচ বৃদ্ধির ব্যাপারটিও। প্রচুর বেড়ে গেল। এসব যখন ঘটছে তখন আমরা, পেশাদারি থিয়েটারের মানুষরা, থিয়েটার বাঁচানোর জন্য কী করেছি? সংগঠিত করেছি কোনও আন্দোলন? আন্দোলন ছিল না বলেই পচন ধরতে শুরু করেছিল, তাই আজ এই অবস্থা। তাই গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে ওই কঠিন কথাগুলো আমি উচ্চারণ করলাম। আমার মনে হয় গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে আন্দোলন কথাটি এখন আর সেভাবে উচ্চারিত হয় না। আন্দোলনরহিত হলে সেই থিয়েটারও টিকবে না।

এরপর আসে দূরদর্শনের কথা। ঘরের মধ্যে এত এন্টারটেইনমেন্টের ছড়াছড়ি — মানুষ আর বাইরে যেতে চায় না। এটা ভালো না খারাপ, এর খারাপ দিক কী কী সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। সে আলোচনায় যাব না। আমি বলছি ঘটনার কথা। টিভি আমাদের গৃহবন্দী করেছে, সিনেমা হলে ভিড় নেই, থিয়েটার বন্ধ। আমরা অন্ধের বিশ্বদর্শনে মশগুল!

থিয়েটার হলগুলো বন্ধ হয়ে গেল — একের পর এক। সরকারের ভূমিকা সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গ বলতে হয়। সরকার শিশির মঞ্চ করেছে, গিরিশ মঞ্চ করেছে। অহীন্দ্র মঞ্চ করেছে। ভালো কথা, করেছে, এ নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু কেন, নতুন করে শিশির মঞ্চ কেন? ওখানে কটা থিয়েটার হয়? শুধু একটা নাম ব্যবহার করে নাম কেনার চেষ্টা কেন? শিশিরবাবুর পদধূলিধন্য মঞ্চটিকে নতুন করে গড়া যেত না? সেটার নতুন নামকরণ হতে পারত শিশির মঞ্চ। মঞ্চটাও বাঁচত, সরকারেরও কিছু কর্তব্য করা হত। অহীন্দ্র মঞ্চ তো অহীন্দ্র চৌধুরীর লজ্জা — ওখানে কী হয়? আসলে আমরা কেউই সংরক্ষণের কথা ভাবিনি। আজ স্টার নিয়ে হইচই হচ্ছে — ভালো কথা। কিন্তু এ কোন স্টার? এ তো বিনোদিনীর স্টার নয়। ক'জন জানে সে কথা? সর্বত্রই রাজনীতির খেলা চলছে। ওতে রাজনৈতিক ফায়দা-লোটাই হয়, ওতে সংস্কৃতি যেমন বাঁচে না তেমনই দেশের ঐতিহ্যও বাঁচে না। তাই স্টারে আগুন লাগে, রঙমহল অনুষ্ঠানবাড়ি ভাড়া খাটে। আর আমরা? শুধুই দিনযাপনের দৌড়ে সামিল হই, আন্দোলিত হই না, আন্দোলনে নামি না।

মুখোমুখি : তন্দ্রা চক্রবর্তী

অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে
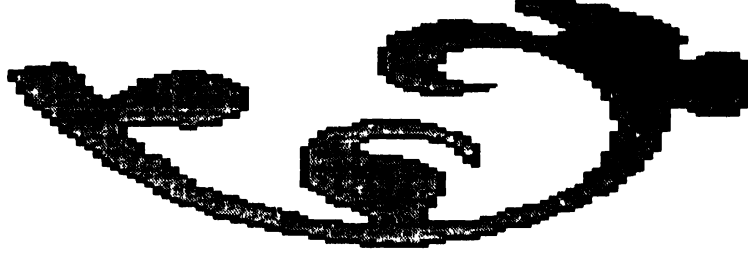
সময়ের পালাবদল আর দর্শক

লিলি চক্রবর্তী

সেইসব দিনগুলো কথা মনে পড়লে আজও রোমাঞ্চ অনুভব করি। পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের সেই আলো, সেট, রঙের গন্ধ, কর্মব্যস্ততা, হাঁক-ডাক, হাসি-তামাশা, শ্রদ্ধা-মুগ্ধতা আজও আমাকে স্মৃতিমেদুর করে তোলে। আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে কলকাতার পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ। অথচ এই রঙ্গমঞ্চে আমার আসার কথা ছিল না। অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা বিক্রমপুরে ১৯৪১ সালের ৮ অগাস্ট আমার জন্ম। বাবা কেশবনাথ চক্রবর্তী ব্যবসায়ী ছিলেন। আমার শৈশব কেটেছে মধ্যপ্রদেশের চিন্দোয়াড়া জেলার পরাশিয়া গ্রামের কয়লাখনি অঞ্চলে। কলকাতা থেকে সে ছিল এক অচিনপুরের দেশ। বিশেষত পরাধীন ভারতে, যখন কমিউনিকেশন এত উন্নত ছিল না। ওই নির্জন প্রান্তরে, অবারিত প্রকৃতির কোলে আমরা ক'ঘর বাঙালি বাস করতাম। প্রবাসী বলেই আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার বাড়তি তাগিদ ছিল। কালীপুজো, দুর্গাপুজো হত। সেই উৎসবকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল আমাদের আত্মা, আমাদের নিঃশ্বাস। আমার মা দীপালি চক্রবর্তী ছিলেন নাচে-গানে পারঙ্গম। তিনি সুদক্ষ অভিনেত্রীও ছিলেন। তাঁর অভিনয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নান্দীকার দলের 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' এবং 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' এই দুটি প্রযোজনায়। মা আমাকে নাচ-গান শিখিয়েছিলেন। তাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানের জন্য, নাচের জন্য আমার ডাক আসত। আমিও পারফরম্যান্স করে আনন্দ পেতাম।

এভাবে যখন আমি ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে উঠছি তখনই একটা নাটকে অভিনয়ের সুযোগ এল। ওখানকার জনৈক বাংলার মাস্টারমশাই 'বাগদীর মেয়ে' নামে একটা নাটক লিখেছিলেন। কালীপুজো উপলক্ষে ডুমুরিয়া নামে এক অঞ্চলে মঞ্চ বেঁধে অভিনয় হল। আমি নামভূমিকায় অভিনয় করলাম। মূলত জাতপাতের বীভৎসতাকে বিষয় করে এই নাটক রচিত হয়েছিল। নাচ-গান, বঞ্চনাবোধের সংমিশ্রণে নিজেরই অজান্তে হয়তো আমার অভিনয়টা ভালো হয়ে থাকবে। খুব প্রশংসা পেলাম। আমাকে ঘিরে সকলের সে কী উচ্ছ্বাস! দর্শকদের অভিনন্দন আমার মনে অভিনয়ের নেশা ধরিয়ে দিল। সেই শুরু।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ব্যবসা-বাণিজ্যে সাময়িক মন্দা দেখা দেয়। একটা নতুন রাষ্ট্র, স্বাভাবিক কারণেই গুছিয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া সেটা ছিল স্বপ্নে ভেসে চলার সময়। রাষ্ট্রচালনার কায়দা-কানুন তখনও আয়ত্ত করা যায়নি। ফলে অনেকের মতো আমার বাবার ব্যবসাতেও মন্দা দেখা গেল। এদিকে আমারও কলেজে ভর্তির ব্যাপার ছিল। জীবন ও

শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজনে কলকাতায় পা রাখলাম ১৯৫৮ সালে, সঙ্গো গোটা পরিবার।

কিন্তু কলকাতা মানেই তো সব পেয়েছির দেশ নয়। তাই অস্তিত্ব রক্ষার্থে সকলে যে যার মতো চেষ্টা করতে লাগলাম। বাবা শূন্য থেকে শুরু করলেন। আমার মা আর মেজদি শেলী তাঁদের অর্জিত অভিনয় শিক্ষাকে পুঁজি করে সংসারের হাল ফেরাতে লাগলেন। একদিন মেজদি শেলীর হাত ধরে চোরবাগানেব নবনাট্যম নাট্যদলের মহলাকক্ষে উপস্থিত হলাম। নির্দেশক দেবব্রত চৌধুরী তখন 'মেঘনাদবধ কাব্য' নাটকের মহড়া দেওয়াচ্ছিলেন। আমাকে তিনি একটা ছোট চরিত্রে অভিনয় করার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি কিছু না ভেবেই হ্যাঁ বলে দিলাম। মেজদিকেও জিজ্ঞাসা করলাম না। রিহার্সাল শেষে বাবা মেজদিকে রোজ আনতে যেতেন। সেদিনও এলেন। মেজদির কাছে আমার কীর্তির কথা শুনে বাবা মহাফাঁপড়ে পড়লেন। বললেন, শুনে মা খুব রাগ করবেন। বাবার মুখে সব শুনে মা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর একটু ভেবে বললেন, নাটক করো, তবে পড়াশোনায় ফাঁকি দিলে চলবে না। মায়ের সম্মতিতে আমার আনন্দ আর ধরে না।

'মেঘনাদবধ কাব্য' নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। আমি রতি চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। আমার অভিনয় দেখে অফিস ক্লাবগুলো থেকে ডাক আসতে লাগল। আমিও প্রচুর নাটকে অভিনয় করতে লাগলাম। তখন অফিস ক্লাবগুলের শো বেশিরভাগই স্টার থিয়েটারে হত। ফলে স্টার কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় একটা ফিল্মে অভিনয় কবার সুযোগ পাই। সে ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস। তিনি স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য আমার নাম কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেন। ছবিদার হাত ধরেই ঐতিহ্যমণ্ডিত স্টার থিয়েটারে আমার অবির্ভাব। তখন (১৯৬১) স্টারে সুবোধ ঘোষ রচিত, দেবনারায়ণ গুপ্ত নির্দেশিত 'শ্রেয়সী' নাটকটা চলছিল। আমি কাজরী চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেলাম।

সুযোগ তো পেলাম। কিন্তু বিহার্সালে গিয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। চারপাশে কী সব দিকপাল শিল্পী। ছবি বিশ্বাস তো ছিলেনই। তাছাড়াও কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, অনুপকুমার, অপর্ণা দেবী। সব মিলিয়ে ভীতিকর অবস্থা। তবু বুক ঠুকে অভিনয় করলাম। গুরুজনদের আশীর্বাদে উতরেও গেলাম।

'শ্রেয়সী'-র পর 'শেষাগ্নি'। তারপর জহর রায় নির্দেশিত 'অপরিচিতা' নাটকে অভিনয় করলাম। রঙমহলে মঞ্চস্থ হয়েছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'না' সেই সময়ের সাড়া জাগানো নাটক। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে অভিনীত হয়। ওই নাটকে আমি হঠাৎই ডাক পেয়ে যাই মাধবী মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে। কারণ মাধবীদি তখন সন্তানসম্ভবা ছিলেন। হঠাৎ সুযোগ পাওয়া আমার জীবনে আর একবার ঘটেছিল। রবি ঘোষ নির্দেশিত 'শ্রীমতী ভয়ঙ্করী' নাটকে বাসবী নন্দীর পরিবর্তে অভিনয় করতে হয়েছিল। মাধবীদির মতো বাসবীরও একই কারণ ছিল।

পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের নাটকে দু-চারটে অভিনয় করার পরে পরেই আমার জীবনে অদ্ভুত এক সমস্যা এল। আমি এখানে আসার আগে থেকেই চলচ্চিত্রে অভিনয় করছিলাম। সমস্যা দেখা দিল তপন সিংহ পরিচালিত হাঁসুলিবাঁকের উপকথা ছবিব আউটডোর শ্যুটিংয়ের সময়। আমি তখন স্টারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। স্টার কর্তৃপক্ষ আমাকে আউটডোর শ্যুটিংয়ে ছাড়তে রাজি হলেন না। মহা ফাঁপড়ে পড়লাম। তপন সিংহের মতো পরিচালক, লোভনীয় প্রস্তাব, পাঁচ-সাত ভেবে ছবিদাকে ধরলাম। কর্তৃপক্ষের সঙ্গো কথা বলে ছবিদা ছুটির ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই চলচ্চিত্রই আমাকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। আমি বম্বেতে (অধুনা মুম্বই) কাজ আরম্ভ করলাম। হৃষীকেশ মুখার্জিসহ বম্বের বেশ কিছু নামী-দামি পরিচালকের সঙ্গো কাজ করছিলাম। মাঝে মাঝে বাংলা ছবিব জন্য কলকাতায় আসতে হত। সেই অবকাশে একবার জ্ঞানেশদা ধরলেন। বললেন, সারা জীবন বম্বে পড়ে থাকলে বাংলা সংস্কৃতি, তোমার তৃপ্তি, শিল্পীসত্তার বিকাশ কী করে ঘটবে? জ্ঞানেশদার কথায় মনে আলোড়ন উঠল। আর বম্বে গেলাম না। ১২ বছর পরে আবার পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে ফিরে এলাম।

এইসময় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত 'নামজীবন' নাটকে অভিনয়ের সুযোগ পাই। এটাই আমার জীবনের সেরা নাটক। চলচ্চিত্রে যেমন সত্যজিৎ রায়কে আমি সেরা পরিচালক বলে মনে করি, নাটকে সৌমিত্রদার স্থান সেইরকম। এর আগে দিলীপ রায় নির্দেশিত 'রাজদ্রোহী' নাটকে অভিনয় করেছিলাম। এটাও উল্লেখযোগ্য একটা প্রযোজনা। সেই

সময় এ নাটকটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

তবে আমার পেশাদারি নাট্যজীবনে স্মৃতিমধুর একটা প্রযোজনা হল তরুণ ভাদুড়ী রচিত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বিলকিস বেগম'। বিজন থিয়েটারে এই এক হাজারেরও বেশি শো হয়েছিল। 'বিলকিস বেগম' পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে একটা মাইলস্টোন। গানে-আলোয়-আবহে-পোশাকে-দৃশ্যপটে-অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন সকলেই। ওই নাটকে বিলকিস বেগমের মা আনোখা বেগমের চরিত্রে অভিনয় করে আমি তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

শুধু অভিনয় নয়, এই নাটকটির প্রযোজনার কাজেও আমি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। এই নাটকের পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্বে আমি ছিলাম। বিশেষত মেয়েদের পোশাক। 'বিলকিস বেগম' নাটকে অনেকগুলো গান ছিল। আমি প্রস্তাব করি পুরুষকণ্ঠের গানগুলো হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে গাওয়ানো হোক। সকলে দ্বিধান্বিত। উনি কি রাজি হবেন! আমি বললাম, কথা বলেই দেখা যাক না। একদিন হেমন্তবাবুর বাড়ি গেলাম। উনি রাজি হলেন। তারপর বললেন এই টাকা লাগবে। পারিশ্রমিকের অঙ্ক শুনে আমাদের সকলের মাথায় হাত। জ্ঞানেশদারা চুপ করে আছেন। আমি সাহসে ভর করে বললাম, এত টাকা আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। হেমন্তবাবু বললেন, তোমরা কত টাকা দিতে পারবে? আমরা সকলে আলোচনা করে একটা অ্যামাউন্ট বললাম। উনি রাজি হলেন।

কেবল পুরুষের কণ্ঠে গান নয়, নারীকণ্ঠেও কতগুলো গান ছিল। হেমন্তবাবুর পাশে মানানসই এমন গায়িকা চাই। আমাদের দুশ্চিন্তা বাড়ল। জ্ঞানেশদাকে প্রস্তাব দিলাম হৈমন্তীকে ধরলে কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ। হৈমন্তী এক কথায় রাজি হয়ে গেল। বিনা টাকায় গান করলেন। বললেন, হেমন্তদার সঙ্গে গান গাওয়াটাই পারিশ্রমিক।

এর পরে জ্ঞানেশদা নির্দেশিত 'খোকাগুন্ডা' (বাসুদেব মঞ্চ), 'বেণীসংহার', 'হচ্ছেটা কী' (কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ), 'সুখের ঠিকানা' (বিজন), 'জীবন সঙ্গিনী' (রঙমহল), 'অপরাজিতা' (বিজন), 'মানিকচাঁদ' (রঙমহল), 'বৈশাখী ঝড়', 'গৃহপ্রবেশ' (বাসুদেব মঞ্চ) এবং চিন্ময় রায় নির্দেশিত 'সুন্দরী লো সুন্দরী', সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত 'ন্যায়মূর্তি' নাটকে অভিনয় করি। এরমধ্যে 'বেণীসংহার' নাটকের সংলাপগুলো আমি হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করি। নাটকটার কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিল একজন মিলিটারি লোক, অবাঙালি। নির্দেশক জ্ঞানেশদাকে প্রস্তাব দিই, মিলিটারি দম্পতির মধ্যে কথাবার্তা হিন্দিতে হলে বেশি ইন্টারেস্টিং হবে। জ্ঞানেশদা প্রস্তাবটা অনুমোদন করলেন। পরে দেখা গেল সত্যিই হিন্দি সংলাপের জন্য নাটকটা আকর্ষণীয় হয়েছে। সেই সময়ের প্রখ্যাত সমালোচক সেবাব্রত গুপ্ত 'বেণীসংহার' প্রযোজনার খুব প্রশংসা করেছিলেন। চলচ্চিত্রের ব্যস্ততা এবং অন্যান্য অনেক কারণে 'ন্যায়মূর্তি'-র পর আর কোনও পেশাদারি থিয়েটারে অভিনয় করা হয়নি। এখন তো সে প্রশ্ন আর ওঠেই না। মঞ্চগুলো প্রায় সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

তবু পেশাদারি রঙ্গামঞ্চের বিলুপ্তির কথা ভেবে মন বিষণ্ণ হয়। গিরিশ ঘোষ, শিশির ভাদুড়ী প্রমুখ অবিস্মরণীয় নাট্যব্যক্তিত্ব যে ঐতিহ্য গড়েছিলেন তা ধরে রাখা গেল না। হাউসগুলোর দৈন্যদশা, শক্তিশালী নাট্যকার ও সৃষ্টিশীল নির্দেশকের অভাব বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। দেবনারায়ণ গুপ্ত, জ্ঞানেশদা, সৌমিত্রদাদের মতো মাপের নির্দেশক কোথায়? মানের অবনতি যেদিন থেকে হতে থাকে, সেদিন থেকেই পেশাদারি রঙ্গামঞ্চের বিলুপ্তির সূচনা।

তাছাড়া টেলিভিশন একটা বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। ঘরে ঘরে টিভি পৌঁছে গেল। হরেকরকম অনুষ্ঠান ঘরে বসে বিনা ব্যয়ে, বিনা শ্রমে আমাদের দেখার সুযোগ এসে গেল। গাড়ি ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি নানা খরচ ও ঝক্কি সামলে হাউসে দর্শক আসা কমতে লাগল। এর ওপর টিকিটের দাম বাড়ল। দর্শক আরও বিমুখ হয়ে পড়লেন।

তবে আমার মনে হয়, সময়ের পালাবদলই বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। একদিকে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অধিপত্য। অন্যদিকে শিল্পীরা নিজেদের দর্শক সাধারণের কাছে সুলভ করে তোলেন যাত্রা, ওয়ান-ওয়াল ইত্যাদিতে গিয়ে। আগের শিল্পীরা নিজেদের অধরা রেখে আকর্ষণকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু এ কালের শিল্পীরা পারলেন না। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আর্টিস্ট দেখার নেশায় যে দর্শক আসতেন, তাঁরা ছিলেন পেশাদারি রঙ্গামঞ্চের প্রাণভোমরা। তাঁদের অনুপস্থিতিতেই পতন।

মুখোমুখি : শিবনাথ বিশ্বাস

অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে
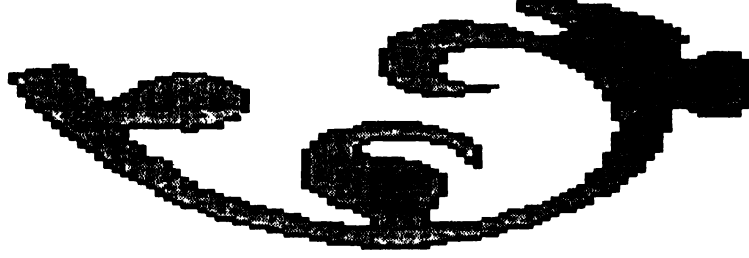
মানও নেমে গিয়েছিল অনেক

সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

পেশাদারি থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেছে — এটাই চরম বেদনার। মঞ্চেই আমার অভিনয় জীবনের সূত্রপাত। সময়টা এখন আর মনে নেই। তবে শ্রীরঙ্গম থেকে সবে বিশ্বরূপা হয়েছে। সেই সময় আমার প্রথম অভিনয় 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকে। না, তার আগে কোনও ছবিতে আমি কাজ করিনি। সুতরাং এই মঞ্চ বা পেশাদারি থিয়েটার সম্পর্কে আমার একটা অন্য সেন্টিমেন্ট আছেই। পরবর্তীকালে আরও অনেক নাটক করেছি, এখনও করছি। আমাদের উত্তম মঞ্চই এখনও টিকে আছে। আমরাই এখন বৃহস্পতি-শনি-রবি শো করছি — আজ বোধহয় এটাই পেশাদার থিয়েটারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে এর মধ্যে কোথায় যেন একটা বেদনার সুর বেজে চলেছে। স্টার নেই, বিশ্বরূপা নেই, রঙমহল নেই, মিনার্ভা নেই — আমরা আছি। এ থাকা আনন্দের নয়, বড় বেদনার।

কেন পেশাদার থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল — এ প্রশ্নের জবাব আমার খুব নিশ্চিতভাবে জানা নেই। তবে দীর্ঘদিন মঞ্চে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা থেকে যেটুকু মনে হয়েছে সেটুকুই বলতে পারি। প্রথমত, দূরদর্শন। দূরদর্শন একটা বড় কারণ বলে আমি মনে করি। দূর-দূরান্ত থেকে আগে মানুষ আমাদের থিয়েটার দেখতে আসতেন। আসতেন, কারণ তাঁদের সামনে অন্য কোনও বিনোদন ছিল না। গ্রাম-গঞ্জের মানুষ উৎসুক হয়ে থাকতেন কলকাতার কোন মঞ্চে নতুন কোন প্রযোজনা নামছে। কারা কারা তাতে অভিনয় করছেন। অনেকে মিলে দল বেঁধে তাঁরা আসতেন আমাদের নাটক দেখতে। বিনোদন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সেই ক্ষুধাতেই তাঁরা ছুটে আসতেন। আজ দূরদর্শন ঘরে ঘরে — গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্রই দূরদর্শন। যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে ব্যাটারি লাগিয়ে দূরদর্শন। অর্থাৎ ঘরের মধ্যে বিনোদন পৌঁছে গেছে। কেন শারীরিক এবং আর্থিক কষ্ট ভোগ করে কলকাতায় ছুটে আসবেন মানুষ? ফলে মঞ্চ মার খেতে শুরু করল।

ওইরকম যখন অবস্থা তখন একটা নতুন ব্যাপার চালু হল। মানুষ আসছেন না। আমরাই শুরু করলাম মানুষের কাছে যেতে। গ্রামে যাত্রা ছিল। আমরা যাত্রার বাজারটা ধরার চেষ্টা করলাম। অথচ আমরা তো যাত্রাশিল্পী নই। আমরা নতুন একটা কথা, একটা টার্ম চালু করলাম — ওয়ান-ওয়াল। এই ওয়ান-ওয়াল গ্রামে গঞ্জে নাটক করতে শুরু করল। তাতে কি মঞ্চ বাঁচল? আসলে মঞ্চ বাঁচানোটা তো উদ্দেশ্য ছিল না — উদ্দেশ্য ছিল টাকা রোজগার। ফলে মঞ্চগুলির আজ এই হাল দাঁড়াল।

মঞ্চকে বাঁচানোর আর এক প্রকার চেষ্টা প্রোডিউসাররা করেছিলেন। সেটাও টেকেনি। ফিল্মের নামী-দামি হিরো-

হিরোইনদের থিয়েটারে নিয়ে এসেছিলেন একদল প্রোডিউসার। ফিল্মের লোকেরা থিয়েটার করতেই পারেন — তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু থিয়েটারের মানসিকতা নিয়ে থিয়েটার করতে হবে। থিয়েটারের ওঠা-পড়ার ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে, সেটা মেনে-মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার আছে। এখানেও যদি ফিল্মের মতো শুধু নিজের হিসাবটা বুঝে নিয়ে খালাস হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে চলে কী করে? এইসময় নামী-দামি যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা থিয়েটারের হিসাবটা বুঝতে নারাজ ছিলেন। নিজেরটুকু কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। ফলে থিয়েটারের অর্থনীতি আরও মুখ থুবড়ে পড়েছিল। ফলস্বরূপ আবারও সেই পেশাদার থিয়েটারের বেহাল অবস্থা।

তৃতীয়ত, থিয়েটারের গুণগত মানের অবনতি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন ভাবনার গল্প নিয়ে নাটক হয়নি একথা যেমন সত্যি, তেমনই ক্রমশ নেমে গেছে অভিনয়ের মান। আমরা যেভাবে শিখেছি আজকালকার ছেলেমেয়েরা আর সেভাবে শিখতে আগ্রহী নয়। তাদের মধ্যে একটা সবজান্তাভাব লক্ষ্য করা যায়। অভিনয়শিক্ষার ব্যাপারটা একেবারেই নেই। তাই ক্রমশ থিয়েটারের মান নেমে গেছে।

এরই মাঝে আমরা তপন থিয়েটারে একটু অন্যভাবে ভেবেছিলাম। দলগত ব্যাপারটা মাথায় রেখে তপন থিয়েটার চালাতাম। অর্থাৎ শুধু ব্যবসা নয়, তার বেশি কিছু আমরা ভেবেছিলাম। সেক্ষেত্রে তপন থিয়েটার কিছুটা সাফল্যলাভ করেছিল। পরে নানা কারণে, বাড়িওয়ালার অত্যাচার ইত্যাদি কারণে তপন থিয়েটার বন্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু তারপরেই আমরা উত্তম মঞ্চ তৈরি করে কাজ করে যাচ্ছি। জানি এবং স্বীকার করি, আগেকার মতো পরিস্থিতি নেই। তবু আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি পেশাদার থিয়েটারকে ধরে রাখার। কিন্তু একার প্রচেষ্টায় কিছু হয় না। সংগঠিতভাবে কিছু করা দরকার — থিয়েটারের স্বার্থেই। তা না হলে থিয়েটার বাঁচবে না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, কিছু একটা ঘটবে, কেউ উদ্যোগ নেবে, আবার পেশাদার থিয়েটার বেঁচে উঠবে — নতুন রূপে, নতুন চেহারায়, নতুন ভাবনায়।

মুখোমুখি : তন্দ্রা চক্রবর্তী
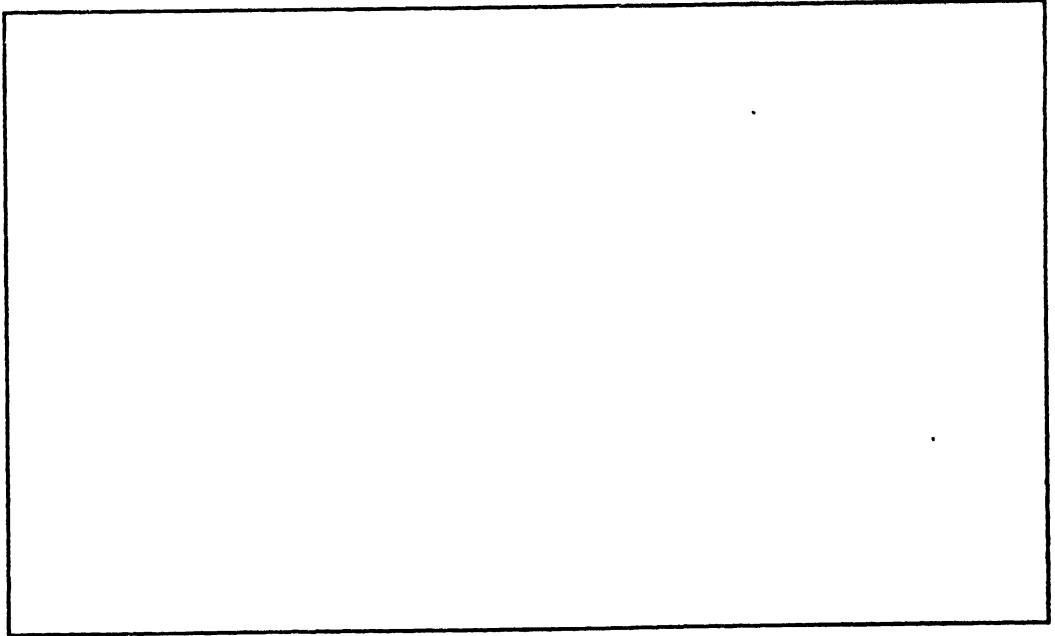
অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

টিভি, আর ব্যবস্থাপনার অভাব

রঞ্জিত মল্লিক

থিয়েটারের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। যেহেতু পেশাগত কারণে দিনের সিংহভাগ আমাকে চলচ্চিত্রে নিযুক্ত থাকতে হয় তাই থিয়েটারে সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ থিয়েটারেরও দাবি, নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট দিন — বৃহস্পতি, শনি ও রবি।

কিন্তু প্রস্তাবটা ছিল অনেকদিনের। আর ছায়াছবির অভিনেতা হিসাবে পরিচিতির পাশাপাশি অভিনয়ের অপর মাধ্যটির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিযুক্তি ঠিক মেনে নিতে পারছিলাম না। ঠিক করলাম, একবার অন্তত থিয়েটার করব। সেই সিদ্ধান্তেরই ফল, 'জয় বিজয়' নাটকে অভিনয়।

'শঠে শাঠ্যং' ফিল্মের গল্পটিই 'জয় বিজয়' নাটকের বিষয়। নির্দেশনায় ছিলেন দুলাল লাহিড়ী। প্রযোজক ডি. মুখার্জি, যাত্রাজগতের মানুষ। সময়টা মনে হয়, গত শতকের নয়ের দশক হবে। যতদূর মনে আছে, তিনটি মঞ্চে প্রায় ন'মাস ধরে অভিনয় করেছিলাম। তিনটি মঞ্চে অভিনয়, ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম অভিনয়স্থান কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ। আশানুরূপ ফল পাচ্ছিলাম না এখানে। কিন্তু প্রযোজনার গুণগত মান ও তার সাফল্যে আমরা স্থির নিশ্চিত ছিলাম। প্রচণ্ড পরিশ্রমে গড়ে তোলা এই নাটকটির এই মঞ্চে অসফলতার কারণ বুঝতে পারছিলাম না। অবশেষে মনে হল, রঙ্গমঞ্চের অবস্থানটাই মূল কারণ। সমস্যাটা পরিবহনের মনে হল। এই অনুমানে আমি প্রযোজককে মঞ্চ পরিবর্তনের পরামর্শ দিলাম।

অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল! মঞ্চবদল করে বঙমহলে এলাম। হুবহু একই প্রযোজনা এই মঞ্চে বিপুল সাড়া ফেলল। দর্শক-সমাদর লাভ করল। প্রথম রজনী থেকে প্রতিটি অভিনয় প্রায় 'পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ'।

নাটকটায় আমার দ্বৈত ভূমিকা ছিল। জয় ও বিজয় দুই যমজ ভাই। এই দুই যমজ চরিত্রেই আমি অভিনয় করতাম। খুব তাড়াতাড়ি পোশাক পরিবর্তন করতে হত। তাই আমি দুটো পোশাক একই সঙ্গে পরে থাকতাম। অবর্ণনীয় পরিশ্রম হত। কিন্তু দর্শকদের যখন ভালো লাগত তখন মনে হত পরিশ্রমটা সার্থক। কিন্তু এখানে আর একটি সমস্যার উদ্ভব হল। দুটো পোশাকই একই সঙ্গে পরে থাকার ফলে গরমের সময় অভিনয় করতে বেশ কষ্ট হত। সাফোকেশন হতে থাকল। শীতকালে অভিনয় শুরু হয়েছিল, তখন কোনও অসুবিধে হয়নি, কিন্তু গরমকালে এসে আর পারা সম্ভব হল না। প্রথমত, ডাবল রোল। দ্বিতীয়ত, ছুটির দিনে ডাবল শো। তখন একটি বাতানুকূল মঞ্চ খোঁজা শুরু হল এবং পাওয়া

গেল, দক্ষিণ কলকাতায় উত্তম মঞ্চ। এখানে অভিনয়ে শারীরিক কষ্ট আর রইল না। কিন্তু দর্শক সমাগম আগের মতো হল না। সেই সময় উত্তম মঞ্চ আজকের মতো এমন 'বহুল প্রচারিত নাম' ছিল না। তাই মূলত অবস্থানের কারণে আমাদের নাটক দর্শক আনুকূল্য লাভ করল না। আমরাও অসম্ভব বিবেচনায় অভিনয় বন্ধ করে দিলাম। তবে এই ন'মাস আমার মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতা অপূর্ব।

'জয় বিজয়'-ই প্রধানত আমার প্রথম ও শেষ মঞ্চাভিনয়। প্রধানত বলার কারণ, আরও একটি নাটকে আমি অভিনয় করি। নাটকটির নাম 'তিন নম্বর চোখ'। আমার অভিনীত চরিত্র 'কাঞ্চন'। কিন্তু এই প্রযোজনাটি কেবল বিদেশেই মঞ্চস্থ হয়েছে। পরের দিকে কলকাতায় অভিনীত হলেও, অভিনেতা হিসাবে আমি যতদিন যুক্ত ছিলাম তখন শুধু দেশের বাইরেই এই নাটকের অভিনয় হয়েছে।

এক বা একাধিক যাই হোক না কেন, থিয়েটারে আমার অভিনয়ের অভিজ্ঞতা এক কথায় অভূতপূর্ব। যাকে 'অপরিসীম ভালো লাগা' বলে তা কিন্তু আমি পেয়েছি নাটক অভিনয় থেকে।

মঞ্চে আমার ও দর্শকের সরাসরি যোগাযোগ এক অন্য উপলব্ধি। আমি যখন হাসাতে চেয়েছি, সে হাসছে দেখতে পাচ্ছি। যখন কাঁদাতে চেয়েছি, সে কাঁদছে। সে চমকিত হচ্ছে। এই যে তৎক্ষণাৎ দর্শকের প্রতিক্রিয়া তা কিন্তু আমরা ফিল্মে পাই না। ফিল্মের অভিনয়ের সাধারণ প্রতিক্রিয়া আমাদের কাছে আসে অনেক পরে, লোক মারফৎ। কিন্তু নাটকে এই যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তা আমার কাছে অনন্যসাধারণ! যদিও সময়াভাবে সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার জন্য এই মাধ্যম আমাকে খুব আকর্ষণ করে। আর তাছাড়া দুই মাধ্যমের মধ্যে নাটকে মনে হয় অভিনেতার স্বাধীনতা একটু বেশি।

সবশেষে বলি, মঞ্চে অভিনয় করে আমি পরিতৃপ্ত, আনন্দিত।

কিন্তু বেদনা এখানেই যে, এত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যে নাটক — বাংলা পেশাদারি থিয়েটার, তার আজ পড়ন্ত বেলা। কোনওটির নিবু-নিবু আলো, কোনওটি অগ্নিদগ্ধ, আর অধিকাংশেরই প্রায় বন্ধ দরজা। এর কতগুলি কারণ আছে বলে আমার মনে হয়।

প্রথমত, দূরদর্শনের আকর্ষণ। এক সময় মানুষ সিনেমাও দেখেছে, থিয়েটারও দেখেছে। উভয় ক্ষেত্রেই ছিল বিপুল দর্শক সমাগম। কিন্তু এর সমান্তরালে যখন দূরদর্শন এলো, শুরু হল তীব্র প্রতিযোগিতা। এই মাধ্যম এককভাবে বাকি দু'জনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। সরকারি, বেসরকারি চ্যানেল নেটওয়ার্ক সহযোগে প্রায় ২০টি সিনেমা ও সোপ প্রতিদিন সে পরিবেশন করছে। ঘরেই যখন বিনোদনের সমারোহ তখন আমরা বাইরে তাকাব কেন!

দ্বিতীয় কারণটি থিয়েটারের মধ্যেই রয়েছে। হলগুলির পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা। বেশ কিছু হলের (যদিও সব নয়) চারপাশের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন। হলের ভেতরে আসনব্যবস্থা, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ দর্শকের প্রত্যাশামাফিক নয়। আর, এক সময় এরকম শুনেছি, কলকাতার থিয়েটারের দর্শকদের ৭৫ শতাংশ ছিল জেলার মানুষ। এখন যখন কলকাতার থিয়েটার অনেক সময়ই অন্য জেলায় আমন্ত্রিত অভিনয়ে যাচ্ছে, তখন জেলার মানুষ কলকাতার থিয়েটার দেখার শ্রমসাধ্য কাজে আগ্রহী হবে কেন? এই যে জেলা ও কলকাতার ভেদরেখা মুছে যাওয়া, পেশাদারি রঙ্গালয়ের দর্শকপ্রিয়তাহ্রাসের সেটাই শেষ কারণ। সংশোধনযোগ্য ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সচেতন হলে আমরা হয়তো আশার আলো দেখতে পাব।

মুখোমুখি : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে

নিজেকে অপরাধী মনে হয়

বাসবী নন্দী

পেশাদারি থিয়েটার বলতে আজ আর কিছু নেই — সবই অতীত। বেশ কিছুকাল হয়ে গেছে অভিনয় ছেড়ে দিয়েছি। তবু এই পরিস্থিতির কথা ভাবলে কষ্ট হয় বইকি। ষাটের দশকে স্টারে 'শেষাগ্নি' নাটকের সূত্র ধরে আমার পেশাদারি মঞ্চের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। তারপর কোথায় নাটক করিনি? একমাত্র বিশ্বরূপা ছাড়া আর সব পেশাদারি মঞ্চে আমি অভিনয় করেছি। স্টার দিয়ে শুরু, তারপর রঙমহল, সারকারিনা, তপন থিয়েটার, উত্তম মঞ্চ— কোনওটা বাদ যায়নি।

পেশাদারি মঞ্চের এই দুরবস্থা হল কেন? এ-প্রশ্নের সামনে দাঁড়ালে নিজেকেও অপরাধী মনে হয়। এ-কথাটা প্রথমেই কবুল করে নেওয়া বোধহয় ভালো। আমি বলছি ওয়ান-ওয়াল থিয়েটারের কথা। আমিও করেছি, রবি ঘোষের সঙ্গে গ্রামে-গঞ্জে ওয়ান-ওয়াল করে বেড়িয়েছি। কিন্তু আজ বুঝি, কাজটা ভালো করিনি। পেশাদারি থিয়েটারের ক্ষতিই হয়েছে এই ওয়ান-ওয়ালের ফলে।

আমার মনে হয়, উত্তর কলকাতা এবং মফস্বলের মানুষের পেশাদারি থিয়েটারের প্রতি একটা বিশেষ টান ছিল। দূরদর্শন এবং কেব্‌ল লাইনের ফলে এই টান, এই আকর্ষণ খানিকটা কমে গেছে। মানুষ ঘরের মধ্যেই বিনোদনের সামগ্রী পেয়ে যাচ্ছেন। ফলে থিয়েটার মার খাচ্ছে, চলচ্চিত্র সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়।

এরপর রয়েছে জেনারেশন গ্যাপ। নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা থিয়েটার চাইছে না। বিনোদনের জন্য তারা অন্য কিছু চাইছে — র‍্যাফ, পপ, ব্যান্ড — এইসব আর কি। পরিস্থিতি যখন এবকম, যখন গ্রামের লোকেরা থিয়েটার দেখতে কলকাতায় ছুটে আসছেন না, তখনই আমরা উল্টো পথ নিলাম। ওঁরা আসছেন না — আমরাই হাজির হলাম ওদের ঘরের দরজায়, ওয়ান-ওয়ালের ব্যানারে। ব্যস, কলকাতার পেশাদারি মঞ্চে নাটক দেখতে আসার অভ্যাসটাই নষ্ট হয়ে গেল। দু'টাকা-তিনটাকায় ঘরের দোরে আমাদের দেখা গেলে কে আর কলকাতায় আসবে? কিন্তু ফল ভালো হল না — থিয়েটারও বাঁচল না, মঞ্চও বাঁচল না। আমরা বৃহত্তর বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব দিইনি, শুধু নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভেবেছি। বুঝতে চাইনি পায়ের নিচের মাটিটাকে পোক্ত করা দরকার। ফল যা হওয়ার হয়েছে, আমরা বাস্তুহারা হয়েছি।

দর্শকদের আমরা বঞ্চনাও কম করিনি। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসতেন ফিল্মের লোকদের দেখবেন বলে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই তাঁরা আসতেন। কিন্তু অনেক সময় এমন হয়েছে, কোনও কারণে ওইসব নামী অভিনেতা-অভিনেত্রী হয়তো সেদিন অভিনয় করলেন না। মানুষ টাকা এবং সময় ব্যয় করে এসে হতাশ হতেন। এইভাবে আমরা মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতাও হারিয়েছিলাম।

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিপাত

'মাইকেল' নাটকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী

দু-একটি কথা

মহেন্দ্র গুপ্ত

১.

এই প্রবন্ধে বাংলা থিয়েটারের দু-একটি অভাব-অভিযোগের বিষয় আলোচনা করব। কলকাতায় বর্তমানে রঙমহল, শ্রীরঙ্গাম, মিনার্ভা, স্টার ও কালিকা — এই পাঁচটি থিয়েটার চলছে। অগুন্তি সিনেমা হাউসের তুলনায় থিয়েটারের সংখ্যা সামান্য। অথচ সিনেমা হাউসগুলি বাংলার এবং হালে বোম্বাই অঞ্চলের ছবি দেখিয়ে বেশ দু'পয়সা অর্জন করছে, আর অল্প সংখ্যক থিয়েটার হাউসগুলি প্রায়ই হাতবদল হচ্ছে। (যুদ্ধের বাজারে কাঁচা-পয়সা আমদানির দিকটা এ প্রবন্ধে ধরা হয়নি; কারণ প্রবন্ধটি তার আগে লেখা।) থিয়েটারের এই দুর্দশার কারণ অনেকে বলেন, সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা। কিন্তু আমি সেকথা স্বীকার করি না। সিনেমা ও থিয়েটারের মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণকে আনন্দ পরিবেশন করা; এদিক দিয়ে উভয় প্রতিষ্ঠানের পরস্পরের মধ্যে মিল থাকলেও থিয়েটার চলে জীবন্ত রক্ত-মাংসের মানুষ নিয়ে, আর সিনেমা চলে ছায়া নিয়ে। দুই প্রতিষ্ঠানের আবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। গন্তব্যস্থান এক হলেও পথ দু'জনকার আলাদা। সুতরাং প্রতিযোগিতার প্রশ্ন এখানে উঠতেই পারে না। বর্তমানে অধিকাংশ থিয়েটার যে অল্পায়ু হয়ে পড়েছে, তার কারণ, সেই সব থিয়েটারের জীবনীশক্তির অপ্রাচুর্য অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ দৈন্য। বিশেষভাবে এই অভাবগুলি বিশ্লেষণ করে দেখাতে যাওয়া অল্প-পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে দু-একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই; সেগুলি বিবেচনা করলে কলকাতার থিয়েটারগুলির কর্তৃপক্ষ হয়তো বা লাভবান হতে পারেন। থিয়েটারের পেছনে মোটা ক্যাপিটাল থাকা, সরকারি সাহায্যলাভের প্রচেষ্টা প্রভৃতি অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে এর আগে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন। ওসব যাঁরা পান বা পাওয়ার আশা রাখেন, তাঁরা ভাগ্যবান। বড় বড় বিষয় বাদ দিয়ে, আমি বলব ছোট দু-একটি কথা, যা ইচ্ছে করলেই থিয়েটারগুলি একসঙ্গে মিলে গঠন করে তুলতে পারেন।

প্রথম অভাবের কারণ হল : থিয়েটারগুলির মধ্যে ব্যবসাগত ঐক্য। চিত্র-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমবায় আছে; সেখানে

তাদের সাধারণ অভাব-অভিযোগের আলোচনা হয় এবং অভাবগুলির প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কলকাতার থিয়েটারগুলোর কোনও সঙ্ঘবদ্ধ মিলন কেন্দ্র বা অ্যাসোসিয়েশন নেই। এই দুর্মূল্যের বাজারে পাবলিসিটির জন্য থিয়েটারগুলির কম পয়সা খরচ হয় না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বলুন কিংবা পোস্টার, ফ্লাইশিট ছাপানো বলুন, সবদিক দিয়েই থিয়েটারকে নির্ভর করতে হয় কাগজওয়ালা বা ছাপাখানার নির্ধারিত মূল্যের ওপর। থিয়েটারগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হলে কি এদিক দিয়ে খানিকটা সুবিধা পাওয়া যায় না? পাবলিসিটির বিষয় আমি উল্লেখ করলুম একটা উদাহরণ হিসাবে। এছাড়া থিয়েটারের এমন অনেকগুলি ব্যবসাগত অভাব-অভিযোগ আছে, যেগুলি একটি সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র গঠন করলে অনায়াসে দূর হতে পারে।

মঞ্চ-সংশ্লিষ্ট সমস্ত শিল্পীর জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ওই ধরনের কোনও ফান্ডের ব্যবস্থা করা সব থিয়েটারের একান্ত কর্তব্য। অপরিমিত ব্যয়ের ফলে শেষ জীবনে অধিকাংশ শিল্পীকে যে কী দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয় — তা আমরা কতবার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শিল্পীর অকাল-মৃত্যুতে শোকসভা করেই যেন আমাদের সকল দায়িত্ব শেষ না হয়। মৃত্যুর পেছনে যারা পড়ে রইল — জীবন্ত মৃত্যুর যাতনা সইতে —তাদের আর্থিক ক্লেশ লাঘব করার খানিকটা দায়িত্ব রঙ্গমঞ্চকে নিতে হবে বইকি। রঙ্গমঞ্চ যদি শিল্পীকে সেই প্রতিশ্রুতি দেয় — তাহলে মঞ্চের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। প্রত্যেক মঞ্চের শিল্পী তাহলে নিজ নিজ কর্মস্থলকে নিজের জিনিস বলে ভাবতে শিখবে। বাইরের প্রলোভন তাকে তার মঞ্চ হতে সহসা অন্যত্র টেনে নিতে পারবে না। এবং মঞ্চের সঙ্গে শিল্পীর এই যে একাত্মবোধ — শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে এর মূল্য অনেকখানি।

আর একটি বড় অভাব, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবেও বটে এবং কলাকেন্দ্র হিসাবেও বটে, সে হল, থিয়েটারের সঙ্গে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষার সংযোগ স্থাপন। নাটক নির্বাচন, নাট্য-পরিচালনা, নাটকের দৃশ্যপট নির্মাণ, অভিনেতার রূপ-সজ্জা, নাটকের চরিত্র রূপায়ণ প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ যদি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার উপদেশ বা সাহায্য পান, তার ফলে, থিয়েটার যে কত রকমে লাভবান হয় সে কথা বলাই বাহুল্য। এককালে স্টারে, আর্ট থিয়েটারের আমলে এবং শিশিরকুমারের নাট্যমন্দিরে এইরূপ প্রতিভা-সমাবেশের কথা শুনেছি। থিয়েটার হয়েছিল তখন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণীর মিলনতীর্থ। তাঁরা সকাল-সন্ধ্যায় থিয়েটারে সমাবেত হয়ে শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান কত বিষয় আলোচনা করতেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগে থিয়েটারে একসঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন হত। এখন দু'জনকার মিলন হওয়া তো দূরে থাক, দু'জনেই যে বিদায় নিতে বসেছেন! থিয়েটারে দেশের মনীষা-সম্মিলন কি এমনই কষ্টসাধ্য ব্যাপার — যার জন্য আজ থিয়েটারগুলির এই দুর্দশা হয়েছে?

আর একটি অভাবের কথা উল্লেখ করে এ নিবন্ধ শেষ করতে চাই। সে হল, থিয়েটারের অভ্যন্তরীণ সমিতি — যে সমিতিতে শুধু প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থনের বাহ্যিক আড়ম্বর না রেখে থিয়েটারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধানের আলোচনা হবে। প্রত্যেক থিয়েটারে সপ্তাহে অন্তত এক আধ দিন ছুটির ব্যবস্থা আছেই। সেইদিন যদি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ, অভিনেতৃগণ বা অভিনয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে সাময়িক অভাব অভিযোগের বিষয় আলোচনা করেন, তাহলে প্রত্যেকেই লাভবান হতে পারেন। এ ছাড়া সম-সাময়িক সাফল্যমণ্ডিত নাটক বা চলচ্চিত্রের সাফল্যের কারণ নির্ণয়, নবাগত নট-নটীকে শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও সেই সমিতিতে হতে পারে। বদ্ধ আবহাওয়ার ভিতর দিনের পর দিন থিয়েটারের সংশ্লিষ্ট লোকদের কোনওরকমে 'দিন-গুজরান' করতে হয়; এইরকম একটি পারস্পবিক মিলনকেন্দ্র স্থাপিত হলে — তাঁরা সবাই পৃথিবীর মুক্ত হাওয়ায় খানিকটা নিঃশ্বাস নিতে পারেন, বৃহত্তর পৃথিবীর যেটুকু সূর্য-কিরণ তাঁরা লাভ করবেন, তাতে তাঁদের পরমায়ু বৃদ্ধিই হবে।

২.

ব্যবসার দিক থেকে থিয়েটার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলব।

যুদ্ধের বাজারে অনেকে প্রচুর কাঁচা পয়সা রোজগার করছেন। পয়সা তাঁদের কাছে আসছে যেমন জলের মতো ....

খরচ হতে চাইছেও তেমনই জলের মতো। তাঁদের ভিতরে অনেকে ঝুঁকেছেন থিয়েটার খুলতে। কলকাতা শহরের সব বড় বড় রাস্তায় থিয়েটারের জন্য বাড়ি খোঁজার ধুম পড়ে গেছে।

সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই কলকাতা শহর বাদে আর কোথাও প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে নিয়মিত অভিনয় ব্যবস্থা নেই। এই শিল্পকে, এই ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বাঙালি। শিল্পচর্চা হিসাবে এবং জীবনের বৃত্তিরূপে শুধু বাঙালির কাছেই অভিনয়কলা অবিভাজ্য রূপ নিয়েছে। তাই গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে এক কলকাতা শহরে পাঁচটি প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে নিয়মিত অভিনয় হচ্ছে। এটা আমাদের গৌরবের কথা।

এই পাঁচটি থিয়েটার ব্যতীত আরও নূতন নূতন থিয়েটার যদি কলকাতায় স্থাপিত হয়, তাতে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। যেখানে অগুন্তি সিনেমা হাউস রঙ্গামোদী দর্শকগণের এক বিরাট অংশ টেনে নিচ্ছে, সেখানে যদি পাঁচটি থিয়েটারের সঙ্গো আর দু'চারটি নূতন থিয়েটার যোগ দেয় — তাহলে সমষ্টিগতভাবে থিয়েটার পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি দর্শক আকর্ষণ করবে — থিয়েটারের বলবৃদ্ধি হবে। তাই বলছিলুম — থিয়েটার সংখ্যায় যত বেড়ে যাবে ততই আমাদের আনন্দের কথা, আশার কথা। থিয়েটারের সংখ্যাবৃদ্ধি হলে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা সব থিয়েটারগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে — ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে — যাঁরা এই যুক্তি দেখান, তাঁদের আমি সমর্থন করতে পারি না। তবে এ বিষয়ে ভাবার কথা আছে। নূতন থিয়েটার খুলতে গেলে আগে বর্তমানের পাঁচটি থিয়েটারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। যাঁদের মস্তিষ্কে নূতন থিয়েটার পরিচালনার কল্পনা জেগেছে — তাঁরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে, শহরের পাঁচটি রঙ্গালয় বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা বেশি দর্শক আকর্ষণ করছে, থিয়েটারগুলির অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হয়েছে। থিয়েটার-ব্যবসায়ে লাভবান হওয়া যায় এ ধারণা মনে না এলে তাঁরা নিশ্চয়ই এই ব্যবসায় নামার পরিকল্পনা করতেন না। কিন্তু আসল ভাববার কথা এই যে — এখনকার পাঁচটি থিয়েটার পয়সা পাচ্ছে, সুতরাং আমরা পাব — এই যুক্তি অনুসরণ করে তাঁরা ব্যবসায়ে নামতে চাইছেন কি না। তা যদি হয় — তাহলে তাঁদের আমি এ বিষয়ে একটু অবহিত হতে বলি।

এখন থিয়েটারগুলির বুকিং অফিসে আগের চেয়ে বেশি ভিড় হচ্ছে — একথা আগেই বলেছি। কিন্তু এই আর্থিক স্বচ্ছলতার মূলে কী? থিয়েটার কি দু-চারবছর আগের চেয়ে এখন সুপরিচালিত হচ্ছে? আগের চেয়ে ভালো নাটক অভিনীত হচ্ছে? অথবা অধিকতর শক্তিশালী নট-নটী থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন? কেন, কীসের জন্য থিয়েটার হঠাৎ 'রমরমে' হয়ে উঠল? আমার মনে হয়, থিয়েটারের বর্তমান আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য থিয়েটার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজস্ব প্রচেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী বর্তমান পরিস্থিতি। এক টাকার মাল আজ দশ টাকা হয়েছে; অর্থাৎ আগের এক টাকা এখনকার দশ টাকার সমান। কাজেই অস্বাভাবিক ভিড় দেখে থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেল, এ ধারণা করা অন্যায় হবে। এর পর যখন দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে, তখন এই জোয়ারের শেষে ভাটার টানে সব থিয়েটারগুলি হবে টাল-মাটাল। অতি বিচক্ষণতার সঙ্গো অতি নৈপুণ্যের সঙ্গো — অত্যন্ত সতর্কভাবে, তখন থিয়েটারকে বাঁচার জন্য লড়াই করতে হবে। কলকাতার পাঁচটি থিয়েটারের ভিতর ক'টি থিয়েটারের অস্তিত্ব যে বজায় থাকবে তখন — সে আজ বলা শক্ত।

এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সময় যাঁদের অর্থ আছে তাঁরা নূতন থিয়েটার না খুলে, যদি বর্তমান থিয়েটারগুলির সঙ্গে যোগ দিয়ে, ভাবীকালের বিপদের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে সাহায্য করেন, সেই হবে সব দিক থেকে যুক্তিসম্মত। থিয়েটারের দুর্দিন আসছে। তার কারণ আগেই বলেছি: বর্তমান স্বাচ্ছল্য থিয়েটার-কর্তৃপক্ষের নিপুণ ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা ঘটেনি। এই অস্বাভাবিক স্বাচ্ছল্যের মূলে রয়েছে দেশের বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতি।

তবে, হ্যাঁ, আর একটা কথা। যাঁরা থিয়েটারের দায়িত্ব বহন করছেন তাঁরা সকলেই বর্তমান পরিস্থিতিতে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন, ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন না — এ বললে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, থিয়েটার তার যাত্রাপথের গতি পরিবর্তন করেছে; অন্তত পরিবর্তনের একটা প্রয়াস জেগেছে। ক'বছর আগের কথা ভাবুন — কোনও থিয়েটার হয়তো 'অভিজাত সম্প্রদায়' বলে নিজেদের জাহির করতেন — সেখানে গিয়ে

দেখতে পেতেন — বিলাতী সস্তা নাটকের ব্যর্থ অনুকরণ; মেমসাহেবকে শাড়ি পরিয়ে বাঙালি মেয়ে বলে চালানোর হাস্যকর প্রচেষ্টা! আবার কোনও কোনও থিয়েটার নিজেদের বলতেন 'আদর্শ সনাতনপন্থী' — সেখানে গিয়ে দেখতে পেতেন — চমকপ্রদ দৃশ্যপটের ভেল্কি, আদিরসাত্মক হাস্য-কৌতুকের প্রাচুর্য বা স্রেফ ভাঁড়ামি! নাট্য-সাধনার নামে থিয়েটারের পরিচালকদের চিত্তবৃত্তির এই যে অবনতি এ থেকে বর্তমান থিয়েটারগুলি অনেক পরিমাণে মুক্ত হয়েছে। কি অভিজাত আসর, কি সনাতনপন্থী আসর — সকলেই আজ বুঝতে পেরেছেন সত্যিকারের অভিজাত বা সনাতনপন্থী হতে হলে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির শুদ্ধি প্রয়োজন। দর্শকের চিত্তবৃত্তিকে আমরা নিম্নগামী বলে ভাবতুম; তার কারণ আমাদের চিত্তবৃত্তিই ছিল নিম্নগামী। দর্শক-সমাজ অনন্ত সমুদ্রের মতো; চোখে যে রঙের কাচ লাগিয়ে আমরা তাদের দেখব, মনে হবে, সেই তাদের স্বাভাবিক রং।

বর্তমান থিয়েটারের পক্ষে আশার কথা এই যে, তারা প্রত্যেকে এ বিষয়ে সচেতন হয়েছে। সব ক'টি রঙ্গালয়েই দেখুন, আজ এমন নাটক অভিনীত হচ্ছে যা পরগাছাও নয়, আগাছাও নয়; দেশের মাটি থেকে তারা রস সংগ্রহ করেছে; জাতির জীবনের ঠিক কেন্দ্রস্থলেই তাদের মূল ভিত গেড়েছে। থিয়েটারের দোষত্রুটি এখনও অনেক আছে; কিন্তু তাদের মূল গলদ যে তারা বুঝতে পেরেছে, দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে সামনে এগোতে চেষ্টা করছে — এইটিই হল সবচেয়ে আশার কথা। বর্তমানের এই প্রচেষ্টা যদি কোনও থিয়েটার পরিম্লান হতে না দেয়, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ অথবা বুদ্ধি বিপর্যয় দ্বারা এই প্রচেষ্টায় শৈথিল্য যদি না আসে তাহলে ভাবীকালের দুর্বিপাক থেকে থিয়েটারগুলি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। এরূপ আশা করা একটুও অসঙ্গত হবে না। অর্থবান যাঁরা, নাট্য-রসে-রসিক সজ্জন যাঁরা, থিয়েটারের এই গতি পরিবর্তনের সময় তাঁরা অর্থ নিয়ে, অভিজ্ঞতা নিয়ে ও সহানুভূতি নিয়ে যদি বর্তমান রঙ্গালয়গুলিকে সাহায্য করেন, তাহলে বাংলার রঙ্গালয় তার গতিপথে যে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারবে একথা সুনিশ্চিত।

১৯৪৫ সালে শ্রীগুরু লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত মহেন্দ্র গুপ্তের 'মঞ্চে ও নেপথ্যে' বই থেকে স্বতন্ত্র শিরনামের দুটি স্বতন্ত্র আলোচনার সংযোজন।
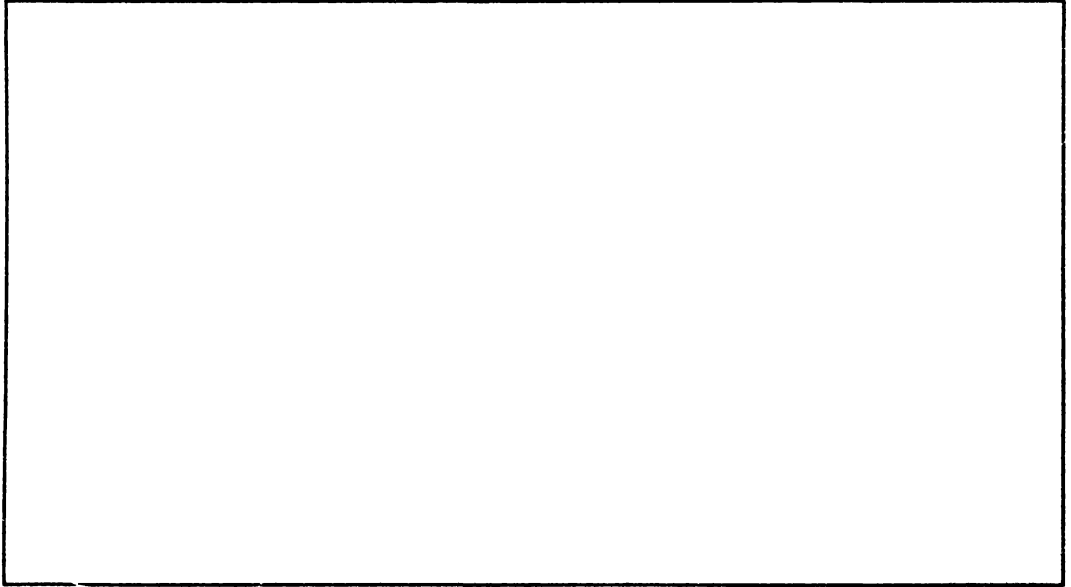
'সাজাহান' নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী

ভস্মীভূত 'স্টার' — একটি প্রতীক

কুমার রায়

কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় অঙ্কুরিত হয়েছিল প্রসন্ন ঠাকুরের শুঁড়োর বাগানবাড়ি, শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাড়ি, কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি, সাতুবাবু, পাথুরেঘাটা এবং বেলগাছিয়া কিংবা জোড়াসাঁকোর বাবুদের বনেদি বাড়ির নাটমঞ্চগুলির চিতাভস্মের ওপর।

এই চিতাভস্মের ওপর প্রথম পুরুষের বনেদিয়ানা জারি হল সাধারণ রঙ্গালয়ে গিরিশচন্দ্র প্রমুখের হাতে। সফল কর্মোদ্যোগীদের মধ্যে সচরাচর ফুটে ওঠে প্রেম নিষ্ঠা থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা। সেটা এঁদের মধ্যে ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু বাণিজ্যিক রেষারেষির মধ্যে সে আমলেই এসবের মধ্যেই কি লুপ্ত ছিল — ধ্বংসের বীজ? থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। সাধারণত এর পরের প্রজন্ম — দ্বিতীয় পুরুষের ঝোঁক থাকে পুঁজিকে উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার। কিন্তু থিয়েটারের ক্ষেত্রে সেই দ্বিতীয় পুরুষের আবির্ভাব শিশির কুমারের সঙ্গে অপরেশচন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রবোধ গুহ প্রমুখের কালে। ভোগ-বিলাস বা দম্ভ নয়, আলস্যও নয় — এই দ্বিতীয় প্রজন্মের হাতে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় মান-মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল। আভিজাত্যের ফুল ফুটল।

এবারে তৃতীয় প্রজন্ম বা সাধারণ রঙ্গালয়ের এই তৃতীয় পুরুষের কার্যকালে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টির কালটা সমান তালে বজায় থাকল না। শিশিরকুমার, অহীন্দ্রবাবু প্রমুখ তখন অস্তাচলের পথে। হল অনেক কিছু — সলিল মিত্র, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সরকার ব্রাদার্স কিংবা গণেশ মুখোপাধ্যায়ের কালে। এই যে নামগুলি বললাম পাঠক নিশ্চয়ই আগের দুই প্রজন্মের নামের সঙ্গে তফাৎটা বুঝতে পারছেন। মাঝে, সরযূ দেবী, জহর রায় পুরনো অভিনেতৃকুলের আভিজাত্যে চলতে চাইলেন — পারলেন না। ভঙ্গুর পর্যায়ে পৌঁছে গেল সাধারণ রঙ্গালয়। লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি সমান তালে কদাচিৎ বহাল থাকল। কিন্তু বনেদিয়ানার বহুমূল্য মণিরত্ন তখন দুর্লভ হয়ে গেল। বাঁচানোর অনেকানেক কৌশল সাময়িক রক্তসঞ্চালন বাড়ালেও ক্রমশই রক্তশূন্যতায় বা রক্তাল্পতায় থিয়েটার অবশেষে মুখ থুবড়ে পড়ল। কলকাতার অনেক প্রাচীন বনেদি

বাড়ির মতো। তিনপুরুষেই অস্তিত্বের অবলুপ্তি। প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষ — এই তিন পুরুষে একটা পরিবার তার ইমারত, ঝাড়লণ্ঠন, বিত্তবৈভব, লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃস্ব হয়ে যায় — এও ঠিক সেই পথেই শেষ হয়ে গেল। সেসব পরিবারে তবু হাত বদল হয়ে কিছু সম্পদ অন্য হাতে অন্য বাড়িতে স্থান পায় — কিন্তু কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় লুপ্ত হওয়ার সময় কোনও চিহ্নই আর কোথাও আশ্রয় পেল না। 'সেন্টিমেন্টাল আত্মীয়েরা তার অন্ত্যেষ্টিসৎকার করতে বিলম্ব করেছিল', এমন এক কথা, — ভিন্ন এক প্রেক্ষিতে, বলেছিল 'শেষের কবিতা'র অমিত। এ ক্ষেত্রে সেটাও ব্যবহার করা যায়। 'উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে', — অবশ্য এখানে ফাঁকি দেওয়ার প্রশ্নই নেই, — কেননা, সাধারণ রঙ্গালয়ের কোনও উত্তরাধিকারীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বর্তমান নিবন্ধকার বেশ কিছুদিন আগে একটি আলোচনায়, স্টার থিয়েটারের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পর লিখেছিল যে, স্টার পুড়ে যাওয়াটা এখন একটা প্রতীকের মতো — সে প্রতীক সাধারণ রঙ্গালয়ের অবলুপ্তির প্রতীক। বিশ্বরূপা এবং রঙ্গমহল উঠে যাওয়ার পর সে কথাটা সত্য হয়ে উঠেছে। কারণটা অবশ্যই অনুসন্ধান করা যায়।

এই অবস্থাটা যে আসতে পারে একদিন সেটা তার চলার ধরন দেখে স্বাধীনোত্তর পর্বে স্বয়ং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলেছিলেন স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথায়। সেটা প্রত্যাশামতো পেলে যে বাণিজ্যিক থিয়েটার এই দশায় পৌঁছত না সেটা হলফ করে বলা যায় না। আর পাঁচটা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মতো চলত হয়তো। তবে এটা অনুমানমাত্র। তবু শিশিরকুমারের উক্তিটি আজ মনে করতেই পারি : 'নাট্যশালাকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে নাট্যশালা সম্বন্ধে যে <u>অনাদরের ভাব</u> আছে, তাকে দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় সৃষ্টির ধারক ও বাহক।'

নাট্যশালা সম্পর্কে এই অনাদরের ভাবটা যে প্রকট হয়েছিল অন্যতম কারণ হিসাবে এটা মেনে নিতে হবে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের মাথায় স্টারের আগুন লাগা কাকতালীয় হলেও তা যেন প্রমাণ করে দিল, সাধারণ রঙ্গালয়ের কাজ নিঃশেষিত আজ। মেনে নিতে হবে, কেননা বাস্তব হল যে, নাট্যশালা জাতীয় থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়নি। শিশিরকুমারের আক্ষেপের কথাটা মনে রাখতে হবে। 'বাংলা দেশে লোকে রঙ্গমঞ্চ থেকে আনন্দ পেয়েছে, শিক্ষা পেয়েছে, জাতীয়তার প্রেরণা পেয়েছে, অথচ থিয়েটার দেখে আসার পর থিয়েটারকে তারা ভুলে গিয়েছে, যেমন ভুলে যায় নিশীথ-বিলাসী পরের দিন সকালবেলা আগের রাত্রির প্রমোদ নিকেতনকে।' এই আত্মপ্রবঞ্চনার নীতি থেকে সমাজ মুক্ত হয়নি। থিয়েটারকে মানুষ ভুলেই গিয়েছে। <u>অন্যতম প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান</u> হিসাবে সাধারণ মানুষ থিয়েটারকে দেখেনি। তাই স্থায়ী বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

থিয়েটার নামক বনেদি বাড়ির ভাঙনের লক্ষণ অবশ্য হালে নয় — দ্বিতীয় পুরুষের জীবনযাত্রার শেষ পর্বেই শুরু হয়েছিল। নইলে, বুদ্ধদেব বসু সেই চল্লিশের দশকের শুরুতে নাট্যশালার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কেন বলে উঠবেন — 'বেশ বোঝা যাচ্ছে, যত চেষ্টাই করা যায় থিয়েটারকে আর বাঁচানো যাবে না, সে মরতে চলেছে। কোনও থিয়েটারের মধ্যে ঢুকলে তার ধূলিমলিন জীর্ণ আসবাব, পানের পিকমাখা মেঝে ও দেওয়াল, রঙ্গমঞ্চের লক্ষপতির ড্রয়িংরুমে দু'খানা ভাঙা চেয়ার — প্রতিটি ছোট জিনিস যেন হা-হা করে বলে — নেই নেই, কিছু আর নেই। .... আসল কথা আমাদের থিয়েটারের প্রাণবস্তু কিছু আর নেই, যারা থিয়েটার চালান তাঁরা <u>নিজেরাই নিরুৎসাহ</u>।'... মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জের তখনও চলছে। অবশ্য একথাও উল্লেখ করতেই হবে যে, স্বাধীনোত্তরকালে একটা পর্বে তৃতীয় পুরুষের বনেদিয়ানা আধুনিক হয়ে থিয়েটারের চাকচিক্য ফিরিয়ে এনেছিল। থিয়েটারও প্রাণ পেয়েছিল। কিন্তু এই পর্বেই থিয়েটারের মালিক থিয়েটার চালিয়ে লাভালাভের প্রশ্নটাকেই ক্রমশ বড় করে দেখতে লাগলেন। অনেক সংস্কার এবং চাকচিক্যের মধ্যে ক্রমশ বাণিজ্যিক লোভের বশবর্তী হয়ে দর্শকের রুচিকে নিজেদের মতো করে গড়তে চাইলেন। সে ব্যাপারে তাঁদের নিজস্ব বিকৃত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক ভেজাল ঢুকিয়ে দিলেন। আর ক্রমেই 'লাভের লোভই লোকসানের কারণ হয়ে দাঁড়াল'। কথাটা পুরনো। বলেছিলেন তুলসী লাহিড়ী মহাশয়। আবার পরে দেবনারায়ণ গুপ্ত

মহাশয়ও এক মূল্যবান উক্তি করেছিলেন : 'একটা কথা আমি বারবার মেনে চলেছি, দর্শকদের চেতনাকে লাঞ্ছিত করে নাট্যশালা পার পায় না। বিকৃতিকে পুঁজি করে থিয়েটার চলতে পারে না।'

উপরের কয়েকটি অনুচ্ছেদে নিম্নরেখ বাক্যগুলি সংকলিত করি : 'অনাদর', 'অন্যতম প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা না করা', 'নিজেরাই নিরুৎসাহ', এবং 'বিকৃতিকে পুঁজি' করা। অবলুপ্তির কারণগুলির অন্যতম এই অনাদর। এই অনাদর উভয় তরফের — থিয়েটার যাঁরা চালাতেন এবং থিয়েটার যাঁরা করতেন। অথচ গৌরবের কালে এমনটি ছিল না।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার — ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান যেমন অন্যতম প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত হল, নাট্যশালা তেমনটি বিবেচিত হয়নি কোনও কালেই। বলা হয়েছে মাত্র। অথচ যেসব নাট্যমঞ্চের চিতাভস্মের ওপর সাধারণ রঙ্গালয় একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল — সে সময় তা সেই প্রসন্ন ঠাকুর কিংবা মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত সামশ্রয়ী প্রমুখ কিংবা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের আমলে নাট্যশালা অন্যতম প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

অবলুপ্তির বেশ কয়েক বছর আগে থেকে আমরা দেখতে পেলাম থিয়েটারের মালিক পক্ষ এবং দর্শক নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে — থিয়েটার সম্পর্কে। মন্টু সেনগুপ্ত, শুক্লা সেনগুপ্ত কিংবা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হাতিবাগানের থিয়েটারকে পুনরুজ্জীবিত করার উৎসাহ দেখানো সত্ত্বেও সেই 'নিরুৎসাহ' উৎসাহে পর্যবসিত হয়নি। তপন থিয়েটারে 'নহবত'ও এক উৎসাহিত হওয়ার বিচ্ছিন্ন প্রকাশ।

আর শেষ নিম্নরেখ বাক্যবন্ধটি 'বিকৃতিকে পুঁজি করে থিয়েটার চলতে পারে না' — মর্মপীড়ার কারণ হলেও বাস্তব হয়ে উঠেছিল। সেই বিচ্ছিন্নভাবে প্রতাপ মঞ্চে এক সময় যা শুরু হয়েছিল, যা একটা সময়ে বিশ্বরূপার 'চৌরঙ্গী'তে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেটাই ইতিহাসের এক গোলমেলে পর্বে মিনার্ভা, এবং নতুন গজিয়ে ওঠা কিছু মঞ্চে উপজীব্য হয়ে গেল। মাঝে মাঝে, মিনার্ভা মঞ্চে এখনও তার জের উঁকি মারে। দর্শকের চেতনা লাঞ্ছিত হচ্ছিল, নাকি দর্শক স্বেচ্ছায় লাঞ্ছনা ভোগ করতে লালায়িত হয়ে উঠেছিল — এ প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন নেই। বাংলা থিয়েটারের রঙ্গালয়গুলির নাভিশ্বাস ওঠার আয়োজন ক্রমশ গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ৭০, ৮০ ও ৯০-এর দশকে। স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছিল না, কেননা, মাঝে মাঝে ওই ৭০, ৮০-র দশকে এক-আধবার মঞ্চ কারও কারও নেতৃত্বে ঝলসে উঠেছিল। কিন্তু ৯০-এর দশকে অনিবার্য পতনের পথরেখা তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। ওই বনেদি বাড়ির অধঃস্তন তৃতীয় পুরুষের অট্টালিকা-প্রাসাদগুলির মতো।

এতদিন, সেই সূচনাকাল থেকে, যে সুদিন-দুর্দিনের সঙ্গো মিলেমিশে ঘর করছিল সাধারণ রঙ্গালয় — তা দুর্দিন কাটিয়ে সুদিনের মুখ দেখত তো দর্শক আনুকূল্যের জনাই। দর্শকের আবেগকে ছুঁতে পারার মধ্যে সে বীজ উপ্ত ছিল। আবার, কখনও কখনও, দর্শককে বহিরঙ্গো মাতিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে। 'শ্যামলী', 'উল্কা', 'ক্ষুধা'-র হাত ধরে সেই আবেগের ভেলা চলেছিল; আবার 'সেতু'-র ট্রেন কিংবা 'থিয়েটারস্কোপ' ইত্যাদি বহিরঙ্গোর খেলা দিয়ে কিছুদিন মজানো গিয়েছিল দর্শকদের। কেউ কেউ বলতেই পারেন, এসবই করা হয়েছিল ওই পতনটাকে সামলানোর জন্যই। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা সত্যকথনও আছে। যেমন, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের মঞ্চে নিয়ে আসাটাও সেই উদ্‌যোগটারই শামিল বলে বিবেচিত হবে! কিন্তু সেটাও আর কাজে লাগল না ৯০-এর দশকে। তখন প্রযোজকদের যেন সব উদ্যম শেষ হয়ে এসেছে, নতুন ভাবনাও আর ভাবতে পারছেন না।

নিরুৎসাহ বা উদ্যমের অভাবটা প্রকটিত হল ওই ৯০-এর দশকে। এখনকার সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রযোজনার তালিকাগুলি মিলিয়ে দেখলেই তা স্পষ্ট হবে। দর্শকের আবেগকে ছোঁয়ার সে এক এলোমেলো আয়োজন। কিংবা দিনগত পাপক্ষয় বলেও মনে হতে পারে। ভালো নাটক, বা বলা ভালো যে নাটক সিদ্ধির নাটক — যা দেখে দর্শকদের রুচি তৈরি হয়, চোখ তৈরি হয় — কোথায় তখন সে নাটক! নাটক দেখার আকর্ষণ বাড়ল না — নাটকের জন্য আদর-আকাঙ্ক্ষার পরিসর তৈরি হল না। আর এই নাটক দেখার নেশাই (হ্যাঁ, দর্শকদের এটাও একটা নেশা হয়ে উঠবে) দর্শক

সমাজকে থিয়েটারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটাই দর্শক-দাক্ষিণ্য। এবং সে দাক্ষিণ্য ওই দর্শকের আবেগকে ছুঁতে না পারলে হয় না।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর স্টার অগ্নিদগ্ধ হয়। তখন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘটক বিদায়' অভিনীত হচ্ছিল। এবারে তালিকাটি তুলে ধরব। জানি এটি সম্পূর্ণ নয়। তবু বুঝতে সাহায্য করবে।

১৯৯০ : স্টার : ঘটক বিদায়। রঙ্গানা : কি বিভ্রাট

১৯৯১ : বিশ্বরূপা : ভালো খারাপ মেয়ে

১৯৯২ : তপন : দর্পণে শরৎশশী

১৯৯৩ : রঙ্গানা : মোসাহেব। বিশ্বরূপা : ঘেরাটোপ

১৯৯৪ : উত্তম মঞ্চ : হীরালাল পান্নালাল। বিজন : চন্দনপুরের চোর

১৯৯৫ : রঙ্গানা : বাদশাহী চাল। বিশ্বরূপা : প্রতীক্ষা/সমর্পণ

১৯৯৬ : সারকারিনা : মমি

১৯৯৭ : বিশ্বরূপা : ন্যায়মূর্তি

১৯৯৯ . মিনার্ভা : এক্স-জোন/সুহাগ রাত /আতঙ্ক/সুন্দরী কলকাতা

সারকারিনা : বদলা/বম্বে গার্লস/বউবাজারের বৌ

নাইট ডল/বোম্বাই কা বিবি

রঙ্গানা : পাকেচক্রে/ জোয়ার ভাঁটা

২০০০ : মিনার্ভা : চরিত্রহীন/প্রেম বন্ধন। সারকারিনা : ভুলভুলাইয়া/ সুহাগ রাত। উত্তম মঞ্চ : মরেও শান্তি নেই। সুজাতা : জোয়ার ভাটা। বিজন : চুক্তিবদ্ধ

তালিকায় হারিয়ে গেল স্টার, রঙমহল, বিশ্বরূপা। গরিষ্ঠ সাধারণ দর্শক — লঘিষ্ঠ হয়ে গেল। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সরল অঙ্কের নয়। অনেকগুলি জটিল সামাজিক ও শৈল্পিক কারণ বর্তমান। রুচির পরিবর্তনও অন্য এক কারণ। অনেক কাল আগে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমাদের প্রকৃত মালিক হচ্ছে কারা জানেন? ওই যারা এক টাকা-দু'টাকার টিকিট কিনে পিছনের সারিতে বসে। এরা টাকা দিলে তবে আমাদের অন্ন হয়।' তা সেই দর্শকই যে বিমুখ হয়ে গেল।

রঙমহল বন্ধ হয়ে গেছে। বিয়ে "মিত্র জ", ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বরূপার দরজাও বন্ধ হল বহুতল বাড়ির কাঠামো তৈরির ধাক্কায়। রঙ্গনাও বন্ধ। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ ৩৫ বছর চলে ১৯৯২ সালে বন্ধ হল। শেষ নাটক 'শত্রু-মিত্র', রঙমহলের শেষ নাটক 'আলোয় ফেরা', বিশ্বরূপায় 'ন্যায়মূর্তি।'

অমর দত্তের মতো কেউ এসে লাগাম ধরেনি। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো মানুষের আবির্ভাব কি অবস্থার সামাল দিতে পারত? তিনি যে সময়ে থিয়েটারে এসেছিলেন তখন দর্শক নতুনের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছিল। বলেছিল, 'এস তুমি অভিমন্যু, তোমাকেই আমরা আমাদের রঙ্গনায়ক বলিয়া জয়মাল্য পরাইয়া দিই।' — লিখেছেন অপরেশচন্দ্র। তিনি আরও লিখেছেন, 'অমরেন্দ্র নাথ তাঁহার সময়ের নাট্যশালায় যে নতুন জীবন দিয়েছিলেন — তাহাতে সন্দেহ নেই।' হায়! এই সময়ে কোথায় সেই অমরেন্দ্রনাথ! নেই! থাকলেও কি সামাল দিতে পারতেন?

আমরা স্টার, রঙমহল, বিশ্বরূপার বিলুপ্তিতে বিলাপ করি — বলি, সাধারণ রঙ্গালয় তথা পেশাদারি থিয়েটার শেষ হয়ে গেল। সত্যিই কি পেশাদারিত্বের ভিতটা তৈরি করা গিয়েছিল এই ১২৯ বছরে? নাটকের মান ও দর্শক সমাজও তৈরি হয়েছিল কি? আসলে একটা থিয়েটার বাঁচে কিন্তু এই দুইয়ের সার্থক আবির্ভাবে — পেশাদারিত্ব এবং তৈরি দর্শক-সমাজ। কেন আসবে দর্শক? কী নাটক দেখতে? কেমন নাটক দেখতে? দর্শকের রুচি কি তৈরি করতে পেরেছিল এইসব নাটক?

ইতিমধ্যে আর একটা বড় ঘটনা সমাজকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। টেকনোলজির দুরন্ত অগ্রগতি। আমি ব্যাপকভাবে আই

টি, সাইবার কাফে ইত্যাদির কথা বলছি না। তারই সামান্য একটা অংশ কেবল সংলগ্ন 'সুখী গৃহকোণে' চৌকো বাক্সটির বিবিধ সচল ছবির কথা বলছি। এর দোহাই দেওয়াটা সাধারণ একটা রেওয়াজ। সমাজ এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও যে বদল ঘটছে। সেই মনটাই যে উবে গেল — যে মন নিয়ে আমরা নাটক দেখতে স্টার, শ্রীরঙ্গম (বিশ্বরূপা) বা রঙমহল মিনার্ভায় যেতাম। জীর্ণ হলগুলির আকর্ষণ না হয় কমেছিল, তবু স্টার তো ছিল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আর এই আরামদায়ক পরিচ্ছন্ন হলের অভাবের জন্যই যদি দর্শক-দাক্ষিণ্য কমে থাকে তাহলে বর্তমানের অন্য যেসব থিয়েটার — গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ কিংবা রবীন্দ্র সদন, আকাদেমিতে সে স্বাচ্ছন্দের স্বাদ পেয়ে কী অন্য দর্শক ভীষণ ভিড় করে অন্য নাটক দেখতে যাচ্ছে? আজকের আলোচনায় এই 'অন্য থিয়েটারের' কথা/সমস্যা আলোচ্য নয়। তবু জিজ্ঞাসা তো উঁকি মারে। বোঝা গেল দেশ, দেশের নাট্য-দর্শক ওই নাট্যধারাকে লালন করতে পারেনি। কেননা একটা সমাজ, একটা দর্শক-সমাজ, একটা সংস্কৃতি তৈরি হয়ে ওঠেনি যার ফলে ওই সাধারণ রঙ্গালয়ের ক্রমান্বয়তা বজায় রাখা গেল না। হারিয়ে গেল। এক সময়, বুদ্ধদেব বসুর কথায়, 'কথা বলা বাংলা ছবির আঘাতের পর আঘাতে বাংলা রঙ্গমঞ্চ' সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়নি। কিন্তু গেল। আমাদের সমাজচেতনা ও জীবনদর্শন — নাট্যশালার মালিক ও দর্শকদের চেতনা আর দর্শনের সঙ্গে এক হয়ে উঠতে পারছে না বলেই এই বিপর্যয় ঘটেছে।

এই সংস্কৃতি তৈরি হওয়ার কথাটা এই আলোচনায় এই প্রথম উচ্চারণ করলাম। তাহলে নাটক, নাট্যশালা চালু রাখার জন্য প্রয়োজন হয় একটা সংস্কৃতির।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কার্যকাল থেকে শুরু করে অন্য থিয়েটার আন্দোলনের যে সূচনা, সেখানেও একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। আমরা সমান্তরাল কথাটা ব্যবহার করতে ভালোবাসতাম — এখনও হয়তো বাসি — কিন্তু সত্যিই কি সমান্তরাল রাস্তা তৈরি হয়েছিল? হয়তো শুরুর দিকে কিছুকাল এই বিভাজনরেখাটা স্পষ্ট ছিল। কিছুদিন যেতেই তো আমরা দেখেছি স্লেট-পেনসিলের আঁচড়ের মতোই তা ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা একটা ছিল, আদর্শও হয়তো ছিল, আবার সেইসঙ্গে টিকে থাকার জন্য খানিকটা আপস-রফা, জীবিকার প্রতি দায়বদ্ধতাও ছিল। আসলে এসবই গোঁজামিলের প্রচেষ্টা। হয়তো গোঁজামিলের এই পারম্পর্যকে বহন করে চলতে হবে। আগামী ভবিষ্যতেও হয়তো এইটাই চলবে।

তখন একটা কথাই বিবেচ্য হবে — বেঁচে থাকার যোগ্যতা কোন মানদণ্ডে মাপা হবে? উত্তর তো হবে, অবশ্যই সেই একমাত্র মানদণ্ড যাকে বলা হয় যোগ্যতা।

এই নিবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদের শেষ দাঁড়িটি টেনে দেওয়ার পরেই খবর এলো, 'রঙমহল' থিয়েটার ভস্মীভূত। নাট্যগৃহ হিসেবে অবলুপ্তি ঘটেছিল বেশ কয়েক বছর আগে। নাট্যগৃহের নামটি বহন করে চলেছিল এবং সেখানে বিয়েবাড়ি, অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণের পাত পড়ছিল। 'রঙমহল' নাট্যশালাটি পুড়ে গিয়ে অন্তত সেই গ্লানি থেকে মুক্তি পেল।
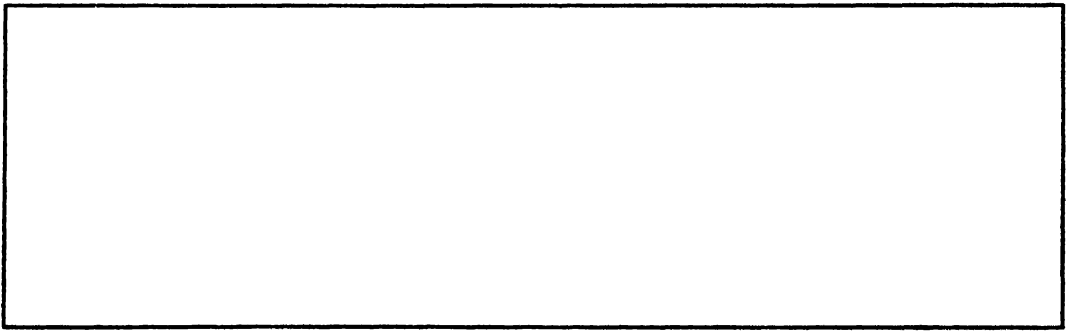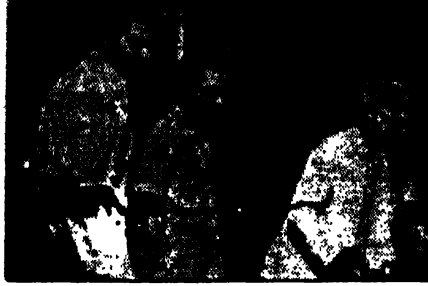
'ক্ষুধা' নাটকে তরুণকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

পেশাদারি থিয়েটার : নির্মাণ, বিনির্মাণ

গণেশ মুখোপাধ্যায়

'থিয়েটার' অর্থে যদি প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে ধরা হয় — তাহলে ইংরেজরাই এদেশে প্রথম এর সামগ্রিক চেহারাটি নির্মাণ করে দেখাল।

কলকাতায় প্রথম প্রসেনিয়াম থিয়েটার 'দ্য ও'ল্ড প্লে হাউস' — এখন যেখানে মার্টিন বার্নের অফিস, সেই জায়গা বরাবর একটা পুরনো গুদামঘরকে সংস্কার করে তৈরি হল ১৭৫৩ সালে। এর ২২ বছর পরে আরও একটি থিয়েটার 'দ্য নিউ প্লে হাউস' ১৭৭৫ সালে জন্ম নিল বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পেছনে লায়ন্স রেঞ্জে। তারও চোদ্দ বছর পরে ১৭৮৯ সালে 'মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার' তৈরি হয়েছিল তাঁর নিজস্ব বাসগৃহে। এরও ছ'বছর পরে লিয়েবেদেফের বেঙ্গালি থিয়েটার ১৭৯৫ সালে নির্মিত হল।

পূর্বোক্ত তিনটি থিয়েটার — এদেশে বসবাসকারী ইংরেজদের বিনোদনের স্বার্থে তৈরি হলেও, ইংরেজ-ঘেঁষা কতিপয় দেশীয় মানুষ এইগুলি দেখেই থিয়েটার হাউস, প্লে হাউস কিংবা থিয়েটার প্লে সম্পর্কে নতুন একটি শিল্পসৃষ্টির ধারণা সংগ্রহ করলেন। কলকাতার বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি এইসব থিয়েটারের নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক হলেন। 'দ্য ওল্ড প্লে হাউস' একবার অর্থাভাবে নিলাম হয়ে যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নিলামে ওই থিয়েটারটি কিনে নিয়ে পুনরায় প্রাক্তন পরিচালকবর্গের হাতেই থিয়েটারটি তুলে দেন। এসব তখনকার কথা। যখন বাংলা ভাষায় থিয়েটারি অভিনয় শুরু হয়নি। 'দ্য ওল্ড প্লে হাউস' তৈরি হওয়ার ৪২ বছর পরে ১৭৯৫ সালে রুশী লিয়েবেদেফ ওই অঞ্চলেই ডোমতলার বর্তমান এজরা স্ট্রিটে বাংলা ভাষায় থিয়েটারি অভিনয়ের প্রবর্তন করেন। যদিও এসকল ইতিবৃত্ত বহুল আলোচিত এবং বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়, তথাপি পেশাদারি থিয়েটারের নির্মাণ প্রসঙ্গে এমন সব গোড়াপত্তনের কথা এসেই যায়।

থিয়েটার ব্যয়বহুল শিল্প। কিন্তু এসব থিয়েটারের শিল্পীদের অধিকাংশই ছিলেন অ্যামেচার। নিছক শিল্পসৃষ্টির

তাগিদেই তাঁরা অভিনয় করতেন। কিন্তু নাট্যপ্রযোজনার অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন তো ছিলই। ভেন্ডুমাস্টারের ক্যালকাটা থিয়েটার অর্থাৎ কলকাতার দ্বিতীয় থিয়েটার 'দ্য নিউ প্লে হাউস' নির্মাণ করতেই লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছিল। প্রবেশপত্রের মূল্য ছিল এক সোনার মোহর, বক্সের জন্য। পিটের জন্য আট সিক্কা টাকা। এত চড়া মাসুল সত্ত্বেও দর্শকের অভাব হত না। কিন্তু এতেও থিয়েটারের খরচ চলেনি। দেনার দায়ে বারবার থিয়েটারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। রঙ্গালয়কে রক্ষা করার জন্য সেকালের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে সময় সময় মোটা অঙ্কের চাঁদাও নেওয়া হয়েছে। প্রাইভেট সাব্‌সক্রিপশন নেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। নির্ধারিত মূল্যের টিকিটের পরিবর্তে বর্ধিত হারে সাব্‌সক্রিপশন পারফরমেন্সের আয়োজন করতে হয়েছে মাঝে মধ্যেই। এত কান্ড করেও কোনও একটি থিয়েটারকে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী করা যায়নি। মাঝে মধ্যেই এসব রঙ্গালয়ের জমিজমা তৈজসপত্রসহ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। গোপীমোহন ঠাকুর তাঁর বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য নিলামে ক্যালকাটা থিয়েটারের সর্বস্ব কিনে নিলেন। কলকাতার থিয়েটারের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনারই খোঁজ পাওয়া যায়।

লিয়েবেদেফের বেঙ্গলি থিয়েটারে প্রথম বাংলা থিয়েটারি নাটক দেখানোর জন্য আট সিক্কা টাকা বক্স ও পিটের এবং গ্যালারির আসনের জন্য চার সিক্কা টাকা প্রবেশমূল্য বিজ্ঞাপিত হয়েছে। কিন্তু পাদপ্রদীপের আলো জ্বালাতে সলতে পাকানোর জন্য তাঁকে বাংলা ভাষা শিখতে হয়েছে, নাটক অনুবাদ করতে হয়েছে, রঙ্গালয় নির্মাণ করতে হয়েছে, অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করে তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়েছে, নাট্যপ্রয়োগের সমস্ত অর্থ এবং উপকরণ যোগাড় করতে হয়েছে, তারপরে তিনি নাটক মঞ্চস্থ করতে পেরেছেন। তাও মাত্র দু'রাত্রির জন্য (২৭ নভেম্বর ১৭৯৫ এবং ২১ মার্চ ১৭৯৬)। লিয়েবেদেফের থিয়েটারের চল্লিশ বছর পরে আবার বাংলা থিয়েটারি অভিনয়ের দেখা মিলেছে ১৮৩৫ সালে, শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাড়িতে। তাঁরই উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে শ্যামবাজার থিয়েটার লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে।

এই চল্লিশ বছরের মধ্যে ইংরেজি থিয়েটার তৈরি হয়েছে কমপক্ষে আরও আটখানি। ১৭৯৭ সালে হোয়েলার প্লেস থিয়েটার, ১৮১২ সালে এথেনিয়াম থিয়েটার, ১৮১৩ সালে চৌরঙ্গী থিয়েটার, ১৮১৪ সালে টাউন হল থিয়েটার, ১৮১৫ সালে খিদিরপুর থিয়েটার, ১৮১৭ সালে দমদম থিয়েটার, ১৮২৪ সালে বৈঠকখানা থিয়েটার, ১৮৩১ সালে হিন্দু থিয়েটার। একমাত্র হিন্দু থিয়েটার নির্মাণ করেন এদেশের মানুষ প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর শুঁড়ো নারকেলডাঙার বাগানবাড়িতে। বাকি সবই ইংরেজদের তৈরি। কিন্তু প্রসন্নকুমারের হিন্দু থিয়েটারেও ইংরেজি ভাষাতেই নাট্যাভিনয় হয়েছিল।

তবে অভিনয়ের ভাষা ইংরেজি হলেও এদেশে থিয়েটার শিল্পের নির্মাণকল্পে এমন সব নাট্যশালার ভূমিকা বড় কম নয়।

নবীন বসুর বাংলা থিয়েটারের আগে শহর কলকাতায় আরও ছ'খানি ইংরেজি থিয়েটার গড়া হয়েছে। সাঁ সুসি থিয়েটার, জুভেনাইল থিয়েটার, সেন্ট জেমস থিয়েটার, গ্যারিসন থিয়েটার, থিয়েটার রয়েল, ইংলিশ থিয়েটার।

প্রসন্নকুমার এবং নবীন বসুর থিয়েটারে আমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতরাই নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু প্রায় সব ইংরেজি থিয়েটারেই সাধারণের জন্য টিকিট বিক্রি হয়েছে। ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই থিয়েটারগুলিকে 'শখের থিয়েটার' বলেছেন। অর্থাৎ টিকিট ব্রিক্রি করে থিয়েটার পরিচালনার ব্যয়নির্বাহের চেষ্টা করা হলেও শিল্পী, প্রযোজক বা পরিচালকবর্গ কোনওরূপ আর্থিকলাভের চেষ্টায় থিয়েটারকে ব্যবহার করেননি।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর দেশীয় বাঙালিদের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের অদ্ভুত উৎসাহ দেখা গেল। স্কুল-কলেজগুলিতে নাটকের অংশবিশেষ আবৃত্তি ও অভিনয়ের রেওয়াজ প্রচলিত হল। তৎকালীন পত্রপত্রিকায় এমন কয়েকটি অভিনয়ের সংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সময় থেকে ১৮৬৮ সালে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত কমপক্ষে সতেরোটি থিয়েটার নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে চারটি ইংরেজি থিয়েটারের অনুকরণেই বলা যায়। রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারের বাড়িতে

শোভাবাজার থিয়েটার, দুর্গাচরণ দত্তের ওয়েলিংটন থিয়েটার, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, প্যারীমোহন দত্তের জোড়াসাঁকো থিয়েটার — এই চারটি রঙ্গালয়ে ইংরেজিতেই নাটকাভিনয় হয়েছে। নবীন বসুর শ্যামবাজার নাট্যশালার পরে বাংলা ভাষায় নাট্যাভিনয় পুনরায় শুরু হয়েছে ১৮৫৭ সালে, আশুতোষ দেবের বিডন স্ট্রিটের নাট্যশালায়। এই রঙ্গালয়ে নন্দকুমার রায় অনূদিত কালিদাসের 'শকুন্তলা'র বঙ্গানুবাদ হল, এই সময় থেকেই বাংলা ভাষায় নাট্যাভিনয় প্রচলিত হয়ে গেল। এর পর কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গামঞ্চ, বেলগেছিয়া থিয়েটার, মেট্রোপলিটন থিয়েটার, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়, শোভাবাজার থিয়েটার, জোড়াসাঁকো থিয়েটার, বহুবাজার থিয়েটার, ঠনঠনিয়া ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, ভবানীপুরে উমেশ মিত্রের থিয়েটার, জয়চাঁদ মিত্রের থিয়েটার, কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের থিয়েটার, হেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের থিয়েটার। এই রঙ্গালয়গুলি খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী না হলেও রঙ্গশালা প্রস্তুত বা নাট্যাভিনয়ের জন্য অর্থাভাব তো হয়ই-নি, বরং দু-এক রাত্রি অভিনয়ের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে অর্থবানদের নিছক শখ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। যে কারণে ইতিহাসবিদদের মতে, এগুলির অধিকাংশই শহরের ধনাঢ্য বিত্তবানদের শখের থিয়েটার। বর্তমান ইতিহাসবিদদের অনেকেই এগুলিকে 'বাবু কালচার'-এর অঙ্গ বলেই মনে করেন। আর সেই কারণে এগুলির নাম দিয়েছেন 'বাবু থিয়েটার'। যদিও এইসব 'বাবু থিয়েটার' থেকেই মাইকেল, রামনারায়ণের মতো নাট্যকারদের লাভ করা গিয়েছে। এইসব রঙ্গালয় থেকেই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে থিয়েটার সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ধনাঢ্যদের এইসব থিয়েটারে শুধুমাত্র সাহেব-মেম এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজন-ইয়ার-বক্সীগণই আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। এখানে সাধারণ মানুষের তো কোনওরকম প্রবেশাধিকারই থাকত না। ফলে এইখান থেকেই সাধারণ মানুষের জন্য থিয়েটারশিল্প প্রসারের একটা প্রচেষ্টার জন্ম হল। পত্রপত্রিকাগুলিতেও বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হল। ১৮৬৮ সালের 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকায় একটি নিবন্ধে লেখা হচ্ছে : 'অভিনয় সংক্রান্ত সৌখীন বাবুদিগের দশা যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক নহে। ইহাদিগের দ্বারা যে বহুকাল নাট্যাভিনয় এদেশে প্রচলিত থাকিবে, সে আশা আমাদিগের দুরাশামাত্র। আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করি, যে তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, কোন একটা প্রকাশ্যস্থলে নাট্যমন্দির প্রস্তুত করুন। বেতনভোগী নট-নটী রাখুন, এবং টিকিট বিক্রয় করুন। তাহা দ্বারা অভিনয়ের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে। উদ্‌বৃত্ত অর্থ অভিনয় খাতায় জমা হইলে ক্রমশ অভিনয়ের উন্নতি হইতে পারিবে। এবং টাকার প্রত্যাশায় অভিনেতৃগণও সবিশেষ মনোযোগদ্বারা অভিনয় কার্যে সুশিক্ষিত হইয়া দর্শকদের মনোরঞ্জন করিতে পারগ হইবেন।'

একাজে এগিয়ে এলেন উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের কয়েকজন মধ্যবিত্ত যুবক। তাঁরা 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' নামে একটি দল গড়লেন এবং যতটুকু সম্ভব স্বল্পখরচে ১৮৬৯ সালে অক্টোবর মাসে শারদীয়া পূজার রাত্রে পল্লীর প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকখানি প্রথম অভিনয় করলেন। গিরিশচন্দ্র-অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় নাট্যাভিনয় অসামান্য সাফল্যলাভ করল এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে পরপর সাত রাত্রি এই নাটক অভিনীত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রারম্ভিক পর্বে টিকিট বিক্রি করে এই নাট্যাভিনয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়নি। উদ্যোক্তারা নিজেদের প্রচেষ্টাতেই মঞ্চনির্মাণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং সাধারণ দর্শকের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছেন। একাজে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'সধবার একাদশী'। প্রথমত, দর্শক নাটকের বিষয়বস্তুতে সমসাময়িক কালের একটি সজীব চিত্র প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তাগণ যৎসামান্য ব্যয়ে নাট্যাভিনয়ের উপকরণাদি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। এই দুটি কারণেই বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের পরবর্তী নাটকও দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'। আর ঠিক এই একই কারণে প্রথম বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটারেরও দীনবন্ধু মিত্রেরই 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হয়েছে।

একটি জাতির শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-নৃত্য-অভিনয়-ভাস্কর্য সবেরই উৎকর্ষ-অপকর্ষ তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ভরশীল। নাট্যাভিনয় ব্যয়বহুল শিল্প। আর নাটক 'সমাজের দর্পণ' — তাত্ত্বিক শব্দটিও প্রমাণিত সত্য। দর্শক সাধারণ নাট্যদর্পণে আপন সমাজের বাস্তব চিত্রাবলী দর্শন করতে পছন্দ করে থাকেন। বাংলা নাটক প্রসারের

শৈশবকালে দীনবন্ধুর নাটকগুলি এই দুটি মূল সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। বঙ্গ রঙ্গামঞ্চের দ্বিশতবর্ষ অতিক্রম করার ভিত্তিপ্রস্তরকে মজবুত করে দিয়েছিল। গিরিশচন্দ্র বহুকাল পরে তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধুকে উদ্দেশ করে বলেছেন, 'যে সময় সধবার একাদশী অভিনয় হয় সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত, কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'-তে বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই কারণে আপনাকে রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।' কথাগুলি ঐতিহাসিক সত্য। নাট্যাভিনয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ অর্থাৎ অভিনয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্য বিপুল ব্যয়, এবং সমাজের চিত্রস্বরূপ নাটকের বিষয়বস্তু যা সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহায্য ব্যতিরেকেই মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হয়েছিল ও সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করতে সাহস পেয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের লেখার মধ্যে এই সমান্য কয়েকটি উক্তিকে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে কীরূপ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে দেশের নিয়মিত থিয়েটারি নাট্যচর্চা ও সাধারণ রঙ্গালয় প্রচলিত হওয়ার কাজটি শুরু হয়েছিল।

কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে শুরু হলেও এঁরা কিন্তু যেমন তেমন করে একটা থিয়েটার করতে চাননি। অমৃতলাল বসু এ প্রসঙ্গো বলছেন, 'ভাল থিয়েটার নির্মাণ করিতে হইবে। এজন্য অবশ্যই টাকা আবশ্যক। আমাদের সকলেরই ঝোঁক ছিল, ষ্টেজের উন্নতি করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে হইবে। এই কারণেই থিয়েটারের জন্য যখন আমরা প্ল্যাকার্ড ছাপিতাম, প্রতি রাত্রির প্ল্যাকার্ডের শিরোদেশে লেখা থাকিত FOR THE BENEFIT OF THE STAGE (ষ্টেজের উন্নতির জন্য)।'

আর এইসব কারণেই টিকিট বিক্রি করে সাধারণ থিয়েটার প্রচলিত করার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়ে পড়েছিল। 'লীলাবতী'-র অসামান্য সাফল্যের যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় দেখা গেল স্থানাভাবে বহু উৎসাহী দর্শক ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। তখন দলের কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রস্তাব করলেন কোনও নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে নিয়মিত অভিনয় করার ব্যবস্থা করা হোক। তখনকার পত্রপত্রিকাগুলিও এইরকম একটি প্রকল্পের প্রস্তাবে সরব হল।

বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার তখন নাম বদল করে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ হয়েছে বটে, কিন্তু দলের সদস্যবৃন্দ প্রায় সকলেই আছেন। তাঁরাই সাহসে ভর করে চল্লিশ টাকা মাসিক ভাড়ায় চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়ির খালি উঠোনটি ভাড়া নিয়ে নিলেন। এবং একটি নাট্যশালা গড়ে তোলার উদ্যোগে সক্রিয় হলেন। পরিস্থিতি অনুকূল হলেও সেসময় নিজেদের মধ্যে কিছু মনান্তর দেখা দিল। নাট্যশালার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ নিয়ে মতান্তর হওয়ায় গিরিশচন্দ্র দল থেকে সরে দাঁড়ালেন। দলের অন্যতম স্তম্ভ গিরিশচন্দ্র সরে দাঁড়ালেও অন্য সদস্যবৃন্দ কিন্তু পিছিয়ে এলেন না। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাট্যাভিনয়ের দ্বারা দেশের প্রথম বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। রঙ্গামঞ্চের নাম হল 'দি ক্যালকাটা ন্যাসনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি', টিকিটের মূল্য বিজ্ঞাপিত হল : প্রথম শ্রেণী — ১ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী —আট আনা। এখানে তুলনামূলকভাবে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রথম ইংরেজদের থিয়েটার 'ওল্ড প্লে হাউস'-এর প্রবেশ মূল্য স্থির হয়েছিল এক স্বর্ণমোহর এবং আট সিক্কা টাকা। কিন্তু তবু সে থিয়েটার নিলামে উঠেছে। অথচ সহায়-সম্বলহীন যুবকবৃন্দের এক টাকা-আট আনা টিকিটের থিয়েটার অন্তত এক বছর স্থায়ী হয়েছে এবং সেখানে আটখানি ভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। অর্থাভাবে বা দর্শকের অভাবে থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়নি। গিরিশচন্দ্রও পরে দলে ফিরে আসেন। কিন্তু উন্মুক্ত আকাশের নিচে ছাদবিহীন মঞ্চটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে জল-বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যই সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম পর্বের অভিনয় ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার মূল কারণ। তবে পরের কারণ, উদ্যোক্তাদের মধ্যে দলাদলি, তো ছিলই।

যদিও এইসব চর্বিত-চর্বণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তবে আলোচনা প্রসঙ্গো

ঘটনাগুলি এসে যায়। আমরা দেখতে চাই কেমনতর আর্থ-সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমাদের দু'শ ছয় বছরের থিয়েটারশিল্প এবং একশ উনত্রিশ বছরের পেশাদারি থিয়েটারের কাজ চলে এসেছে, আবার কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই থিয়েটারচর্চা অবলুপ্তির দ্বারদেশে এসে পৌছেছে।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ছোট-বড় মিলিয়ে কমপক্ষে একশ তিরিশটির বেশি থিয়েটার দল শুধুমাত্র কলকাতা শহরেই গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারি অর্থানুকূল্যে দশটির বেশি নাট্যশালা তৈরি হয়নি। স্কুল-কলেজ-অফিস কিংবা এই জাতীয় কোনও সংস্থার দ্বারা নির্মিত হয়েছে পঞ্চাশটির মতো মঞ্চ। বাকি সত্তরটি নাটমঞ্চ বাংলা থিয়েটারের তথাকথিত নাট্যকর্মীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচেষ্টাতেই নির্মিত হয়েছে।

কলকাতার নাট্যচর্চাকে মোটামুটি চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। ন্যাশনাল থিয়েটারের সময় থেকে পেশাদারি থিয়েটারের কাল ধরা হলে ইংরেজি থিয়েটার, লিয়েবেদেফের বাংলা থিয়েটার এবং বাবু থিয়েটার পর্যন্ত প্রথম পর্ব। ন্যাশনাল থিয়েটার-গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু-ধর্মদাসদের কাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব। তৃতীয় পর্বে থাকবেন শিশির, অহীন্দ্র, সতু সেনরা। আর বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, ও তাপস সেনরা রয়েছেন চতুর্থ পর্বে।

একদল সমালোচক-গবেষকের ধারণা, পেশাদারি থিয়েটারের প্রারম্ভিক কাল থেকেই অর্থাৎ গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর সময় থেকেই বঙ্গা রঙ্গামঞ্চের পতনের বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছিল। নাট্যকর্মীরা যখন থেকে পেশাদারি মনোভাবাপন্ন হয়েছেন তখন থেকেই বঙ্গা রঙ্গামঞ্চ সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু অমৃতলাল বলছেন : 'নিজেদের জীবিকার উপায় মনে করে আমাদের মধ্যে একজনও তখন টিকিট বিক্রয় করে থিয়েটারের অভিনয় করবার কল্পনা মাথায় নেননি। .... তখন আর্শি, বুরুষ, চিরুনীখানা পর্যন্ত কিনতে হত — নয় নিজেদের বাড়ী থেকে ভুলিয়ে আব্দার করে চেয়ে নিতে হত, মেয়ে সাজবার শাড়ী ও গয়না ঐ উপায়ে সংগ্রহ করা গেছে।' নাট্যকর্মীদের অধিকাংশই চাকুরিজীবী ছিলেন। তাঁদের থিয়েটারি অর্থের প্রয়োজন ছিল না। তবে অর্দ্ধেন্দুশেখরের মতো দু'একজন মানুষ ছিলেন যাঁরা তাঁদের সব কিছু নিয়ে সর্বক্ষণের জন্য নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের সময় সময় কিছু অর্থ না দিলে চলত না। এ প্রসঙ্গে অমৃতলাল বলছেন : '.... ইহার জন্য অর্দ্ধেন্দুকে দোষ দিতে পারি না। থিয়েটারের উন্নতি করিতে গিয়া তিনি নিজের সংসারের দিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর পান নাই .... যদি আমরা তাঁহার অর্থাভাব মোচনের চেষ্টা না করিতাম তাহা হইলে আমাদের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হইত।' অনেকে আবার এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্রকে দায়ী করেন। তাঁর পেশাদারি মতলবেই নাকি ভুবন নিয়োগী, গুর্মুখ রায়, গোপাল শীল, প্রতাপ জহুরির দল বাংলা থিয়েটারে অর্থ লগ্নি করতে এসে রঙ্গামঞ্চের কবর খুঁড়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মতলব এঁদের যাই থাক, এঁরা সেই সময় টাকার তোড়া নিয়ে এগিয়ে না এলে পেশাদারি থিয়েটারের গোড়াপত্তনের কাজটি অত সহজে রূপায়িত হতে পারত কি না সন্দেহ। এঁদের মধ্যে এক প্রতাপ জহুরি ছাড়া থিয়েটারের ব্যবসা করে কেউই মুনাফার মুখ দেখতে পাননি। অথচ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, এঁরা যে গাছগুলি পুঁতেছিলেন বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে সেগুলি ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছিল, ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে সেগুলিই কালে মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। গিরিশ ঘোষের জীবৎকালেই বাংলা নাট্যসাহিত্য, অভিনয়কলা যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। ১৮৭২ সাল থেকে ১৯১২ সালে তাঁর প্রয়াত হওয়ার সময় পর্যন্ত একুশটি নতুন রঙ্গামঞ্চ এবং তিরিশটিরও বেশি পেশাদারি নাট্য সংস্থা গড়ে উঠেছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একাই পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক মৌলিক নাটক এবং উপন্যাসের নাট্যরূপ মিলিয়ে নব্বইখানি নাটক রচনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। অপরাপর নাট্যকারগণের রচনাও সাতশর কম নয়। নাট্যকার এসেছিলেন তিনশজন। এসব ঘটনা ঘটেছিল তথাকথিত পেশাদারি রঙ্গামঞ্চের পুষ্টিসাধনের জন্য; তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। গিরিশচন্দ্র দীর্ঘ ন'বছর অ্যাটকিনসনের অফিসে চাকরি করে থিয়েটারের কাজ করেছিলেন। ন'বছর পর একশ পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে প্রতাপ জহুরির থিয়েটারে একশ টাকার বিনিময়ে বাংলা রঙ্গামঞ্চের পেশাদার নাট্যকর্মী হয়ে এসেছিলেন।

সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে পেশাদারি রঙ্গামঞ্চে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৭৬ সালের নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল। সাম্রাজ্যবাদী অপশাসনের বিরুদ্ধে সমসাময়িক কালের সামাজিক জনসাধারণ, পত্রপত্রিকাসমূহ যেমন প্রতিবাদ-মুখর হয়ে

উঠেছে, মাত্র চারবছরের পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে সমাজের সেই মনোভাবকে মঞ্চে উপস্থিত করে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করেছেন কয়েকজন নাট্যব্যক্তিত্ব। কিন্তু আর্থিক লাভ-লোকসানের জালে সেকালের নাট্যকর্মীরা কোনও সময়ই আবদ্ধ হয়ে থাকেননি।

পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় পর্বের শেষের দিকে নাট্যশালার অন্তর-বাহিরের অবস্থা কিছু স্তিমিত হলেও কাজটি কখনই থেমে যায়নি। গিরিশ ঘোষের সক্রিয় অবস্থাতেই রঙ্গমঞ্চের বিপ্লবী নাট্যব্যক্তিত্ব অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পদসঞ্চার ঘটেছে পেশাদারি থিয়েটারে। সঙ্গে ছিলেন দানীবাবু, তারাসুন্দরী, অপরেশচন্দ্রের দল যাঁদের প্রতি পদক্ষেপের পরামর্শদাতা ছিলেন প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব অমৃতলাল বসু।

এঁদের পরবর্তীকাল তৃতীয় পর্ব, অর্থাৎ শিশির-অহীন্দ্রের নবযুগের কাল পর্যন্ত সংখ্যায় পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ কিংবা নাট্যনির্মিতির কাজটিতে (অনেকের মতে) কিছু খামতি থাকলেও হিসাবমতো কিন্তু কিছু কমতি হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অতুলকৃষ্ণ প্রমুখ নব্বই জনের বেশি নাট্যকার এসেছেন। দু'শাটিরও বেশি নাটক মুদ্রিত হয়েছে। এর মধ্যে একশ তেত্রিশখানি পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। অন্যদিকে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রারম্ভকাল থেকে সমকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় প্রতিভামণ্ডিত বহু নাটক এবং নাটকীয় কাহিনী রচনা করেছেন। পেশাদারি মঞ্চে ১৯২১ সালে পর্যন্ত কমপক্ষে চল্লিশেরও বেশি সংখ্যক কবিগুরু রচিত কাহিনীর নাট্যরূপ ও মৌলিক নাটক অভিনীত হতে দেখা গিয়েছে। যদিও ইতিমধ্যে পেশাদারি মঞ্চের অর্থনৈতিক চিত্রটির যথেষ্ট উন্নতি হয়নি। চল্লিশের দশকের শেষের দিক পর্যন্ত পাঁচ টাকার বেশি দর্শক প্রতি টিকিটের দাম ওঠেনি। আর সর্বনিম্ন আট আনার টিকিটের তো আমরাই নিয়মিত দর্শক ছিলাম।

রবীন্দ্র ভাবধারার অনুসরণে শিশিরকুমারের 'সীতা' এবং অপরেশচন্দ্র-অহীন্দ্র চৌধুরীর 'কর্ণার্জুন' পেশাদারি নাট্যাভিনয়ে নবযুগ, নতুন ধারার সৃষ্টি তো করলই, সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের সমাজচেতনা এবং পেশাদারি থিয়েটারের আর্থিক অবস্থাকে দৃঢ়তর ও উন্নততর অবস্থানে স্থাপিত করল। নাট্যকার শচীন্দ্র সেনগুপ্ত বলছেন : 'রবীন্দ্রনাথ যা করতে চেয়েছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার যথার্থ তাই-ই করেছিলেন, এমন কথাও বলতে পারি না। তবে একথা বলতে পারি যে, গিরিশ যা চেয়েছিলেন নাট্যাচার্য তা করেছেন; অর্থাৎ নাটককে ন্যাশানাল রেখেছেন, আত্মপ্রসারের জন্য নাটক যে খাতটি তৈরি করেছিল, সেইখাতে নাটককে প্রবহমান রেখেছেন।' শিশিরকুমার নিজেও এই উক্তিকে অংশত স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন : ' বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, নট ও প্রয়োগকর্তা। যৌবনের প্রান্তর থেকে যদিও ব্যবসাদার হিসাবে নয়, তিনি নট, নাট্যকার ও প্রয়োগকর্তারূপে তাঁর গুণমুগ্ধদের সম্মুখে অনেকবার আবির্ভূত হয়েছেন। .... আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে ঘটে উঠল না। আমি নিজে তাঁকে এদিকে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বাধা এসেছে নানা দিক থেকে।'

অপরেশচন্দ্র সম্পর্কেও শচীন সেনগুপ্তমশাই বলেছেন : 'কর্ণার্জুন' রচয়িতা অপরেশচন্দ্র নিজেকে গিরিশচন্দ্রের শিষ্য বলে পরিচিত করতেন। তাঁর পদ্য গদ্য দুই-ই মিষ্টি ছিল, কিন্তু গিরিশের প্রভাব তাঁর রচনার উপর ছিল না। না পদ্যে; না গদ্যে। তাঁর ছন্দ গৈরিশ ছন্দ নয়, যদিচ অভিনয়োপযোগী করে বাঁধা, তবুও রবীন্দ্র প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট।' অহীন্দ্র চৌধুরীও এই উক্তিকে সমর্থন করেছেন। 'চিরকুমার সভা'-য় অহীন্দ্র চৌধুরীর চন্দ্রবাবু দেখে কবি স্বয়ং মন্তব্য করেছিলেন : 'ওটি অহীন্দ্রের একটি সৃষ্টি।' শিশিরকুমার এবং আর্ট থিয়েটার প্রায় একই সময়ে বেশ কয়েকখানি রবীন্দ্র-নাটক প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু যে রবীন্দ্র-প্রতিভা বাংলা নাটককে বিশ্বনাট্যের সম্মানে উন্নীত করেছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলা নাট্যচর্চা সেই রবীন্দ্র- প্রতিভাকে পেশাদার কিংবা অপেশাদার কোনও নাট্যচর্চাতেই গ্রহণ করতে পেরেছে কি?

তবু এই দুর্ভাগ্যকে মাথায় নিয়ে তিরিশের দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত পেশাদারি মঞ্চে তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ শিশিরকুমার-অহীন্দ্র চৌধুরীর কালের মধ্যভাগ অবধি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে খুব বড়রকমের অর্থাভাব কিংবা সমাজসচেতন নাটকের অভাব ঘটেনি। একালে নতুন পেশাদারি মঞ্চ সৃজিত হয়েছে তেরোটি। বেঙ্গালি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি বা কর্নওয়ালিশ

থিয়েটার, নাট্যনিকেতন, করিন্থিয়ান থিয়েটার, নিউ এম্পায়ার, ফার্স্ট এম্পায়ার, রঙমহল, নাট্যপীঠ (হাওড়া), জুপিটার থিয়েটার, চিপ থিয়েটার, রূপমহল, ও রঙ্গমহল, মুনলাইট থিয়েটার, নাট্যভারতী, পূর্ণ থিয়েটার। নাটক রচিত হয়েছে দু'শ সত্তরটিরও অধিক। প্রবীণ নাট্যকারদের সঙ্গে যোগেশ চৌধুরী, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অয়স্কান্ত বক্সী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ জনা পঁয়ত্রিশ নবীন নাট্যকার যুক্ত হয়েছেন। সবদিক মিলিয়ে তিরিশের দশকেও পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের চেহারা খুব একটা ম্লান নয়। তখনও পর্যন্ত অন্তত একটা নির্ভরযোগ্য স্থিতাবস্থায় রঙ্গমঞ্চটি দাঁড়িয়ে আছে।

হিসাব মতো ধস নামল চল্লিশের দশকের প্রারম্ভকাল থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশাল ধাক্কা — তার সঙ্গে মুনাফারাজ কালোবাজারীদের সৃষ্টি করা মন্বন্তর, দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক শিরদাঁড়া একেবারে গুঁড়িয়ে দিল। সাধারণ মানুষের দুরবস্থার প্রভাব অনিবার্যভাবেই দেশের সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে প্রতিফলিত হল।

এই অবস্থার মধ্যেই ১৯৪২ সালে শিশিরকুমার 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চটি লিজ নিয়ে তাঁর নিজস্ব (প্রায় পারিবারিক) 'শ্রীরঙ্গম' নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন নাট্যাচার্যের বয়স তিপ্পান্ন বৎসর। বত্রিশ বছর যাবৎ নাট্যসাধনায় রত রয়েছেন ও অধিক কাল নাট্যপেশায় অতিবাহিত করেছেন। যশ এবং সাফল্যের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছেন। কিন্তু প্রাপ্তির সুখ-স্মৃতি যত মধুর তুলনামূলকভাবে অপ্রাপ্তির আশাভঙ্গের বেদনা-অভিমান-তিক্ততা ততোধিক। বিশ্বের নব্বইজন প্রতিভার ভাগ্যলিপি যেমন নির্ধারিত হয়ে থাকে ঠিক তেমনটিই।

এতদ্‌সত্ত্বেও উৎসাহের অভাব ছিল না নাট্যাচার্যের। ঋণের ওপর ঋণ করেও নাট্যপ্রযোজনায় লগ্নি করতে পিছপা হননি তিনি। ১৯৫৪ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ঋণের পাহাড় মাথায় নিয়ে 'শ্রীরঙ্গম' চালিয়ে এসেছেন শিশিরকুমার।

কিন্তু শ্রীরঙ্গম পর্বের তেরো বছরের নাট্যচর্চার আর্থ-সামাজিক চিত্রটি মোটেই উজ্জ্বল নয়। অথচ নাট্যাচার্যের সৃজনী শক্তির প্রশ্নই ওঠে না। দুঃখের বিষয়, 'মাইকেল মধুসূদন', 'তখৎ-এ-তাউস', 'দুঃখীর ইমান'-এর মতো কয়েকখানি নাটক ছাড়া আংশিক সাফল্যও কদাচিৎ দেখা গেছে। অবশেষে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ঋণের দায়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় ১৯৫৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

অপরদিকে অহীন্দ্র চৌধুরী ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। তিনিও একইকালে একইরকম আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে অতিক্রম করে এসেছেন। কিন্তু পরিস্থিতিকে সর্বদাই মান্য করে চলেছেন। তাঁরও স্লোগান ছিল — 'নতুন কিছু কর'। তবে বাস্তব সমস্যাকে সময়োচিত মোকাবিলা করেই নতুন পথে পা বাড়িয়েছেন তিনি। ১৯৫৭ সালে তিনি মঞ্চ থেকে স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ করেছেন। চল্লিশের দশক থেকে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত সকল নাট্যমঞ্চেই বিভিন্ন নাটকে অভিনয়ে, প্রযোজনায় অংশগ্রহণ করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষাও কম করেননি। কিন্তু অসাফল্যের দায়ভাগ তাঁকে হতাশার আগুনে দহন করতে পারেনি।

তথাপি অস্বীকার করার উপায় নেই, ৪০-এর দশক থেকেই বাংলা পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের মূল স্রোতটির বহতা- শক্তি ব্যাহত হতে শুরু করেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই দীর্ঘকালের বহমান নদী-মুখ যখন রুদ্ধ হতে শুরু হয় — তখনই তার স্রোতের ধারাটি দিক পরিবর্তিত হয়ে শাখা নদীরূপে বহমান হতে বাধ্য।

পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ যখন সামগ্রিকভাবে দৈন্যে মলিন তখনই একদল প্রগতিবাদী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী কর্তৃক সৃজিত হল গণনাট্য-নবনাট্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্দরের মানুষ শচীন সেনগুপ্ত বলছেন : 'যুদ্ধোত্তরকালের এক বিশেষ সমাজ সচেতন রাজনৈতিক দলের বহু কর্মী .... মনে করেছিলেন ফ্যাসিজম রোখা আর সাম্রাজ্যবাদ রোখা, সম্ভব হয় জনশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারলে। .... তাঁরাই সর্বপ্রথম মনে করলেন নাটকে কেবল জনজীবনকে প্রতিফলিত করলেই চলবে না — রচনা ও প্রযোজনায় এমন রূপ দিতে হবে, যা জনমনে বাস্তব জীবনের সঙ্কট ও সম্ভাবনা প্রকট করতে পারে। .... বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' হলো বাংলা নাটকের এক নতুন প্রকাশ। রচনাতেই শুধু নতুনত্ব প্রকাশ পেল না, অভিনয় এবং প্রযোজনাতেও প্রকাশ পেল নানা অভিনবত্ব।

.... বাংলার সাধারণ নাট্যশালায় ওর আগে জনচিত্তের ক্ষোভকে, জনবঞ্চনাকে ওভাবে রূপায়িত করা হয়নি; নীলদর্পণেও নয়।'

পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের এমন একজন দায়িত্বশীল নাট্যব্যক্তিত্বের এ হেন উক্তির পরেও তার চলার পথ পরিবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল কি না তা ভেবে দেখা দরকার। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার অবশ্য এনেছিলেন তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান'। কিন্তু সে প্রযোজনা এ দলের শম্ভু মিত্রকে যথেষ্ট উৎসাহিত করতে পারেনি। তিনি বলেছেন, '.... 'দুঃখীর ইমান' সম্পর্কে আমাদের সম্মান ও অভিনন্দন জানানো উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 'দুঃখীর ইমান'-কে কেন্দ্র করে কোনও আন্দোলন গড়ে উঠল না এবং সেটা কেবল একটি মাত্র উদাহরণ — প্রায় ব্যতিক্রম বলতে পারেন। মোটামুটি 'দুঃখীর ইমান' থেকে আমরা কোনও সুবিধা উসুল করে নিতে পারিনি। তাই মঞ্চ যেখানে ছিল সেখানেই আছে।' উক্তিগুলি অপ্রিয় হলেও বাস্তব এবং প্রমাণিত সত্য।

পাশাপাশি গণনাট্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানুষ সুধী প্রধানের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, সেই সময়ের নাট্যশক্তি বিভাজিত হতে হতে গণ থেকে নব-সৎ এবং গোষ্ঠীনাট্যে টুকরো টুকরো হয়েছে। কিন্তু পেশাদারি থিয়েটারের মূল স্রোতকে বহতা রাখতে সচেষ্ট হওয়া দূরের কথা, কেউই তেমন আগ্রহও প্রকাশ করেননি।

বস্তুত পক্ষে, পঞ্চাশের দশকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত পেশাদারি মঞ্চ উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে পড়ে। ১৯৫৩ সালের ১৫ অক্টোবর স্টার থিয়েটার প্রযোজিত নিরুপমা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যরূপায়িত 'শ্যামলী' নাটক পুনরায় পেশাদারি মঞ্চের চিত্রটি পরিবর্তিত করে দেয়। মঞ্চ এবং চলচ্চিত্রের একদল নবীন এবং প্রবীন শিল্পীর সমন্বয় দ্বারা অভিনীত 'শ্যামলী' অসামান্য সাফল্যলাভ করে। এ সম্পর্কে স্বয়ং দেবনারায়ণ গুপ্ত বলছেন : 'শ্যামলী' নাটকের অভূতপূর্ব সাফল্যে সাধারণ রঙ্গালয়ের মোড় ঘুরে গেল। সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে একই নাটকের একটানা অভিনয় — রঙ্গজগতের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। 'শ্যামলী'-র সাফল্য অন্যান্য মঞ্চগুলিকেও উৎসাহিত করে তুলল। .... ১৯৫৩ সালের পর থেকে সাধারণ রঙ্গালয় পুনরায় ধীরে ধীরে দুর্দিন কাটিয়ে উঠে ঋণমুক্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে।'

প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব দেবনারায়ণ গুপ্ত এই উক্তি রাখছেন আশির দশকের প্রথম পাদে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের চরম দুর্দিনে রঙ্গমঞ্চগুলি ঋণভারে জর্জরিত হয়েছে, মালিকানা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু খুব কম রঙ্গালয়ই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে নাট্যকর্মীগণ যথেষ্ট সজাগ এবং সক্রিয় ছিলেন। এক সময় রঙমহল থিয়েটারকে সিনেমা হলে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু নাট্যকর্মীদের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে সে চেষ্টা ফলবতী হতে পারেনি। 'শ্রীরঙ্গম' হাতবদল হয়েছে। নামবদল করে 'বিশ্বরূপা' হয়েছে। মৃতপ্রায় মিনার্ভাকে উৎপল দত্ত এল টি জি-কে দিয়ে পুনরুজীবিত করেছেন। মুক্তাঙ্গনকে জনপ্রিয় করেছে শৌভনিক। অজিতেশ নান্দীকার-কে নিয়ে নবনির্মিত রঙ্গনা-কে পরিচিত করেছেন। চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশকের মধ্যে সাধারণ রঙ্গালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ছোট-বড় মিলিয়ে কুড়িখানিরও বেশি রঙ্গমঞ্চ। এবং এগুলির অধিকাংশই নাট্যকর্মীদের প্রচেষ্টাতে নির্মিত।

কোনও প্রতিষ্ঠান বা সরকারি মঞ্চের সংখ্যা একমাত্র কলকাতা শহরের আপাতত আশিটারও বেশি। এগুলির মধ্যে সরকার-নিয়ন্ত্রিত হল বা মঞ্চের সংখ্যা দশটির বেশি নয়। যদিও ইতিমধ্যে সরকারি হলের একটিকে সিনেমা হলে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। বাকি সরকারি হলগুলির ব্যয়ভার শতকরা নব্বই শতাংশ নাকি ভর্তুকি দিয়ে চালাতে হয়। বেসরকারি হলগুলির অধিকাংশতেই মাসের পর মাস বাতিই জ্বলে না। আর পেশাদারি থিয়েটারের প্রতি সাপ্তাহিক পাঁচটি করে 'শো' তো বন্ধই হয়ে গিয়েছে।

অথচ আশির দশক পর্যন্ত উপরোক্ত হলগুলিতে গ্রুপ থিয়েটার, অফিস থিয়েটার, স্কুল-কলেজের থিয়েটার, পাড়ার থিয়েটার, সব মিলিয়ে গড়ে অন্তত পক্ষে তিনদিন করে তো নাটক অভিনয় হয়েছেই। পেশাদারি থিয়েটারের মালিকরা লাভ-লোকসানের হিসাব সরিয়ে রেখে ১৯৯০-৯২ সাল পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতি-শনি-রবিবারে পাঁচটি করে শো করে

গেছেন। তাহলে এতকালের একটা প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি হঠাৎ থমকে গেল কেন? বিশেষ করে পেশাদারি থিয়েটার, যাকে কিছুকাল যাবত ব্যঙ্গ করে বলা হত 'বাজারী' বা 'শ্যামবাজারী থিয়েটার', সে থিয়েটার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল কেন?

এককথাতেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেওয়া যায় যে, পেশাদারি থিয়েটার উপযুক্ত পরিকাঠামো-প্রয়োগ ব্যবহারের অভাবে জীর্ণতায় ভুগছিল, তাই মুখ থুবড়ে ভেঙে পড়ে গেল। কিন্তু বিশাল মহীরুহের গোড়ার মাটিটা তো দু'-একদিনে ফাঁকা হয়ে যায়নি। দেশে তো বৃক্ষ-প্রেমিকের অভাব ছিল না। তাহলে কোনও বৃক্ষপ্রেমী গাছের গোড়ায় দু'ঝুড়ি মাটি, দু'কলসি জল ঢেলে দিতে এগিয়ে এলেন না কেন? এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজতে শম্ভু মিত্রের একটি উক্তি আজ খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। তিনি এই সঙ্কট প্রসঙ্গে বলছেন : 'আমাদের এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন, ও মত-বিদীর্ণ বাঙালীদের মধ্যে মতৈক্য যদি কোনও বিষয়ে পাওয়া যায় তো সে হল থিয়েটারের অধঃপতন সম্বন্ধে। বুড়ো হোক বা ছোঁড়া হোক, গম্ভীর হোক বা চটুল হোক, সকলেই এক বাক্যে এবং একইরকম ভাবে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে মন্তব্য করে থাকেন — 'থিয়েটার জাহান্নমে গেছে।' উত্তরে তখনকার উপরোক্ত সাধারণ সামাজিক সাধারণ বলতেন — 'ভালো নাটক পাওয়া যায় না'। .... কিছু লেখকবন্ধু এ ধরনের তর্ক তোলেন যে ভাল অভিনেতা না থাকলে ভাল নাটক লেখা যায় না, কী হবে লিখে। .... এমন কথাও গম্ভীর চালে বলতে শুনেছি যে থিয়েটারের লোকমাত্রেই খারাপ, তাই আজ মঞ্চের এই দশা। .... যতো অর্থলোভাতুর মালিকদের শোষণে সব ক্রমশ রক্তহীন হয়ে পড়েছে, ... ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।' এসব সেই চল্লিশ দশকের কথা। সেকাল থেকে একালেরও অতি-আধুনিক সামাজিক সাধারণ আজও একই রেকর্ডকে বাজিয়ে চলেছেন এবং ওইসব ইত্যাদির সঙ্গে যোগ করেছেন, ... মঞ্চাভিনয়ে অনভিজ্ঞ সিনেমার হিরো-হিরোইনদের মোটা টাকা মাইনে দিয়ে পেশাদারি মঞ্চে আমদানি, ওয়ান ওয়াল থিয়েটারের প্রচলন, থিয়েটারের নামে অ-থিয়েটার কার্যকলাপের প্রকোপ, দূরদর্শনে অসংখ্য প্রোগ্রাম, অজস্র টিভি সিরিয়াল, এবং তৎসহ মঞ্চে অপসংস্কৃতি — ক্যাবারে ইত্যাদির দ্বারা দর্শক সাধারণের চরিত্র হনন। এই সমস্ত অপরাধের জন্য অর্থলোলুপ মঞ্চ মালিকগণই দায়ী।

মানলাম, এসব অভিযোগই অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত — কিন্তু শম্ভুবাবুর কথা অনুযায়ী বলতে হয় 'এ অবস্থা নিশ্চয়ই একদিনে হয়নি। অনেকদিন ধরে তিল তিল করে পচতে পচতে আজ দুর্গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠেছে লোকের, আর তাই নাক সিঁটকিয়ে বলছে — 'থিয়েটার জাহান্নমে গেছে।' উক্তিটি কঠোর বাস্তব, কিন্তু সেই জাহান্নম থেকে থিয়েটারকে টেনে তুলতে ক'জন থিয়েটার-প্রেমী এগিয়ে এসেছেন! রবীন্দ্রভারতীর একটি সেমিনারে উৎপল দত্ত অবস্থাটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেই ডুবন্ত ছেলেটির দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। 'সাঁতার না জানা ছেলেটি নদীর জলে ডুবে যাচ্ছে — একদল লোক নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে, সাঁতার না শিখে নদীতে নামার জন্য ছেলেটিকে দোষারোপ করছে, কিন্তু যারা সাঁতার জানতো তারাও ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ছেলেটিকে উদ্ধার করল না, হতভাগ্য ছেলেটি ডুবে গেল।' আমাদের থিয়েটারেও কেন ঘটে এমন ঘটনা? উৎপলবাবু বললেন : 'এই হচ্ছে পাতি- বুর্জোয়া মনোভাবের ফল।'

বাংলার ১৩৪৭ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে একষট্টি বছর আগে শম্ভু মিত্র এই সঙ্কটকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন: 'এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের এই কথাটাই মনে হয়েছে যে একটা ভাঙা ফিউড্যালী আবহাওয়া যেন মাকড়সার জাল দিয়ে আমাদের প্রত্যেকটা মঞ্চকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। .... এ আবহাওয়া কিন্তু গিরিশ ঘোষ বা অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফির সময়কার নয়। সেকাল সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে মনে হয় তখন ছিল এক বলিষ্ঠ আবহাওয়া, ... শিশিরকুমার এসেছিলেন সেই আবহাওয়ায়। এসেছিলেন খানিকটা আধুনিকত্ব নিয়ে। জনপ্রিয় করেছিলেন শরৎচন্দ্রের নাটককে, এবং নিজেও জনপ্রিয় হয়েছিলেন তার মধ্যে দিয়ে। মধ্যবিত্ত জীবনের রোমান্টিক চরিত্র প্রকাশ পেলো শিশিরকুমারের মধ্যে। .... যে রোমান্টিক কল্পনায় তাদের সৃষ্টি, ঠিক সেই একই জাতের কল্পনায় 'নাদির শাহ', 'আলমগীর'-এর সৃষ্টি।'

শম্ভু মিত্র তখন এই আবহাওয়াকে অনুভব করেছিলেন। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকেই তিনি পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেছেন এবং সেই সময়েই তাঁর পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, শিশিরকুমারের মতো প্রতিভাও 'আটকে রইলেন সেইখানে — একটা ফিউড্যালী ছায়াচ্ছন্ন রোমান্টিক মধ্যবিত্ত চরিত্রের মধ্যে।'

অবশ্যই এই উক্তির যাথার্থ্য আজ হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক ওই সময়টিতেই তো ওই ফিউড্যালী মাকড়শার জালকে ছিন্ন করে মঞ্চের আচ্ছন্ন অবস্থাকে কাটিয়ে তোলার জন্যই নাট্যব্যক্তিত্ব সুধী প্রধানের ভাষায় 'গণ-নব-সৎনাট্যের আন্দোলন' জোরদার শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই বলিষ্ঠ আন্দোলনের ঢেউ পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের বদ্ধস্রোতে কতটা জোয়ার আনতে পারল? যে কাজের দায়িত্বভার পূর্বসূরী নাট্যকর্মীরা দায়িত্বের সঙ্গো পালন করে এসেছেন। এদেশে ইংরেজি থিয়েটারকে বাংলা থিয়েটার-চর্চায় রূপান্তরিত করেছে বাবু থিয়েটার। গিরিশচন্দ্ররা বাবু থিয়েটারকে সাধারণ রঙ্গামঞ্চে নিয়ে এসে সাধারণ মানুষের কাছে থিয়েটারকে জনপ্রিয় করেছেন। গিরিশযুগ যখন স্তিমিত হচ্ছে তখন অমর দত্ত, অপরেশচন্দ্ররা এসে পেশাদারি রঙ্গালয়ের হাল ধরেছেন। এঁদের যুগ যখন ম্লান হয়ে এসেছে তখন শিশিরকুমাররা এসে সে মলিনতা কাটিয়ে নবযুগের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সেই নবযুগ যখন পুরাতন জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়তে চলেছে, তখন যাঁরা এলেন — পরিস্থিতিটা বুঝতেও পারলেন, তাঁরা পূর্বসূরীদের মতো দায়িত্ব পালনে কতটুকু এগিয়ে এলেন! অথচ শেষোক্তকালেই বাংলা থিয়েটারে সর্বকালের অধিক সংখ্যক বুদ্ধিজীবী মানুষের সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু এঁরাও সেই মধ্যবিত্ত মনোভাবের বাইরে বেরতে পারলেন কি? ওই মধ্যবিত্ত মনোভাবের জালটাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যই এককালে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশেরা প্রায়শই ব৽৷৻তন, 'নেশা আর পেশা এক করো'। এঁরা কথায় কাজে এক হওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি পারবেশই কি এঁদের প্রচেষ্টাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল?

আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে, গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু, শিশির[illegible]মার, [illegible]হীন্দ্র চৌধুরীদের দৃষ্টান্তে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশের মতো একঝাঁক থিয়েটারের মানুষ সময়মতো [illegible]িয়ে এসে যদি হাল ধরতে পারতেন তাহলে আজ বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের এই হাল হত কি?
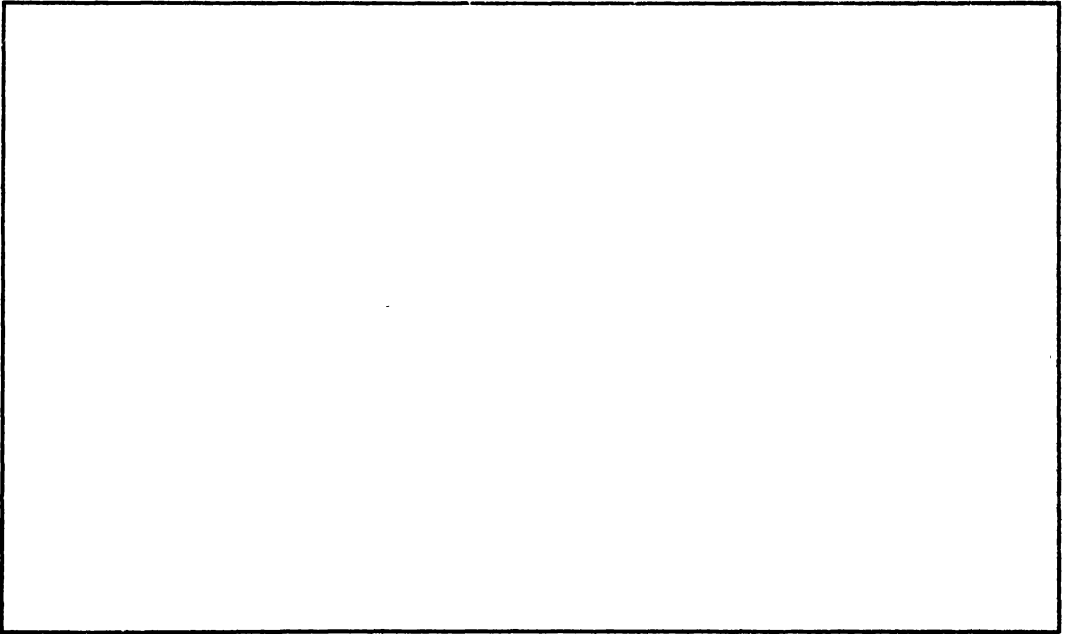
বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিপাত

'সেতু' নাটকে অসীমকুমার, তরতুণকুমার, তৃপ্তি মিত্র, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় : রৌদ্রছায়া

অমিত মৈত্র

ইতিহাসবিদকরাও মানুষ। তাই ঘটনার পশ্চাতে তথ্যসংকলন, নির্মম পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্তে উপনয়ন ইতিহাসবিদের দায়বদ্ধতা হওয়া সত্ত্বেও প্রয়শই দেশ-কালের দাবি তাঁকে প্রভাবিত করে। সমাজের কেউকেটা শ্রেণীর মন্তব্যকে যুক্তি হিসাবে উদ্ধৃত করতে বাধ্য হন। ঠিক এই কারণেই একই ঘটনার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ নিয়ে বিতর্ক হয়, লক্ষ্যকে অতিক্রম করে উপলক্ষ্য প্রধান হয়ে ওঠে। প্রবন্ধের সূচনায় এমত গৌরচন্দ্রিকা এক পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন।

বাংলার নাট্য-ইতিহাসের বৃহত্তব পর্যায় আবর্তিত হয়েছে কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়কে ঘিরে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা অর্থনৈতিক ঝড়ে টালমাটাল হতে হতে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় ১৮৭২ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে ২০০১ সালেও চলেছে বটে, তবে নখদন্তহীন বৃদ্ধ জরদ্গবের মতো। সাধারণ রঙ্গালয়ের পাশাপাশি অন্য নাট্যধারা ইতিমধ্যে যৌবন অর্জন করেছে। অন্য নাট্যধারার বাহকেরা উপেক্ষাভরে পিছিয়ে যাওয়া সাধারণ রঙ্গালয়ের জীর্ণতাকে নিয়ে কখনও ব্যঙ্গ করেছেন, কখনও উদাসীন থেকেছেন, আবার কখনও করুণায় বিগলিত হয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের পতনের কারণ অনুসন্ধানে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছেন। মাঝে মাঝে মহাজনবাক্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে — 'জাতির পরিচয় তার জাতীয় রঙ্গমঞ্চে'।

পাশ্চাত্য দেশের এক সমালোচক একবার দুঃখ করে ভারতের ইতিহাসবিস্মৃত মানুষের সমালোচনা করে বলেছিলেন, এ জাতি তার ইতিহাস বিস্মরণে লজ্জিত হয় না, বরং মিথ্যাবচনে নিজেকে আড়াল করে, অজস্র অজুহাত সৃষ্টি করে। আজকের পটভূমিতে পাশ্চাত্য সমালোকের এই তিক্ত মন্তব্য একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক। ইদানিং কলকাতার কিছু রঙ্গালয়ের শবব্যবচ্ছেদ চলেছে অথবা দু-একটি রঙ্গালয়কে পুনরুজ্জীবিত করার নিদান হাঁকা হচ্ছে এবং 'আমরা সবাই ভালো' আর 'তোমরা সবাই খারাপ' গোছের বৃন্দগীতির আয়োজন চলেছে। প্রচারের ঢক্কা-নিনাদে রাজনীতি যতটুকু আছে, দায়বদ্ধ সংগঠকের ঐকান্তিকতা ততখানি নেই। 'গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর, সুন্দর হল সে।' খুব

স্বাভাবিক। সুন্দরকে সুন্দর বলার মধ্যে বাহাদুরি কোথায়, তা জানি না। কিন্তু অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে জাগিয়ে তোলায় রয়েছে স্রষ্টার স্বকীয়তা। এটিই অনুপস্থিত আজকের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে। ফলে বাংলার পেশাদারি সাধারণ রঙ্গালয় মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছে। দগ্ধ স্টারের ধ্বংসস্তূপে, প্রোমোটার বাহিনীর সন্ত্রাসশাসিত বিশ্বরূপার নির্জনতায়, বিবাহাদি উৎসবের কৌতুকে মেতে ওঠা রঙমহলে ও তার অগ্নিদগ্ধতায়, রুদ্ধদ্বার কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের পারাবতের ডানা ঝাপটানো প্রেক্ষাগৃহে বাতি জ্বালিয়ে থিয়েটারের পুনরুজ্জীবনের প্রবচনে কোনও নিদান আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের মৃত্যু অথবা অপমৃত্যুর কারণ খুঁজতে হবে সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসের মধ্যে। তবেই পাওয়া যাবে পুনরুজ্জীবনের পথ।

১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হওয়ার কয়েকদিন পরেই টাকা-পয়সার হিসাব মেলানোর দ্বন্দ্বে ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কাদা ছোঁড়াছুড়ি হল ক'দিন, তারপর যখন বাবু ভুবন নিয়োগী অর্থ সরবরাহের বরাভয় তুলে আবির্ভূত হলেন তখন দু'দল নিরাপত্তার খাতিরেই পরস্পর মিলিত হল। অন্যদিকে কলকাতার ধনী মুৎসুদ্দি ছাতুবাবুর দৌহিত্র বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষ অর্থের সুনিশ্চিত যোগান নিয়ে তৈরি করলেন বেঙ্গল থিয়েটার। সঙ্গী হিসাবে পেলেন বন্ধু বিহারীলালকে। পরবর্তীকালে 'আঙটি-পরা ভুবন নিয়োগী' থিয়েটার চালাতে গিয়ে সরকারের ক্রোধের শিকারে পরিণত হলেন, সহযোদ্ধাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হলেন এবং থিয়েটারের খরচ যোগাতে যোগাতে 'নেংটি-পরা ফকির'-এ যখন পরিণত হলেন তখন প্রতাপচাঁদ জহুরিকে ন্যাশনাল থিয়েটার বিক্রি করে দিলেন। প্রতাপচাঁদই প্রথম থিয়েটারকে ব্যবসায় পরিণত করলেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। ব্যবসায়ীর বজ্র আঁটুনিতে অধিক জোর দিতে গিয়ে থিয়েটার ছেড়ে চলে গেলেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। গুর্মুখ রায় নামে এক মাড়োয়ারি তরুণ সেই সময়ের অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রেমে মশগুল হয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসা নট-নটীদের জন্য তৈরি করে দিলেন স্টার থিয়েটার। এরই কিছু আগে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় নির্মাণ করেছিলেন বীণা থিয়েটার। কিন্তু মহিলা অভিনেত্রী ছাড়া স্ত্রী চরিত্রে অভিনেতাদের দিয়ে অভিনয় করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন। যখন ভুল সংশোধন করতে উদ্যত হলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। নানা নামে বীণা থিয়েটার ভাড়া করে কেউ কেউ চালাতে চেষ্টা করেছিলেন বটে — কিন্তু সেখানেও ছিল 'কাপ্তেন'-নির্ভরতা। অভিনেত্রীদের প্রতি মুগ্ধতা বা উচ্ছৃঙ্খল জীবনের উদ্দাম তরঙ্গে সন্তরণের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাপ্তেনবাবুরা থিয়েটার গড়তে আসতেন বটে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা সাফল্যের তটে উঠতে পারতেন না।

ইতিমধ্যে আত্মীয়-স্বজনের দল চাপ দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেলেন গুর্মুখ রায়কে। স্টার থিয়েটারের মালিক হলেন স্টার থিয়েটারেরই চার কর্মকর্তা। বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো — চার কর্মকর্তা 'কাপ্তেনি' করার সুযোগ ছাড়াই স্টারের কর্তৃত্ব পেলেন।

বেঙ্গল থিয়েটার শরৎচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু পর্যন্ত বেশ দাপিয়েই চলছিল। শরৎচন্দ্রের টাকার যোগান ছিল নিয়মিত। ফলে সম্ভব হয়েছে বেঙ্গল পরিচালনা। এমনকি শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও বন্ধু বিহারীলাল বেঙ্গল চালিয়েছেন। অবশ্য বেঙ্গলের প্রেক্ষাগারটি ছিল বেঙ্গলের নিজস্ব। ফলে কোনওক্রমে থিয়েটার চালু রেখেছিলেন বিহারীলাল। আর তাই তাঁর মৃত্যুর পরেই বেঙ্গল বন্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎই স্টার থিয়েটারকে প্রায় ভয় দেখিয়ে কিনে নিলেন গোপাললাল শীল। গড়লেন এমারেল্ড থিয়েটার। পৃথিবী টাকার বশ — এই প্রবাদবাক্যে বিশ্বাস করে থিয়েটার গড়লেন বটে, কিন্তু তুলে দিতে বাধ্য হলেন। অচিরেই শখ গেল মিটে। সেখানে থিয়েটার খুললেন চোরবাগানের দত্তবাড়ির সন্তান অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। নাম দিলেন ক্লাসিক থিয়েটার।

গোপাললাল শীল স্টার থিয়েটার কিনে নেওয়ার পর আবার তাঁর দেওয়া টাকায় কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ওপর নির্মিত হল নতুন স্টার, সে থিয়েটারের মালিক হলেন অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, দাশুচরণ নিয়োগী এবং হরিপ্রসাদ বসু।

সুতরাং থিয়েটার গড়ার প্রায় প্রথম দুটি দশকে থিয়েটার গড়ে উঠেছে শৌখিন কাপ্তেনদের দ্বারা। আর ভেঙেছে অর্থনৈতিক মিথ্যাচারে, প্রযোজকদের অর্থনৈতিক ধ্বংসদশায়, অভিনেত্রীদের প্রতি প্রযোজক তথা নটদের লালসায়,

রাজরোষে বা যুগের সঙ্গো তাল মেলানোর ব্যর্থতায়। বাংলা রঙ্গালয়ের এই পতন-অভ্যুদয়ের পথে চলতে চলতে থিয়েটার জন্ম নিয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার ধ্বংস হয়েছে। একমাত্র স্টার এবং বেঙ্গাল নিরবচ্ছিন্ন নাট্যধারা চালাতে পেরেছে, কারণ মঞ্চ ছিল মালিকের নিজের।

মঞ্চমালিকানার অধিকার নিয়েও মঞ্চ চালাতে পারেননি গোপাললাল শীল, রাজকৃষ্ণ রায়, নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথ সরকার। ১৮৯৩ সালে জন্ম নিয়েছিল মিনার্ভা। গিরিশচন্দ্রকে প্রধান স্তম্ভ করে 'ম্যাকবেথ' নাটকের অভিনয় দিয়ে নাগেন্দ্রভূষণ যাত্রা শুরু করেছিলেন মিনার্ভার। কিন্তু অচিরেই কাপ্তেনির খরচ যোগানোর প্রতিবাদ করে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা ত্যাগ করলেন। নিজের মঞ্চ হওয়া সত্ত্বেও লোকসানের বোঝা বাড়াতে না চেয়ে নাগেন্দ্রভূষণ মিনার্ভা বিক্রি করে দিলেন। মিনার্ভা কিনলেন শ্রীপুরের নাবালক জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার। অভিনেত্রী সুশীলাবালার প্রতি ভালোবাসা আর নাট্যকার হওয়ার অদম্য প্রেরণায় মঞ্চের মালিক হয়েও চালাতে পারেননি থিয়েটার। দেউলিয়াগ্রস্ত হয়ে প্রায় অনেকাংশেই সুশীলাবালার ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হয়েছে তাঁকে।

অতঃপর কলকাতার থিয়েটার হয়ে উঠেছে লেসি- নির্ভর। অজস্র থিয়েটার জন্মেছে, মরেছে, আবার জন্মেছে। কলকাতার রঙ্গালয়ের ভাঙাগড়ার সেই ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত তথ্য পেশ করলাম :

প্রথম দশক (১৮৭২-১৮৮১) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ৩ : ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গাল থিয়েটার।

দ্বিতীয় দশক (১৮৮২-১৮৯১) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ৬ : ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গাল থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, বীণা থিয়েটার এবং সিটি থিয়েটার।

তৃতীয় দশক (১৮৯২-১৯০১) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ৬ : স্টার থিয়েটার, সিটি থিয়েটার, বেঙ্গাল থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার।

চতুর্থ দশক (১৯০২-১৯১১) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ১১ : মিনার্ভা, ক্লাসিক, অরোরা, ইউনিক, স্টার, গ্র্যান্ড, ন্যাশনাল, কোহিনুর, নিউ ক্লাসিক, গ্রেট ন্যাশনাল, নিউ গ্র্যান্ড ন্যাশনাল।

পঞ্চম দশক (১৯১২-১৯২১) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ৮ : স্টার, কোহিনুর, গ্র্যান্ড ন্যাশনাল, মিনার্ভা, মনোমোহন, থেসপিয়ান টেম্পল, প্রেসিডেন্সি, বেঙ্গাল থিয়েট্রিক্যাল কোং।

ষষ্ঠ দশক (১৯২২-১৯৩১) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ১০ : মিনার্ভা, স্টার, বেঙ্গাল থিয়েট্রিকাল কোং, স্টারে আর্ট থিয়েটার কোং. মনোমোহন, নাট্যমন্দির, পূর্ণ থিয়েটার, মিত্র থিয়েটার, নাট্য নিকেতন, রঙমহল।

সপ্তম দশক (১৯৩২-১৯৪১) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ৮ : স্টার, মিনার্ভা, নাট্য নিকেতন, রঙমহল, নবনাট্যমন্দির, রঙমহল (নতুনবাজার), চিপ থিয়েটার (ধর্মতলা), নাট্যভারতী।

অষ্টম দশক (১৯৪২-১৯৫১) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ৬ : স্টার, মিনার্ভা, শ্রীরঙ্গাম, রঙমহল, নাট্যভারতী, কালিকা থিয়েটার।

নবম দশক (১৯৫২-১৯৬১) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ৫ : স্টার, মিনার্ভা, শ্রীরঙ্গাম, বিশ্বরূপা, রঙমহল।

দশম দশক (১৯৬২-১৯৭২) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ৮ : রঙমহল, বিশ্বরূপা, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, রঙ্গানা, প্রতাপ মঞ্চ, পিয়াসী (নিউ আলিপুর), শীষমহল, বয়েজ ওন লাইব্রেরি।

একাদশ দশক (১৯৭৩-১৯৮২) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ১৭ : স্টার, মিনার্ভা, রঙ্গানা, কাশী বিশ্বনাথ, রঙমহল, বিশ্বরূপা, রামমোহন. নেতাজী সুভাষ, বয়েজ ওন, শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ, সারকারিনা, সুজাতা সদন, ক্রেমব্রাউন, বিজন, বাসুদেব, থিয়েটার সেন্টার, প্রতাপ।

দ্বাদশ দশক (১৯৮৩-১৯৯৪) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ৮ : সুজাতা, তপন, সারকারিনা, রঙ্গানা, বিশ্বরূপা, স্টার, উত্তম, বিজন।

ত্রয়োদশ দশক (১৯৯৫-২০০১) : সাধারণ রঙ্গামঞ্চের সংখ্যা ৫ : রঙ্গানা, সারকারিনা, মিনার্ভা, উত্তম, সুজাতা।

আপাতভাবে উদ্ধৃত সারণি প্রমাণ করে যে শতোত্তর রজতজয়ন্তী অতিক্রান্ত বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের উত্থান আর পতনের জোয়ার-ভাটা শুরু থেকেই চলেছে। তাই আজকের ভাটা কোনও আশ্চর্য ঘটনা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, একাদশ দশকে অর্থাৎ ১৯৭৩-১৯৮২ পর্যন্ত কালসীমায় ১৭টি মঞ্চে নাটক অভিনীত হয়েছে। প্রযোজকরা পাগল হয়ে টুঁড়েছেন কলকাতার কোনও অখ্যাত মঞ্চে নতুন করে থিয়েটার খোলা যায় কি না। দ্বাদশ দশকে আবার ভাটা শুরু হয়েছে। মঞ্চের সংখ্যা নেমেছে ৮, আর 'আনলাকি থার্টিন' অর্থাৎ ত্রয়োদশ দশকে এসে মঞ্চের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচে।

সাধারণ রঙ্গালয়ের এই গতিপ্রকৃতি বিচার করেই অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখার্জী তাঁর The Story of Calcutta Theatres গ্রন্থে মন্তব্য করেন :

A careful analysis of the different periods or phases of the Public Theatre will show that a period of strength and glory has always been followed by one of weakness and decline.

কিন্তু এত সরলীকৃত ব্যাখ্যা আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। একথা আমি বলতে চাই না যে ভাবনার কোনও অবকাশ নেই। আমি বরং বলি, বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের সংকট অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। পরিসংখ্যানগত তথ্যের মধ্যে সে সংকট প্রকট হয়ে ওঠেনি। বরং তাকে চাপা দেওয়া হয়েছে। প্রথম কথা, একটি দশকে কলকাতায় যতগুলি মঞ্চের কথা বলা হচ্ছে, ততগুলি মঞ্চে সমগ্র দশক ধরে থিয়েটার চলেনি। কোনও কোনও মঞ্চে মাত্র একমাস বা দু'মাস পর্যন্ত অভিনয় হয়েছে। কোনও মঞ্চে একবছরে তিনটি প্রযোজনা নামানো হয়েছে, অথচ প্রত্যেকটি প্রযোজনাই বন্ধ হয়ে গেছে দর্শকের আনুকূল্য না পাওয়ায়। কোনও নাটক চলেছে শুধু দেনার ওপর ভর করে। আর প্রযোজক পরিবর্তন হয়েছে। এ সমস্ত তথ্য সংকলনের পর যদি পরিসংখ্যানগত তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায় তাহলে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় অবলুপ্তির ব্যাপারে কোনও সংশয় আর জেগে ওঠে না। ১৯৭২ সালের আগে পর্যন্ত রঙ্গালয়ে সংকট এসেছে — কিন্তু তা 'মৃত্যুর শমন টাঙানো সংকট' নয়। দর্শক রুচির পরিবর্তন জনিত সংকট সেখানে ছিল না। তাই বর্তমান সংকটের মূল অনেক গভীরে প্রোথিত একথা স্বীকার করতে হবেই। এই সংকট শুরু হয়েছে দীর্ঘদিন আগে থেকেই। কয়েকটি ধারায় এই সংকটের মূল আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।

প্রথম ধারা : থিয়েটারের সঙ্গে বিযুক্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নির্দেশিত কারণ :

বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মনে করতেন যে প্রাক-স্বাধীনতা যুগেই রঙ্গালয়ের মৃত্যুদশা শুরু হয়েছিল। তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যেমন বুদ্ধদেব বসুর মতো সর্বজনমান্য কবি-নাট্যকার মন্তব্য করেছিলেন — '.... যত চেষ্টাই করা যাক থিয়েটারকে আর বাঁচানো যাবে না, সে মরতে চলেছে। কোন থিয়েটারের মধ্যে ঢুকলে তার ধূলিমাখা জীর্ণ আসবাব, পানের পিকমাখা মেঝে ও দেয়াল, রঙ্গমঞ্চে লক্ষপতির ড্রয়িংরুমে দুখানা ভাঙ্গা চেয়ার — প্রতিটি ছোট জিনিস যেন হা হা করে বলে — নেই, নেই, কিছু আর নেই। এর কারণ কি সিনেমার প্রতিযোগিতা? কিন্তু যেসব দেশে সিনেমার প্রতিপত্তি আমাদের একশো গুণ, সেখানে তো থিয়েটারের এ অবস্থা হয়নি; বরং নতুন নাটক, নতুন নাট্যকারের কথাই শোনা যাচ্ছে। আসল কথা আমাদের থিয়েটারের প্রাণবস্তু কিছু আর নেই, যাঁরা থিয়েটার চালান তাঁরা নিজেরাই নিরুৎসাহ; বক্স অফিসে ঝনঝন না বাজলে উৎসাহ আসে না, জানি, কিন্তু ঝনঝন আসবে কোথা থেকে? লোকে যাতে আনন্দ পান তাতে তো পয়সা খরচ করেন। টিমটাম করে যে সব নাটক চলে তার বেশীর ভাগই অযোগ্য।'

কবি অমিয় চক্রবর্তীও এই ধারার অন্যতম নিদান হাঁকা বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব। তিনিও বলেন : '.... বাংলাদেশ নাট্য প্রতিভার দেশ, যদিও বহুদিন আমাদের দেশে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক লেখা হয়নি, এবং শ্রীহীন রঙ্গালয়, অবিশুদ্ধ পরিবেশ ও প্রবঞ্চিত অভিনেতার ত্র্যহস্পর্শযোগ চতুর্দিকে প্রকাশিত।' এসব পর্যবেক্ষণের প্রাক্কালে সোভিয়েত রাশিয়া, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের থিয়েটার সম্পর্কে প্রভূত সদ্বিশেষন যুক্ত করেছেন কবি অমিয় চক্রবর্তী।

কিন্তু বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের বিশ্লেষণ, সবিনয়ে বলি, বাংলার সাধারণ রঙ্গামঞ্চ সম্পর্কে অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোনও সত্যকে প্রকাশ করে না। বিদেশের নাট্যালয় দেখে আসার পর যে স্বপ্নকাজল চোখে মেখে তাঁরা বাংলার পেশাদারি মঞ্চের

মুক্তি খুঁজতে এসেছিলেন তাতে তাঁদের তো মোহভঙ্গ হবেই। তাঁরা কেমন করে বুঝবেন যে খাপরার চালের যে থিয়েটার হলে লণ্ঠনের আলোয় বাংলা নাটকের চলা শুরু সে নাটকের পাকা দেওয়াল পানের পিকে রঞ্জিত হয়েও অনেকখানি। মাতালের কুৎসিত মন্তব্য তাঁরা শোনেননি, শোনেননি অ-বাবুর রক্ষিতার সঙ্গে ক-বাবুর রক্ষিতার অশ্রাব্য কলহ, দেখেননি কলকাতা দেখতে আসা গ্রাম্য-সরল মানুষদের কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে বসে জীবনের চরমতম আনন্দভোগের অভিব্যক্তি। বিদেশের নাট্যমঞ্চে নাটক দেখে, নাটক লিখে যুগান্তর সৃষ্টির মোহভঙ্গ ঘটেছে। সুতরাং বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের জীর্ণতায় তাঁরা আতঙ্কিত হয়েছেন, সাধারণ রঙ্গালয়ের মরণের ডঙ্কা শুনেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে ইউরোপের থিয়েটারের তুলনায় বাংলার যাত্রার সঙ্গে বাংলা নাটকের যোগ অনেক বেশি। গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের নাটক পর্যন্ত যাত্রা আদর্শকে নাট্যাদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই 'রঙ্গমঞ্চে লক্ষপতির ড্রয়িংরুম' মেনে নিতে বাংলার দর্শকের দু'খানি ভাঙা চেয়ার বড় তুচ্ছ বস্তু নয়। যাত্রার কল্যাণে ওরা শূন্য আসরের ওপর নদী, পর্বত, সমুদ্র থেকে শুরু করে ধনীর প্রাসাদ বা কুবেরের কোষাগার — সব কিছু দেখতেই অভ্যস্ত। বিদেশী পরকলা চোখে এঁটে এদেশী পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সমস্যা নির্দেশ এক কৃত্রিম প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়। প্রাবন্ধিক কবি বুদ্ধিজীবীরা নিঃসন্দেহে তাঁদের স্বক্ষেত্রে করাঙ্গুলিগণ্য ব্যক্তিত্ব — কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সমস্যা নির্দেশে 'মণিহারা ফণী' দেখতে পান না, কিন্তু অন্ধ আক্রোশে দংশন করেন।

দ্বিতীয় ধারা : থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের নির্দেশিত কারণ :

১৯৫২ সালের মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনের 'সাহিত্য মেলায়' নাট্যসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যবসায়িক মঞ্চের জীর্ণতা ও নাভিশ্বাস বিষয়ক আলোচনা জমে ওঠে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তুলসী লাহিড়ী ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো নাট্যব্যক্তিত্ব। এই সভায় তুলসী লাহিড়ী মহাশয় মন্তব্য করেন : 'গণমনের পরিবর্তন সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে মঞ্চ-মালিকেরা চর্বিতচর্বণ করে চললেন। ফলে গণমনের সঙ্গে সংযোগের অভাবে এবং যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির দরুণ ব্যয়বাহুল্যে তারা অর্থ সংকটে পড়ে ক্রমশ ডুবতে লাগলেন। অথচ এই নাটকের মন্দার বাজারেও বর্তমান জীবনসমস্যা নিয়ে, কয়েকটি অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় কয়েকটি সুলিখিত না হলেও সু-অভিনীত নাটক পরিবেশন করে জনগণের কাছে প্রশংসা ও অর্থ দুই-ই পেয়েছেন। প্যাঁচসর্বস্ব একদা জনপ্রিয় অভিনেতাদের দ্বিধা ও সংযোগের জন্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ বর্তমান জীবনসমস্যা এড়িয়ে শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের রসঘন গল্পগুলিকে নাট্যরূপ দিয়ে পরিবেশন করে সঙ্কট এড়াবার চেষ্টা করছেন

সুতরাং নাট্যকারপ্রবর তুলসী লাহিড়ী মহাশয় ইঙ্গিত করলেন যে, (১) গণমনের সঙ্গে সংযোগের অভাব, (২) যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির জন্য ব্যয়বাহুল্য ও অর্থসংকট, (৩) মঞ্চমালিকদের চর্বিতচর্বণ, (৪) প্যাঁচসর্বস্ব জনপ্রিয় অভিনেতাদের দ্বিধা ও সঙ্কোচ, (৫) বর্তমান জীবনসমস্যা এড়িয়ে শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের রসঘন গল্পগুলির নাট্যরূপদানের প্রয়াস ব্যবসায়িক মঞ্চের সংকটকে গভীরতর করে তুলেছিল। এই কারণগুলিই তাদের পতনের উৎস। কয়েকটি অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় এগুলি থেকে মুক্ত হওয়ায় দর্শকের আনুকূল্যস্বরূপ প্রশংসা ও অর্থ, দুই-ই অর্জন করে।

এই ধারাব অপর ব্যক্তিত্ব নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন : 'নাট্যশালা যেরকম চায় নতুন লেখকেরা যদি সেরকম নাটক না লেখেন, আর নাট্যশালা যদি নতুন লেখকেরা যে নাটক লেখেন তা মঞ্চস্থ করতে ভরসা না পান, তাহলে নাট্যশালা নাটক পাবে না। উপন্যাসের নাট্যরূপই তাদের ক্রমাগত পরিবেশন কবতে হবে।'

অর্থাৎ বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে শচীন্দ্রনাথ মূলত নাটকের অভাবকেই চিহ্নিত করলেন। স্বাভাবিক কারণেই এই ধারার কারণ নির্দেশকে স্বীকার করে নিতে পারি না। না মানার কারণ অতি বাস্তব। স্বাধীনতা-উত্তরযুগে নতুন নাটক অভিনীত হয়েছিল ৪টি। 'দুঃখীর ইমান', 'কালো টাকা', 'পরিচয়' এবং 'এই স্বাধীনতা'। এর মধ্যে 'দুঃখীর ইমান' নাটকটি ছাড়া অন্য নাটকগুলির একটাও দর্শকদের ভালো লাগেনি। আর 'দুঃখীর ইমান' নাটকও অর্থকরী সাফল্য খুব একটা

দেখাতে পারেনি। অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয়সাফল্য আর ব্যবসায়িক মঞ্চের সাফল্য, দুটি এক বস্তু নয় — এটা আগে বোঝা দরকার। মঞ্চের সমস্ত খরচ যুগিয়ে, অভিনেতাদের মাস-মাইনে প্রদান করার পর ব্যবসায়ীকে লাভের মুখ দেখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, নিয়মিত একটি নাটক অভিনয় করে যেতে হবে। সপ্তাহে প্রায় তিনটি থেকে চারটি প্রদর্শনী। সুতরাং বিজ্ঞাপনের নিয়মিত আয়োজন দরকার। সে কারণে নাটকে অধিক সংখ্যক দর্শক আনয়ন করার স্বার্থে প্রমোদমূল্যকে গুরুত্ব দিতে হবে ব্যবসায়িক মঞ্চকে। অবৈতনিক নাট্যপ্রয়াস যতখানি শিল্পের বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক, ব্যবসায়িক মঞ্চ ততখানি রাজনৈতিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে পারে না। শিল্পের চেয়ে বিপণন তার কাছে অধিকতর মূল্যবান। ব্যবসায়িক মঞ্চ থাকবে, অথচ ব্যবসায় শুধু লোকসানের বোঝা সৃষ্টি করবে এমনটা চলতে পারে না। সুতরাং এই ধারার সমালোচকেরা একদেশদর্শিতার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন না। তাছাড়া ব্যবসায়িক মঞ্চের দায়বদ্ধতা শুধু ভালো নাটক নির্বাচনে নয়; দক্ষ জনপ্রিয় অভিনেতা, পরিচালক, সজ্জাকর, সংগীতকার, বাদ্যকর, উপযুক্ত বিজ্ঞাপন, দক্ষ কর্মীদল, আলোক-প্রক্ষেপ প্রভৃতির নিয়োগও গুরুত্বপূর্ণ এখানে। অবৈতনিক নাট্যপ্রয়াসে এসবের অনেক কিছু উৎসাহী নাট্যকর্মীদের দ্বারাই সম্ভব। এসব আলোচনা এই ধারায় ঠাঁই পায়নি।

তৃতীয় ধারা : নট পরিচালক ও নাট্যপ্রযোজক শিশিরকুমার ভাদুড়ী নির্দেশিত কারণ :

শিশিরকুমার ভাদুড়ী বাংলা রঙ্গামঞ্চের নট-নাট্যপরিচালক ও নাট্যপ্রযোজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর আগমন বাংলা রঙ্গামঞ্চে এক যুগান্তর সৃষ্টি করে এবং নাট্যপ্রযোজনায় শিশিরযুগ সমৃদ্ধ নাট্য- সংস্কৃতির আদর্শরূপে চিহ্নিত। তাঁর মতো সহজ ও স্পষ্ট করে রঙ্গামঞ্চের সংকট আর কেউ বলেননি। ব্যক্তি মালিকানায় যে বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ও বাংলা নাটকের মুক্তি অসম্ভব — এটাই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন নাট্যাচার্য। অর্থাৎ ব্যবসায়িক রঙ্গামঞ্চ মালিকের হাতে থাকবে, আবার তিনি ব্যবসার স্বার্থ অস্বীকার করে প্রতিনিয়ত দেনা করে চলবেন এমন 'মামার বাড়ির আবদার' গোছের নিদান তিনি হাঁকেননি। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন : 'নাট্যশালার মালিকেরা ঝুঁকি নিতে নারাজ। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভয় পায়। তারা বাঁধা ছন্দের নাটক আর বাঁধা ছন্দের অভিনয় পছন্দ করে। তারা অভিনয় বা নাট্য প্রযোজনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী নয়।'

এটা স্বাভাবিক। ব্যবসায় যেসব রীতিনীতি মেনে চলায় তারা লাভ পেয়েছে তার বাইরে অজানিত পদ্ধতি তারা গ্রহণ করবে কেন? তাদের মহাজনের ঋণভার তো শোধ করতে হবে তাদেরই। শিশিরকুমারের এমত অভিজ্ঞতা তো হয়েছেই। তাই দেউলিয়া জীবন তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। তাঁর প্রযোজনায় মঞ্চের ভেতরের অবস্থা যে অত্যন্ত সুন্দর ছিল একথা অতি বড় শিশির-সমর্থকও দাবি করবেন না। মণি শ্রীমানি, কমল মিত্র প্রমুখের স্মৃতিকথায় দেখি যে শিশিরকুমার তাঁর অতিবড় আত্মীয়দের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি — শৃঙ্খলারক্ষায় ও আর্থিক ব্যাপারে। এমনকি প্রযোজনার খরচ পর্যন্ত যোগাতে পারেননি বলে হাহাকার করেছেন। আবার যখন অন্য মালিকের অধীনে কাজ করেছেন তখন তাদের রুচি, বিশ্বাস ও ব্যবস্থাপনায় আস্থা হারিয়েছেন বারবার। অনেক সার্থক প্রযোজনার পাশাপাশি অসফল প্রযোজনার দায়ও তাঁকে মাথায় তুলে নিতে হয়েছে। 'তোমার সব ভাল'— এমত গোঁড়ামিতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা দাস্যসুখে যদি বলেন 'তোমার মলমূত্র'ও আদরণীয় — তাহলে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠবেই। সুতরাং শিশিরকুমারের প্রযোজক জীবনের নব নব উদ্ভাবনী সত্ত্বেও শিশিরকুমার যে মঞ্চের স্থায়িত্ব সাধনে ব্যর্থ, এ সত্য স্বীকার করতে হবে। আর নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তা নিজে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ব্যক্তিমালিকানার ব্যবসায়িক থিয়েটার দিয়ে যে মুক্তি আসবে না তা তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন।

'থিয়েটার চালাতে গেলে টাকা চাই, নিজস্ব বাড়ী চাই, কেবলমাত্র (ছাত্রছাত্রীর) বেতন দিয়ে বিদ্যালয় যেমন ভালভাবে চলে না, তেমনি কেবল টিকিট বিক্রয়ের টাকা দিয়ে থিয়েটার ভালোভাবে চলতে পারে না। থিয়েটার সমস্ত চারুশিল্পের মিলনকেন্দ্র .... জাতির সাংস্কৃতিক দর্শন, সুতরাং থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে জাতিকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে। বিদেশের বড় বড় থিয়েটার রাজশক্তির সহায়তায় গড়ে উঠেছে। কিন্তু এদেশীয় সরকার থিয়েটার সম্বন্ধে উদাসীন।'

সুতরাং শিশিরকুমার নাট্যশালার যে সংকট উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা থেকে মুক্তির যে রূপরেখা নির্দেশ করেছিলেন তা আদৌ কার্যকর হয়নি। তা সত্ত্বেও ব্যক্তিমালিকানায় ব্যবসায়িক থিয়েটার চলেছিল শিশিরের কালেও। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিপদ সামলেছিল কোনওভাবে। টিকে থাকার রসদ সংগ্রহ করেছিল। থিয়েটারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের যোগসূত্রের অধিকার নিয়ে সেই পর্যায়ের কথা লিখতে গিয়ে অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখার্জী মন্তব্য করেছিলেন : It may be recalled that 1953 was marked as the year of the changing theatre, from this time the Public theatre made a rapid and commendable recovery, both dramatically and financially, after its severe struggle for existence during the war and post-war years (1942-52).

চতুর্থ ধারা : শতবর্ষোত্তর বাংলা ব্যবসায়িক মঞ্চ, বৃদ্ধি-হ্রাস-অবলুপ্তি, হেতু-পরিক্রমা

১৯৭২ সালে বাংলা রঙ্গামঞ্চের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। উৎসবের বন্যা ছুটল। গ্রুপ থিয়েটারগুলিও শতবর্ষ পূরণ করল জেলায় জেলায়। অচিরেই বাংলা নাট্য-ইতিহাসের নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশ পেল। বক্তৃতায়-গানে-পরিকল্পনায়-আর প্রতিশ্রুতিতে নাটকের 'হন্দমন্দ' হল।

পূর্বপ্রদত্ত সারণি প্রমাণ করে যে কলকাতায় মঞ্চের সংখ্যা লাফ মেরে প্রায় ২০ স্পর্শ করল। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এমনটি কখনও ঘটেনি। কিন্তু কার্যত কী ঘটল তা একটু বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

স্টারের সফল পরিচালক সলিল কুমার মিত্র মহাশয় স্টার ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর rights and properties বিক্রয় করে দিলেন রঞ্জিত পিকচার্স লিমিটেডকে। রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া হলেন স্টারের সর্বময় কর্তা। ১৯৭৫ সালে জুন মাসে স্টারের প্রায় সমস্ত প্রধান নট-নটী এবং পরিচালক নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত স্টার ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। রঞ্জিতমলবাবু হলেন স্টারের নাট্যপরিচালক। থিয়েটার চলতে লাগল। রঙমহলেও নাটক চলল, কিন্তু এই দশকে ১৫টি প্রযোজনার মধ্যে দুটি নাটক ছাড়া লাভের মুখ দেখা সম্ভব হল না। বিশ্বরূপায় নানা উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনীত হতে শুরু হল। শংকরের 'চৌরঙ্গী' নিয়ে শুরু করে 'আসামী হাজির', 'পরস্ত্রী', 'জনগণমন', 'সাহেব-বিবি-গোলাম', 'দেনা পাওনা', 'ষোড়শী', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'সুবর্ণলতা', 'সব ঠিক হ্যায়' চলল। জানান দিল যে সব ঠিক হ্যায়। দশ বছরে দশটি নাটকের ব্যয়বহুল প্রযোজনা ব্যবসায়িক মঞ্চের পক্ষে খুব একটা শুভ লক্ষণ কিন্তু নয়।

মিনার্ভা থেকে তখন লিটল থিয়েটার গ্রুপ চলে গেছে। ফলে, রাসবিহারী সরকার প্রদর্শিত পথে মিনার্ভাতেও চলতে লাগল 'প্রজাপতি', 'ব্যভিচার', 'বান্ধবী', 'জুয়া', 'প্রিয়ার খোঁজে' প্রভৃতি নাটক। সে নাটকের বিজ্ঞাপনে 'A' দর্শক আকর্ষণ করত। নিষিদ্ধপল্লীতে প্রবেশ করতে গিয়ে ভদ্রলোকের দল যেমন চারদিক দেখে নেয় — তেমনই অনেককে এমন আচরণ করতে দেখা যেত সে সময়।

অন্যান্য কয়েকটি মঞ্চের দিকে তাকাই। অন্ত্র হলে শুরু হল 'সুজাতা'। আরম্ভের কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়েছিল। বাসুদেব মঞ্চে নেমেছিল চারটি নাটক দু'বছরের মধ্যে। শুরু হওয়ার পর নাটকগুলি বেশিদিন চালানো যায়নি। অহীন্দ্র মঞ্চ গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু নাটকাভিনয় হয়নি। বিধানমঞ্চে ১৯৭৭ ও ৭৮ সালে মোট চারটি নাটকের উদ্বোধন হয় ও শেষ হয়। সুজাতা সদনে ৩টি নাটক যাত্রা শুরু করেছিল, অচিরেই শেষ হয়েছিল সেগুলি।

তবে চমক দেখিয়েছিল কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ। অশ্লীল নাটকের ভিড়ের মধ্যেও হরিদাস সান্যালের প্রযোজনায় ও জ্ঞানেশ মুখার্জীর পরিচালনায় 'মল্লিকা', 'না', 'অঘটন' অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেল। স্বচ্ছ, সুন্দর, স্পষ্ট প্রযোজনা। তারপরের প্রযোজনা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নামজীবন'। অনেকেই বলেন পেশাদার মঞ্চের একটি 'মাইল স্টোন' হল 'নামজীবন'।

রঙ্গানা মঞ্চটি নিয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নান্দীকার অন্য থিয়েটারকে নিয়ে এলো ব্যবসায়িক মঞ্চে। তাঁদের সফল প্রযোজনা প্রথাগত ব্যবসায়িক থিয়েটারকে ভাবিয়ে তুলল। পরে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় হল 'জয় মা কালী বোর্ডিং'। প্রযোজক হরিদাস সান্যাল আবার অসাধারণ ব্যবসা পেলেন এই নাটকে।

প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চ 'বারবধূ' 'ভালবাসার ব্রোহট নাটক' চালাল। প্রতিটি দৃশ্যই তার প্রাপ্তবয়স্কের। ফলে 'মীরাবাঈ', 'বধূনায়িকা', 'নিশিপদ্ম' বা 'শ্রীমান-শ্রীমতী' নাটক আর জমানোই গেল না। দর্শকের দাবি হল, প্রতাপ মঞ্চ ব্রোহট নাটকই করবে। বয়েজ ওন মঞ্চ, শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ, গালিব মঞ্চ, নেতাজী মঞ্চ ইত্যাদির উল্লেখ করে তালিকা বৃদ্ধি করতে মন চায় না। তবে নাটকের প্রবাহ কোন দিকে তা বুঝতে বাকি থাকেনি। যার ফলে অজস্র লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে বহু নবাগত প্রযোজক থিয়েটার ছাড়লেন। থিয়েটার হলগুলি যাত্রার প্রদর্শনী কেন্দ্র হয়ে উঠল। প্রায় প্রতিটি হলে বিশ্বরূপার 'চৌরঙ্গী' নাটকের অনুকরণে Miss A থেকে Miss Z পর্যন্ত মেয়েরা নগ্ন-ক্যাবারে নাচ নাচতে লাগল। ফলে আশির দশকে মঞ্চের সংখ্যা ৮ থেকে কমতে কমতে ৫-এ এসে দাঁড়াল। ৯০-এর দশকে মঞ্চের সংখ্যা প্রকৃত অর্থে ১ বা ২। যাঁদের মঞ্চমালিকানা নিজস্ব — তাঁরাই চালাতে পারলেন মঞ্চ এই কটা বছর।

কেন এত অন্ধকার? কেন সংঘর্ষ? সাধারণ রঙ্গালয়ের অবলুপ্তির কারণ কী? অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখার্জী বিভিন্ন বিদগ্ধজনের বক্তব্যকে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন : Its drama is poor. It lacks direction and inspiration. Its acting standard is midiocre. There is no outstanding performance. A few talented ones are either wasting themselves by repitition or infrequently seen. The performances of most actors and actresses is uninspired, routined. Original drama is rare.

সুশীলকুমার মুখার্জীর কারণ নির্দেশ নিঃসন্দেহে অতিসরলীকরণ। বাস্তব প্রেক্ষিত বিশ্লেষণের দায় তিনি উপলব্ধি করেননি। সুতরাং বিপর্যয়ের সেই পটভূমিকে বিশ্লেষণ করাই আজ প্রয়োজন। সত্তরের দশকের সূচনায় রাজনৈতিক ঘূর্ণি এলো পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতা হল সেই রাজনীতির কেন্দ্রভূমি। এই রাজনীতি বাংলার নাটককে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করল না বটে, কিন্তু কার্ফু, বোমাবৃষ্টি, শ্রেণীশত্রু খতমের ঘোষণা কলকাতাকে এমনই সন্ত্রস্ত করে তুলল যে গ্রাম থেকে আসা পাবলিক স্টেজের প্রকৃত দর্শকেরা ভয় পেলেন। অকস্মাৎ যদি বাস-ট্রেন বন্ধ হয়ে যায় কেমন করে তাঁরা ফিরবেন গাঁয়ে। ফলে কলকাতার ব্যবসায়িক মঞ্চের নাট্যদর্শকের সিংহভাগ নাটক থেকে মুখ ফেরালেন। আর এই অবকাশেই শুরু হল যাত্রার আগ্রাসন।সরকারি দাক্ষিণ্য তখন যাত্রাকে ঘিরে কম বর্ষিত হয়নি। যাত্রা চলল গ্রামে। গাঁয়ের মাঠে মাঠে তিনদিন থেকে শুরু করে দশ বা পনেরো দিন ব্যবসায়িক যাত্রার উৎসব শুরু হল। অল্প দর্শনী, অথচ আনন্দের সীমা নেই। যাত্রার লাভে যাত্রার মালিকেরা 'ধরাকে সরাজ্ঞান' করতে লাগলেন। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে যাত্রা-মালিক কলকাতার থিয়েটার হল কিনে নিয়ে যাত্রার প্রদর্শনী করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। সুতরাং টনক নড়ল থিয়েটার ও চলচ্চিত্র শিল্পীদের। তাঁদের কেউ কেউ স্থায়ীভাবে যোগ দিলেন যাত্রায়। এক মাসে যে অর্থ উপার্জন করলেন তাঁদের অনেকেরই সারা বছরে থিয়েটার বা সিনেমা থেকে তা রোজগার করা অসম্ভব ছিল। অথচ যাত্রাওয়ালা হতেও তাঁদের নাক কুঁচকোয়। পুরাতন প্রবাদ মনে পড়ে — 'যাত্রা করে ফাতরা লোকে'। সুতরাং আত্মপ্রতারণার পথে গেলেন তাঁরা। 'তিনদিক খোলা' মঞ্চ নামে একটি সোনার পাথরবাটি অবলম্বন করে রথী-মহারথী নট-নটীরা যাত্রা করতে ছুটলেন (ছিঃ! থিয়েটার করতে ছুটলেন) গ্রামে-গঞ্জে। টাকার ফোয়ারা ছুটল। থিয়েটার হল গৌণ। 'কল শো' হল মোক্ষের পথ। শহরতলীও তিনদিক খোলা মঞ্চের আসর সাজাল। এমনকি পাবলিক থিয়েটারের চালু নাটকও অভিনীত হতে শুরু করল তিনদিক খোলা মঞ্চে। তিনদিক খোলা মঞ্চের যোগাযোগকারীরা পেশাদারি মঞ্চের নট-নটীদের সামনে যে টোপ ঝোলালেন সেদিন তাতে তাঁরা ব্যবসায়ী মঞ্চের প্রযোজককে বাধ্য করলেন কলকাতাতে তাদের 'কল শো'-র অভিনয়ে 'আপত্তি নাহি' ঘোষণা করতে। এমত অবস্থায় দর্শক কেন আসবেন পুলিসি হাঙ্গামা সহ্য করে, বাস-ট্রাম-ট্রেনের হুজ্জোৎ সামলে থিয়েটার দেখতে? সুতরাং সেই বিপর্যয়ের দিনে নট-নটীর দল অর্থ কামালেন — থিয়েটারের ব্যবসায়ী প্রযোজক ঘর-বাড়ি বেচলেন, মহাজানের সুদ মেটাতে না পেরে পালিয়ে বেড়ালেন গুন্ডার ভয়ে।

এমত পরিস্থিতিতেই বিশ্বরূপা থিয়েটারের রাসবিহারী সরকার বাঁচতে ও থিয়েটারকে বাঁচাতে থিয়েটারে আমদানি করলেন 'ক্যাবারে ডান্স'। গ্রামের লোকে যাত্রার সঙ্গে এটি তো পাচ্ছে না — সুতরাং, আদিমতার সুড়সুড়ি চলুক। পরিকল্পনা সফল হল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য থিয়েটারেও কোরামিন খুঁজতে গিয়ে 'স্বর্গের অপ্সরা শেফালী' বা গীতা-মিতা-

সীতার আমদানি ঘটল। ফলে যাঁরা সপরিবারে নাটক দেখাকে জীবনের উৎসব বলে মনে করতেন, তাঁরা পেশাদারি মঞ্চের নাটক থেকে সরে গিয়ে অন্য থিয়েটারে ভিড় জমালেন।

পেশাদারি মঞ্চের অনেক নায়ক-নায়িকাই তখন অধিক অর্থ আদায়ের পথ খুঁজে পেয়েছেন। ফলে মাইনে বাড়ানোর আন্দোলন শুরু হল। না হলে চালু নাটক ছেড়ে অন্য স্টেজে যোগ দিতে ছুটলেন। অন্য মালিকও ভাবলেন যে অন্তত একজনকে বা দু'জনকে বেশি টাকা দিয়ে ভাঙিয়ে আনলে তাঁদের কৃতিত্বেই নাটক চলবে। এভাবে থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রী হারিয়ে ফেললেন বিশ্বাসযোগ্যতা। থিয়েটারের পরিবেশ হল কৃত্রিম। সবচেয়ে বড় কথা, এইসব অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল কেবলমাত্র নিজেদের বেতনবৃদ্ধির জন্যই সরব হলেন। সকলের জন্য নয়। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের প্রযোজক চেয়েছিলেন যে তাঁর মঞ্চের কোনও অভিনেতা যেন ১০০ টাকার কম না পান। তাতে অন্তত সেই অভিনেতার গাড়িভাড়ার টাকা উঠে আসবে। কিন্তু খ্যাতিমান নট-নটীরা মন্তব্য করেছিলেন — 'ওদের জন্য ফুল ছড়িয়ে দেবেন .... ওদের দেখতে থিয়েটারে দর্শক আসে? আমাদের দেখতে আসে।' এই ধরনের মানসিকতায় থিয়েটারের পরিবেশ নরক হয়ে উঠতে বাধ্য। থিয়েটারের অন্যতম প্রাক-শর্ত হল যৌথ দায়িত্ববোধ। পরিচালক-নাট্যকার-নায়ক থেকে শুরু করে পর্দা-ফেলিয়ে মানুষটি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের সাফল্যে এঁরা প্রত্যেকে দায়বদ্ধ। এই মনোভাব প্রাক-স্বাধীনতা যুগের থিয়েটারে ছিল — ১৯৫৩ সালের সময় থেকে মঞ্চে যে খোলা হাওয়া বইতে শুরু করে তাতেও এই বৈষম্য ছিল না। কিন্তু শতবর্ষোত্তর ব্যবসায়িক মঞ্চে এটি নতুন করে জন্ম নিল। ফলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শক্তি গেল কমে। থিয়েটারে তিনটি দলের সৃষ্টি হল — প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল, অপ্রধান শিল্পীদের দল, আর মালিকের দল। দল থাকলেই থাকবে উপদল এবং অনুসিদ্ধান্তে কোন্দল।

আগেই বলেছি যে যাত্রা বিজয়-বৈজয়ন্তী ওড়াচ্ছে তখন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের পাতা যাত্রার কল্যাণে তখন প্রতিদিন পূর্ণ। কে কত বড় বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারেন, 'তারি লাগি কাড়াকাড়ি' চলেছে। ফলে অর্থনীতির সাধারণ নীতি অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের দাম আকাশ-ছোঁয়া হয়ে গেল। বড় বিজ্ঞাপন দেওয়া যেমন দস্তুর হয়ে দাঁড়াল তেমনই বিজ্ঞাপনের ব্যয়ও পেশাদার মালিকের কপালে ভাঁজ ফেলল। রাতারাতি থিয়েটারের মাসিক খরচ বেড়ে গেল দেড়গুণ। লোকসানের বোঝা বেড়েই চলল।

প্রবাদবচন বলে, 'দুর্ভাগ্য একা আসে না, উহারা দল বাঁধিয়া আসে।' — দল বেঁধেই এলো। গ্রামে গ্রামে 'ভিডিও সেন্টার' গড়ে উঠল, গঞ্জে-শহরে-উপশহরে ঘরে ঘরে বসল টিভি বিশ্বের তাবৎ প্রমোদের আয়োজন প্রস্তুত করে। বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পূর্বের লজ্জা কাটিয়ে 'যাত্রা জীবন্ত লোকশিল্প' এমত প্রশংসাপত্র হাতে নিয়ে সরাসরি অভিনয় করতে শুরু করলেন, প্রতি রজনী ২৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা দক্ষিণা নিয়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই রাতারাতি গ্রুপ থিয়েটার খুলে সংগ্রামী নাট্য-বিশেষজ্ঞ বনে গেলেন, আর 'সিরিয়াল' নামক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাট্টা অধিকার করে বসলেন।

এমত অবস্থায় কার দায় পড়েছে তমসাচ্ছন্ন থিয়েটারগুলি বাঁচানোর? দেনায় দেনায় ছয়লাপ সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মালিকের? কেন সে দায়িত্ব নেবেন তাঁরা? অন্য ধারার থিয়েটার বুঝে নিয়েছে কোন মন্ত্রে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ এতদিন ধরে চলেছিল। সেই মন্ত্র তাঁরা গ্রহণ করলেন। খরচ তাঁদের কম — কারণ অধিকাংশ নাট্যকর্মীই গাঁটের পয়সা খরচ করে নাট্যসংগ্রাম করতে অন্য ধারার থিয়েটারে যোগ দিতে আসেন। সুতরাং নয়া চিরস্থায়ী ব্যবস্থার 'সিরিয়াল'-এ দলের কয়েকজনের ছিঁটেফোঁটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পারলেই 'অন্য ধারার থিয়েটার' ও 'সিরিয়াল' একই সঙ্গে রক্ষিত হবে। পাশাপাশি বুদ্ধিজীবীর তকমা লাভ করা যাবে অক্লেশে।

সম্প্রতি অন্য ধারার জনৈক প্রতিভাবান নাট্যকার-পরিচালক নিদান হেঁকে বলেছেন যে, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ আবার বাঁচতে পারে যদি চারটি শর্ত পূর্ণ হয়। সেগুলি হল — ১. সহজ সাদামাটা আকর্ষণীয় গল্প আর ভালো সংলাপ সাজানো নাটক, ২. চার-পাঁচজন প্রতিভাবান স্টার অভিনেতা, ৩. লাইট, স্টেজের বৈভব ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত উপকরণ, ৪. শততম রজনী পর্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করে চলানোর মতো বুকের পাটাওয়ালা প্রযোজক।

নিদান শুনে হাসি পেয়েছিল; কারণ এমন পাটাওয়ালা প্রযোজক আর থিয়েটার করবেন কেন? তিনি ওই টাকায় 'মেগা সিরিয়াল'-এর প্রযোজক হবেন এবং বিনা ক্লেশে কোটি টাকার ব্যবসা করবেন। সত্যের খাতিরে আরও সহজ করে বলি, 'নামজীবন' যখন অভিনয় হয়েছিল তখন উপরোক্ত চারটি শর্ত ভালোভাবেই রক্ষিত হয়েছিল। ইতিহাসেও লেখা হয়েছিল বাংলা রঙ্গামঞ্চের 'মাইল স্টোন' 'নামজীবন'। কিন্তু 'নামজীবন'-এ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন যিনি, তিনি হলেন এই নাটকের প্রযোজক নামক ব্যবসায়ী প্রাণীটি। তাঁর 'জয় মা কালী বোর্ডিং' যদি মোটা লাভ ঘরে না তুলে দিত তবে ওনাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হত না। প্রযোজক মহাশয় এখনও জীবিত, এবং তাঁর সাক্ষাৎকারও টেপবদ্ধ হয়ে আছে। ইতিহাস সৃষ্টি করা নাটকটি প্রযোজকের বিনিয়োগ অনুযায়ী লাভ দিল না। ওই বিশাল বিনিয়োগ-করা টাকা ব্যাঙ্কে ফেলে রাখলে যে টাকা সুদে পাওয়া যেত তা তো তিনি পাননি। তাই এক অর্থে এই প্রযোজনা তাঁর লোকসানের। তাই লোকসান মেটাতে সস্তার আর একটি প্রযোজনার সাহস দেখিয়েছিলেন বটে। তারপর মানে মানে থিয়েটারকে সেলাম ঠুকে কাশী বিশ্বনাথ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এই সমস্ত ইতিহাস সৃষ্টি করার আকুতি নিয়ে আসা প্রযোজকদের নাম কিন্তু উচ্চারিত হয় না। এই বোকামি আর তাঁরা চালাবেন কেন? প্রাসঙ্গিকভাবেই উদ্ধৃত করি গবেষকপ্রবর ড. প্রভাত কুমার দাসের বিশ্লেষণ : 'মনোজ মিত্র রঙ্গামঞ্চের 'হারানো প্রাপ্তি' স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির মুহূর্তে প্রশ্ন তুলেছিলেন : 'সলিল মিত্রের মতো রুচিবান প্রযোজকেরা সরে যেতে কিছু লোভী, চতুর মুনাফাখোরদের পাল্লায় পড়ে কুৎসিত কান্ডকারখানার আখড়া হয়ে উঠেছিল সাধারণ রঙ্গালয়গুলি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গণেশ মুখোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজনের দ্বারা হৃত সম্মান উদ্ধার করা সম্ভব কি? কিন্তু এই প্রশ্নের আরও অন্য প্রশ্ন উঠতে পারে। সত্যি কি সলিল মিত্রের পরে বাংলা রঙ্গালয়ে বাণিজ্যিক উপলক্ষে কোনও উদারহৃদয় প্রযোজক আসেননি? অনুপ গুপ্ত, স্বপন সেনগুপ্ত কিংবা মন্টু সেনগুপ্ত, শুক্লা সেনগুপ্ত শুধু কি বক্স অফিসের বিস্ফোরণের অভিলাষে দল সাজিয়ে থিয়েটার ব্যবসায়ে এসেছিলেন? এঁদের মধ্যে শেষোক্ত দম্পতির উত্তরাধিকার ছিল থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের ও প্রচারের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত যোগেন সেনগুপ্তের মত মানুষের। .... ভালো থিয়েটারের প্রযোজনায় হাতিবাগানের দুর্নাম মোচন করা সম্ভব — এই ব্যবসা বুদ্ধিহীন অথচ কেবল আবেগ নিয়ে তাঁরা আবিষ্কারের নতুন পথ খুঁজতে চেয়েছিলেন। যার অনিবার্য পরিণতি পেশাদার মঞ্চের শেষতম কলঙ্কিত ঘটনা, দেনার দায়ে গৃহবধূর উদ্‌বন্ধন।'

আরও প্রশ্ন উঠতে পারে।

নাট্যকার শ্রী মিত্রের নাটক নিয়ে বাংলা মঞ্চে 'নামজীবন' নাটকের প্রযোজক আবার প্রযোজনা করেছিলেন 'দম্পতি'। কিন্তু তা নিয়ে সাধারণ রঙ্গামঞ্চের ভাগ্যরেখা বদল হয়নি। প্রযোজক ভদ্রলোক দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, কি পেলাম? রজতঝংকার কানে বাজেনি, স্বীকৃতিও মেলেনি। এমনকি 'দম্পতি' নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পরেও তার প্রযোজক হিসাবে তাঁর নামটি লিপিবদ্ধ হয়নি। প্রকাশিত গ্রন্থটি হাতের কাছে না পাওয়ায় প্রযোজক মহাশয়ের এই খেদোক্তি কতখানি বস্তুগত তা বিচার করতে পারিনি। আসলে প্রযোজকদের প্রতি অন্য থিয়েটারের উপেক্ষা সাধারণ রঙ্গামঞ্চের পতনের অন্যতম কারণ। তাঁরা ব্যবসা করতে এসেছিলেন সত্য, কিন্তু এটা তো সত্য যে তাঁদের ব্যবসার খাতিরেই বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় প্রায় ১৩০ বছর এগিয়ে এসেছে ঝড়ঝাপটা সহ্য করে, দেউলিয়া হওয়ার ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে। এঁদের আড়াল করে উন্নাসিক মন্তব্য 'মৃতসঞ্জীবনী' হতে পারে না। তা হয়ে ওঠে শৌখিন মজদুরি।

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে ভর্তুকি দিয়ে সরকার থিয়েটার চালাতে পারে না। অন্য ধারার থিয়েটারে নাট্যকর্মীর দল মূলত আর্থিক সম্বন্ধে বিজড়িত নন। তাঁরা হয় অন্য পেশায় নিযুক্ত, বা অভিনয় ও নাট্যঅভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে অন্য কোনও মাধ্যম থেকে রোজগার করে ভরণপোষণ করে থাকেন। এ অবস্থায় নাট্যদলের প্রধান আকুতি হল শুধু অভিনয়ের মতো অর্থ সংগ্রহ করা। ফলে ভর্তুকির প্রশ্ন, সরকারি অনুদানের প্রশ্ন সেখানে থাকতেই পারে। সমাজের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা সামাজিক দায়বদ্ধতার। সুতরাং সমাজ তথা রাষ্ট্র সেই জাতীয় থিয়েটারকে অনুদান দিতে নীতিগতভাবে বাধ্য। কিন্তু সাধারণ রঙ্গামঞ্চে যুক্ত প্রতিটি কর্মীর সেটাই পেশার স্থান। এবং থিয়েটার ব্যবসায়ীর ব্যবসা ক্ষেত্র। প্রত্যেক নাট্যকর্মী সেখানে বেতনভুক এবং প্রতিমাসে নির্দিষ্ট রঙ্গমঞ্চে অন্তত গড়ে ২০টি শো

তাঁদের করতে হবেই। এই অবস্থায় ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সরকার এসে যদি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ চালাতে বসেন তাহলে সরকারকেও ব্যবসায়ী হতে হবে (সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রশ্ন আলাদা, কারণ সেখানে নাট্যপ্রযোজনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি ভিন্ন প্রকারের)। সুতরাং ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চের মুক্তির নিদান খুঁজব আর বলব ব্যবসায়ীরা ধান্দাবাজ, একি স্ববিরোধিতা নয়?

নির্মোহ বিশ্লেষণে যদি নিন্দার বাণ ঝলসে ওঠে, তাহলে সহ্য করতে হবেই। কতকগুলি মিথকে আদর্শ করে বসে থাকলে চলবে না। সত্য ব্যাপারটি হল, বাবু আমলের যুগে যাঁরা থিয়েটারকে ব্যবসা বলে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা থিয়েটার চালাতে নিঃস্ব হয়েছিলেন শুধু দর্শকের আনুকূল্য না পেয়ে নয় — তার সঙ্গে ছিল তাদের খামখেয়ালিপনা, অমিতব্যয়িতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা। বাংলা রঙ্গালয়ের নেপোলিয়ন বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যের পেছনে দর্শকদেবতার বিরূপতা ছিল না৷ দর্শক উজার করে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁকে। কিন্তু খামখেয়ালিপনা, ব্যবসায়িক অদূরদর্শিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাও বড় কম ছিল না তাঁর। সেই ধারা সঞ্চারিত হয়েছে আর্ট থিয়েটার, শিশিরকুমারের যুগেও। শিশিরকুমার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের দল থিয়েটারের ভেতরের কদর্যতার প্রতি দৃকপাত করেননি। কারণ করা সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে। চিত্রমঞ্চের খ্যাতিমান নট কমল মিত্র মহাশয়ের আত্মজীবনী, মণি শ্রীমানির স্মৃতিচারণ সে সমস্ত তথ্যকে প্রমাণ করার মতো অজস্র সাক্ষ্য বহন করছে! মনে রাখা দরকার যে আমি শিশিরকুমারের নিন্দায় বসিনি, বসেছি এটা দেখতে যে থিয়েটারকে কলুষিত করার একটা চোরাস্রোত সমানে চলেছে। অমরেন্দ্রনাথের আমল থেকে দর্শকের শিস্ দেওয়া, মন্তব্য করা বা অন্যান্য অভদ্রাচরণের একটা প্রচ্ছন্ন প্রশয় দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল বটে, কিন্তু থিয়েটারের পরিবেশ দূষিত করেছিল। ভদ্রমানুষ থিয়েটারকে এড়িয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। স্ত্রী-কন্যাসহ থিয়েটার দেখা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। গুর্মুখ রায়ের কামনায় বিনোদিনীকে সঁপে দিয়ে গিরিশচন্দ্রের থিয়েটার গড়ার চেষ্টায় এই দূষণের উৎসকে খুঁজতে হবে। কেন স্টারের সম্রাট মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অজস্র সার্থক প্রযোজনা সত্ত্বেও তাঁকে থিয়েটার ছাড়তে হয় তার কারণ খুঁজতে হবে। সুতরাং থিয়েটারের প্রথম যুগের মালিক থেকে যে রোগ সৃষ্টি হয়, তা সংক্রামিত হয় নট-নটী, ম্যানেজার থেকে শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত। ভাবতে অবাক লাগে যে তার মাঝেই কয়েকজন মালিক চেষ্টা করেছিলেন মঞ্চকে সুরুচির তীর্থ বানাতে।

তাই বলছিলাম, ব্যবসায়িক থিয়েটারের মালিককে গাল পেড়ে লাভ কী? তাঁদের বিপদের দিনে অনেক ক্ষেত্রে যে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁদের সহায়তা করেননি তার প্রমাণ থিয়েটার পরিচালনায় দীর্ঘদিন যুক্ত থাকা দেবনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের সাক্ষ্য।

'দু-একটা ব্যতিক্রমী প্রযোজনা ছাড়া মার খাচ্ছে বেশিরভাগ নাটক। খাবেই। প্রথমতঃ, যে না সে লিখছে; বোধ হয় একটা বাক্যও শুদ্ধ করে লিখতে পারে না। নতুন টেকনিশিয়ানরা উঠে আসছে না। তাপস সেনদের পরেও জায়গাটা শূন্য হয়ে আছে। তারপর রয়েছে শিল্পীদের আচার-আচরণ। টাকার জন্য এঁরা এমন সব কাজ করেন যাতে অবমাননা করা হয় থিয়েটারের, শিল্পের।'

প্রসঙ্গত বলি, কিছুদিন পূর্বে খালেদ চৌধুরীর নাট্যজীবনের ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে 'নন্দন' ভবনে একটি প্রদর্শনী আয়োজন করেছিলেন সম্ভবত 'নাট্যশোধ সংস্থা' এবং সেই উপলক্ষ্যে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রশ্ন করবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উত্তর দেবেন খালেদ চৌধুরী। সভাকক্ষ প্রায় পূর্ণ। উৎসাহী শ্রোতাদের অধিকাংশই কিন্তু খালেদ চৌধুরীর নাট্যকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না। ফলে 'প্রশ্নোত্তর' পর্বে এক 'উল্টাপুরাণ'-এর খেলা শুরু হল। খালেদ চৌধুরী মশাই নিজে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন আর উত্তর দিতে লাগলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ক্রমে শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আসতে লাগল। অজস্র প্রশ্ন। স্বাভাবিক। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সুদক্ষ নট-নাট্যকার-অভিনেতা-আবৃত্তিকার-কবিকে মুখোমুখি পাওয়া এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। মূল অনুষ্ঠানের ছন্দভঙ্গ ঘটল। এসময় জনৈক প্রশ্নকর্তা শ্রী চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অবলুপ্তির দিনগুলিতে তাঁদের মতো নট-নাট্যকার-পরিচালকেরা কি কিছুই করতে পারেন না? তাঁর রচিত ও পরিচালিত নাটক দেখতে কী অদ্ভুত আগ্রহ লক্ষ্য

করা গেছে সম্প্রতি। সুতরাং এখন কি কিছু করার মতো কাজ তাঁরা করতে পারেন না ওই থিয়েটারগুলিকে ঘিরে? প্রশ্নকর্তাকে বসিয়ে দিলেন শ্রী চট্টোপাধ্যায়। বললেন, প্রশ্নকর্তা পেশাদারি থিয়েটার সম্বন্ধে কোনও সংবাদই রাখেন না। সেসব মঞ্চ চলে গেছে প্রোমোটারের দখলে। প্রশ্নকর্তা তর্কবিস্তারে ইচ্ছুক হননি। কারণ বাবু যত বলে, তার পারিষদের দল বলে আরও বেশি। সুতরাং প্রশ্নকর্তা বসলেন। উপলব্ধি করলেন যে এমন একদল প্রতিভাদীপ্ত থাকেন যাঁরা মহামানব। চলচ্চিত্রের আকালে তাঁদের জন্য সাধারণ রঙ্গামঞ্চের দ্বারা খোলা, সাধারণ রঙ্গামঞ্চের দুর্ভাগ্যের দিনে তিনদিন খোলা মঞ্চে তাঁরা নাট্যসংগ্রাম চালান — তারপর যাত্রার (থুড়ি তিনদিক খোলা মঞ্চের) বিপদের দিনে তাঁরা গ্রুপ থিয়েটারের পথপ্রদর্শক, গ্রুপ থিয়েটারের জটিলতা ও ব্যক্তিত্ব সংঘাতের দিনে দূরদর্শন ও A থেকে শুরু করে Z চ্যানেলে তাঁদের আসন পাতা। সুতরাং তাঁদের কাছে সাধারণ রঙ্গামঞ্চ বাঁচল কি ডুবল তা একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। কারণ তাঁদের বিশ্বাস, 'উদেতি সবিতা তাম্রস্তাম্র এবা স্তমেতি চ — অর্থাৎ সূর্য উদয়কালে যেমন রক্তবর্ণের, অস্তকালেও তেমনই রক্তবর্ণ ধারণ করে অবস্থান করে।

তাই অবাক লাগে, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বরা যখন বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের দুর্ভাগ্য দূর করতে ইদানীংকালের সলিল মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গণেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজে পান না। সলিল মিত্র, গণেশ মুখোপাধ্যায় না হয় থিয়েটারের প্রযোজক তথা মালিক। কিন্তু এই তালিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কেন? জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, হরিদাস সান্যাল, ধনঞ্জয় বৈরাগী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অপর্ণা সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাহলে কী দোষ করলেন?

নাট্যকার-পরিচালকরূপে বেতনের বিনিময়ে চাকরি করতে গিয়েছিলেন শ্রী চট্টোপাধ্যায় — তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তার জন্য তিনি ধান্দাবাজি-ভরা ব্যবসায়িক থিয়েটারের দুর্দিন ঘুচিয়ে থিয়েটার বাঁচানোর মহত্তম কর্মটি কী করলেন? কোনও ব্যক্তির সদর্থক ভূমিকা তুলে ধরা যায় সদর্থক ভঙ্গিতে, স্তাবকতায় নয়। তাই বলি, প্রতিভাধর শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ক্ষমতা, তাঁর নাট্যপরিচালন ক্ষমতা, তাঁর সাহিত্যবোধ নিঃসন্দেহে একটি যুগের উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। বাংলা সাধারণ রঙ্গামঞ্চে তিনি কয়েকটি উজ্জ্বল প্রযোজনার অনুবাদ-নির্ভর রচয়িতা ও নির্দেশক। একথা দিনের মতো পরিষ্কার, কিন্তু সাধারণ রঙ্গামঞ্চের অবলুপ্তির দিনে তিনি রক্ষাকর্তা, এমত সিদ্ধান্ত অতিকথন।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ব্যবসায়িক রঙ্গামঞ্চকে বাঁচাতে ব্যবসায়ীরা কী করেছেন ইদানীংকালে? এই প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলাম রঞ্জিতমল কাঙ্করিয়ার কাছে। দেখলাম স্পষ্ট ধারণা তাঁর এই বিষয়ে। তিনি বললেন, আধুনিককালের সঙ্গে তাল মেনে পুরাতন মঞ্চগুলির পুনর্নির্মাণ দরকার — প্রযোজনাকে প্রযুক্তিগত দিক থেকেও আধুনিক করে তুলতে হবে। একথা মাথায় রেখে তিনি যে স্টার রঙ্গামঞ্চের পুনর্নির্মাণের উদ্যোগী তা বোঝাতে কিছু তথ্য পেশ করেন। মেয়রকে প্রেরিত নিম্নকৃত চিঠিটি তাঁর উদ্যোগের এক প্রমাণ।

Submitted to Hon'ble Mayor of Calcutta

<u>MEMORANDUM TO RESUME STAR THEATRE</u>

<u>Parties interested in the Star Theatre</u>

1) Renubala Dey of 54, Ramdulal Sarkar Street, Calcutta - 700004 widow of Late Amiya Kr. Dey, elder brother of Late Govinda Chandra Dey (Ex-Mayor). She is the landlady of Star Theatre premises, and the building thereon.

2) Shree Ranjit Pictures (P) Ltd. is the Owner of goodwill of Star Theatre and all its moveable property and assests.

3) Allahabad Bank — Beadon Street Branch financed M/s. Protap Chandra Dey, Amiya Kumar Dey & Bros. against mortage of the following properties.

i) No. 1 Gorkha Basi Road, Nager Bazar Dum-Dum.

ii) 36A & 36B, Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta.

iii) No. 20, 20/1A, 20/1B, 20/1C Lalbazar Street, Calcutta.

The Bank Claim as on 30-06-93 was Rs. 6,71,16,826 filed a title suit No. 321 of 1993 before the Honable High Court Calcutta and subsequently transferred to Bank Recovery Tribunal and judgment is not yet passed till date.

4) It is heard in the Trade that one Makhanlal Natta of Natta Company had abvanced certain sums to Govindra Chandra Dey for purchase of the Star Theatre premises. There is no registered document of any kind before the Registry Office, Courts and Calcutta Municipal Corporation.

Current position is :

Renubala Dey had filed an ejectment suit No. 134/1988 before the Hon'ble High Court against M/s. Shree Ranjit Pictures (P) Ltd. for vacating the said premises. All the interim application were duly disposed and a receiver Mr. Subhas Bhattacharya was appointed to collect Rent from M/s. Shree Ranjit Pictures (P) Ltd. and M/s. Shree Ranjit Pictures (P) Ltd. were allowed to carry their Theatre business as usual. The final hearing of the suit is pending before the Hon'ble High Court.

Claim of Allahabad is still pending before the Tribunal.

Claim of Makhanlal Natta is very uncertain and we do not understand his legal aspect if any.

Relief Wanted :

An amicable settlement can be done between Sm. Renubala Dey & Shree Ranjit Pictures (P) Ltd. as follows : -

i) Fresh Lease for a period of (30) years be granted to Shree Ranjit Pictures (P) Ltd.

ii) Shree Ranjit Pictures (P) Ltd. shall bear the entire cost of reconstruction/restoration of the building.

OR

An amount which was settled for sale of the property to Makhanlal Natta was to be paid the Landlord / Allahabad Bank by M/s. Ranjit Pictures (P) Ltd. on reasonable installments. The advance amount paid by Makhanlal Natta to be refunded directly to Mr. Makhanlal Natta by Shree Ranjit Picture (P) Ltd.

OR

By calling the Landlady, Ranjit Mull Kankaria, Allahabad Bank and Makhalal Natta you can arrange a settlement on such terms and conditions you coinsider suitable to resume STAR THEATRE.

OR

Star Theatre Building is declared as a Heritage Building and thereafter the Government be rightfully chased to bring the theatre to life.

The star Theatre Buiding's front portion which has a Temple-Style Architecture which no other theatre has in India. Its gradual destuction, we appeal to Hon'ble Mayor to intervene sharp to save this National Cultural Monument.

Dated 18th September 2000.

(RANJIT MULL KANKARIA)

জানি না এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে কি না। কলকাতার মাননীয় মেয়রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হয়তো স্টার খুলতেও পারে একদিন। কিন্তু একথা ঠিক যে শুধু স্টার খুলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অবলুপ্তি ঠেকানো যাবে না।

সাধারণ রঙ্গালয়কে 'দয়া' দিয়ে না বাঁচিয়ে 'সম্মান' দিয়ে আত্মনির্ভর করে তোলার পথ খোঁজা কয়েক পৃষ্ঠা প্রবন্ধের বিষয় নয়। তাই সে চেষ্টা করলাম না। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মুক্তিসন্ধানে কোনও পরিকল্পনা যদি ভবিষ্যতে রচনা করা হয় তবে অন্য ধারার কয়েকজন নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনাই যথেষ্ট হবে না। কারণ তাঁরা পাবলিক থিয়েটার জানেন না। এ জন্য ডাক দিতে হবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কেরাণী, দারোয়ান, আশার, শিফটার, প্রম্পটার, অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক ও প্রযোজকদের।

নতুবা রোগটা জানা যাবে না, ঔষধ সন্ধান হবে কীভাবে?
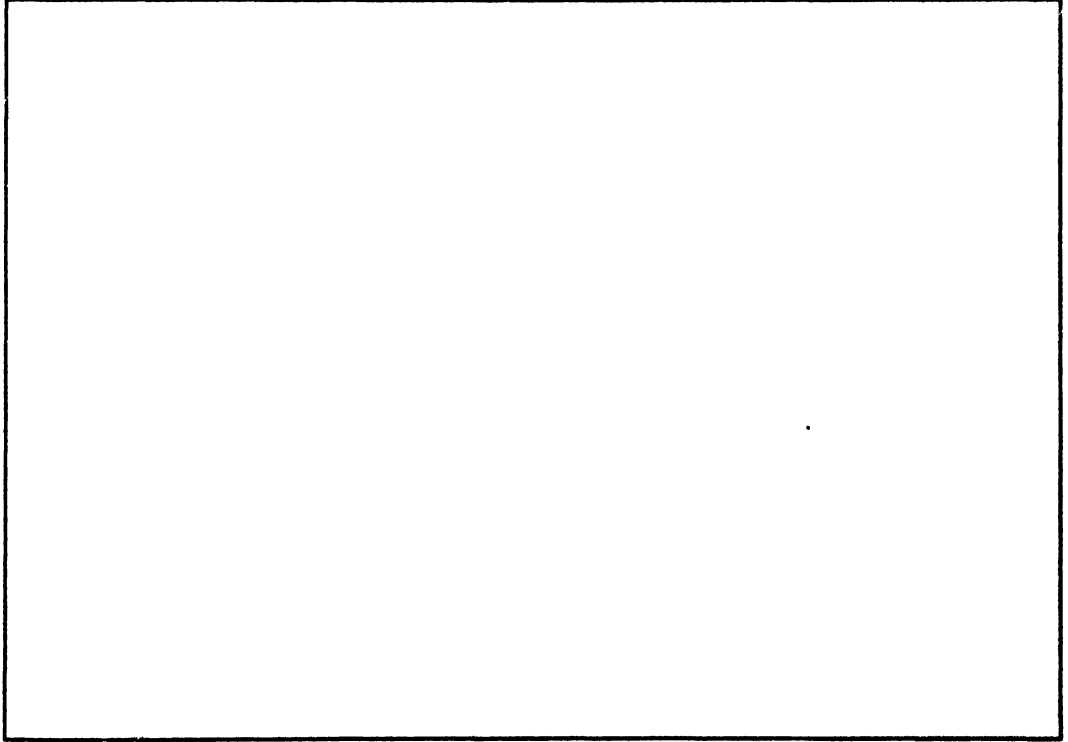
'একক দশক শতক' নাটকে নীলিমা দাস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু

অদ্ভুত আঁধার গ্রাসে সাধারণ রঙ্গালয়

জগন্নাথ ঘোষ

রঙ্গভূমি ভালবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন
— গিরিশচন্দ্র

সাধারণ রঙ্গালয়ের আবির্ভাব ঘটে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর, ন্যাশনাল থিয়েটারে যেদিন দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনীত হল সেদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিপ্লব ঘটে যায়। এই বিপ্লব জাতীয়তাবোধের উন্মেষের বিপ্লব। মুক্তিপাগল ভারতবাসীর হৃদয়-ভাষ্য রচনা করেছিল ন্যাশনাল থিয়েটার। আত্মপ্রকাশের আনন্দ বিহুল করেছিল সমগ্র জাতিকে। কারণ থিয়েটারের মাধ্যমে সমগ্র জাতি কথা বলে। 'নীলদর্পণ' জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনার নাটক। তার প্রধান চরিত্র স্বরপুর গ্রামের গোলোক বসুর প্রথম পুত্র নবীনমাধব বসু শুধু অসহায় প্রজা সাধারণের 'বড়বাবু' নয়, জাতীয়তাবোধের নবজাগ্রত জাতির 'বড়বাবু'। ১৮৬০ সালে এই বড়বাবু ইংরেজ নীলকর সাহেবের বুকে বুটপরিহিত পায়ে পদাঘাত করেছিল। এই পদাঘাত কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আত্মবিকাশে উন্মুখ সমগ্র জাতি পদাঘাতে ইংরেজ বিতাড়নের স্বপ্ন দেখছিল। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নীলদর্পণ নাটকে সেই স্বপ্নের নাট্যরূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার সেই নাটকের অভিনয় করে জাতির মুক্তিআকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটিয়েছিল।

বর্তমানে একটি শব্দ প্রায়ই আমাদের বিহুল করে। শব্দটি হল 'দায়বদ্ধ'। আজকাল রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রায়ই এই শব্দ উচ্চারণ করে তাঁদের জনতোষিণী মানসিকতার প্রকাশ ঘটান। দেখে মনে হয়, 'দায়বদ্ধ' শব্দটি এ কালের মানুষের একচেটিয়া সম্পত্তি। কিন্তু যেদিন ন্যাশনাল থিয়েটার নীলদর্পণ অভিনয় করে সেদিন কি এই থিয়েটার দেশের

মানুষের কাছে তার দায়বদ্ধতার পরিচয় দেয়নি? সাধারণ রঙ্গালয় যে দেশ ও সমাজের কাছে দায়বদ্ধ সেকথা ন্যাশনাল থিয়েটার তার আবির্ভাবের দিনই স্বীকার করে নিয়েছে।

১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারের মাধ্যমে যে সাধারণ রঙ্গালয়ের গৌরবময় অভিযাত্রা শুরু হয়েছে তার শতাধিক বছরের ইতিহাস নানা বৈচিত্র্যময় রোমাঞ্চনায় ভরা। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে সেই বিচিত্র রোমাঞ্চিত ইতিহাসের গতি আজ স্তব্ধ। সেই স্তব্ধতার পাদপীঠে দাঁড়িয়ে ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে, এই স্তব্ধতা কীসের ইঙ্গিত বহন করে।

বাঙালি থিয়েটার-পাগল জাতি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদেই নাটক ও নাটকাভিনয়ের উল্লেখ আছে। এ থেকে প্রমাণ হয়, বাঙালির কাব্যচর্চার মতো নাট্যচর্চার ইতিহাসও এক হাজার বছরের প্রাচীন। যে নাট্যচর্চার ইতিহাস এত প্রাচীন, যে ঐতিহ্য এত দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, হাজার বছরের সেই অতিক্রান্ত পদযাত্রা অকস্মাৎ স্তব্ধ হল কেন? তাহলে গোড়ায় কোনও গলদ ছিল!

শ্রেষ্ঠ বাঙালি প্রতিভা নাট্যাভিনয়ে ও নাট্যচর্চায় অভিনিবিষ্ট হয়েছেন। স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য প্রচারের হাতিয়ার করেছিলেন নাট্যাভিনয়কে। তিনি স্বয়ং অভিনয়ে অংশ নেন। তরেপর যাত্রা ও কথকতার যুগ পেরিয়ে বাঙালি আধুনিক বিদেশী থিয়েটারের আকর্ষণে শিহরিত হয়েছে। ১৮৩১ সালে প্রথম বাংলাসন্তান প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্থাপন করেন 'হিন্দু থিয়েটার'। এই থিয়েটারই বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটার। বলা বাহুল্য, এই থিয়েটার ছিল শৌখিন। এই থিয়েটারে অবশ্য ইংরেজি ও ইংরেজিতে অনূদিত সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হয়। নাটকের তালিকায় ছিল শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের অংশবিশেষ এবং উইলসন অনূদিত ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'। এই সম্বন্ধে ১৮৩২ সালের ৭ জানুয়ারির 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে প্রসঙ্গক্রমে লেখা হয় : 'এদেশে পূর্বকালে রাজারা নানাপ্রকার যাত্রাদর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটকগ্রন্থসকল বর্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রথযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক।'

'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত পত্র প্রমাণ করে, থিয়েটারের আবির্ভাবকে তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাদরে সংবর্ধিত করেন।

হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরে স্থাপিত হয় শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটার। ১৮৩৫ সালের ৬ অক্টোবর এখানে অভিনীত হয় 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক। এই নাটকের অভিনয়ে নারী ভূমিকায় নারী-অভিনেত্রী অংশগ্রহণ করেন। ১৮৩৫ সালের ২২ অক্টোবর তারিখের 'হিন্দু পাইওনিয়ার' পত্রিকায় এই অভিনয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করা হয়। সেই সমালোচনায় 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়কে 'বড় নৈতিক বিপ্লব' বলে অভিহিত করা হয়। এই মন্তব্য নানা কারণে ঐতিহাসিক।

বাংলা থিয়েটার জন্মলগ্ন থেকেই সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছিল। বাংলা থিয়েটার যখন তার শৌখিন যুগ অতিক্রম করে পেশাদারি যুগে প্রবেশ করল তখনও তার দায়বদ্ধতার দায় থেকে সে মুক্ত হয়নি। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার সেই দায় পালন করতে গিয়ে এক ঘোরতর রাজনৈতিক জটিল আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ রাজকর্মচারী ও পুলিসকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার দায়ে বাংলা থিয়েটারকে শাসন করার কথা ভেবেছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। সেই ভাবনার ফলশ্রুতি 'ড্রামাটিক পারফরম্যান্স অ্যাক্ট'। এই আইন জারি করা হয় ১৮৭৬ সালে। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েনি তৎকালীন বাংলা থিয়েটার। তার জন্য দেখা যায়, গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারেরা একের পর এক লিখছেন পৌরাণিক, ধর্মমূলক, অবতারমূলক, চরিত নাটক, ঐতিহাসিক নাটক প্রভৃতি। সেই সঙ্গে রঙ্গরসে ভরা প্রহসন, গীতিনাট্য পঞ্চরং প্রভৃতি।

রাজনৈতিকভাবে তখন বাংলা পেশাদারি থিয়েটার আলোড়িত হয়নি একথা ঠিক, কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে বাংলা অভিনয়ে তখন এসেছিল নানা বৈচিত্র্য। নাট্যকার, নট ও নাট্যপরিচালক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা থিয়েটারে নিয়ে এলেন বেশ কিছু পরিবর্তন। কাটা সিন, ঠেলা সিন, আসল আসবাবপত্র, দরজা-জানালার ব্যবহার দেখা দিল তাঁর ক্লাসিক থিয়েটারে। 'ভ্রমর'-এর (কৃষ্ণকান্তের উইল-এর নাট্যরূপ) অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ ভিজে কাপড়ে রোহিণীকে তুলে

নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারও আগে মঞ্চে এসে গেছে রেলগাড়ি, হাতিসহ আরও অনেক গিমিক যা আজকের দিনেও ভাবা দুরূহ।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা থিয়েটার জাতীয়তাবাদী চেতনায় পুনরায় মেতে উঠল। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌল্লা ও মীরকাশিম নাটকের অভিনয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তীব্রতাকে ঘণীভূত করে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন এই দেশপ্রেমের পটভূমিকায় জাতীয়চেতনার উদ্বোধনের নাটক। বাংলা থিয়েটারে এইসব নাটকের অভিনয় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতি দেখাল তীব্র অবহেলা।

১৮৭২ সালের ডিসেম্বরে দায়বদ্ধতার মন্দ্রমুখর ঘোষণা নিয়ে বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের শুভযাত্রার যে সূচনা হয়েছিল, তার অব্যাহত প্রবাহ বাঙালির সংস্কৃতি- মনস্কতার পরিচয় বহন করে। কলকাতার থিয়েটার বলতে পেশাদারি থিয়েটারের কথাই স্মরণ করায়। বাংলা তথা ভারতের স্বনামধন্য নট-নটীরা এই থিয়েটারে আবির্ভূত হয়েছেন। এঁদের তালিকায় আছেন গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, কঙ্কাবতী, প্রভা দেবী, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই নামের তালিকা দীর্ঘ। সকলের নাম উল্লেখের প্রবল স্থানাভাব।

শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনীষা বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম, কল্লোল পত্রিকাগোষ্ঠীর লেখকেরা — সবাই বাংলা থিয়েটারের অভিনয় দেখতে এসেছেন। বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখতে এসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এত খুশি হন যে চৈতন্যদেবের ভূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন।

১৯২৪ সালে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে 'সীতা' নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সীতা'র প্রযোজক ছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার। এই প্রযোজনাকর্ম দেখে তিনি শিশিরকুমারকে প্রয়োগকর্তার সম্মান দিয়েছিলেন। পেশাদারি থিয়েটারকে যাঁরা ব্যবসায়ী থিয়েটার বলে নাসিকাকুঞ্চন করেন তাঁদের কাছে এই তথ্য কোনও গুরুত্ব পায় না। ১৯৪৩ সালে আবির্ভাব ঘটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তৎকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটের মুহূর্তে গণনাট্য সংঘ নাট্যপ্রযোজনায় এগিয়ে আসেন। গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় অভিনীত হয় বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের। এই নাটকের অভিনয়ে মঞ্চে আবির্ভাব ঘটল গ্রাম থেকে আসা অর্ধনগ্ন অনাহারে জর্জরিত রোগগ্রস্ত নরনারীর। গণনাট্য জনগণকে মুখ্য চরিত্রে উপস্থাপিত করে। গণনাট্যের এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ে। বলাবাহুল্য, এই অভিনয়ের মাধ্যমেই আবির্ভাব ঘটে পেশাদারি থিয়েটারের পাশাপশি সমান্তরাল থিয়েটারের। একে আমরা বলি গ্রুপ থিয়েটার। এই থিয়েটার সামাজিক রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে। সে কারণে এই থিয়েটারে নাটক নির্বাচন ও তার প্রযোজনায় থাকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস। শম্ভু মিত্র তাঁর বেশ কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ থেকে। তাঁরা গড়ে তুললেন নতুন নাট্যদল, 'বহুরূপী'। এই দল গড়া হয় যখন, তখন দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। অতএব দেশের সমাজ, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, জাতীয়চেতনা প্রভৃতি ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বহুরূপীতে নাটক বাছা হয়। 'নবান্ন', 'ছেঁড়াতার', 'পথিক', 'উলুখাগড়া' প্রভৃতি নাটকের প্রযোজনার মধ্য দিয়ে তার পরিচয় স্পষ্ট হয়।

নট ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যও গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে গড়ে তোলেন তাঁর নিজস্ব নাট্যদল, যার নাম ছিল ক্যালকাটা থিয়েটার। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকে রূপায়িত করেন গ্রামবাংলার বাউল, কৃষিজীবী, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের জীবন।

শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের গ্রুপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরপরেই কলকাতায় আবির্ভাব ঘটল আরও অনেক গ্রুপ থিয়েটারের। এই তালিকায় সর্বাগ্রে উল্লেখিত নাম : লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, চেতনা, নক্ষত্র, শৌভনিক, সুন্দরম প্রভৃতি। এইসব থিয়েটারের নট-নটী ও নির্দেশকরা বামপন্থী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজবদলের নাটক

নির্বাচন করতেন। এইসব নাটকের প্রযোজনা ও অভিনয় যেমন অভিনব ভাবনায় পুষ্ট হয়েছে, তেমনই জনমানসে তাদের নাট্যিক আবেদন নানাভাবে সাড়া জাগিয়েছে। গ্রুপ থিয়েটারের ধারা নিরূপণ করা আশু উদ্দেশ্য নয়। পেশাদারি থিয়েটারের পাশাপাশি আবির্ভূত হওয়া গ্রুপ থিয়েটারের স্বরূপ চিনে নেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতালাভের পর পেশাদারি থিয়েটার কেমন যেন ম্লান হয়ে পড়ল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এবং নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী তখন মঞ্চ থেকে বিদায়ের চিন্তায় মগ্ন। বা বলা যায়, তাঁদের নট-জীবনের অন্তিম দশার ক্লান্তিকর ক্রমাবর্তন চলছে। তাঁদের অন্তে পেশাদারি থিয়েটার রক্তাল্পতায় ভুগতে বসল।

স্বাধীনতালাভের পর বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপকে আশ্রয় করে বাঁচতে চাইল। কিন্তু তাতে তাৎক্ষণিকভাবে থিয়েটারি ব্যবসা সচল থাকলেও যুগ ও জীবনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারল না। এই সময়ের সাধারণ রঙ্গালয়ের তালিকায় রয়েছে স্টার, মিনার্ভা, রঙমহল, বিশ্বরূপা, প্রতাপ মঞ্চ, বয়েজ ওন লাইব্রেরি, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, রঙ্গানা, সারকারিনা, বিজন থিয়েটার। এদের মধ্যে মিনার্ভা দীর্ঘদিন নট ও নাট্যকার উৎপল দত্তের অধিকারে ছিল। এখানে তিনি স্থাপন করেন লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ। উৎপল দত্ত পেশাদারি মনোভাব নিয়ে নাট্যানুষ্ঠান করতে লাগলেন। তাঁর নির্দেশনায় মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হল উৎপল দত্তের দায়বদ্ধতার নাটক। বিশ শতকের সত্তর দশকের শুরুতেই মিনার্ভা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন উৎপল দত্ত। তারপর আমৃত্যু তিনি থিয়েটারহীন জীবনে অস্থায়ী মঞ্চে বা ভাড়া করা মঞ্চে নাট্যক্রিয়া সুসম্পন্ন করে গেছেন। রঙ্গানা ব্যক্তি-মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে দীর্ঘদিন অভিনয়ের আসর বসিয়েছেন বিখ্যাত নট ও নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠী রঙ্গানায় প্রদর্শন করেছে বিখ্যাত সব নাটকের অভিনয়। অজিতেশও পেশাদারি মনোভাব নিয়ে রঙ্গানায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তুও তিনিও অবশেষে রঙ্গানা ছাড়তে বাধ্য হলেন। তারপর থেকে তিনি ভাড়া-করা মঞ্চে অভিনয় চালিয়ে গেছেন। রঙ্গানায় তারপর নাটকের আসর জমজমাট করে তুলেছিলেন অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠী। কিছুদিন রঙ্গানার প্রতিষ্ঠাতা নাট্যবিদ গণেশ মুখোপাধ্যায় নিজেই তাঁর থিয়েটার চালালেন। কিন্তু রঙ্গানা এখন ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার মুখে।

বিজন থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় হয় না। কোনও কোনও গ্রুপ থিয়েটার মাঝে মাঝে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। সায়ক নাট্যগোষ্ঠী বিজন থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেও ব্যবসায়ী থিয়েটারের অঙ্গীকারে আবদ্ধ নয়। সারকারিনা বিপুল লোকসান সহ্য করে অনিয়মিত অভিনয় করেন।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর হাত থেকে শ্রীরঙ্গম থিয়েটার চলে যায় রাসবিহারী সরকারের হাতে। রাসবিহারী ছিলেন নাট্যব্যবসায়ী। তিনি শ্রীরঙ্গমের নাম পাল্টে রাখলেন বিশ্বরূপা। তাঁর মালিকানায় বিশ্বরূপা স্মরণীয় নাট্যপ্রযোজনা উপহার দিয়েছে। এখানে অভিনীত হয়েছে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিমল মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শংকর প্রমুখ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের নাট্যরূপ। এইসব অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। স্বনামধন্য নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের উল্লেখযোগ্য নাটক 'সেতু' বিশ্বরূপায় সাড়ম্বরে অভিনীত হয়েছে। এই নাটকে তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় বাংলা পেশাদারি মঞ্চের গর্বিত কাহিনী। সেই সঙ্গে আলোর শিল্পী তাপস সেনের আলোর খেলায় মঞ্চে রেলগাড়ির দ্রুত প্রবাহিত হওয়ার ঘটনা সাম্প্রতিককালের পেশাদারি মঞ্চে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রাসবিহারী সরকার নাটকের অভিনয়ে প্রবর্তন করেন থিয়েটারস্কোপের। নাট্য-নিরীক্ষায় এও এক স্মরণীয় নিবেদন। এছাড়া রাসবিহারী তাঁর থিয়েটারে নাট্য-আলোচনার ও নাট্য-প্রতিযোগিতার আসর বসিয়ে পেশাদারি থিয়েটারের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধীরে ধীরে বিশ্বরূপাকে গ্রাস করে অন্ধকারের থাবা। নানা সময়ে এখানে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী অভিনয় চালিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। শোনা যাচ্ছে, বিশ্বরূপায় তৈরি হবে আকাশছোঁয়া বহুতল অট্টালিকা।

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ ব্যক্তি-মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেও নানা সময়ে এসেছেন নানা নাট্যদল। থিয়েটার-পাগল বাঙালির মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এই থিয়েটার। কিন্তু আজ সেখানে শ্মশানের শান্তি।

১৯৩১ সাল থেকে রঙমহল বাংলা নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে রেখেছে স্মরণীয় নাট্য-অবদান। এখানে অভিনীত হয়েছে

বিশিষ্ট নাট্যকারের নাটক, সেই সঙ্গে জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ। যেমন, তারাশঙ্করের 'কবি' ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। শ্রেষ্ঠ বাঙালি নট-নটী এখানে এসে পাদপ্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়েছেন। কিন্তু রঙমহল আজ তার সমস্ত জৌলুস হারিয়ে ফেলেছে। সেখানে নিমন্ত্রণ বাড়ির কোলাহল ধ্বনিত হয়। কিছুদিন আগে অগ্নিদগ্ধও গেছে।

আর স্টার থিয়েটার তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ১৯৯১ সালের অক্টোবরে। শোনা যাচ্ছে, স্টার নাকি পুনরুজ্জীবিত হবে। স্টারের অগ্রগতির ইতিহাস বাঙালির সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাস। এই ইতিহাসের পাতা ওল্টালে আমরা আধুনিক বাঙালির প্রাণসম্পদের পরিচয় পাব। স্টার চিরতরে বন্ধ হওয়ার অর্থ বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতির চর্চার ঐতিহ্যও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হওয়া। নাট্য-সচেতন বাঙালি একে একে পেশাদারি থিয়েটারের অবলুপ্তিতে আশ্চর্য উদাসীন।

অথচ এই বাঙালি ভিড় করেন রবীন্দ্র সদনে, আকাডেমিতে, মধুসূদন মঞ্চে, গিরিশ মঞ্চে এবং শিশির মঞ্চে। বাংলা আকাডেমির সভাঘরে নাট্যালোচনার আসরে উৎসাহী বাঙালির ভিড় উপচে পড়ে। নাটক ও মঞ্চাভিনয় নিয়ে গ্রন্থ রচনার তালিকা দিনে দিনে দীর্ঘ হচ্ছে। নাটক বিষয়ক পত্র-পত্রিকাও মুদ্রিত হচ্ছে এখন আশাতীতভাবে। আশ্চর্যের বিষয়, পেশাদারি থিয়েটারগুলির দিনে দিনে অবলুপ্তির ব্যাপারে নাট্যরসিক বাঙালির উদাসীনতা পীড়াদায়ক হলেও প্রশ্ন জাগায়, এই উদাসীনতার কারণ কি?

এই প্রশ্নের একটাই উত্তর সবচেয়ে আগে মনে আসে। তা হল, বাঙালি বোধহয় বুঝতে শিখেছে, থিয়েটারি ব্যবসার দিন শেষ হতে চলেছে। প্রতাপচাঁদ জহুরি, ভুবনমোহন নিয়োগী, গুর্মুখ রায়, গোপাললাল শীল, মনোমোহন পাঁড়ে, নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের দেখা আর মিলবে না। হাতিবাগানে যখন স্টার নতুন করে তৈরি হল, তখন কোনও ব্যবসাদার তার মালিকানায় এগিয়ে আসেননি। অমৃতলাল বসু, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, দাশুচরণ নিয়োগীর মতো কিছু নাট্যামোদী মানুষ প্রবল উৎসাহে স্টার পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ধনীর সন্তান নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রবল থিয়েটারি উৎসাহে ক্লাসিক থিয়েটার খোলেন। বলাবাহুল্য, তিনি সার্থকও হন। কিন্তু তিনিও একদিন ব্যর্থ হলেন থিয়েটার চালাতে। থিয়েটার বিত্ত-বৈভবের অবলুপ্তি ঘটাবে, এই আশঙ্কায় গিরিশচন্দ্রের আপনজনেরা থিয়েটারের মালিক হতে তাঁকে নিষেধ করেন। গিরিশচন্দ্র সেই নিষেধ অমান্য করেননি। তাতে তাঁর মঞ্চসেবায় ব্যাঘাত ঘটেনি।

স্টারে আসর বসিয়েছেন কখনও নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। কিন্তু তাঁরা নাট্যব্যবসায়ী ছিলেন না। স্টারের মালিকানায় এগিয়ে এসেছেন শিশির মিত্র, উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া। শেষ পর্যন্ত স্টার ১৯৯১ সালের ১৩ অক্টোবর অগ্নিশয্যা গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত তার পূর্ব গৌরব বজায় রেখেই এগিয়ে এসেছিল।

পেশাদারি রঙ্গালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে যেন নাট্যরসিক বাঙালির আর আগ্রহ নেই। তার অনাগ্রহের মূলে কি অত্যধিক দূরদর্শনের প্রভাব? এ প্রশ্নের জবাব এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রের উত্তরোত্তর প্রভাবে যখন শ্যামবাজারের থিয়েটারপাড়ার ঝাঁপ বন্ধ হয়নি, তখন দূরদর্শনের কতখানি ক্ষমতা থিয়েটারের দরজায় খিল তুলে দেওয়ার? দূরদর্শন তো বইপাড়ার ভিড় কমাতে পারেনি! বৈদ্যুতিন-মাধ্যম কখনই মুদ্রণ-মাধ্যমকে হঠাতে পারবে না। এ কথা আজ প্রমাণিত সত্য। তাহলে কেন পেশাদারি রঙ্গালয়ের প্রয়োজন নেই বলে এত হা-হুতাশ? নাকি হা-হুতাশ নয়, উল্লাস?

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য, বাঙালি আজও থিয়েটার-পাগল। বিশিষ্ট গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয়ে বাঙালি দর্শকের ভিড় চোখে পড়ার মতো।

যে বাঙালি দর্শক গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয়ে উৎসাহিত হচ্ছেন, তাঁর উৎসাহে ভাটার টান পেশাদারি থিয়েটারে অভিনয় দেখার ব্যাপারে। গ্রুপ থিয়েটারে যেসব দর্শক অভিনয় দেখেন, তাঁদের নাসিকা কুঞ্চিত হয় পেশাদারি থিয়েটারের কথায়। তাঁদের ধারণা, পেশাদারি থিয়েটার নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহী নয়। সেখানকার অভিনয় নিম্নস্তরের, হালকা মানের। সে অভিনয় শুধুই প্যাঁচমারা কৌশলে ভরা। এককথায়, পেশাদারি রঙ্গালয়ের অভিনয় অশৈল্পিক,

স্থূলরুচির এবং নিম্নমানের। অতএব ওই থিয়েটার বাঁচল কি থাকল, সে ভাবনায় উদ্বেল নন উল্লিখিত দর্শকরা।

এই প্রসঙ্গেই আসে রাজনীতির কথা। আগেই বলা হয়েছে, গ্রুপ থিয়েটারের কর্তাব্যক্তিরা অনেকেই বামপন্থী চেতনায় ঋদ্ধ। তাঁরা সমাজবদলের মার্ক্সবাদী চিন্তার আলোকে নাটক বাছেন এবং তার প্রযোজনার কথা ভাবেন। তাঁরা যে চিন্তা ও চেতনায় প্রগতিশীল, সেই মনোভাব তাঁরা পদে পদে ব্যক্ত করেন। পেশাদারি রঙ্গালয় তাঁদের চোখে প্রতিক্রিয়াশীল, ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে। প্রগতিবাদীর চোখে এ হেন রঙ্গালয় বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এইসব প্রগতিবাদী নাট্যকর্মী নাট্যাভিনয়কে নিছক মনোরঞ্জনের মাধ্যম বলে ভাবেন না। নাট্যাভিনয় হল সমাজবদলের হাতিয়ার, সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম চাবিকাঠি। যে উৎপল দত্ত নিজেকে শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন 'প্রোপাগান্ডিস্ট' বলে, তিনিও গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রয়াসকে পরিমাপ করেছেন মার্ক্সবাদী চিন্তার আলোকে। তিনি প্রশংসা করেছেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। তাঁদের অভিনয় যে আধুনিক মানের অভিনয়রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, একথা তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এমনকি স্বয়ং শম্ভু মিত্র স্বীকার করেছেন, ১৯৪৪ সালে 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রযোজিত 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের প্রয়োগকর্ম তাঁকে অনেকখানি প্রেরণা জুগিয়েছিল। 'দিগ্বিজয়ী'র তৃতীয় অঙ্কে নাদির শাহ যখন দিল্লি ধ্বংস করছিল, তখন পিছনের পট লাল আলোয় রঙিন হত, আর পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠত। শিশিরকুমারের প্রয়োগকলা সম্পর্কে শম্ভু মিত্র তাঁর প্রবন্ধে (১৯৬৬) এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে লিখেছিলেন : 'এই নাট্যাভিনয় যদি না দেখতুম তাহলে 'নবান্নে'র প্রথম দৃশ্যের কল্পনা করা যে সম্ভব হত না এ কথা অনস্বীকার্য।' শম্ভু মিত্র ওই প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, তিনি শিশিরকুমারের কাছ থেকে শিখেছেন কেমন করে নাটক কাটতে হয় বা গাঁথতে হয়।

দেখা যাচ্ছে, গ্রুপ থিয়েটার নাট্য-প্রয়োগকর্মে অনুপ্রেরণা পেয়েছে পেশাদারি রঙ্গালয়ের কাছ থেকেই। আবার পেশাদারি রঙ্গালয়ও গ্রুপ থিয়েটারের কাছে ঋণ স্বীকার করেছে। স্বয়ং শিশিরকুমার তাঁর শ্রীরঙ্গমে 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' নাটক প্রযোজনা করেছেন। বিশ্বরূপা থিয়েটারে 'সেতু' নাটকে আলোর কাজে ডাক পড়েছে আলোর শিল্পী তাপস সেনের। গ্রুপ থিয়েটারের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শোভা সেন ও তৃপ্তি মিত্র পেশাদারি থিয়েটারের অভিনয়ে অংশ নিতে এসেছেন যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে। উৎপল দত্ত যখন মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে অভিনয়ের আসর বসান লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের ব্যানারে, তখন তাঁর মানসিকতা ছিল পেশাদারি থিয়েটারের।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রয়াণের পর পেশাদারি থিয়েটারে আর তাঁর মতো মাপের নাট্যকর্মীর দেখা মেলেনি, একথা ঠিক। তাছাড়া পেশাদারি থিয়েটারে নাটক বাছার ব্যাপারে ততখানি সংগ্রামীচেতনার পরিচয় মেলেনি। পরিচিত ও জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তার অভিনয় চালিয়ে যাওয়া হয়েছে পেশাদারি থিয়েটারে।এইসব অভিনয়ে হয়তো সমাজবদলের ডাক শোনা যায়নি, কিন্তু অভিনয়ের সৌকর্য সৃষ্টিতে ঘাটতি দেখা যায়নি। আপামর বাঙালি দর্শক শহর এবং মফস্বল থেকে ছুটে এসেছেন শ্যামবাজারের থিয়েটারপাড়ায়। আজ সেই পাড়া নিঃস্তব্ধ। তাই প্রশ্ন জাগে, এই নিস্তব্ধতার মূলে কি রাজনীতি? দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে সরকার চালাচ্ছেন মার্ক্সবাদীরা। তাঁরা কি মনে করেন পেশাদারি থিয়েটার প্রতিক্রিয়াশীল? অতএব এই থিয়েটারের আর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই?

অথচ এই সরকার নাট্যাভিনয়ের সপক্ষে। বলাবাহুল্য, এই নাট্যাভিনয় গ্রুপ থিয়েটার-কেন্দ্রিক। তার ফলে, এই সরকারের দৃষ্টি হয়েছে একপেশে। সরকারি আর্থিক অনুদানে নাট্যশিল্পের সাময়িক বাঁচার পরোয়ানা মেলে। গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীরা সেই অনুদানে একটি কি দুটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন।

গ্রুপ থিয়েটারগুলি আগে অভিনয়ের আসর বসাতেন শ্যামবাজারের থিয়েটার হলগুলিতে। এখন সেই সব হল বিলুপ্তপ্রায়। এদিকে বেসরকারি এবং সরকারি মঞ্চ সংখ্যায় অপ্রতুল। তাহলে একটি গ্রুপ থিয়েটারকে ওই সব হল পেতেকতদিন অপেক্ষা করতে হবে? এই অপেক্ষায় যার সব থেকে ক্ষতি হয় তা হল নাট্যশিল্প। এই নাট্যশিল্পের দায় ঘাড়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে পেশাদারি রঙ্গালয়। অথচ এই রঙ্গালয় আজ ধ্বংসের মুখে।

শ্যামবাজারের থিয়েটারপাড়ার তুলনা করা যায় আমেরিকার ব্রডওয়ে থিয়েটারের সঙ্গে। ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশে কলকাতার মতো থিয়েটারপাড়া আছে। আমেরিকার ব্রডওয়ে থিয়েটার চলে পুরোপুরি পেশাদারি মনোভাবে। সেখানে একটি নাটক পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বছরের পর বছর ধরে চলে। থিয়েটারের ভাষাকে কতখানি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করা যায় তাই নিয়ে সেখানে চলে নিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নট-নটীদের নাচ, গান, অভিনয়কে কতদূর শিল্প-সৌকর্যের চরমে নিয়ে যাওয়া যায় সেই দিকে সেখানকার প্রযোজক সর্বদা নজর রাখেন। সেই সঙ্গে সেখানে মঞ্চকলার সর্বাত্মক পরিশুদ্ধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। নট-নটীদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অর্কেস্ট্রার এক চরম সমাপতন ঘটানো হয়। ফলে যান্ত্রিক কলাকৌশলের শিল্প-সুষমা পরিস্ফুট হয়। যে কারণে দর্শক-সাধারণ সেই প্রযোজনা প্রত্যক্ষ করার জন্য উৎকণ্ঠিত হন। অভিনয়-দিনের ৩/৪ মাস আগে প্রবেশপত্র বিক্রি হয়ে যায়।

ব্রডওয়ের প্রযোজকরা শুধু অভিনয় ও মঞ্চকলার উন্নতিসাধনের দিকেই যে নজর রাখেন তা নয়। সেই সঙ্গে তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেন প্রেক্ষাগৃহ সংস্কারের কাজে। প্রেক্ষাগৃহকে আরামদায়ক করা, বসার আসনকে রুচিসম্মত করার দিকেও তাঁরা থাকেন সজাগ। শোনা যায়, প্রেক্ষাগৃহের আসন পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত করা হয় অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক নট-নটীদের। এটাও এক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। আমাদের পেশাদারি রঙ্গালয়ের দুর্দিনে আমেরিকার ব্রডওয়ে থিয়েটারের কথা স্বতই মনে আসে। শ্যামবাজারের থিয়েটার পেশাদারি শুধু প্রবেশপত্র বিক্রিতে আর স্বনামধন্য নট-নটীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানে। সেখানে প্রেক্ষাগৃহ সংস্কার করা হয় না। দর্শকাসন আরামপ্রদ করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। যান্ত্রিক কলাকৌশল, অর্কেস্ট্রেশন ও নট-নটীদের কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ সৌকর্যের ব্যাপারে নাট্যপরিচালকের অবহেলা পীড়াদায়ক। সর্বোপরি, অভিনয় যদি মনোরঞ্জনী প্রলেপে সমৃদ্ধ না হয় তাহলে দর্শকের উপস্থিতি ঘটবে কেন?

পেশাদারি রঙ্গালয়ের আর একটি দিকও অবহেলিত। থিয়েটারের যাঁরা নেপথ্যকর্মী তাঁদের প্রতি বর্ষিত হয় অবজ্ঞা। তাঁরা প্রবেশপত্র বিক্রি করেন, দর্শকাসনের পরিদর্শক হন, তাঁরা প্রেক্ষাগৃহ ঝাড়পোঁছ করেন এবং শিফটারের কাজ করেন। তাঁদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ থাকেন উদাসীন। তাঁরা নাট্যশিল্পের দায় ঘাড়ে নিয়ে রঙ্গমঞ্চের কাজে যোগ দেননি। তাঁদের নেই আদর্শগত প্রেরণা। কিন্তু তাঁদের না হলে রঙ্গালয় চালানো যায় না। এই অপরিহার্য মঞ্চকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে অল্প পারিশ্রমিকে বা নামমাত্র ভাতায় জীবিকানির্বাহ করতে পারেন না। শুধু নট-নটীই মঞ্চের সব নন। দুঃখের বিষয়, পেশাদারি রঙ্গালয়ের মালিকরা মঞ্চের ওই সব নেপথ্যকর্মী সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। এই উদাসীনতা পেশাদারি রঙ্গালয়ের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে' মালিকরা মনে করেন, থিয়েটার হল তুলে দিয়ে সেখানে দোকানঘর তৈরি করে দিলে বা আকাশছোঁয়া বহুতল বাড়ি বানিয়ে দিলে অনেক সুবিধা।

এখানে নাট্যদরদী সরকার এগিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা অজ্ঞাত কারণে নীরব। কিন্তু এই নীরবতার যথার্থ কোনও কারণ নেই। কেননা, গ্রুপ থিয়েটারগুলির জন্য আর্থিক অনুদানের সরকারি ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। দুঃস্থ নাট্যশিল্পীরা ভাতা পাচ্ছেন মাসিক কিস্তিতে। তাই যদি হয় তাহলে পেশাদারি থিয়েটারের পতনরোধের ব্যাপারে সরকারি উদাসীনতা কেন?

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী সরকারের কাছে 'পদ্মভূষণ' উপাধি চাননি, চেয়েছিলেন একটি থিয়েটার। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন একটি থিয়েটার যেখানে অভিনয় হবে ভালো নাটক। এই থিয়েটারের জন্য তিনি নাটক লিখবেন। রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার, কারোর কথাতেই কান দেননি সরকার। না ব্রিটিশ সরকার, না স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার। আজ এই পেশাদারি রঙ্গালয়ের বিপর্যয়ের দিনে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমারের কথা। বাঙালির হাজার বছরের প্রাচীন নাট্যস্পৃহা শুধুমাত্র গুটিকয়েক গ্রুপ থিয়েটারের দ্বারা অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে না। তার জন্য চাই অনেকগুলি পেশাদারি থিয়েটার। শুধুমাত্র বাজার বসিয়ে আর বহুতল বাড়ি বানিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনার ব্যবস্থা পাকা করা যায়, তাতে নাট্যসরস্বতীর প্রাণে বাঁচার উপায় থাকবে না। থিয়েটারের মাধ্যমে সমস্ত জাতি মুখর হয়ে ওঠে। সেই থিয়েটার বন্ধ হওয়ার অর্থ জাতির অপমৃত্যু ডেকে আনা। আশা করা যায়, জাতি তার বাঁচার তাগিদে আবার থিয়েটার নিয়ে চিন্তিত হবে।

বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিপাত

'রাজদ্রোহী' নাটকে দিলীপ রায়

সমাজের হৃদ্-কেন্দ্র ও রঙ্গামঞ্চ

প্রভাতকুমার দাস

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বছর দুয়েক আগে তদানীন্তনকালের স্টার থিয়েটারের মঞ্চাধ্যক্ষ মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় শহর কলকাতার পেশাদার রঙ্গামঞ্চের দুরবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য করে বলেছিলেন : 'এই বিশ বছরে রঙ্গালয়কে দেখলুম যেন ঘড়ির পেন্ডুলামের মত কেবলই দোল খাচ্ছে! যতটা সামনে এগুচ্ছে — আবার ঠিক সেই পরিমাণ পিছিয়ে যাচ্ছে! এই দেখলুম রিভলভিং স্টেজ হল, ওয়াগন স্টেজ হল, ... নূতন ধরনের আলোকসম্পাত চোখ ঝলসে দিল, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট-এর সিন্, ড্রেপারি ওয়ার্ক — অগ্রগতির কত না আশ্বাস দিল! — তারপরই আবার দেখলুম, রঙচটা ছেঁড়া সিন-এ 'মোগল পাঠান', 'বঙ্গো বর্গী'র অতিক্রান্ত পদে মঞ্চ পরিক্রমা ....। আমাদের টেম্পারেচার যখন ১০৫° উঠে যায় — জ্বরের ঘোরে তখন আমরা হাত পা ছুঁড়ে প্রলাপ বকি — 'সংস্কার কর্চ্ছি ... মঞ্চের উন্নতি কর্চ্ছি'; টেম্পারেচার পড়ে গেলেই — দারুণ অবসাদ, অপরিসীম ক্লান্তি! সিনের গাদা থেকে বেরিয়ে আসে তখন সেই ছেঁড়া সিন্ .... সিন্ধুক থেকে নামাই পাতা-ছেঁড়া পুরনো বই! সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে আমরা রঙ্গালয়ের সেবা করতে পারছি না। বদ্ধ ঘরে বাইরের আলো হাওয়া আসছে না; যেটুকু আসছে, তাও এখানকার আবহাওয়ায় মিশে তার জীবনী-শক্তি হারিয়ে ফেলছে।'

পেশাদার মঞ্চের এরকম সংকটাপন্ন অবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যে কঠিন শূন্যতা তৈরি করেছিল, তাতে মঞ্চের সঙ্গো প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় অথচ শিল্প সংস্কৃতিসাহিত্য বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত মানুষ মাত্রেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। যেমন চল্লিশের দশকের শুরুতেই বুদ্ধদেব বসু 'বাংলা থিয়েটারের মর্মান্তিক অধঃপাতের' দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত হতাশাক্লান্ত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন : 'বেশ বোঝা যাচ্ছে, যত চেষ্টাই করা যাক থিয়েটারকে আর বাঁচানো যাবে না, সে মরতে বসেছে। কোনও থিয়েটারে মধ্যে ঢুকলে তার ধূলিমলিন জীর্ণ আসবাব, পানের পিক-মাখা মেঝে ও দেয়াল, রঙ্গামঞ্চে লক্ষপতির ড্রয়িংরুমে দু'খানা ভাঙা চেয়ার — প্রতিটি ছোট জিনিস যেন হা-হা করে বলে — নেই,

নেই, কিছু আর নেই।' প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে, এরকম পরিস্থিতি উদ্ভবের প্রধান কারণ বোধহয় সিনেমার সঙ্গে বাংলা পেশাদার মঞ্চের প্রতিযোগিতা, কিন্তু বুদ্ধদেব সে প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেই তার প্রকৃত উত্তরও অনুধাবন করেছেন : 'আসল কথা, আমাদের থিয়েটারে প্রাণ-বস্তু কিছু আর নেই, যাঁরা থিয়েটার চালান তাঁরা নিজেরাই নিরুৎসাহ। বক্স-অপিসে ঝনঝন না বাজলে উৎসাহ আসে না, জানি, কিন্তু ঝনঝন আসবে কোত্থেকে? লোকে যাতে আনন্দ পায় তাতে তো পয়সা খরচ করবে। টিমটাম করে যে-সব নাটক চলে তার পেশির ভাগই আখ্যান ও কথোপকথনের দিক দিয়ে এত অসম্ভব বাজে যে হাজার সাজিয়ে-গুছিয়েও (আর বলাই বাহুল্য, বাইরের সাজসজ্জাটাও ভালো হয় না) অত্যন্ত সাধারণবুদ্ধির দর্শককেও বেশিক্ষণ খুশি করতে পারে না।'

অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না, সাধারণ রঙ্গালয়ে সাধারণবুদ্ধি দর্শকদের মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ রেখেই মালিকপক্ষকে তাঁদের বাণিজ্যিক সাফল্যের প্রত্যাশা পূরণ করতে হয়। তুলসী লাহিড়ী একবার 'নাটক ও দর্শক' শীর্ষক এক রচনায় লিখেছিলেন : 'নাটক একান্তভাবে দর্শকের জন্য। পরিবেশন ও সংগঠনকারীগণ তাঁদের তৃপ্তি দিয়ে যশ অর্থ সব কিছু পাওয়ার আশা করেন। কল্যাণধর্মী ভাল নাটক দর্শক যদি অপছন্দ করে, তবে সেটাকে পরিবেশনকারীগণ পরাজয় বলে মেনে নেয়। আবার যদি অন্তঃসারশূন্য উত্তেজনাবহুল, চাকচিক্যসম্বল নাটক পছন্দ করে, কুভোজ্যের মত বিষ-ক্রিয়ায় সে দর্শকগণের এবং সমাজের যত অকল্যাণই করুক না কেন, পরিবেশকগণ আত্মরক্ষার তাগিদেই তাকে জয় বলে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। তাই নাট্যাভিনয়ের উন্নতি অবনতি প্রভৃতি সব কিছুর জন্য দর্শকের দায়িত্বও প্রচুর। ' দর্শকের চাহিদার তারতম্য যুগে যুগে নাট্যালয়ের সংগঠকদের প্রভাবিত করলেও, বিচক্ষণ ও সুবিবেকী মালিকপক্ষ অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও সুনাট্যের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা বজায় রেখে নাট্যপ্রযোজনাকে কেবল বাণিজ্যিক লাভালাভের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেননি, কিংবা বক্স-অফিসের সাফল্যের পক্ষেই তাঁদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। বরং কীভাবে উন্নততর নাটকের দিকে দর্শকদের আকর্ষণ করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করতে চেয়েছেন। তুলসী লাহিড়ী তাঁর পূর্বোক্ত নিবন্ধে বলেছিলেন : 'সাধারণ রঙ্গালয়ে নানা প্রকার দর্শকের সমাবেশ হয়। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সুরসিক থেকে জড়বুদ্ধি সূক্ষ্মানুভূতি ও রসজ্ঞানহীন সব রকম দর্শকই থাকে। তারা নাটক অভিনয় থেকে যে যার ধারণা-শক্তি অনুসারে আনন্দ আহরণ করে। এই বিভিন্ন রুচি ও বুদ্ধির দর্শকরা নট-নাট্যকার ও নাট্য-পরিবেশকদের এক চিরন্তন সমস্যা। এদের কাকে খুশি করব? এটা অনেকেই স্থির করতে পারেন না।' যাঁরা স্থির করতে পারেন না, তাঁরা কেবলই অলীক কোনও ভাবনায় থিয়েটারকে ক্রমাগত চমক আর আকর্ষণ তৈরি করে দর্শক সমাগম ঘটানোর অভিলাষে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন। কীভাবে রসোত্তীর্ণ নাটকে সব ধরনের দর্শকই সন্তুষ্টবোধ করেন সে বিষয়ে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তুলসী লাহিড়ী জানান : 'সাথক নাটক বহুদিন চলে। প্রতিদিন বিভিন্ন নাটক দেখতে আসে। তাদের ভাবগ্রাহীতার তারতম্য প্রতিদিনই থাকে। কিন্তু অভিনয়ে কোনও ত্রুটি না হলে সমবেত প্রতিক্রিয়া একইভাবে নিত্য প্রকাশ পায়। করুণরসের প্রভাবে প্রতিদিন দর্শক একইভাবে অভিভূত হয় এবং প্রেক্ষাগৃহে একটা থমথমেভাব সৃষ্টি হয়। যেখানে হাসি ওঠার প্রতিদিনই সেখানে হাসি ওঠে। বারোয়ারী আসরে, যেখানে ছোট ছেলেমেয়েরাই মঞ্চের ঠিক সম্মুখে বসে, তারাও অভিভূত হয়ে একটা অদ্ভুত আগ্রহ নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দেখতে থাকে, যদিও অভিনীত রসের সঙ্গে বয়সের জন্য তাদের পরিচয় থাকে না।'

নাট্যজগতে স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেক আগেই গিরিশচন্দ্র মঞ্চাধ্যক্ষের পেশাদারিত্ব সম্পর্কে সতর্ক হয়েছিলেন বলে, দি ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা পর্বে টিকিট বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন : 'আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এখনও এমন উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ টিকিট বিক্রয় করিয়া সাধারণের সম্মুখে বাহির হওয়া যায়। ন্যাশনাল থিয়েটার নাম শুনিয়া অনেকেই মনে করিবেন এই থিয়েটার দেশের সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সমবেত চেষ্টার ফল ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু কতগুলি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সাজসরঞ্জামে ন্যাশনাল থিয়েটার করিতেছে ইহা বড়ই বিসদৃশ হইবে।' অবশেষে টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করার বিপক্ষে যাঁরা --- সুরেশচন্দ্র মিত্র, রাধামাধব কর,

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, নন্দলাল ঘোষ, মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণ করে, ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'কিছু কিছু বুঝি' অভিনয়ের সময় মাইকেল মধুসূদন, অর্দ্ধেন্দুশেখরকে টিকিট বিক্রয় করার অনুরোধ করেছিলেন। টিকিট বিক্রয়ের পক্ষে যাঁরা, তাঁরা মনে করতেন — দিনের পর দিন মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চ নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়।

আপামর জনসাধারণের সহজ প্রবেশাধিকারের মুক্ত-ব্যবস্থায় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর উদ্বোধন হল ন্যাশনাল থিয়েটারের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মাধ্যমে। 'সধবার একাদশী' নাট্যাভিনয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের যে বীজ রোপিত হয়েছিল, 'লীলাবতী'-তে অঙ্কুরিত হয়ে 'নীলদর্পণ'-এ বিকশিত হয়ে উঠল। এই নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছিল অব্যবহিত পরেই। অভিনয়ে সকলে সুখ্যাতি করলেও নাটককার দীনবন্ধু স্বয়ং আক্ষেপ করেছিলেন : 'ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের এক্টর যোগদান করেন নাই।' বন্ধুদের অনুরোধে, থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে নিজের নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে গিরিশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারের 'কৃষ্ণকুমারী' নাট্যাভিনয়ে যুক্ত হন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর মাস চারেকের মধ্যেই ন্যাশনাল থিয়েটার স্থগিত হয়ে যায়। ন্যাশনাল থিয়েটার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কিন্তু বিত্তশালী বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই সুনাম ও লাভের আশায়, কেউ কেউ নিছক বিনোদনের প্রলোভনে নাট্যব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় সিমলার জমিদার আশুতোষ দেবের (সাতুবাবু/ছাতুবাবু) দৌহিত্র সুঅভিনেতা শরৎচন্দ্র ঘোষের। শরৎচন্দ্র তাঁর মাতামহের কাছ থেকে তাঁদের অট্টালিকার সম্মুখস্থ মাঠের কিছুটা অংশ ভাড়া নিয়ে এখন যেখানে বিডন স্ট্রিট ডাকঘর, সেখানে বেঙ্গল থিয়েটার নামে একটি টালি ছাওয়া মঞ্চ নির্মাণ করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অগাস্ট 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে উদ্বোধন হয় সেই মঞ্চের। এই উদ্যোগে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য — প্রকৃত নারী দিয়ে এই প্রথম স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করানো হয়। সেই উদ্যোগ অগাধ বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছিল। একদিন ধর্মদাস সুর, ভুবনমোহন নিয়োগী ও নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চার টাকার টিকিট দ্বিগুণ মূল্যেও সংগ্রহ করতে না পেরে উত্তেজিত হয়ে ফেরার পথে নিজেরাই একটি মঞ্চ নির্মাণ করার দৃঢ় সংকল্প করেন। পিতৃবিয়োগের কারণে ভুবনমোহন প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনি সিমলা নিবাসী মহেন্দ্র দাসের কাছ থেকে একটি খালি জমি মাসিক চল্লিশ টাকায় পাঁচ বছরের জন্য লিজ নিয়ে, ধর্মদাসের পরিকল্পনা অনুসারে লুইস থিয়েটারের আদলে ৬ নং বিডন স্ট্রিটে (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) এদেশে প্রথম একটি কাঠের তৈরি মঞ্চ নির্মাণ করে নাম রাখেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ৩১ ডিসেম্বর 'কাম্যকানন' নাটক দিয়ে মঞ্চের উদ্বোধন হলেও, প্রথম রজনীতেই সেই মঞ্চে অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ডে বিপর্যয় দেখা দেয়। পরে এই মঞ্চে সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে গিরিশচন্দ্রও সংযুক্ত হন।

আমোদপ্রিয় ভুবনমোহন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্যবসার জন্য নয়, নিজের শখ মেটাতে, সে কারণে তাঁর অমিতব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খলতার দরুণ গ্রেট ন্যাশনাল প্রচুর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ভুবনমোহন থিয়েটারের দায়িত্ব কোনও বন্ধুর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। শ্যামপুকুর নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিজ নিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে মহেন্দ্রলাল বসুর মতো কৃতবিদ্য নাট্যাধ্যক্ষের অধীনেও সেই থিয়েটার চারমাসের বেশি চলেনি। এরপর উপেন্দ্রনাথ দাস দায়িত্বভার নিয়ে অমৃতলাল বসুকে অধ্যক্ষ করেন, কিন্তু কুখ্যাত নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের জন্য তাঁদের উভয়ের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী কয়েক বছর ব্যবসায়িক সাফল্য ক্রমান্বয়ে এতটা নিম্নাভিমুখী হয়েছিল যে, গ্রেট ন্যাশনালে রাধামাধব হালদারের একটি গীতিনাট্য দেখে গিরিশচন্দ্র রসিকতা করে গান বেঁধেছিলেন : 'আমায় ফিরিয়ে দেনা আধুলি/কী ঠকানটা ঠকালি।' বলা বাহুল্য, আধুলি বলতে এখানে তদানীন্তনকালের থিয়েটারের সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য আট আনা উল্লিখিত হয়েছে।

ক্রমে গ্রেট ন্যাশনালের দুরবস্থা দেখে গিরিশচন্দ্র ভেবেছিলেন, 'সুশিক্ষা দানে কলাকৌশল দেখাইয়া' ভালো নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করতে পারলে এই নিষ্প্রভ নাট্যশালাকে সমুজ্জ্বল করা সম্ভব। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে, তিন বছরের জন্য ভুবনমোহনের কাছ থেকে লিজ নিয়ে গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনালের পরিবর্তে ন্যাশনাল নামকরণ করেন।

এই থিয়েটারেই মুকুটাচরণ মিত্র ছদ্মনামে তাঁর নাটক লেখার শুরু। ন্যাশনাল থিয়েটার জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও, গিরিশচন্দ্র তাঁর ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের পরামর্শে থিয়েটার লিজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভুবনমোহনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ভাই অতুলকৃষ্ণ, ভবিষ্যৎ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ভ্রাতার আশঙ্কায় বিচলিত গিরিশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেছিলেন থিয়েটারের সংশ্রবে যতদিন থাকবেন, ততদিন স্বত্বাধিকারী হওয়ার কোনও চেষ্টা করবেন না।

এরপর গিরিশচন্দ্রের শ্যালক দ্বারকানাথ দেব সেই ন্যাশনাল লিজ গ্রহণ করেন। অবশ্য দ্বারকানাথের কর্তৃত্বও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, এমনকি নানা জনের হাত বদল হয়েও সে মঞ্চের ভাগ্যদেবী দীর্ঘকাল অপ্রসন্ন ছিলেন। দ্বারকানাথের পর ডায়মন্ডহারবারের অন্তর্গত ঘাটেশ্বর গ্রামের জমিদার কেদারনাথ চৌধুরী, তারপর অবিনাশ করের উদ্যোগে জনৈক মাড়োয়ারি গোপীনাথ কেইয়া (শেঠী), সবশেষে কেদারনাথের মাতুল কালিদাস মিত্র কেউই প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ করেও থিয়েটারে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হননি। এরপর কেউ কেউ একসপ্তাহ বা একমাসের জন্য ভাড়া নিয়ে চালানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। এঁদের একজন যোগেশচন্দ্র মিত্র, থিয়েটার ভাড়া নিয়ে দর্শক সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টায় অদ্ভুত ধরনের উপহার প্রবর্তন করেছিলেন — স্বর্ণালঙ্কার, আয়না, রুমাল, সাবান, এসেন্স, থেকে শুরু করে তরমুজ, ফুটি, লাউ, কুমড়ো পর্যন্ত বিতরণ করেও দর্শকসমাগম আশানুরূপ বজায় রাখতে পারেননি।

২.

অগত্যা থিয়েটারকে প্রকৃতপক্ষে ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিণত করার অভিপ্রায় নিয়ে প্রতাপচাঁদ জহুরি নামে এক মাড়োয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিকানা ক্রয় করেন। পাকাপাকিভাবে গিরিশচন্দ্রকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান প্রতাপচাঁদ। পার্কার কোম্পানির দেড়শ টাকা মাইনের চার্করি ছেড়ে দিয়ে প্রতাপচাঁদের প্রতিশ্রুত একশ টাকার মাইনেতে চাকরি করতে সম্মতি দিয়েছিলেন এই জন্য যে, এরকম একজন পাকা ব্যবসাদারে সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের মনোমত অভিনেতৃ সংঘ সুসংগঠিত করে সুশৃঙ্খল থিয়েটার স্থাপনে ভালো নাটকের অভিনয় দিয়ে নাট্যশালার উৎকর্ষ সাধন করতে পারবেন।

প্রকৃতপক্ষে জহরত ও অন্যান্য ব্যবসার মালিক প্রতাপচাঁদ, থিয়েটারের ব্যবসায় হাত দিয়েছিলেন অতিরিক্ত অর্থাগমের আশায়। যাবতীয় পুরাতন ধারা বাতিল করে তিনি কর্মচারীগণের নির্দিষ্ট বেতন, হাজিরাবহি এবং আয়ব্যয় হিসাব-নিকাশের জন্য দস্তুর মতো খাতার প্রচলন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্বত্বাধিকারী প্রতাপচাঁদের অনুদার অর্থনীতি ও অতিবাস্তববাদী ব্যবহারের জন্য গিরিশচন্দ্র অসন্তুষ্ট হয়ে ন্যশনালের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। প্রতাপচাঁদও ব্যবসার দিক থেকে বিপন্ন হয়ে পড়েন। এ সময় স্টার কোম্পানি দল গঠন করে বেঙ্গল মঞ্চে গিরিশচন্দ্র তাঁর পুরনো নাটকের অভিনয় করতে থাকেন, এবং রাজস্থানের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যুবক গুর্মুখ রায় মুসাদ্দির সঙ্গে যোগাযোগ হয়, যিনি পিতৃবিয়োগের পর উত্তরাধিকার সূত্রে হোরমিলার কোম্পানির প্রধান দালাল নিযুক্ত হওয়ায় প্রভূত সম্পদের মালিক ছিলেন। নটী বিনোদিনীর প্রতি অনুরক্ত এই অবাঙালি যুবক থিয়েটার ব্যবসায় একই সঙ্গে আমোদ ও অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণে আগ্রহী হয়েছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের পর ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্র রচিত 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে স্টারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ছ'মাসের মধ্যে সামাজিক ও সাংসারিক চাপে পড়ে গুর্মুখ থিয়েটারের সঙ্গে তথা বিনোদিনীর সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন; গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে এগারো হাজার টাকায় স্টারের স্বত্ব ক্রয় করেন অমৃতলাল মিত্র, দাশুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু, অমৃতলাল বসু। গুর্মুখ চেয়েছিলেন, বিনোদিনীর একটা অংশ থাক এই নতুন মালিকানায়, কিন্তু গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিদের যুক্তিতে বিনোদিনীর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। বিনোদিনী ও তাঁর দিদিমাকে বোঝানো হয়েছিল থিয়েটারের ব্যবসায় সর্বস্বান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, শেষ পর্যন্ত ভদ্রাসনটুকুও বিক্রি হয়ে যেতে পারে ঋণের দায়ে। সেই স্টার যখন জমজমাট তখন মতিলাল শীলের পৌত্র গোপাললাল শীল স্টারের জমি কিনে নিয়ে মালিকদের উচ্ছেদ করেন। গিরিশচন্দ্রের পরামর্শেই স্টারের নাম-গৌরব হাত ছাড়া না করে, তিরিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বাড়িটা খালি করে দিয়ে, রণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও তাঁর ভাইদের কাছ থেকে হাতিবাগানে সাতাশ

হাজার টাকায় কেনেন তিরিশ কাটা জমি। গোপাললাল কিন্তু তাঁর নব-প্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রকে যুক্ত রাখলেন ম্যানেজার-নাট্যকার-অভিনেতা পদে, এককালীন বিশ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক তিনশ পঞ্চাশ টাকা বেতনে। প্রায় বছরখানেক পরে তিনি চুক্তিমুক্ত হয়ে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন — গোপাললাল এমারেল্ড লিজ দেন মতিলাল সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, ব্রজলাল মিত্রকে। পাঁচবছর পরে স্টার থেকে গিরিশচন্দ্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় স্থাপিত মিনার্ভা মঞ্চে যোগ দেন — অল্পদিনের মধ্যে নাগেন্দ্রভূষণের অমিতব্যয়ের কারণে ঋণগ্রস্ত হওয়ার দরুণ থিয়েটারের দুরবস্থা দেখা দিলে গিরিশচন্দ্র পুনরায় স্টারে ফিরে যান। এবারে ম্যানেজারের পরিবর্তে তাঁকে নাট্যাচার্য পদে বৃত করা হয়, নাট্যমঞ্চে এই ধরনের উপাধির প্রচলন তাঁকে দিয়েই শুরু হয়।

৩.

শচীন সেনগুপ্ত, একবার তাঁর একটি গ্রন্থে বাংলার নাট্যপ্রেমী দর্শকদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর কীভাবে রঙ্গালয় মালিকদের নির্ভর করতে হয় সে প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'বাংলার সখের থিয়েটার 'প্রফেশনাল' থিয়েটারে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে যখন অর্থের বিনিময়ে সাধারণ দর্শক হওয়ার অধিকার লাভ করল, তখন আর বাংলার নাট্যশালা বিদগ্ধ ধনিকদের আনন্দনিকেতন হয়ে রইল না। বিভিন্ন রুচির ও শ্রেণীর দর্শক প্রেক্ষাগৃহে সমবেত হতে লাগলেন। নাট্যশালার পরিচালকরা খুব শিগগিরই বুঝতে পারলেন যে, 'গ্যালারী'র দর্শকদের মর্ম-বীণে যে সুর বাজে, তারই সঙ্গে সুর বেঁধে দিতে না পারলে তাঁদের নাটক জনপ্রিয় হবে না, এবং নাটক জনপ্রিয় না হলে নাট্যশালা নিজের আয়ের ওপর নির্ভর করে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, অর্থের জন্য ধনিকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলেও পারবে না।' গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন, বাংলার সব ধরনের দর্শক — শিক্ষিত অশিক্ষিত, শহরের গ্রামের, ধ্যানে-ধারণায়, রুচিতে বিশেষ পার্থক্য আছে। গিরিশচন্দ্র সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ের সেবা করতে চেয়েছিলেন।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরবর্তী পঁচিশ বছর পর্যন্ত, বাংলা পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রধানতম এবং একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন গিরিশচন্দ্রই। পরবর্তী পঁচিশ বছরের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বিডন স্ট্রিটের স্টার মঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারের প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে। ইতিমধ্যে সেই মঞ্চে অবশ্য এমারেল্ড এবং ক্ষণস্থায়ী সিটি থিয়েটারের অবসান হয়েছিল। একটানা পঁচিশ বছর পুরাতন থিয়েটারের একঘেঁয়েমির মধ্যে অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। নতুন নাটক হলেও, অভিনেতৃবর্গের সেই পরিচিত মুখ, নায়ক চরিত্রে হয় অমৃতলাল মিত্র না হয় অমৃতলাল বসু। গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে। প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হলেও তাঁকে বয়সের দরুণ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ সাজতে হত, কিন্তু শারীরিক কারণে আলোচ্য কালপর্বের শেষের দিকে মঞ্চের সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে — এই অবস্থায় সুদর্শন অমরেন্দ্রনাথকে দর্শকরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। ক্লাসিকের সার্থকতার কারণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তদানীন্তন পেশাদার মঞ্চের অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন : 'নানা বিশৃঙ্খলায় মিনার্ভা তখন হতশ্রী হইয়া আসিতেছিল; বেঙ্গল থিয়েটার বিশেষ আড়ম্বর না করিয়া সাবেক চাল বজায় রাখিয়া চলিতেছিল বটে, কিন্তু কাপ্তেনী আক্রমণের পূর্ব সূচনায় এই বৃদ্ধ জীর্ণ প্রাচীন রঙ্গমঞ্চ যেন ক্রমেই অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। এদিকে প্রধান নাট্যনায়ক অমৃতলাল বসুর পরিচালনে বয়স ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্টার একটি বালকবৃন্দের বিদ্যালয়ে পরিণত হইতেছিল। স্টারের সব দিকেই ধরা-বাঁধা নিয়ম, দর্শকগণকেও আসতে হত যেন ভয়ে ভয়ে — বহুদিনের প্রতিষ্ঠার উত্তাপে স্টারের ব্যবহার মাঝে মাঝে দর্শকবৃন্দকে একটু বিশেষ রূপেই অনুভব করিতে হইত। অকুতোসাহস অমরেন্দ্রনাথ সেই নিয়ম ও নীতির বাঁধ ভাঙিয়া দিলেন; 'আলিবাবা' প্রভৃতির অভিনয় দেখিতে দেখিতে বিডন স্ট্রিটের দর্শকবৃন্দ বোলচাল কাটিয়া, শিস্ দিয়া, দুই-একটা অসঙ্গত ইয়ার্কি কপচাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারকে একটা সর্বজাতীয় আমোদাগারে পরিণত করিলেন। থিয়েটার যেন বুরোক্রেসির রাজত্ব ছিল, অমরবাবু থিয়েটারকে ডেমোক্রেট করিয়া তুলিলেন। ফলে যা দাঁড়াইল, ক্লাসিকে যখন 'বাদুড় ঝোলে' — স্টারের প্রেক্ষ

তখন শূন্য। স্টারের এই অবস্থার পরিবর্তন হয় প্রতাপাদিত্য খোলার পর। গিরিশচন্দ্রও এই সময় এক থিয়েটারে স্থায়ী হইতে পারেন নাই; তিনি কখনো মিনার্ভায়, কখনো স্টারে, কখনো ক্লাসিকে — এই রূপ ভাবেই দিন কাটাইতে ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে থিয়েটারের জগতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল।' জাঁকজমক, আড়ম্বর, নাচ-গান-লঘু রঙ্গরসিকতা বর্ণময় জৌলুস দিয়ে দর্শকদের সামনে প্রলোভন তৈরি করে মৃতপ্রায় থিয়েটার-ব্যবসার মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। গিরিশচন্দ্রের কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটককার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা'-র সাফল্যে, ক্লান্ত রঙ্গালয়ে নতুন জীবনস্পন্দন অনুভূত হল।

'আলিবাবা' প্রযোজনা কাল থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথের প্রয়াণ পর্যন্ত, পরবর্তী দুই দশকব্যাপী, যদিও বাংলা মঞ্চে নানা নতুনত্ব সঞ্চারিত হয়েছিল, মঞ্চব্যবসায় আধুনিকতা থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন ও উপহারের প্রচারের মাধ্যমে, তা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে অনেকটা স্তিমিত হতে শুরু করে। মৃত্যুর পূর্বে স্টার থিয়েটার তিন বছরের জন্য লিজ নিয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। অমরেন্দ্রনাথের অধীনে 'সৎসঙ্গ' নাট্যের প্রথম অভিনয়ের পূর্বে প্রারম্ভিক ভাষণে প্রবীণতম অমৃতলাল বলেছিলেন : 'বঙ্গীয় নাট্যজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা একে একে নিভে গিয়েছে। এখন একমাত্র গিরিশবাবু আর আমি আছি। গিরিশবাবু ত' রোগশয্যায় আর আমি বার্ধক্যে অশক্ত। সুতরাং অমরবাবুই এখন নাট্যজগতের যোগ্য ও যথার্থ উপযুক্ত পরিচালক। তাহার মতো থিয়েটার পরিচালনার শক্তি আর কারও নাই। আর তার মতো উদার, সৎবংশজাত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লাভ করে নাট্যজগৎ ধন্য। আমরাও তাঁর মতো লোকের হাতে স্টার থিয়েটারের ভার দিতে পেরে ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত।' যে স্টার দর্শক অভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল অমরেন্দ্রনাথ নতুন পুরাতন নাট্যাভিনয়ে সেই স্টার মঞ্চের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে কলকাতার একটি প্রধানতম থিয়েটারে পরিণত করতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত জনসমাজ দারিদ্র্য ও আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল, ফলে পেশাদার মঞ্চের বাণিজ্যিক অবস্থায় একটা সর্বাত্মক মন্দা পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। গিরিশচন্দ্রের প্রয়াণের পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, হেমেন্দ্রকুমার রায় সেই সময়টাকে 'বিষম অজন্মার যুগ বলে চিহ্নিত করে বলেছিলেন : 'এ সময়টাকে বাংলা রঙ্গামঞ্চের অন্ধযুগ বলে গণ্য করা চলে। এর মধ্যে একজন মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর নতুন নাট্যকারেরও খোঁজ পাওয়া যায়নি এবং একজনমাত্র উল্লেখযোগ্য নূতন অভিনেতা নাট্যজগতে প্রবেশ করেননি। নগণ্য শ্রেণীর নাটকের জঘন্য অভিনয় বাংলা নাট্যজগৎকে করে তুলেছিল ভযাবহ।'

অমরেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর স্টার থিয়েটার খুব বিপদের সম্মুখীন হয়, এরপর অনঙ্গ হালদার, গিরিন্দ্রমোহন মল্লিক এবং অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনেক চেষ্টা করেও হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হননি। তার প্রধান কারণ চুনীলাল দেব, তারকনাথ পালিত, কুঞ্জলাল চক্রবর্তীর মতো প্রধান ও পুরাতন অভিনেতারা কোনও নতুন আকর্ষণ গড়ে তুলতে পারেননি। অবশেষে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড গঠন করেন — ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ম্যানেজার), সতীশচন্দ্র সেন (সলিসিটর), কুমারকৃষ্ণ (ব্যবসায়ী), নির্মলচন্দ্র চন্দ্র (সলিসিটর ও জাতীয় নেতা), হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্দ্র গুহ যথাক্রমে ম্যানেজার এবং সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই আর্ট থিয়েটার লিমিটেড-এ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যোগদানের কথা ছিল, কিছু 'পদ' ও সম্ভ্রমের প্রশ্নে তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরে দেখা যাবে তাঁর নেতৃত্বে ভাদুড়ী অ্যান্ড কোম্পানির পরিচালনাধীন নাট্যমন্দির গঠিত হয় — তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই তিনজন ডিরেক্টরের মালিকানায়। মনোমোহন থিয়েটারে দুরবস্থার সুযোগে তাঁরা মনোমোহন নাট্যমন্দির স্থাপনা করে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' প্রযোজনা করেন ৬ অগাস্ট ১৯২৪-এ, যা বাংলা পেশাদার রঙগমঞ্চের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। শিশিরকুমার 'অধ্যাপনার সম্মান ও আরামের কার্য পরিত্যাগ' করে 'বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের একঘেঁয়ে একটানা স্রোতে একটা পরিবর্তন আনার জন্য' পেশাদার অভিনেতার জীবন গ্রহণ করে একটা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের আকর্ষণেই তাঁর বিদগ্ধ বন্ধুমণ্ডলীর অনেকেই রঙ্গামঞ্চের নিয়মিত দর্শক হন, কেউ কেউ প্রযোজিত নাট্যের সঙ্গে

প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পরিকল্পনা অনুসারে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের (বর্তমানে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ) উত্তরমুখী প্রসারের কারণে সেই মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয়। যে জন্য প্রায় আবির্ভাব মুহূর্তেই মঞ্চহারা শিশিরকুমার কর্নওয়ালিশ থিয়েটার ম্যাডানদের কাছ থেকে লিজ নিয়ে নাট্যমন্দির স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তী তিরিশ বছরব্যাপী তাঁর সে অভিযাত্রা, নিজের নাট্যচর্চার উপযোগী একটি নিজস্ব স্থায়ী নাট্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টায় বারবার ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে দেখা যাবে. এমনকি সেই মঞ্চবদলের অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টকে মান্য করে নিজেও নিজেকে 'ভাড়াটে কেষ্ট' বলে মন্তব্য করেছেন তাঁর নাট্য-জীবনের অন্তিম পর্বে।

বঙ্গা রঙ্গামঞ্চের ক্ষেত্র হাতিবাগান থেকে সামান্য দক্ষিণামুখী হয়েছিল; বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায়, বিংশ শতাব্দীর সূচনায় কলেজ স্ট্রিট-হ্যারিসন রোডের সংযোগে অবস্থিত কার্জন থিয়েটারে — প্রথমে নীলমাধব চক্রবর্তীর সিটি থিয়েটার এবং পরে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের গ্র্যান্ড ও নিউ ক্লাসিক থিয়েটারের পত্তনে আরও প্রসারিত হয়। এই কালপর্বে সুদূর দক্ষিণে স্যাভয়, রমা ও শান্তি — এই থিয়েটার তিনটি ক্ষণস্থায়ী পরমায়ু নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। প্রসঙ্গাত স্মরণ করা যেতে পারে, পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে অনেকগুলি সিনেমা হল, রঙগমঞ্চে রূপান্তরিত হতে দেখা যাবে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সূচনায়, কলকাতায় দুটি নতুন মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়, একটি নাট্যনিকেতন (১৯৩১) অন্যটি রঙমহল (১৯৩১) আর দশক শেষে আদি কার্জন থিয়েটারের সর্বশেষ রূপান্তর নাট্যভারতী (১৯৩৯) নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রসঙ্গাত স্মর্তব্য রঙমহল গঠিত হয় লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে রবি রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দে-র তত্ত্বাবধানে। তিরিশ-চল্লিশের দশকে আরও কয়েকটি নূতন মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় জুপিটার (১৯৩০), চিপ থিয়েটার (১৯৩৩) এবং কালিকা (১৯৪৪) — যেগুলির প্রথমতমটির প্রকৃত নাম 'জুপিটার সিনেমা এন্ড ভ্যারাইটি টাইপস' — যে মঞ্চে সিনেমার আগে এক-দেড়ঘন্টা অভিনয় হত। দ্বিতীয়টি বর্তমানে লিবার্টি সিনেমা, শেষেরটি পঞ্চাশের শুরুতে একই নামে সিনেমায় রূপান্তরিত হয়। চিপ থিয়েটার বর্তমানে লুপ্ত, একসময় ধর্মতলা স্ট্রিটে বিখ্যাত কমলালয় স্টোরসের সংলগ্ন ছিল। তিরিশের দশকের শুরুতেই শিশিরকুমার আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন, ফিরে এসে সালকিয়ার হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত নাট্যপীঠে কিছুদিন অভিনয় প্রদর্শন করেন। চিৎপুরে নতুনবাজারে, সান্যাল বাড়ির বিপরীতে রূপমহল নামে একটি রঙ্গামঞ্চ হয়, পরে সেটির নামকরণ হয় রঙগমহল। ধর্মতলা অঞ্চলে ফার্স্ট এম্পায়ারে (বর্তমান রক্সি সিনেমা) মধু বসু ও সাধনা বসুর 'আলিবাবা' প্রদর্শিত হয় (১৯৩৬-৩৮) বিপুল সাফল্যে। শিশিরকুমার রঙমহলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অল্পদিনের জন্য। তারপর স্টারে তিনি নবনাট্যমন্দির (১৯৩৪-৩৭) প্রতিষ্ঠা করে অভিনয় করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে উপেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র সলিল কুমার মিত্র স্টার থিয়েটারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, পরবর্তী ৩৩ বছর ছিল তাঁর দীর্ঘ স্থায়িত্বকাল। নাট্যনিকেতন মঞ্চে শচীন সেনগুপ্ত রচিত 'ঝড়ের রাতে' (১৪-১১-৩১) নাটকে সতু সেন অভিনব আলোক প্রক্ষেপণে নতুনত্ব প্রদর্শন করেন। নাট্যনিকেতনে এরপর 'জননী' নাটকে (২২-৭-৩৩) ওয়াগন স্টেজ প্রবর্তন করে তিনি মঞ্চ ব্যবস্থার বদল ঘটান। এর কয়েক মাস আগে রঙমহল মঞ্চে 'মহানিশা' নাটকে (১৫-৪-৩৩) ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তন করেন সতু সেন। একদিকে অমৃতলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ তথা দানীবাবুর প্রয়াণে যেমন বাংলার মঞ্চজগৎ শোকাবিভূত তেমনই অন্যদিকে দেখা যাবে শিশিরকুমারের পাশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমকালে মিনার্ভা মঞ্চে যুক্ত হয়েছিলেন নরেশ মিত্র ও রাধিকানন্দন মুখোপাধ্যায়। আর্ট থিয়েটারের 'কর্ণার্জুন' নাটকের জনপ্রিয়তা এঁদের অনেকের সমৃদ্ধ অভিনয় প্রতিভা বাংলা মঞ্চের সামনে নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মোচন করে দিয়েছিল। এদিকে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পর তরুণ নাটককার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায় এবং তিরিশের শেষের দিকে বিধায়ক ভট্টাচার্য। অথচ বাংলা পেশাদার মঞ্চে নানা ধরনের সম্ভাবনার মধ্যেও সঙ্কট তৈরি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর থেকে। বস্তুত পক্ষে আর একটি বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়া দরকার, তিরিশের প্রায় শুরু থেকেই মঞ্চনাট্যের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখা দিয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রের উত্থান। বুদ্ধদেব বসু এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেছিলেন: 'নতুন

অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রায়ই আমদানি হচ্ছেন ফিল্ম থেকে, কিংবা দু'চারদিন স্টেজে দেখা দিয়েই তারকা হবার মতলবে টালিগঞ্জে ছুটেছেন। তারকা না বলে তাড়কা বললেই ঠিক হয়; কারণ ফিল্ম আজ রাক্ষসীর মতো সমস্ত বাংলা দেশ গিলে খাচ্ছে।'

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর পরই দেশে মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতালাভ এবং দেশবিভাগের প্রভাবে সমাজ ও সংস্কৃতি ক্রমান্বয়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় পেশাদার রঙ্গালয়র তদানীন্তন পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে লিখেছেন : 'যুদ্ধের সময় সিনেমার প্রসার ঘটল অসম্ভব, অভিনেতৃকুলের চাহিদা বেড়ে উঠলো রঙ্গাজগতে — মঞ্চে ও পর্দায়। অভিনেতারাও তখন পারিশ্রমিকের হার এত বৃদ্ধি করে দিলেন যে, তা দেওয়া রঙ্গালয়ের মালিকদের যদিও সম্ভব ছিল না — তবু বিনা দ্বিধায় তাঁরা তাঁদের দাবি মেটাতে লাগলেন। নাটকের উন্নতি বা নাট্যকারদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি এমন কি তাঁদের প্রাপ্য অর্থও যথাযথ প্রদান করলেন না। টাকা আমদানিও হতে লাগল বেশ ভালভাবেই কিন্তু সে টাকা তাঁরা এত যদৃচ্ছভাবে নিজেদের জন্য খরচ করতে লাগলেন যে কহতব্য নয়। রঙ্গালয় চালাতে বিশ বাইশ হাজার টাকার প্রয়োজন হতে লাগল এবং তার ফলে রঙ্গালয়ের ভিত্তি টলে উঠল টলমল করে। যুদ্ধের পরেই পুর্বেকার ক্ষত আর নিরাময় হল না। রঙ্গালয় তাব অন্তিম শ্বাস গ্রহণ করতে শুরু করলে।' মৃত্যুমুখী এই নাট্যশালার আভ্যন্তরীণ অবস্থার চিত্রটি যে কতটা করুণ হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আরও লিখেছেন : 'আমদানি অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে প্রেক্ষাগৃহের সামান্যতম সংস্কারও কেউ করলেন না, দর্শকদের এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থাও হল না, নাট্যকারদের বা সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণও জানালেন না, নতুন নাট্যসম্ভারের প্রযোজনায় যথাযথ ব্যয় করার মতো সামর্থও পরে রইল না — নাটমন্দিরের দীপ নিভতে শুরু করলে। অভিনেতৃকুলের সঙ্গো ও স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গো পূর্বেকার মধুর যোগসূত্র গেল হারিয়ে। ফলে বাংলাদেশে পেশাদার রঙ্গামঞ্চের চেয়ে সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় প্রযোজনা, নাটক রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে পেশাদার রঙ্গামঞ্চের গৌরবকে ম্লান করে দিলেন। পরে পরে পেশাদার রঙ্গালয়ের দরবার বন্ধ হতে শুরু করলো।'

প্রধান নাটককার দেবনারায়ণ গুপ্ত, স্বাধীনতালাভের পর ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলা পেশাদার রঙ্গামঞ্চে অভিনীত নাটকের একটা সাধারণ পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে দিলেন ১৪৬ খানা নাটকের মধ্যে 'রিজিয়া', 'বঙ্গে বর্গী', 'মেবার পতন', 'প্রফুল্ল', 'সধবার একাদশী' , 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি পুরনো নাটকের পুনরাভিনয় সংখ্যা ছিল প্রায় ২৯টি, নতুন মৌলিক এবং উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনীত হয়েছে ১১৭টি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্টের স্বাধীনতালাভের পর কীভাবে সাধারণ রঙ্গালয়গুলিকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে দেবনারায়ণ লিখেছেন : 'স্বাধীনতালাভের পর যে দুর্যোগের ঝড় সাধারণ রঙ্গালয়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে — আমি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সন্ধ্যায় প্রতিটি রঙ্গালয়ে আলো জ্বলত বটে, কিন্তু দর্শক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং রঙ্গালয়গুলির অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও দৃশ্যপটগুলির ছিল জরাজীর্ণ অবস্থা। সুলিখিত নাটক মঞ্চস্থ করেও এই সময় দর্শকদের মন জয় করা যায়নি। ' হেমেন্দ্রকুমার এই সময়কার রঙ্গালয়ের সঙ্কট দেখে আর একটি অন্ধকার যুগের দ্রুত পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন এবং কাতরকণ্ঠে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন : 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।'

৪.

পেশাদার নাট্যজগতের আর এক দিকপাল ব্যক্তি, মহেন্দ্র গুপ্ত নাটককার হিসাবেই পেশাদার মঞ্চের সঙ্গো যুক্ত হন প্রথমে। পরে পরিচালকের দায়িত্ব পান, স্বরচিত 'উষাহরণ' নাটকে স্টার থিয়েটারে, আরও পরে হন অভিনেতা, ১৯৪৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি স্টার থিয়েটারে। পেশাদার মঞ্চে তাঁর সংযুক্তিতে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর প্রত্যক্ষ অনুপ্রাণনা ও সহযোগিতা ছিল, তাঁরই পরামর্শে শিশিরকুমারের সঙ্গো দেখা করলে তিনি তখনকার মিনার্ভার নাট্য-পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মিনার্ভায় তাঁর নাটক 'গয়াতীর্থ' যে বাণিজ্যিক সাফল্য এনে দিয়েছিল, তারই

সুবাদে সলিল মিত্র ও কালীপ্রসাদ ঘোষ মিনার্ভার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কিছু পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁদের গৃহীত স্টারে মহেন্দ্র গুপ্তকে সংযুক্ত করবেন নাটককার হিসাবে। স্টার নেওয়ার পরে তাঁরা প্রথমে খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি। সলিল মিত্র তাঁর সমবয়স্ক বন্ধু মহেন্দ্র গুপ্তের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে স্টারের পরিচালকের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহেন্দ্র গুপ্ত বলেছেন : 'আমার পরিচালনায় প্রথম নাটক থেকেই স্টারে আবার অর্থ সমাগম হতে শুরু করে। এবং বলতে দ্বিধা নেই, সলিল মিত্র মশাইদের নলিনী সরকার স্ট্রীটের বিরাট বসত বাড়িটি সেল্‌-ডিড-এ মডগেজ ছিল। আমার আমলে ওদের বাড়ি খালাস তো হলোই, উপরন্তু সলিলবাবুর নানা দিক থেকে অবস্থা ফিরে এল।' স্টারের নাটককার-পরিচালক-অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্ত অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধোত্তর বাংলা মঞ্চের দুর্দশা মোচনের জন্য প্রাণপন প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ছাড়াও সে সময় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকেও বেশ খামতি দেখা দিয়েছিল, পুরনো দিনের প্রতিষ্ঠিত অভিনেতাদের যুগ শেষ হয়েছে, বয়সের দিক থেকে প্রবীণ তাঁদের অনেকেরই পেশাদার আকর্ষণ ফুরিয়ে গিয়েছিল। দর্শকরা ক্রমান্বয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েছিলেন। সেই অবস্থা থেকে টেনে তুলে স্টারকে আবার বিপুল লোকসানের হাত থেকে মুক্ত করছিলেন তিনি। তখনকার দিনে একটা নাটক একাদিক্রমে দীর্ঘদিন চালানো হত না, সেল নিম্নমুখী হলেই নতুন নাটকের উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়ে যেত। দর্শকরা এই পরিবর্তন প্রত্যাশা করতেন মঞ্চ-মালিকদের কাছ থেকে। সেসব নাটক যে সবকটিই কালের কষ্টিপাথরে টিকে থাকেনি সে বিষয়ে তিনি নিজেও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, তিনি জানিয়েছেন : 'তাড়াতাড়ি নাটক প্রোডাকশনের জন্য আমাকে অতি দ্রুত নাটক রচনা করতে হত। সেগুলির প্রত্যেকটিই তখন জনপ্রিয় হয় এবং থিয়েটারের প্রচুর পয়সা আনে। বিশেষ করে মিনার্ভা ছেড়ে আমি স্টার থিয়েটারে আসার পর (১৯৩৯-৪০ সালে) কোনোদিনই শিল্পী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন বাকী তো পড়েইনি, বরং প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মাইনে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পুজোর সময় তাঁরা বোনাসও পেয়েছেন। অন্য কোনো মঞ্চ এভাবে নতুন নাটক প্রযোজনা করেনি বলে মঞ্চকর্মীদের অনেক সময় দু-তিন মাসের বেতন আটকে পড়ে যেত। এরই ফলে রঙমহল থিয়েটার ওই সময় তিন/চারবার হাত বদল হল। মিনার্ভা থিয়েটারের ঠিক একই অবস্থা। তাঁরা প্রায়ই বড়ো বড়ো শিল্পীদের নিয়ে কম্বিনেশন নাইট করে লস-মেকাপ করার চেষ্টা করতেন। তখন শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গম মঞ্চেও মাঝে মাঝেই শিল্পীদের মাইনে বাকি পড়ত এবং তাঁরা কোনোরকম বোনাস পেতেন না। এমনকী একবার শ্রীরঙ্গমের নেপথ্য কর্মীরা পুজোর সময় আমাকে এসে ধরেন বিনা পারিশ্রমিকে অভিনয় করে দেবার জন্য।' স্টার থিয়েটারে তিনি মেলোড্রামা অভিনয় করেছেন এরকম অভিযোগ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেও তিনি বলেছিলেন : 'আমি যখন নাটক লিখতাম তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ দর্শককে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করতাম। তারই ফলে পঞ্চাশ-ষাটটি পরিবারের নিয়মিত অন্নবস্ত্রের সংস্থান হত।'

সেই মহেন্দ্র গুপ্তকেই স্টার ছেড়ে যেতে হয়েছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'অমর প্রেম' নামে একটা ছবি তৈরির ব্যাপারে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েন তিনি, যার জন্য থিয়েটারের কাজে বেশি সময় দিতে পারেননি। স্টারে তাঁর শেষ নাটক 'রাজনর্তকী' ব্যবসায়িক দিক থেকে ব্যর্থ হল, ইতিমধ্যে পুরনো নাটক কয়েকটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করিয়েও অবস্থার কোনও উন্নতি ঘটাতে পারেননি। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই মহেন্দ্র গুপ্তকে বিদায় নিতে বাধ্য করেন স্বত্বাধিকারী সলিল মিত্র, মাস তিনেকের ব্যবধানে স্টারে যোগ দেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। এরপর দীর্ঘ বাইশ বছর মহেন্দ্র গুপ্ত স্টারে প্রবেশ করেননি। এমনকি তাঁর এই উপেক্ষার অভিমান এতটাই তীব্র ছিল যে, স্টার থিয়েটারের দিকের ফুটপাত দিয়ে ভুলেও হাঁটেননি।

দেবনারায়ণ স্টারে যোগ দিয়েই, নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের স্বকৃত নাট্যরূপ 'শ্যামলী' পরিচালনা করে প্রভূত বাণিজ্যিক সাফল্য এনে দিতে সক্ষম হন। বছর কয়েক আগে রঙমহলে তাঁর নাট্যরূপায়িত 'রামের সুমতি' অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, সে প্রযোজনায় তদানীন্তন লেসি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাগ্য খুলে গিয়েছিল। স্টারের মালিক সলিল মিত্র লাভের টাকা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ না করে মঞ্চসংস্কারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। দর্শকরা এই নতুন ব্যবস্থায় আকৃষ্ট হন, বিশেষ করে চলচ্চিত্রের উত্তম-সাবিত্রী জুটির অভিনয় মঞ্চব্যবসার সামনে নতুন নজির স্থাপন করেছিল।

স্টারের পর সংস্কার হয় রঙমহলের। ইতিমধ্যে নাট্যনিকেতন মঞ্চে শ্রীরঙ্গমের পালা শেষ হয়ে যায়, তিন বছর যাবৎ শুধু টিকে থাকার মোহে একটার পর একটা পুরনো নাটকের পুনরাভিনয়ে। সেই পর্ব শেষ করে, সেখানে বিশ্বরূপা নামে একটা নতুন মঞ্চের আবির্ভাব ঘটে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। রাসবিহারী সরকার এবং দক্ষিণারঞ্জন সরকার বিশ্বরূপার মালিকানা গ্রহণ করে নাট্যসংস্কৃতির পুনঃজাগরণে নাট্য উন্নয়ন পর্ষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে বিচিত্র ধরনের কর্মকান্ডের প্রবর্তনা করেন; গিরিশ লাইব্রেরি এবং গিরিশ থিয়েটারে প্রবর্তনা বিশ্বরূপা মঞ্চের একটি উল্লেখ্য কর্মসূচি। যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

৫.

স্বাধীনতার পরবর্তী ক্রমানুসারি পঁচিশ বছরের কালসীমায় বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বয়ঃক্রম শতবর্ষ পূর্ণ করে এই পর্বাংশের প্রথম দশ বছর কলকাতায় একটি নতুন রঙ্গালয় নির্মিত হয়নি, যদিও পরবর্তী পনেরো বছরে ছোট-বড় সাতটি মঞ্চ নির্মিত হতে দেখব আমরা। ষাটের দশকের শুরুতে কলকাতায় দুটি পরীক্ষামূলক মঞ্চ স্থাপনার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় — প্রথমটি ধনঞ্জয় বৈরাগী ওরফে তরুণ রায়ের থিয়েটার সেন্টার, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণ কুন্ডু, নিবেদিতা দাস ও বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মুক্তাঙ্গন। বিদেশ প্রর্ত্যাগত তরুণ রায় থিয়েটার ইনস্টিটিউট অব ইউনেস্কোর কলকাতা শাখা গড়েছিলেন তাঁর নিজের চক্রবেড়িয়া রোডের বাসগৃহে, প্রথমোক্ত মঞ্চটি তারই ফলশ্রুতি। শৌভনিক দলের প্রচেষ্টায় আরও দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত হয় মুক্তাঙ্গন — মূলত গ্রুপ থিয়েটারের সহজলভ্য অভিনয় ক্ষেত্র হিসাবে। দুটি মঞ্চই অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৬৪ এবং ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে — সংগঠকদের উদ্যমে তাদের পুনঃনির্মাণও সম্ভব হয়েছিল। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চকে (১৯৬৩) বাদ দিলে পিয়ালী (১৯৬৪), প্রতাপ মেমোরিয়াল (১৯৬৭), শিসমহল (১৯৬৮), বয়েজ ওন লাইব্রেরি (১৯৭১) সবগুলিই ছোট মাপের মঞ্চ। এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মঞ্চ রঙ্গনা (১৯৭০), পেশাদার মঞ্চ ব্যবসার ক্ষেত্রে নবতর দিকদর্শক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পেশাদার মঞ্চের বিপরীতে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সাফল্যে নবনাট্য আন্দোলনের পর্বে ছোট-বড় অনেক নাট্যদল তাদের অভিনয় প্রদর্শন করে শহরে নাট্যামোদী দর্শক তৈরি করেন। প্রধানত নিউ এম্পায়ার ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চে তাঁরা নাটক করে বিশেষ সাড়া জাগান। পরে বহুরূপী প্রদর্শিত আকাদেমি অব ফাইন আর্টসের মঞ্চেও অপেশাদার দলের নিয়মিত নাট্যাভিনয় হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমায় মিনার্ভা মঞ্চে পেশাদারিভাবে নিয়মিত নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করেন উৎপল দত্তর লিটল থিয়েটার গ্রুপ, এর অল্প পরে, প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে ইংরেজি প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমার বিজ্ঞাপন নকল করে রঙ্গালয়ে ভালোবাসার ব্রোহট নাটক 'বারবধূ' অভিনয় করে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে, অসীম চক্রবর্তীর অধিনায়কত্বে চতুর্মুখ দল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রায় সত্তরের দশকের সূচনা থেকেই মঞ্চ মলিকরা তাঁদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে দেহসর্বস্ব কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নাট্যপ্রযোজনার জোয়ার আনেন, বলা যায় বিশ্বরূপায় 'চৌরঙ্গী' নাটকে এই ধারার সূচনা হয়েছিল। অবশ্য এরমধ্যে হরিদাস সান্যালের মতো প্রযোজক এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের মতো নাট্যালয়ের পড়তি অবস্থায় উন্নতির মুখ দেখেছিলেন তা নিঃসন্দেহে স্মরণ করার মতো ঘটনা। সেই সময় ওই মঞ্চের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন অসীম মৈত্র। তিনি জানিয়েছেন, 'সওদাগর' কিংবা 'দয়াল অপেরা' নাটকের সম্পূর্ণ বানিজ্যিক ব্যর্থতা 'মল্লিকা' নাটকের প্রযোজনায় প্রায় শুরু থেকেই প্রচন্ড সার্থকতা বহন করে আনে। জরাসন্ধ রচিত উপন্যাসের বীরু মুখোপাধ্যায় কৃত নাট্যরূপ 'মল্লিকা' নামের প্রয়োজনার সময় তখনকার চাহিদামতো অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নাটকের সর্বোচ্চ টিকিট দশ টাকা থেকে বাড়িয়ে বারো টাকা করানোর। দ্বিতীয়ত দর্শক আকর্ষণ করা সহজ হবে বলে ধর্ষিতা নায়িকাকে প্রকাশ্য মঞ্চে বে-আব্রু অবস্থায় দেখানোর সুযোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন কেউ কেউ — কিন্তু হরিদাস সান্যাল দুটি পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বেশ দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে 'মল্লিকা'-র সাফল্য এমনই লাভের মুখ দেখিয়েছিল যে তিনি রঙ্গনা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে থিয়েটারের ব্যবসাক্ষেত্র শুধু

বাড়াননি, আনুমানিক ২৮ লক্ষ টাকা লাভের অংশ থেকে তিনটে চলচ্চিত্র প্রযোজনাও করতে পেরেছিলেন। রঙ্গনায় সেই সময় হরিদাস, পরিচালক পদে নিযুক্তি দেন দেবনারায়ণ গুপ্তকে, তাঁর অধ্যক্ষতায় 'চন্দ্রনাথ', 'জয় মা কালী বোর্ডিং', 'অঘটন', 'সুন্দরী লো সুন্দরী', 'রাজদ্রোহী', 'নাবালক বাবা' এবং 'দম্পতি' অভিনীত হয়েছিল।

হরিদাস সান্যাল, পেশাদার মঞ্চের অধোগামিতা রোধ করার প্রচেষ্টায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'নামজীবন' প্রযোজনা করেন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। যদিও সেই প্রভাব দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বরং উত্তেজক এই নাট্যপ্রবাহে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সঙ্কট ভেতরে ভেতরে ক্রমবিস্তারি হয়েছে, আপাত আড়ম্বরের অন্তরালে। লক্ষণীয়, ১৯৭৫ থেকে পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে অন্তত ছোট-বড় দশটি পেশাদার মঞ্চ স্থাপিত হয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ই বি আর ম্যানসন — নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তপন থিয়েটার, যোগেশ মাইম, গালিব থিয়েটার, রঙ্গনার বিপরীতে সারকারিনা, উত্তরে টালা ব্রিজ সংলগ্ন শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ক্রেমব্রাউন মঞ্চের নতুন নাম হয় বিধান মঞ্চ, দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত হয় সুজাতা সদন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে চেতলায় সৃজিত হয় অহীন্দ্র মঞ্চ। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে শ্যামবাজারে সঞ্চয়িনী চিটফান্ড, অভিনেত্রী কণিকা মজুমদারের প্ররোচনায় স্থাপন করেন বাসুদেব মঞ্চ, রঙ্গনার বিপরীত দিকে গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বিজন ভট্টাচার্যের স্মরণে এবং নটরাজ এন্টারপ্রাইজের আন্তরিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিজন মঞ্চ। শেষোক্ত মঞ্চটির রূপদাতা ও পরিকল্পক সায়ক নাট্যগোষ্ঠী ঘোষণা করেছিলেন, গ্রুপ থিয়েটারের জন্যই এই মঞ্চের প্রতিষ্ঠা।

গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে পেশাদার মঞ্চের সংযোগ সাফল্য এনেছিল বিশ্বরূপা মঞ্চে 'সেতু' (১৯৫৯) প্রযোজনার সময়, নাটককার কিরণ মৈত্র, প্রধান অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র এবং আলোর যাদুকর তাপস সেনের সম্মেলনে। এরপর বিশ্বরূপায় 'থিয়েটার স্কোপ' ('লগ্ন' ১৯৬৪), স্পিডো স্কোপ ('পরস্ত্রী' ১৯৭৫), স্পিড রিফ্লেকশন ('সব ঠিক হ্যায়' ১৯৮০) প্রভৃতি চমকের আয়োজন করে দর্শক আকর্ষণের উদ্ভট প্রয়াস লক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটারে 'প্রজাপতি', 'ব্যাভিচার' প্রভৃতি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নাটকের সাফল্যে ক্রমাগত এই বিশেষ রীতির প্রযোজনায় সাধারণ রঙ্গালয় ভরে যেতে থাকে। কিন্তু এই একঘেঁয়ে নিছকই দেহসর্বস্ব নাট্য প্রযোজনার ভেতরেই সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিস্থিতি ক্রমশ বিপন্ন হতে হতে বিলুপ্তির শেষ বিন্দুতে পৌছে যায়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অস্তিত্বের সঙ্কট এমনই ভয়ানক হয়ে ওঠে যে পেশাদার নাট্যশালাব ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর রাত ১ টা ৪০ মিনিটে স্টার থিয়েটার অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়ার মধ্যে দিয়ে।

৬.

সাধারণ রঙ্গালয়ের এই বিপন্নতা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, সেটা থিয়েটার কর্তৃপক্ষের অনভিজ্ঞতা, অর্থলোলুপতা এবং নিছকই আত্মবিলাসের পথে ক্রমান্বয়ে অধঃপতনের পথে ভবিষ্যৎ ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সাধারণ দর্শকরা এই থিয়েটার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সত্যি কিন্তু তাঁরা অনেক সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে বছরের পর বছর ধরে। দর্শকদের মধ্যে সাধারণ যাঁরা তাঁরাই পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রাণশক্তি পূরণ করে চলেন বছরেব পর বছর, তাঁদের অবজ্ঞা করে রঙ্গালয় বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা দুরাশামাত্র। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই দর্শক চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন : ' সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যাঁরা দর্শক হিসাবে আসেন, তাঁদের মধ্যে প্রকৃত বিদগ্ধজনেরও যেমন সমাগম হয় তেমন বেশির ভাগ দর্শকই নানা রকম মনোভাব নিয়ে দেখা দেন। কেউ চান হাসি, কেউ চান নৃত্যগীত, কেউ বা উৎকৃষ্ট আবেগময় অভিনয়, কেউ চান অতি স্বাভাবিক অভিনয়, বা অতি চমকদার নাটক ইত্যাদি এই সমস্ত দর্শকদের মধ্যে গড়পড়তা আশি জন দর্শক খুব ইনটেলেকচুয়াল নাটক দেখতে আসেন না। মোটামুটি প্লটের মধ্যে যে চমক থাকে, হাসি থাকে, নাচ, গান থাকে এবং গল্পটা সহজভাবে সাসপেন্স (কৌতূহলোদ্দীপক ভাব) রেখে এগোতে পারা কৌশলটা বজায় থাকে, তাহলেই নাটকটা সাধারণ দর্শকদের কাছে আদরণীয় হয়ে থাকে।' তিনি বলেছিলেন বাজারের মাছ বিক্রেতা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ পুরুষরা যেখানে এসে বসেন — সেখানে মোটামুটি সকল শ্রেণীর মনে কিছু না কিছু ধরে রাখবার মতো বস্তু

যদি না পান তাহলেই সাধারণ রঙ্গামঞ্চে বিপদ ঘনিয়ে আসে।' বিদগ্ধমহলে বহু প্রশংসিত নাটক সাধারণ রঙ্গামঞ্চের উপযুক্ত হবে কিনা, তা সাধারণ দর্শকরাই নির্ধারণ করে দেয়। বহুরূপী নাট্যদলে যে 'রক্তকরবী' প্রযোজনা করে বিদগ্ধমহলে প্রভূত প্রশংসার অধিকারী হয়েছিলেন সেই নাটক পরীক্ষামূলকভাবে মিনার্ভা থিয়েটারে বেশি দিন চালিয়ে যাওয়ার সাহস পাননি, পাছে তাঁদের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় সেজন্য তাঁদের পরিকল্পনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাধারণ রঙ্গামঞ্চের এই পৃথক ভাবধারা প্রসঙ্গে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাই বলেছিলেন : 'কখন কোন নাটক জমবে আর কোনটা জমবে না — তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সাধারণ দর্শকদের উপর। অনেক সময় উচ্চশ্রেণীর নাটক দেখতে বিদগ্ধজন আসেন, অনেক সময় অনেক দিন বেশ বড়ো বড়ো আসনগুলি পূর্ণ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু অল্প মূল্যের টিকিট যদি বিক্রি না হয়, তাহলেই বুঝতে হবে সে নাটকের জীবনীশক্তি হয়ে ওঠে মুমূর্ষু রোগীর মতো তার মৃত্যুর তারিখ যে কোনো দিন ধার্য করা যেতে পারে।'

অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই রঙ্গামঞ্চ নিয়ন্ত্রণে এই সাধারণ দর্শকদের সর্বময় অস্তিত্বকে সকলেই স্বীকার করতে চাননি। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে বঙ্গা রঙ্গামঞ্চের দুর্দশার সময়, গোপাল হালদার এই প্রসঙ্গটি তাঁর 'আমাদের রঙ্গামঞ্চ' শীর্ষক একটি রচনায় উত্থাপন করে লিখেছিলেন : 'দর্শকের রুচি অনুসারে নাটক মঞ্চস্থ করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। রুচি জিনিসটা স্থির এবং অচঞ্চল কিছু নয়। রুচি পরিবর্তনশীল। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলেই দর্শকের রুচির পরিবর্তন করতে পারেন।' এই বিশ্বাস চিরদিন অবশ্য পালন করেছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত, ষাট-সত্তরের দশকে যখন দর্শক রুচির নাম করে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ক্যাবারে ড্যান্স আর কদর্য ব্যাপার-স্যাপার আমদানি করে রঙ্গামঞ্চকে নিষিদ্ধ ব্যবসায় রূপান্তর করে ফায়দা লুটতে চেয়েছেন, তখন দেবনারায়ণ গুপ্ত সে প্রলোভন সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পেরেছেন কেবল মনের জোরে। কেন না তিনি মনে করতেন : 'দর্শকের চেতনা লাঞ্ছিত করে নাট্যশালা পার পায় না। বিকৃতিকে পুঁজি করে থিয়েটার চলতে পারে না। এমন কিছু নাটকে থাকবে না, যা বাবা মা ছেলে মেয়ে একসঙ্গে বসে দেখতে পারে না। পেছনে সিটের শিসে যেন সামনের সিটের দর্শক লজ্জিত না হয়। গার্হস্থ্য জীবনের গল্প, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক সম্পর্ক জড়ানো ঘরোয়া গল্প — যার মধ্যে হাসিকান্না আছে সব রকমের আবেগের প্রকাশ আছে — পাবলিক থিয়েটারের উপজীব্য হওয়া উচিত।'

পেশাদার রঙ্গামঞ্চে দর্শক সমাগমের ক্ষেত্রে, নবপ্রবর্তিত চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গো প্রতিযোগিতায় এটা বিপর্যয় তৈরি হয়েছিল। তেমনই আর একটা বিপদ ঘনীভূত হয় ষাটের দশকে, বাংলা যাত্রাগানের সঙ্গো প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বাংলার যাত্রাগানের পুনঃপ্রবর্তনের প্রচেষ্টায় প্রথম শোভাবাজার রাজবাড়িতে নিখিলবঙ্গা যাত্রা উৎসব সংঘটিত হয়েছিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে, পরের বছর বিডন স্কোয়ারে আরও ব্যাপকতর আয়োজন করেন নাট্য উন্নয়ন পর্যদ। বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ নিয়মিত যাত্রাভিনয়ের উদ্যোগ নেন, এই সময় থেকেই। এরই ফলশ্রুতি সারা সত্তর দশক এবং প্রায় আশির দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতার মঞ্চগুলিতে ব্যবসায়িকভাবে যাত্রাভিনয়ের রমরমা শুরু হয়। একথা অস্বীকাব করার উপায় নেই মঞ্চ প্রবর্তনায় নারীদেহ প্রদর্শন ও উদ্ভট নানা ধরনের প্রায়োগিক চমক উদ্ভাবনের প্রভাবে যাত্রার আধুনিকতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। একটা সময় দেখা গেল মঞ্চ-চলচ্চিত্রের প্রায় সব প্রধান অভিনেতৃবর্গ অর্থাগমের উদ্দেশ্যে কিন্তু বৃহত্তর দর্শক সমাগমের কাছে পৌঁছনোর অজুহাতে যাত্রায় যুক্ত হতে শুরু করেন। এমনকি গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শবাদী পরিচালক অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই এ সময় থেকে যাত্রা-পথিক হয়ে ওঠেন। যদিও এ ধরনের সংযুক্তির মধ্যেও পেশাদার যাত্রার ভবিষ্যৎ আশাবাদী করা সম্ভব হয়নি।

মনে পড়ে যায়, পঞ্চাশের শুরুতে শিশিরকুমার, জাতীয় নাট্যশালা না গড়ে তুলতে পারার ব্যর্থতার প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'যাত্রা থেকে যদি আমাদের থিয়েটার গড়ে উঠত তবে আজ তার রূপ হত অন্যরকম; তা সত্যি হয়ত আমাদের জাতীয় নাট্যশালা হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু এ থিয়েটার গড়ে উঠেছে বিদেশির প্রভাবে।' থিয়েটারকে 'ব্যয়বহুল আড়ম্বর প্রদর্শনের স্থান' না করে তুলে যাত্রাকেই 'নতুন করে কালোপযোগী করে' গড়ে তোলার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন নাট্যাচার্য। সেই অনুপ্রাণনার একটা ভিন্ন ব্যবসায়িক রূপ দেখা যাবে সত্তরের দশকের প্রায়

শুরু থেকে। পেশাদার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত অভিনেত্রীবর্গ তাঁদের নিয়মিত মঞ্চাভিনয়ের প্রতিশ্রুত তারিখগুলির বাইরে বিভিন্ন স্থানে অভিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে — ভ্রাম্যমাণ সেই থিয়েটার দল মফঃস্বল বাংলাব অগণিত দর্শক সাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। এ ধরনের উদ্যোগ বাঙালির নাট্যচর্চায় কোনও নতুন ঘটনা নয়, সেই আদিযুগ থেকেই এই ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়েছিল। আধুনিককালে, যাটের দশকের শেষের দিকে যাত্রার জনপ্রিয়তার পাশে এই প্রথার একটা ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। মহেন্দ্র গুপ্তের 'সপ্তপর্ণা' দল তখন বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল। তারই অনুকরণে অসীম মৈত্র শুরু করেছিলেন 'রঞ্জনা' নামের একটা ভ্রাম্যমান দল। প্রতিষ্ঠিত অভিনেতৃবর্গ চুক্তি অনুসারে দক্ষিণার বিনিময়ে এই নাটকে অংশগ্রহণ করেন, সেগুলি অনেক সময় কলকাতার চলতি প্রযোজনারও টাটকা আকর্ষণে দর্শকদের টেনে আনে। এই উদ্যোগের সাফল্যে, যাত্রার নায়কেরাও প্রলুব্ধ হন, যাত্রার আসরেই মঞ্চবিহীন থিয়েটার — তিনদিক খোলা মঞ্চে। অসীম মৈত্র তাঁর ভ্রাম্যমাণ দলকে ওয়ান ওয়াল থিয়েটার হিসাবে তুলে ধরেন। যাত্রার পড়তি অবস্থায় এই উদ্যোগ আসরে-আসরে নতুন ধরনের চমক তৈরি করেছিল। এমনকি চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায় এই ওয়ান ওয়ালের ঝোঁক এতটাই বাড়তে থাকে যে, অল্প দিনের মধ্যে সে যাত্রাদলের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। এর একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় হাতিবাগানের থিয়েটারে, কেননা মফঃস্বল বাংলার দর্শকরা শহরে কিংবা গ্রামে বসেই যে অভিনেতৃবর্গকে দেখার সুযোগ পান তাঁরা স্বয়ং কলকাতায় কষ্ট করে এসে অভিনয় দেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে থিয়েটার পাড়ার অবস্থা অতিদ্রুত বিপদসীমা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বিলুপ্তির অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেতে থাকে।

৭.

অনেকে পেশাদার রঙ্গামঞ্চের এই অবস্থার জন্য দায়ী করেন প্রকৃত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রযোজকের অভাবকে। মনোজ মিত্র, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির মুহূর্তে নাট্যশিল্পের গৌরব 'হারানো প্রাপ্তি'-র তালিকায় কীভাবে ফিরে এসেছে গ্রুপ থিয়েটারের সেই সুসময়ের কথা বলার উপসংহারে প্রশ্ন তুলেছিলেন : 'সলিল মিত্রের মতো রুচিবান প্রযোজকরা সরে যেতে কিছু লোভী চতুর মুনাফাখোরদের পাল্লায় পড়ে কুৎসিত কাণ্ডকারখানার আখড়া হয়ে উঠেছিল সাধারণ রঙ্গালয়গুলি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গণেশ মুখোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজনের চেষ্টায় হৃত সম্মান উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি?' কিন্তু এই প্রশ্নের পরেও অন্য প্রশ্ন উঠতে পারে, সত্যি কি সলিল মিত্রের সরে যাওয়ার পর বাংলা রঙ্গালয়ে বাণিজ্যিক উপলক্ষে কোনও উদার হৃদয় প্রযোজক আসেননি? অনুপ গুপ্ত, স্বপন সেনগুপ্ত কিংবা মণ্টু সেনগুপ্ত, শুক্লা সেনগুপ্ত — শুধু কি বক্স-অফিসের বিস্ফোরণের অভিলাষে দল সাজিয়ে থিয়েটার ব্যবসায় এসেছিলেন? হ্যাঁ এঁদের মধ্যে শেষোক্ত দম্পতির উত্তরাধিকার ছিল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন প্রচারের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত যোগেন সেনগুপ্তের মতো মানুষের। নাটক লেখা, পরিচালনা, কিংবা অভিনয় করে নাম করার অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না, কিন্তু ভালো থিয়েটারের প্রযোজনায় হাতিবাগানের দুর্নাম মোচন করা সম্ভব, ব্যবসাবুদ্ধিহীন কেবল এই আবেগ দিয়ে তাঁরা নতুন আবিষ্কারের পথ খুঁজতে চেয়েছিলেন। যার অনিবার্য পরিণতি পেশাদার মঞ্চের শেষতম কলঙ্কিত ঘটনা, দেনার দায়ে গৃহবধূর উদ্‌বন্ধন। আসলে, বাংলা নাট্যশালার বাণিজ্যিক কারণে অর্থ বিনিয়োগ করার লোকের অভাব হয়তো হয়নি, কিন্তু প্রকৃত অর্থে নিবেদিতপ্রাণ মঞ্চাধ্যক্ষ, নাটককার কিংবা অভিনেতৃবর্গের অভাব ক্রমশ রঙ্গালয়ের ভবিষ্যতকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। স্টার থিয়েটার পুড়ে যাওয়ার পর ব্যবসায়িক মঞ্চের দিশাহারা, দুরবস্থা দেখে সখেদে দেবনারায়ণ গুপ্ত জানিয়েছিলেন : 'দু'-একটা ব্যতিক্রমী প্রযোজনা ছাড়া মার খাচ্ছে বেশির ভাগ নাটক। খাবেই। প্রথমত যে-না-সে লিখছে, বোধ হয় একটা বাক্যও শুদ্ধ করে লিখতে পারে না। নতুন টেকনিশিয়ানরা উঠে আসছে না। তাপস সেন-দের পরে ও জায়গাটা শূন্য হয়ে আছে। তারপর রয়েছে শিল্পীদের আচার-আচরণ। টাকার জন্য এঁরা এমন সব কাণ্ড করেন যাতে অবমাননা করা হয় থিয়েটারের, শিল্পের।'

বাঙালির সাধারণ জীবনে সাধারণ রঙ্গালয়ের উপযোগিতা স্বাধীনতার পূর্বেই অত্যন্ত গভীরতার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন শচীন সেনগুপ্ত : 'বিশেষ ব্যক্তিকে খুশি করলেই আজকের থিয়েটার প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে না। তাকে

সকল শ্রেণীর লোককে খুশি করতে হয়, গোষ্ঠী সমর্থনের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। নইলে তার অস্তিত্ব থাকে না।' এই গোষ্ঠী সমর্থনের কথা মাথায় রেখে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পেশাদার রঙ্গালয়ে পরিচালক-অভিনেতা-নাটককার হিসাবে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। মিনার্ভায় উৎপল দত্ত ও রঙ্গনায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থিয়েটার তাঁকে সাধারণ রঙ্গালয়ে যুক্ত হওয়ার সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছিল। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের চিন্তার সঙ্গে তাঁর ভাবনার অমিল এখানে যে তিনি মনে করতেন, অধিকাংশ দেশবাসী যেহেতু ওই হলে থিয়েটার দেখে, সুতরাং তাঁকে ভালো থিয়েটার করতে গেলে ওইখানে গিয়েই করতে হবে। তা না হলে সামাজিকভাবে তাঁরা থিয়েটারকে বাঁচাতে পারবেন না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন প্রফেশনালিজমই সবচেয়ে বড় কথা এবং প্রফেশনালিজমের মধ্যে দিয়েই ভালো থিয়েটার তৈরি করা সম্ভব। এই মনোভাবই তাঁকে পাবলিক থিয়েটারে যুক্ত হতে প্রাণিত করেছিল। বিভাস চক্রবর্তীকে একবার তিনি একথাও বলেছিলেন : 'মনে মনে আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে আমি এমন কোনও থিয়েটার করব না যে থিয়েটার পাবলিক থিয়েটারে আদৃত হবে না। কেন না আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে কতকগুলি পরিস্থিতিতে, কিছু শর্ত মেনে নিয়েই মানুষকে কাজ করতে হয়। পাবলিক থিয়েটারে যে শ্রেণীর দর্শক আজকের দিনে আসবেন তাঁরা শিশির ভাদুড়ী, গিরিশ ঘোষের যুগের দর্শক নয়, তাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শিশিরকুমার কী অভিনয় করছেন বা গিরিশ ঘোষ নাটকে যা দিচ্ছেন তাই নেব —এমন ভাবনায় তাঁরা নাটক দেখতে আসেন না। তাঁদের নিজেদের আরও পাঁচটা মিডিয়া থেকে প্রভাবিত জনরুচি তৈরি হয়েছে, সিনেমা দেখে, বম্বের সিনেমা দেখে। সেখান থেকে আমার ধরে নিতে হয়েছিল যে আমি কী করব, আর কী কী করব না।' নিজে একজন শ্রেষ্ঠ স্টার হওয়া সত্ত্বেও প্রথমাবধি সচেতন ছিলেন তাকে দেখার জন্য লোক থিয়েটারে এসে ভিড় করলেও, সেই সুযোগে কোনও খারাপ নাটক দিতে পারবেন না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন : 'গরিষ্ঠ সাধারণ দর্শক সাধারণ রঙ্গালয়েই নাটক দেখতে আসেন, অতএব ভালো থিয়েটারের জন্য লড়াইটা শেষ পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে থেকেই করতে হবে।'

শতাব্দীর শেষ দশকটি পেশাদার নাট্যগৃহের পক্ষে নানা দুর্বিপাকে বিড়ম্বিত, প্রকৃতপক্ষে সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষপূর্তির পর দু'-দশক পূরণ করার আগেই পেশাদার মঞ্চের ধারাবাহিক ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে। ইতিপূর্বে ব্যবসায়িক মঞ্চে মাঝে মাঝেই দুর্যোগ দেখা দিয়েছে। কিন্তু সকলের সমবেত চেষ্টাতেই তা উত্তীর্ণ করা সম্ভব হয়েছে। ষাটের দশকে যখন মালিকপক্ষের গোপন ইচ্ছায় রঙমহল মঞ্চকে চলচ্চিত্রগৃহে রূপান্তরের চেষ্টা দেখা দিয়েছিল, তখন অভিনেতা জহর রায়, অভিনেত্রী সরযূবালা দেবীর নেতৃত্বে সমবায়ভিত্তিক মঞ্চ-ব্যবসার পত্তন হয়েছিল, যা সাময়িক সঙ্কটমুক্তি হলেও যথার্থই অভূতপূর্ব ঘটনা। চলচ্চিত্র কারবারীদের মধ্যে পি. ভি. মানসাটা ও জিতেন্দ্রনাথ বসু রঙমহল লিজ নিয়েছিলেন পঞ্চাশের মাঝামাঝি সময়, সত্তরের প্রথমাংশে রণজিৎমল কাঙ্কারিয়া যে স্টার থিয়েটার গ্রহণ করেন, চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁরও পূর্ববর্তী সংযোগ সর্বজনবিদিত।

নব্বইয়ের শুরুতেই স্টার থিয়েটার অগ্নিদগ্ধ হয়ে যাওয়ায় পেশাদার রঙ্গালয়ের যে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সমাপ্তি চিহ্নিত হয়েছিল, সম্প্রতি তারও একযুগ অতিক্রম করে আর একটি অধ্যায় শেষ হল একইরকম অগ্নিকাণ্ডে, ২৯ অগাস্ট ২০০১ সালের মধ্যরাত্রে রঙমহল পুড়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। প্রায় ৬৭ বছর আগে যে রঙ্গালয়ে সতু সেন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ স্থাপন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, বাঙালি দর্শকদের সামনে সেই মঞ্চের নিষ্ঠুর বিলুপ্তি চিরদিনের আর একটি কলঙ্কিত ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। অথচ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৮ অগাস্ট রঙমহলের উদ্বোধন রজনীতে 'শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকের প্রথমাভিনয়ের পূর্বে প্রবীণ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : 'নূতন থিয়েটার খোলা হচ্ছে, এতে আমাদের চেয়ে আনন্দ আর কার বেশী? আনন্দের কারণ একটা নূতন থিয়েটার জন্মাচ্ছে বলে, গোত্রবৃদ্ধি হচ্ছে বলে। গোত্রবৃদ্ধি হলে বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আনন্দ বেশী হয় বাড়িতে যারা বুড়ো আছে তাদের। তার কারণ বুড়োদের দিন সংক্ষেপ, তাদের চোখের উপর যত গোষ্ঠীবৃদ্ধি হয়, ততই আনন্দ বাড়ে, ধারা বজায় থাকবে এই আশায়। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি এই যে, বাংলায় নতুন একটি রঙ্গালয় আজ জন্মালো, যার নামকরণ হয়েছে রঙমহল, এই রঙমহলের জীবন সুদীর্ঘ হোক, এ সবল হোক, সুস্থ ও সুন্দর হোক, বঙ্গনাট্যবাণীর মুখ উজ্জ্বল করুক।

আমার বিশ্বাস এ তা করবেই। কারণ এর লালনপালনের ভার যিনি নিয়েছেন, তিনি স্বনামধন্য নট আমার স্নেহের ও শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীমান শিশিরকুমার ভাদুড়ী।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য অপরেশচন্দ্রের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, মাস সাতেকের মধ্যেই শিশিরকুমার রঙমহলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। প্রায় বৃদ্ধ বয়সে অপরেশচন্দ্র তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, নতুনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন দ্বিধাহীন কণ্ঠে, কেননা মনেপ্রাণে যথার্থই উদার মানুষ ছিলেন বলে। নাট্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করে প্রয়াণোত্তর শোকলেখনে অপরেশচন্দ্র সম্পর্কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে 'নাচঘর' পত্রিকা লিখেছিল : 'কেবল অধ্যক্ষরূপেই বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। কোন সময়ে কেমনভাবে কাজ চালালে রঙ্গালয়ের উন্নতি হয়, এ জ্ঞান তাঁর যথেষ্ট ছিল, 'কর্ণার্জুন' অভিনয়কালে 'স্টারের' পতাকার তলায় নব নব অভিনেতাকে আহ্বান করে তিনি তাঁর প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়ে গেছেন। ' বলাবাহুল্য, উত্তরকালে যথার্থ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অধ্যক্ষের অভাবেই, অনভিজ্ঞ, আত্মম্ভরী এবং নিছক বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন স্বত্বাধিকারীদের প্রলোভনের পাকে জড়িয়ে জড়িয়ে দিনদিন পেশাদার মঞ্চের দুর্গতি বারবার প্রকট হয়ে উঠছে। মহেন্দ্র গুপ্ত কথিত 'ধনিকের বিলাস কেন্দ্র' হিসাবে যেদিন 'নৈশপানাগারে বীভৎস উল্লাসে মদমত্ত নরপশু'র মত্ততার মধ্যে বাঙালির রঙ্গালয় প্রমোদ-বিলাসের কেন্দ্রে পরিণত হলে, ঐতিহ্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই তার পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

থিয়েটারের সংখ্যাবৃদ্ধিকে মহেন্দ্র গুপ্তও স্বাগত জানিয়েছিলেন স্বাধীনতার দু'বছর আগে রঙ্গামঞ্চের আর্থিক উন্নতির মধ্যেও ভবিষ্যৎ-সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে। থিয়েটারের সংখ্যাবৃদ্ধি হলে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা সব থিয়েটারগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে, ব্যবসার ক্ষতি হবে — যাঁরা এই যুক্তি দেখান, তাঁদের তিনি সমর্থন করতে পারেননি। যদিও সেই সময়ের অস্বাভাবিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য যে কেবল থিয়েটার কর্তৃপক্ষের নিপুণ ব্যবসাবুদ্ধির দ্বারা ঘটেনি, একথা তিনি অনুভব করেছিলেন। যুদ্ধের বাজারে প্রচুর কাঁচা পয়সা রোজগার করেছেন যাঁরা, তাঁরা অনেকেই জলের মতো পয়সা খরচ করার আকাঙ্ক্ষায় থিয়েটার খোলার দিকে ঝুঁকেছিলেন। যে জন্য যাঁদের থিয়েটার খোলার মতো অর্থ আছে তাঁদের তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন : 'তাঁরা থিয়েটার না খুলে, যদি বর্তমান থিয়েটারগুলির সঙ্গে যোগ দিয়ে, ভাবীকালের বিপদের হাত থেকে তাঁদের বাঁচতে সাহায্য করেন, সেই হবে সবদিক থেকে যুক্তিসঙ্গত।' কলকাতার থিয়েটারগুলোর কোনও সঙ্ঘবদ্ধ মিলন কেন্দ্র ছিল না তখন, অথচ আভ্যন্তরীণ দৈন্য ঘোচানোর জন্য সম্মিলিত ঐক্যভাবনার মধ্যেই মঞ্চ জগতের সংকট মোচন সম্ভব। তাঁর এই অনুভব নিছক কোনও তাৎক্ষণিকতার সমাধানের প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়নি — বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ কয়েক দশক জুড়ে যে পেশাদার মঞ্চ ক্রমান্বয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল তার মূলেও ওই সত্যটাই বড় করে দেখা দিয়েছিল। এই দৈন্য প্রকট হয়ে ওঠায়, মঞ্চমালিক ও মঞ্চাধ্যক্ষ তাঁদের প্রদর্শিত নাটকের মধ্যে দর্শক সাধারণের প্রকৃত চাহিদা পূরণ করা দরকার সে বিষয়ে উদাসীন থেকেছেন। তাঁরা চমকসর্বস্ব কিংবা শরীরসর্বস্ব প্রযোজনায় দর্শকরা আকৃষ্ট হবেনই এই অলীক বিশ্বাসে অকাতরে অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করেননি। তার ফল মঞ্চব্যবসার গাঢ় অন্ধকারকেই ক্রমশ ব্যাপ্ত করে তুলেছে। অথচ দর্শকের চাহিদা আর মঞ্চের মননকে এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে না বাঁধতে পারলে নতুন করে আশার আলো জ্বেলে দেওয়া সম্ভব হবে না। শিশিরকুমার যেমন তাঁর জীবনের শেষ পর্বে পেশাদার রঙ্গালয়ের দুর্দশার দিকে তাকিয়ে 'সমাজের হৃদ-কেন্দ্র আর আমাদের রঙ্গামঞ্চের মধ্যে' সুগভীর বিচ্ছেদের গহ্বরটি সজ্ঞানে ভরাট করে তোলার কথা ভেবেছিলেন, আজ সেই মহত্তর ভাবনার পথেই হয়তো ঐতিহ্যশালী থিয়েটার-গৃহগুলি রক্ষা করার কথা ভাবতে হবে নতুন করে।

বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিপাত
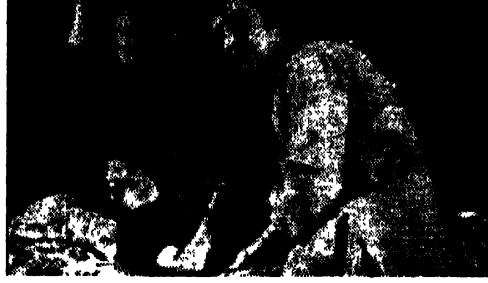
'নামজীবন' নাটকে সৌমিত্র ও মাধবী

গ্রুপ থিয়েটারেরও দায়িত্ব ছিল

তাপস সেন

আজ আমরা পেশাদারি থিয়েটারের বিলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে নেমেছি। যখন সব শেষ, তখন আমরা কারণ অনুসন্ধানে আগ্রহী। অথচ যখন রমরম করে চলেছে, বা যখন একটু একটু করে যেন বেসুরো সুর শোনা যাচ্ছিল তখন তো সতর্ক হইনি। তখন তো ভাবিনি কীভাবে এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু পেশাদারি থিয়েটারের এই পরিণতির আশঙ্কা আজ থেকে অনেক বছর আগেই প্রকাশ করে গেছেন শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ, 'মঞ্চে ও নেপথ্যে'-তে তিনি সরাসরি এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কলকাতার বুকে তখন পাঁচটি থিয়েটার সাংঘাতিকভাবে চলছে — স্টার, মিনার্ভা, রঙমহল, শ্রীরঙ্গাম এবং কালিকা। সেই সময় মহেন্দ্র গুপ্তের মনে প্রশ্ন জাগছে — এই থিয়েটার টিকে থাকবে কি? বলা যায় না। যখনই এই আশঙ্কা ফুটে উঠছে তখনই ধরে নিতে হবে ধ্বংসের বীজ বপন করা হয়ে গেছে। — না হলে আশঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছে কেন? যাই হোক, আমরা সতর্ক হইনি, আমরা আত্মসুখে পরিতৃপ্ত থেকেছি — তাই আজ এই অবস্থা। কলকাতার বুকে পেশাদারি থিয়েটার বলতে আজ আর কিছুই নেই — সবই ইতিহাস।

আমার বাল্য-কৈশোর-লেখাপড়ার সময়টা কেটেছে দিল্লিতে। সেখানে অ্যামেচার থিয়েটারের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই যোগাযোগ। ড্রইং শিক্ষক প্রতাপ সেনই থিয়েটারের পোকাটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতায় এলেই থিয়েটারেরপাড়ায় ঘুরে বেড়াতাম। স্কুল শেষ করার ঠিক পরে পরেই, এই ১৯৪৪ সাল নাগাদ, রঙমহলে দেখেছি 'রামের সুমতি', দেখেছি প্রথম রিভলবিং মঞ্চে 'মহানিশা'। আর পেশাদারি থিয়েটারে প্রথম ভিন্নস্বাদের নাটক 'ঝড়ের রাতে'।

পেশাদার থিয়েটারে আমার প্রথম কাজ ১৯৫৬ সালের জুন মাসে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতনে' এবং তারপর বিধায়ক ভট্টাচার্যের সামাজিক নাটক 'ক্ষুধা'-য়। পরিচালনায় নরেশ মিত্র। তিন বেকার যুবকের দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াইয়ের গল্প। লক্ষ্য করার বিষয় হল, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা পেশাদারি থিয়েটারেও দেখা

গেছে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি রঙমহলে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী' তার প্রথম উদাহরণ। টেলিফোন অপারেটরের জীবন নিয়ে নাটক। অভিনয় করার কথা ছিল শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসুর, পরে অবশ্য এঁরা করেননি। পরিচালনায় বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। আলোক পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রথমে আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলেও এই নাটকে আমি আলো করিনি। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির নাটক 'দূরভাষিণী'। ইতিমধ্যে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত খানিকটা পরিচিতি পেয়ে গেছেন। যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তরুণ রায়। তিনি করলেন 'এক পেয়ালা কফি', 'এক মুঠো আকাশ'। এর কিছু পরে পার্থপ্রতিম চৌধুরী নিজের গল্প নিয়ে পরিচালনা করলেন 'ছায়ানায়িকা'। সেখানে আলোক পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলাম আমি। ভিন্ন রুচির নাটক হিসাবে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'রাজদ্রোহী'। পরিচালক দিলীপ রায়, নায়কের ভূমিকাতেও তিনিই অভিনয় করেছিলেন। পেশাদারি থিয়েটারে এই নাটকটি আরও বিশেষ কারণে উল্লেখের দাবি রাখে। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন শ্রদ্ধেয় বিজন ভট্টাচার্য। এই নাটক চলাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয়।

একদা যেখানে ছিল একটি সাবানের কারখানা, সেখানেই প্রবোধ গুহের উদ্যোগে তৈরি হয় নাট্য নিকেতন। পরবর্তীকালে শিশির ভাদুড়ী এই থিয়েটারের দায়িত্ব নেন এবং নতুন নামকরণ হয় শ্রীরঙ্গম। এখানে 'বিপ্রদাস', 'সধবার একাদশী', 'সীতা', 'মাইকেল' — এসবই আমার দেখা। কিন্তু দেনার দায়ে থিয়েটার ছেড়ে দিতে হয় তাঁকে। চলে যান বরানগর বাজারের কাছে স্বেচ্ছা-নির্জনাবাসে। ১৯৫৫-৫৬ সালে এখানেই হল বিশ্বরূপা। শ্রীরঙ্গম নামটি শিশিরবাবু কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না, তাই বিশ্বরূপা। চলচ্চিত্র পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হল 'আরোগ্য নিকেতন'। পেশাদারি থিয়েটারে এই প্রথম আমি আলোর কাজ করলাম। সংগীত পরিচালক কমল দাশগুপ্ত। নৃত্য পরিচালক অনাদি প্রসাদ। এরপরে হল নরেশ মিত্রের পরিচালনায় 'ক্ষুধা'। উল্লেখ করা যেতে পারে, একটানা চলার ট্র্যাডিশনে যেমন 'শ্যামলী' একটি নাম তেমনই 'শ্যামলী'-র রেকর্ড ভেঙেছে রঙমহলের 'উল্কা', 'উল্কা'-র রেকর্ড ভেঙেছে 'ক্ষুধা'। 'ক্ষুধা'-র পরে রাসবিহারী সরকারের নজর এলো অন্য কিছু করার। কিরণ মৈত্রের একাঙ্ক 'বুদবুদ'। গল্পটি সম্প্রসারণ করেছিলেন কিরণবাবু। আরও বড় করে নাট্যরূপ দিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। 'উল্কা' এবং 'ক্ষুধা'-র সাফল্য দেখে রাসবিহারীবাবুর মনে সংস্কার তৈরি হল নামকরণ করতে হবে দুই অক্ষরের, 'বুদবুদ' নাম বদলে নাট্যরূপের নামকরণ হল 'তৃষ্ণা'। 'তৃষ্ণা'-র পরে 'সেতু'। মনে রাখতে হবে, ইতিমধ্যে গ্রুপ থিয়েটারের অঙ্গনে 'রক্তকরবী' বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিশ্বরূপার মালিক দক্ষিণেশ্বর সরকারও 'রক্তকরবী' দেখেছেন। উনি অবশ্য নাটকটি মোটেই পছন্দ করেননি — উনি বলতেন 'রক্তকম্বল'। তবে পছন্দ হয়েছিল তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়। 'সেতু'-র জন্য তৃপ্তি মিত্রকে পেশাদারি মঞ্চে নিয়ে এলেন উনি। আলোয় নতুনত্ব কিছু করতে হবে — স্পেক্টাকুলার কিছু চাই — এই দাবি থেকে তৈরি হল ট্রেন লাইন, হল মঞ্চে চলন্ত ট্রেন। ক্ষুধার রেকর্ড ভাঙল 'সেতু'। ক্রমাগত চলল।

ইতিমধ্যে মিনার্ভায় নিয়মিত অভিনয় শুরু করল এল. টি. জি.। 'নীচের মহল', 'ছায়ানট', 'ওথেলো' — এই তিনটি নাটক নিয়ে শুরু করল ওরা। চলল না। দেনার দায়ে ডুবে গেল। তখন কিন্তু 'সেতু' চলছে রমরম করে। এবার মিনার্ভায় 'অঙ্গার'-এর পরিকল্পনা নেওয়া হল। প্রচন্ড খেটে আলোর পরিকল্পনা করলাম। এর মধ্যে বিশ্বরূপা থেকে উকিলের চিঠি। আমি তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ — মিনার্ভায় যুক্ত হতে পারব না। আমরাও বাঁকা পথ নিলাম। আমি হয়ে গেলাম টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার, উপদেষ্টা। ব্যস, আর বাধা রইল না।

ক্রেম ব্রাউন ইনস্টিটিউটে 'কালবৈশাখী', নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট বা ই. বি. আর. ম্যানশনে বিজন ভট্টাচার্যের 'নীলদর্পণ', 'মরাচাঁদ'. 'কলঙ্ক', প্রতাপ মেমোরিয়ালে 'নিশিপদ্ম', রামমোহনে 'থানা থেকে আসছি', কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে 'অ্যান্টনি কবিয়াল', 'মল্লিকা', 'নামজীবন' — এসবেই আমি নিজে যুক্ত ছিলাম। এসব নাটক তো নতুন ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টাই করেছে। তবু থিয়েটার টিকল না কেন? উদাহরণ আরও আছে, 'নীলকণ্ঠ', 'ভালোখারাপ মেয়ে', 'দর্পণে শরৎশশী'। শেষোক্ত নাটকটি আরও একটি কারণে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে — এই নাটকেই খালেদ চৌধুরীর প্রথম পেশাদার থিয়েটারে মঞ্চসজ্জা। এর আগে বহু অনুরোধেও উনি পেশাদার মঞ্চে কাজ করতে সম্মত

হননি। কিন্তু তবু আজকের এই হতাশা। পেশাদারি থিয়েটারে নতুন কিছু ভালো কিছু করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনটি নাম, প্রথম হরিদাস সান্যাল, দ্বিতীয় শুক্লা সেনগুপ্ত এবং তৃতীয় সমর মৈত্র। এঁরা বারবার ভালো কাজ করার চেষ্টা করেছেন, কেন কোনও নাটক চলেছে কোনও নাটক চলেনি সে-প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

আমার মনে হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যেমন চলচ্চিত্রে দেখা গেছে প্রোডিউসার বা প্রযোজক — থিয়েটারেও তেমনই। থিয়েটার মালিক আর থিয়েটার করেন না, বাইরে থেকে প্রযোজক এসে থিয়েটার করে। অর্থাৎ থিয়েটার আর পেশাদারি নয়, একেবারে বাণিজ্যিক। ব্যবসায়িক হলেই আরও অনেক ফ্যাক্টর এসে যায়, তখন রুচি থেকে রুপি অর্থাৎ টাকার অঙ্কটা অনেক বড় হয়ে দেখা দেয় এবং স্বভাবতই বেনোজল ঢোকে। তারই পরিণতিতে থিয়েটারে ক্যাবারে ঢুকল, থিয়েটার গৌণ হয়ে গেল। তার ওপর আছে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার আধিপত্য। এর যেমন ভালো দিক আছে, তেমনই খারাপ দিকও আছে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই মিডিয়া পরবর্তী প্রজন্মের চটুল সস্তা রুচি তৈরি করছে। গ্রুপ থিয়েটারের এখানে একটা বড় ভূমিকা ছিল। রঙ্গনায় নান্দীকার একসময় সে চেষ্টা চালিয়েছে, বিজন থিয়েটারেও খানিকটা চলেছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। তাদেরই আরও বড় উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল। তাহলে হয়তো পেশাদার থিয়েটারের অন্য রূপ আমরা দেখতে পেতাম — এই ভস্মীভূত রূপ নয়, প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিতে আমাদের প্রয়োজন ছিল নতুন সময়ের ছবি।